রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা

নীহাররঞ্জন রায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত
১৯৪১

"তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়-মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি'
মোর গান হানি'।"

শ্রীমতী মণিকা দেবী

করকমলে

বিষয়-সূচী

বিষয় — পৃষ্ঠা-সংখ্যা

দেহাকর্ষণ ও রোমান্টিক ভোগাকাঙ্ক্ষা—দেহসম্ভোগের অতৃপ্তি—"মানসী"তে আত্ম-প্রতিষ্ঠা—প্রথম সার্থক কাব্যসৃষ্টি—প্রেমের কবিতা—বস্তুনিরপেক্ষ, কামানৈকট্যহীন প্রেম—ভাবলোকের আসঙ্গলিপ্সায়ই প্রেমের চরিতার্থতা—দেহ-আত্মার প্রেমলীলা—রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য—"মানসী"র নিসর্গ-কবিতার কান্ত ও রুদ্ররূপ—নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যময় কাব্যময় জীবনে অতৃপ্তি—"চিত্রাঙ্গদা"র রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গীতধর্ম—(৪) "সোনার তরী", "চিত্রা"—বস্তুহীন কল্পনা হইতে মুক্তি, বস্তুময় বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ—প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মবোধ, একান্ত তন্ময়দৃষ্টি—সবল কল্পনা ও গভীরতর ভাবসমৃদ্ধির সূচনা—জীবনের নূতন দৃষ্টি—নিসর্গানুভূতির সমগ্রতা—'সোনার তরী'র চিত্র ও ভাব-সৌন্দর্য—'নিরুদ্দেশ যাত্রা'—"চিত্রা"য় সোনার তরী পারে ভিড়িল—কবি-মানসের অপরূপ পরিণতি—প্রেমময়, সৌন্দর্যময় জীবন-পর্যায়ের পরিপূর্ণতা—"চৈতালি"তে জীবনান্তরের আভাস—"চৈতালি"র চতুর্দশপদী কবিতা—মানব-মহিমার পূজা—"চৈতালি" "নৈবেদ্য"-গ্রন্থের ভূমিকা—(৫) জীবনসন্ধি যুগ—জীবনকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা—"কথা" ও "কাহিনী"-গ্রন্থের উপাদান ও রবীন্দ্রচিত্তে ভারতীয় ঐতিহ্যের আবেদন—মানব-মহত্ত্বের রূপ, প্রাচীন ভারতবর্ষের রূপের আকর্ষণ—"কল্পনা"য় কবিচিত্তের দুই ধারা—কবির সৃষ্টি-প্রচেষ্টাকে নামাঙ্কিত করিবার বিপদ—গভীর জীবন-দ্বন্দ্ব—নূতন মহাজীবনের আহ্বানের স্বীকার—"ক্ষণিকা"র ক্ষণিক সাধনা—দুইদিকের টানে স্পর্শকাতর চিত্তের বেদনা—"ক্ষণিকা"র ছন্দরূপ—প্রেম ও সৌন্দর্যতন্ময় জীবন হইতে একান্ত বিদায়—(৬) "নৈবেদ্য" ভারতীয় মহিমার গভীরতর প্রকাশ—স্বদেশ-চেতনা—অধ্যাত্ম-চেতনা ও অধ্যাত্মাদর্শ—সংসার নিরপেক্ষ সাধনা নয়—সহজ উপলব্ধির সূচনা - ভাবোন্মাদ মত্ততার প্রতি বিরাগ—বীর্য ও জ্যোতি, জ্ঞান ও কর্মময় ভক্তি—মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শের সাধনা—বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার সঙ্গে পার্থক্য—"স্মরণ"—ব্যক্তিগত শোকের নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি—মৃত্যুর মাধুরী জীবনের মধ্যে বিস্তৃত—"শিশু"—"উৎসর্গ"—"খেয়া" ও সমসাময়িক বাঙ্‌লার সমাজ ও রাষ্ট্র—পারিবারিক জীবনে মৃত্যুর হানা—"নৈবেদ্যে"র সঙ্গে "খেয়া"র যোগ—রূপক-রহস্য—বাহিরের কর্মময় জীবন ও ভিতরের ভাবময় আত্মগত অনুভূতি "খেয়া"র কাব্যমূল্য—"খেয়া"য় কবি খেয়াপার হইলেন—নবজন্মলাভের

সূচনা—(৭) কবিচিত্তের নূতন রূপ—অধ্যাত্মজীবনে দীক্ষা—"গীতাঞ্জলি"তে সাধনার কথা, বেদনার কথা, সংগ্রামের কথা—ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথ—মধ্যযুগীয় সাধক-কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্র-অধ্যাত্মাদর্শের পার্থক্য—বৈষ্ণবপদকর্তাদের সঙ্গে তুলনা—উপনিষদের অধ্যাত্মযোগ ও রবীন্দ্রাদর্শ—"গীতাঞ্জলি"র সুর—"গীতাঞ্জলি" অসমাপ্ত সাধনার কাব্য—"গীতিমাল্য" ও "গীতালি"তে সাধনার পরিণতি—ভাগবত-সাধনার সহজ মুক্ত আনন্দ ও আরাম, তৃপ্তি ও শক্তি—"গীতিমাল্য", "গীতালি" শ্রেষ্ঠতর কাব্য—ভাগবত সাধনার পরিপূর্ণতা—একটি পথের শেষ—কবি ত পথের শেষ চাহেন নাই—পুরাতন ধূলিময় স্বর্গভূমির প্রতি নূতন প্রেমের জাগরণ—(৮) নূতন পথের আহ্বান—কবির ব্যক্তিজীবন ও সমসাময়িক সমাজ-জীবনে তাহার কারণ অনুসন্ধান—যৌবনের নূতন বোধন ও "বলাকা"—"বলাকা"র গভীরতর সুর—পূর্ব-জীবনের যৌবনপূজা এবং পরিণত জীবনের যৌবন-পূজার পার্থক্য—সমাজ-চেতনা ও চিত্তের এই ভাব-পরিবর্তন—যৌবনের জয়গান "বলাকার" শেষ কথা নয়, মূল কথাও নয়—"বলাকা" গতিরাগের কাব্য—এই গতিরাগ কোনও তত্ত্ব নয়, তত্ত্বহিসাবে "বলাকা" বিচার্যও নয়—'শা-জাহান' কবিতায় চিন্তাসূত্রের একটি গ্রন্থি—'চঞ্চলা' ও 'বলাকা' কবিতা—কিন্তু গতিই কি একমাত্র সত্য? মৃত্যুভাবনা ও গতিবেগ হইতে মুক্তিও গতির অন্যতম সত্য—"বলাকা"র অন্যান্য কবিতার সুর—মাটিমায়ের আহ্বান—"পলাতকা"য় মাটির স্বর্গের রূপ—পুরাতন জীবনের নূতন অভিব্যক্তি—সমাজ-চেতনার পরিচয়—"লিপিকা" ও "শিশু ভোলানাথ"— মানসিক নির্লিপ্ততা—"পূরবী"র সৃষ্টি-উৎস—"পূরবী"র সুর—হারাইয়া যাওয়া দিনগুলির জন্য দুঃখ বোধ—'তপোভঙ্গ' কবিতায় কবির নিজের তপস্যা-ভঙ্গ—"পূরবী"র ছন্দজগৎ—'লীলা-সঙ্গিনী' কবিতা।

ছোটগল্প

(১) বাঙ্‌লা ছোটগল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ—বাঙালীর সমাজ-জীবনে উপন্যাসের উপাদানের অভাব—সমাজ-জীবনের নিভৃত দুর্লভগোচর দিক্ এবং ছোট-গল্পের উপাদান—রবীন্দ্র-দৃষ্টির আবিষ্কার—রবীন্দ্র-ছোটগল্পের গীতধর্ম—(২) রবীন্দ্র-ছোটগল্পের প্রথম পর্যায়—সমসাময়িক কাব্যসৃষ্টি—গল্পের

পরিবেশ সৃষ্টি ও সুরাবেগের স্পর্শ—যে-বস্তুকে লইয়া গল্প সেই বস্তুর রূপের পরিবর্তন—অপূর্ব প্রশান্তি ও অচঞ্চল অবসান—বিশেষ নির্বিশেষে রূপান্তরিত —উত্তর-পর্যায়ের গল্পগুলিতে এবং অতিপ্রাকৃত রহস্যধর্মী গল্পেও সুরাবেগের স্পর্শ—অতিপ্রাকৃত রহস্যধর্মী গল্প—বাস্তব ও অতিপ্রাকৃতের অপূর্ব সমন্বয়—(৩) সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সত্য রূপ—মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয়—জটিল হৃদয়বৃত্তির লীলা বিশ্লেষণ—প্রকৃতির ভাষায় মানুষের রূপান্তর—(৪) বুদ্ধিসাধ্য সমস্যা-প্রধান বাস্তবনিষ্ঠ ছোটগল্প—কথা-সাহিত্যের নূতন অধ্যায়—সামাজিক অগ্রগতির চেতনা—রবীন্দ্র-মানসের বিবর্তন—বাঙলার সমসাময়িক চিন্তা ও কর্মধারা এবং তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ—'স্ত্রী'র পত্র' ও নারীর মূল্য—'নামঞ্জুর গল্প' ও সমসাময়িক রাষ্ট্রীয়ান্দোলনের চেতনা—বাঙলা কথাসাহিত্যের নূতন ধারা—রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত।

(১) বাঙলা সাহিত্যে নাটকের অভাব—সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য, ইংরাজী নাটক ও রবীন্দ্র-নাটকের প্রকৃতি—সমসাময়িক কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধ—রবীন্দ্র-নাটকের ধর্ম (২) নাট্যপ্রতিভার উন্মেষ—সুরাশ্রয়ী গীতি-নাট্য—প্রথম সার্থক নাটক "প্রকৃতির প্রতিশোধ"—জীবনের পূর্ণতর সত্যের ইঙ্গিত—বৃহত্তর মানবতার জয়গান—সমসাময়িক সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ—(৩) "রাজা ও রাণী"র সাহিত্যবিচার—নাট্টীয়গুণের দুর্বলতা—ভাবাশ্রয়ী নাটক—"রাজা ও রাণী"র গল্পবস্তু—নাটকীয় সংস্থানের শৈথিল্য—বিক্রম-দেবের চরিত্রের পরিবর্তনের মধ্যেই নাটকীয় সম্ভাবনার পরিণতি—ইলা ও কুমারের গীতিকাব্যিক জলীয় উপাখ্যান—পঞ্চম অঙ্কের দ্রুত ঘটনাস্রোতের কারণ—"রাজা ও রাণী"র অন্তর-রহস্য—চরিত্র-ব্যাখ্যা—"বিসর্জনে"র গল্প-বস্তু—ঘটনাসংস্থানের দৃঢ়তা—স্থির অথচ সবল গতিবেগ—দুই বিরোধী সমস্যায় নাটকীয় দ্বন্দ্বের উৎপত্তি—"বিসর্জনে"র অভিনয়-সাফল্যের কারণ—জয়সিংহ চরিত্র—রঘুপতি চরিত্র ও তাহার বিবর্তন—অপর্ণা চরিত্র পরিবর্তন-হীন—অপর্ণা একটি 'আইডিয়া'র রসমূর্তি—পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পরই নাটকের যবনিকাপাত হওয়া উচিত ছিল কিনা—এই বিচারের বিরুদ্ধ যুক্তি

—"শকুন্তলা" নাটকের সঙ্গে তুলনা—"বিসর্জন" ও "মালিনী"র তুলনামূলক আলোচনা—রবীন্দ্র-নাট্যের গীতধর্ম—"মালিনী"র গল্পবস্তু—মালিনী"র নাট্টীয় গুণ ও সাহিত্যবিচার—"মালিনী"র দ্রুত ঘটনাস্রোত—দৃঢ়, সংহত গল্প-সংস্থান—মালিনী কি "unconvincing figure"?—মালিনী কাহাকে ভালবাসিয়াছিল?—মালিনীর ভালবাসার স্বরূপ—"মালিনী"র 'আইডিয়া'—(৪) "কাহিনী"র নাট্যকাব্যপঞ্চক—"Reading drama"—'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' ও 'সতী'র নাটকীয়ত্ব—ইহাদের উপাদান ও ভারতীয় ঐতিহ্য—মানবধর্মের জয়গান—প্রাচীন কাব্য ও পুরাণ ইতিহাসের নূতন অর্থনির্দেশ—সমসাময়িক সমাজ-চেতনা—(৫) সঙ্কেত-রহস্যধর্মী নাট্য-পর্য্যায়—গীতধর্মী নাটকের প্রকৃতি—সঙ্কেত-রহস্যধর্মী নাটকের স্বরূপ—ইহার ইতিহাস—ভারতীয় মানসে ইহার ইঙ্গিত—রবীন্দ্র-মানসের বৈশিষ্ট্য—জীবনের পূর্ণতর গভীরতর পরিণতির রূপ দিবার চেষ্টা—সঙ্কেতধর্মী নাট্যের রূপ ও ভঙ্গি—য়ুরোপীয় রহস্যধর্মী নাটকের সঙ্গে তুলনা—রবীন্দ্র-সঙ্কেতধর্মী নাটকের বৈশিষ্ট্য—এই ধরণের নাটককে নাটক বলা যায় কিনা?—অরূপ অতীন্দ্রিয় জগতের আকুতি—জীবনের পূর্ণ পরিণতির ইঙ্গিত—(৬) "শারদোৎসবের" 'আইডিয়া'—সাহিত্যবিচার—নাটকীয় রূপ ও সৌন্দর্যকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে 'আইডিয়া'—"শারদোৎসবের" যুক্তি কি সার্থক?—"প্রায়শ্চিত্তের" নাট্টীয় গুণ—ধনঞ্জয় বৈরাগী ও তাহার বিবর্তন—"রাজা" নাটকের 'আইডিয়া'—কলাকৌশল—দৃশ্যগত দ্বন্দ্ব-রচনার সচেতন চেষ্টা—"অচলায়তনে"র সমাজ-চেতনা ও ঐতিহাসিক বোধ—রূপক ব্যাখ্যা—"ডাকঘর", শ্রেষ্ঠ সঙ্কেত রহস্যময় গীতধর্মী নাটক—সাহিত্যবিচার—গল্পবস্তু—অমল চরিত্র ও কবির নিজের বাল্যাবস্থার রুদ্ধ পীড়িত পরিবেশ—"ফাল্‌গুনী"র মর্মবাণী—কবিকল্পনা ও সমাজ-চেতনা—"মুক্তধারা" ও সমসাময়িক সমাজ-মানস—য়ুরোপীয় সমাজ-মানসের সঙ্গে যোগ—গল্পবস্তু—সাহিত্য বিচার—যান্ত্রিকতার প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গি—অভিজিতের জন্মরহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন—গোরার জন্মরহস্যের সঙ্গে তুলনা—বুদ্ধদেব—কর্ণের জন্মরহস্য ও মহাভারতকারের কবিমানস—"মুক্তধারা"র নাট্টীয়গুণ—"রক্তকরবী" গীতধর্মী নাটকীয় কাব্য—সাহিত্য-বিচার—"যক্ষপুরী" নাম অধিকতর সার্থক—গল্পবস্তু ও 'আইডিয়া'—সমাজ-চেতনা—"রক্তকরবী"র দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিক।

বুদ্ধিসাধ্য উপন্যাস—শ্রীবিলাসের দৃষ্টি ও মনন-ভঙ্গিই "চতুরঙ্গে"র রহস্য-কুঞ্চিকা—পাঠকের কাছে স্বচ্ছ দৃষ্টি ও মোহমুক্ত বুদ্ধির দাবী—পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নাই, কিন্তু পরিপূর্ণ ইঙ্গিত আছে—শচীশ—দামিনী—শ্রীবিলাস শচীশও নয়, দামিনীও নয়—চরিত্রগুলির পরিবর্তনের প্রত্যেকটি স্তর সম্পূর্ণ উন্মাটিত, কিন্তু উন্মাটনের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কেতময়—নিয়মহীন উদ্দাম খেয়াল নয়, আত্মানুসন্ধান—"চতুরঙ্গ" বিবরণ-ধর্মী উপন্যাস নয়—কবি-কল্পনার সমৃদ্ধি—ঘটনা ও চরিত্রের ক্ষণিক দীপ্তি—তবু, "চতুরঙ্গ" মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি নয়, যদিও সুন্দর ও সার্থক সৃষ্টি—"ঘরে বাইরে"—সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য—"ঘরে বাইরে"র সামাজিক পটভূমি—সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র-চেতনা—ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি—গতিবেগ—নিখিলেশের আদর্শ ও তাহার পরিণতি—সন্দীপ চরিত্র—নিখিলেশ চরিত্র—বিমলা চরিত্র—চন্দ্রনাথ বাবু—মেজরাণী—ঘটনাস্রোতের পরিণতি—একটি প্রশ্ন—আদর্শ-বিচারের মানদণ্ড যেন নিরপেক্ষ নয়—(৭) "যোগাযোগ"—সূচনায় নাম ছিল "তিন পুরুষ"—নাম পরিবর্তনের কৈফিয়ৎ—কৈফিয়ৎ যুক্তিসহ কিনা—উপন্যাসটির নাম ও নামের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সম্বন্ধ—একটি অনুমান—ঘটনা-সংস্থান ও বিষয়-বিন্যাস - গল্পবস্তুর বিভিন্ন পর্বের বিবৃতি—মধুসূদন—কুমুদিনী—নবীন ও মোতির মা—বিপ্রদাস—কুমুর স্বামীগৃহ ত্যাগের পর রচনা বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু গল্প আর বিস্তৃত হয় নাই—"যোগাযোগে"র কল্পনা খণ্ডিত—ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি—গল্পের বিবৃতি দীপ্ত, কিন্তু গতি মন্থর—ইহার কারণ—"শেষের কবিতা"—"শেষের কবিতা" চরম কাব্যোপন্যাস—সামাজিক আশ্রয় ও সমাজ-চেতনা—প্রেমোপজীবি উপন্যাস—জীবনের বাস্তবতা ও রোমান্সের কল্পলোক—সাহিত্যিক মূল্য—বিচার্য বস্তু—ঘটনাবিন্যাস একটু জটিল—গল্পের বিবৃতি ও চরিত্র-বিকাশ—লাবণ্য-অমিত—কেটি-অমিত—লাবণ্য-শোভনলাল—অমিতের কৈফিয়ৎ-বিচার—কেটির কাছে অমিতের প্রত্যাবর্তন উপন্যাসের প্রয়োজনে যেন নয়—চরিত্র-চিত্রণ-দক্ষতা—"শেষের কবিতা" কি satire?—"শেষের কবিতা" অপূর্ব, কিন্তু বৃহৎ ও মহৎ উপন্যাস নয়—রবীন্দ্রোপন্যাসের উপজীব্য—"গোরা"-পরবর্তী উপন্যাসের সামাজিক পটভূমি ও সমাজাশ্রয়।

নামসূচী ৪৭৩

নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের আশী বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। বাঙালী ও ভারতবাসীর পরম সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি আজও আমাদের মধ্যে বর্তমান। জরা তাঁহার বলিষ্ঠ মন ও চিত্তকে জীর্ণ করিতে পারে নাই; ক্ষীয়মাণ দেহের শাসন নাশন চূর্ণ করিয়া তাঁহার বুদ্ধি ও কল্পনা থাকিয়া থাকিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে।

পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া এই দুর্জয় প্রদীপ্ত প্রতিভা বাঙ্‌লা সাহিত্যের চক্রবর্তিক্ষেত্রে জ্যোতি বিকিরণ করিতেছে; শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের সকল স্তরের সকল জ্ঞান ও কর্মে, ধ্যান ও ধারণায়, চিন্তা ও আদর্শে, আচার ও ব্যবহারে তাঁহার অপরিমেয় দান ও প্রদীপ্ত প্রতিভার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। একথা আজ আর কোনও প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা।

আমার এই গ্রন্থ সেই দান ও সেই সূর্যকরোজ্জ্বল কবি-প্রতিভার সমগ্র পরিচয় দিবার স্পর্ধা রাখেনা। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠে যাঁহারা আনন্দলাভ করেন, সেই সাহিত্য-তীর্থে পরিক্রমা করিয়া যাঁহারা অন্তরে তৃপ্তিলাভ করেন, আমি সেই সহস্রের একজন। যে চংক্রম-পথ ধরিয়া আমি এই তীর্থ-পরিক্রমা করিয়াছি, সে-পথই একমাত্র পথ এ-দাবী করিবার মতন স্পর্ধাও আমার নাই। তবু, এই পথ ধরিয়া তীর্থ-দেবতার সন্ধান পাইয়াছি বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। গত পনেরো বৎসর ধরিয়া নানাস্থানে নানাভাবে আমি আমার এই পথশ্রমের আনন্দ, তীর্থ-সান্নিধ্যের আনন্দ কিছু কিছু ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কিছু ছাপার অক্ষরে পাঠকজনের গোচর হইয়াছে নানা সাময়িক পত্রের পাতায়, কিন্তু অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় গোপন ছিল। আজ দীর্ঘকাল পর কবি যখন জরায় আক্রান্ত তখন মনে হইল, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাণ্ডার হইতে যত আনন্দ প্রতিদিন আহরণ করিয়াছি, এখনও করিতেছি, সেই অপরিমেয় আনন্দের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনও চেষ্টাই করা হয় নাই। এই গ্রন্থ আমার সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষীণতম প্রয়াস মাত্র।

রবীন্দ্র-সাহিত্যসাধনার সকলদিক এই গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। যে-সব দিক আলোচিত হইয়াছে তাহাও অসম্পূর্ণ, কারণ, একান্ত অধুনাতন রচনাগুলি

ইচ্ছা করিয়াই আমি এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করি নাই। কাব্য-প্রবাহের আলোচনায় "পূরবী"তে (১৩৩১), ছোটগল্পে 'নামঞ্জুর গল্পে' (১৩৩২), নাটকে "রক্তকরবী"তে (১৩৩১) এবং উপন্যাসে "শেষের কবিতা"য় (১৩৩৫) পৌঁছিয়াই ছেদ টানিয়াছি। কোনও ক্ষেত্রেই এই ছেদের বিশেষ কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য নাই; সাধারণভাবে এইটুকুই শুধু বলিতে পারি, একান্ত সাম্প্রতিক রচনাগুলি সম্বন্ধে সমসাময়িক মানস-দৃষ্টি কতকটা আচ্ছন্ন থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। সেই আশঙ্কায় আমি সে-চেষ্টা করি নাই। "কবি রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটি আমি সূচনায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছি এই কারণে যে, এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় সমস্ত গ্রন্থের কুঞ্চিকা বলিয়া আমি মনে করি। "রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন" প্রবন্ধটি এই গ্রন্থে না থাকিলেই ভাল হইত; বন্ধুপ্রীতির দাবীতে ইহাকে স্থান দিতে হইয়াছে। অন্য চারিটি ছোট বড় অধ্যায়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে কয়টি দিক্ আলোচিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সবিনয়ে পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করি। আমার আলোচনা কালানুক্রমিক; রবীন্দ্র-মানসের ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিবর্তন এই কালানুক্রমিক পাঠ ও আলোচনা ছাড়া সম্পূর্ণ বুদ্ধিগোচর হয়না বলিয়া আমার বিশ্বাস। দ্বিতীয়তঃ, আমি সর্বত্রই রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, কবির ব্যক্তিজীবন ও সমসাময়িক সমাজেতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। আমার ধারণা, এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া দেখিলে রবীন্দ্র-মানস ও রবীন্দ্র-সাহিত্য বুঝিবার সুবিধা হয়। কলাকৌশলের আলোচনা আমি ততটুকুই করিয়াছি যতটুকু রবীন্দ্র-কবিমানসকে বুঝিবার জন্য প্রয়োজন, যতটুকু রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাব ও রসানুভূতির সহায়তা করে।

এই সুদীর্ঘ গ্রন্থ-রচনায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অনেকের নিকট হইতেই ঋণগ্রহণ করিয়াছি। রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া কতদিন কতজনের সঙ্গে কতরকম আলোচনা হইয়াছে; কাহার কোন্ চিন্তা ও ধারণা কি ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছি তাহার হিসাব রাখি নাই। প্রত্যক্ষ ঋণ যাঁহাদের নিকট লইয়াছি, সর্বত্রই তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাদিগকে এবং পরোক্ষ ঋণ যাঁহাদের নিকট লইয়াছি তাঁহাদের সকলকে আমার সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই গ্রন্থের 'প্রুফ্' দেখিতে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীমতী মণিকা দেবী। তিনিই বিষয়-সূচী এবং নাম-সূচীও সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ তাহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনও অবকাশ নাই।

অনেকগুলি ভুল ত্রুটি রহিয়া গেল ; তাহার কিছু অনবধানতা বশতঃ, কিছু হয়ত অজ্ঞতায়। স্বল্পজ্ঞান লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ধারিত বানান-পদ্ধতি অনুসরণ করিতে গিয়াও কিছু গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছি। ভাষার শৈথিল্যও হয়ত স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সব ভুলের সমস্ত অপরাধই আমার, এবং তাহার জন্ত পাঠকের তিরস্কার সহ্য করিতেই হইবে, সমালোচকের ত কথাই নাই। তবে আশা করি, এই জাতীয় ভুল যাহা আছে তাহার কোনটিই খুব মারাত্মক নয়, এবং আমার বক্তব্য তাহাতে আহত বা আচ্ছন্ন হয় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের আনুকূল্য ছাড়া এই গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইবার গৌরব লাভ করিতে পারিত না। ইঁহাদের উভয়ের নিকট আমি স্নেহঋণে আবদ্ধ একথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

শ্রীসরস্বতী প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় দুই বৎসর ধরিয়া আমার অনেক উৎপাত সহ্য করিয়াছেন। তাঁহাকেও সকৃতজ্ঞ ধন্তবাদ জানাইতেছি। ইতি, ১লা বৈশাখ, ১৩৪৮

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিনয়াবনত
নীহাররঞ্জন রায়

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা

কবি রবীন্দ্রনাথ

বহুদিন আগে বাঙ্‌লাদেশের এক প্রতিভাবান্ মনীষীর লেখায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি কথা পড়িয়াছিলাম। সে-কথাটি এখন আর যথাযথ মনে নাই; মোটামুটি তিনি এই ধরণের একটি কথা বলিয়াছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাবান্ সুলেখক, রবীন্দ্রনাথ চিন্তাশীল দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত, রবীন্দ্রনাথ আদর্শ নৈষ্টিক গৃহস্থ, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঋষি।' যথাযথ-ভাবে কথাটি আমি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না; কিন্তু লেখক রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার কথা বলিতে গিয়া তাঁহার ঋষিত্বকেই সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল, এ কথাটা মনে আছে। ইহা কিছু অস্বাভাবিকও নয়। কারণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ, উপনিষদের ভাবরসে পুষ্ট রবীন্দ্রনাথ, "গীতাঞ্জলির" রবীন্দ্রনাথ, অসংখ্য ধর্মসঙ্গীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, Religion of Man-র রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, এবং পরম সুরসিক তত্ত্বজ্ঞ রবীন্দ্রনাথকে ঋষি রবীন্দ্রনাথ বলিয়া মনে হইবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। পশ্চিম যে দুয়ার খুলিয়া রবীন্দ্রনাথকে সাদর অভিনন্দন জানাইয়াছে, তাহা কবি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এই ঋষি রবীন্দ্রনাথকেই, যে-রবীন্দ্রনাথ তাহাদিগকে পরম ধর্মের সন্ধান দিয়াছেন, মুক্তির বাণী শুনাইয়াছেন। আর ঋষিত্বের যে-আদর্শ আমরা প্রাচীন ও বর্তমান ভারতবর্ষে দেখিয়াছি, সে-আদর্শের মাপ কাঠিতেও রবীন্দ্রনাথের উপর ঋষিত্ব আরোপ করিবার আপত্তিকর কারণ কিছু আছে বলিয়া-তো মনে হয় না। যে যোগময় ধ্যান-দৃষ্টি, যে পরমজ্ঞান, যে-দৃষ্টি ও প্রতিভা, যে দিব্য পরম ঔদাসীন্য, এবং সর্বোপরি যে বিরাট ব্যক্তিত্ব আমাদের ভারতীয় ঋষিত্বের আদর্শকে মহীয়ান করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অল্পবিস্তর

সঞ্চারিত হইয়াছে। সত্যই, রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলিলে অত্যুক্তি কিছু করা হয় না। তবু, বলিতে ইচ্ছা হয়, সব কিছু ছাড়িয়া, সব কিছুর উপরে, সব কিছুর মূলে রবীন্দ্রনাথ কবি। তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী, একথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যতখানি সত্য, বর্তমান জগতে আর কোনও জীবিত মানুষের পক্ষেই হয় ত ততখানি সত্য নয়, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার সকল দিক্ ছাড়াইয়া উঠিয়াছে তাঁহার কবি-প্রতিভা। পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ, ঋষি রবীন্দ্রনাথকেও ম্লান করিয়াছেন কবি রবীন্দ্রনাথ।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সকলপ্রকার চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা তাঁহার অন্তর্নিহিত সত্তার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু বলিয়া মনে করিতে পারি না। কাব্যে-সঙ্গীতে-গল্পে-নাট্যে-উপন্যাসে তিনি যেমন করিয়া আপনার আনন্দের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করিয়াছেন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টায়, শিক্ষাদান ও প্রচারে, তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও ব্যাখ্যায়, অধ্যাত্মবোধ ও তাহার প্রচারেও তিনি তেমন করিয়াই নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকাশ কোনও নূতন জ্ঞান লাভের প্রেরণায় বা প্রয়োজনের তাড়নায় নয়। বিশ্বজীবনের বিচিত্র বিকাশের সঙ্গে মানুষের একটা নিবিড় যোগ আছে; বুদ্ধির সাহায্যে, জ্ঞানের প্রেরণায় এ সম্বন্ধকে কেহ জানিতে চায়, প্রয়োজনের তাড়নায় এ-সম্বন্ধকে কেহ আরও দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে চায়। কিন্তু এই জাতীয় চেষ্টার বাহিরেও একটা চেষ্টা মানুষের আছে; মানুষ চায় এই সম্বন্ধটিকে, এই নিবিড় সংযোগের রসটীকে ভোগ করিতে, জানিতে নয়, অনুভব করিতে। এই ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির প্রেরণাই কবি ও শিল্পীকে রূপসৃষ্টি, রসসৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত করে, তাহার নিদ্রিত চৈতন্যকে প্রকাশের তাড়নায় ব্যাকুল করিয়া তোলে। নানা যুগের নানা দেশের ইতিহাস যে কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, ভাস্কর্যে পুষ্পিত ও অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে এই অনুভূতির আবেগ, প্রকাশের প্রেরণা, নিজের সত্তার আনন্দবোধকে বিকশিত করিবার ব্যাকুল প্রয়াস। এই যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের রসকে ভোগ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার মনে যে অনুভূতির আবেগ জাগিয়াছে, তাহারই ফলে তিনি অদ্বিতীয় রূপস্রষ্টা, অদ্বিতীয় কবি। তাঁহার এই কবিমানস, বস্তুতঃ সকল প্রকার রূপমানসের মূলে আছে এই রসভোগের ইচ্ছা, অনুভূতির প্রেরণা, প্রকাশের প্রেরণা,—জ্ঞানের প্রেরণা নয়, প্রয়োজনের তাড়না নয়।

একদিন রবীন্দ্রনাথ—তখন তাঁহার বয়স কুড়ি কি একুশ হইবে—কলিকাতায় সদরস্ট্রীটের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক অপূর্ব সুমহান্ সত্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। সেই সকাল বেলায় এক জ্যোতির্ময় মুহূর্তে মানুষের সঙ্গে বিশ্বজীবনের বিশ্বপ্রকৃতির সত্য সম্বন্ধটিকে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন; পরবর্তী জীবনে কাব্য-গানে-কর্মে-চিন্তায় এই সত্যটি কত ভাবে ও রূপে যে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তত্ত্বচিন্তার দিক হইতে, অধ্যাত্মবোধের দিক হইতে এই সত্যটির একটি বিশেষ মূল্য আছে, এবং চিন্তাজগতে এই তত্ত্ব একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের এ-সত্য কিছু তত্ত্বচিন্তা অথবা অধ্যাত্মবোধের ফল নয়, একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক রসবোধের ফলেই এই সত্যকে তিনি জানিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কাছে কিছু 'তত্ত্বও নয়, বিজ্ঞানও নয়, কোন প্রকার কাজের জিনিষও নয়, তাহা চোখের জল ও মুখের হাসির মত অন্তরের চেহারা মাত্র। তাহার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান কিম্বা আর কোনো বুদ্ধিসাধ্য জিনিষ মিলাইয়া দিতে পার তো দাও, কিন্তু সেটা গৌণ।' ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সংস্করণ, ২৩২ পৃঃ)। কবিধর্মের, সৃজন-প্রতিভার ইহাই স্বরূপ; এবং এই স্বরূপটিই রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টায় ব্যক্ত হইয়াছে। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের এই কবিমানস কি ভাবে অঙ্কুর ফুঁড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, "জীবনস্মৃতি" (বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৬ পৃ) হইতে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় তাহা একটু উদ্ধৃত করিলেই ইহার স্বরূপটি বুঝা যাইবে।

"নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে, সে-বয়সে উহার তাৎপর্য্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি "ভূর্ভুবঃস্বঃ" এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম, স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো জিনিষ নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে,—মনের মধ্যে ঘা' দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে-জিনিষটা বাজিয়া উঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে সেটা নিতান্তই ছেলেমানুষী কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে, তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশী * * * আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিষ বুঝি নাই, কিন্তু তাহা অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে।"

শুধু ছেলেবেলায়ই নয়, পরবর্তী সমগ্র জীবনেও তাঁহার এই বিশিষ্ট কবি-প্রকৃতিই জয়যুক্ত হইয়াছে। এক একটা জিনিষ এক এক সময়ে তাঁহার অন্তরের মধ্যে একটা খুব নাড়া দিয়াছে, এবং তাহারই ফলে তিনি সেই জিনিষকে ভোগ করিয়াছেন, পাইয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন; বুদ্ধিদ্বারা, চিন্তাদ্বারা তাহাকে জানিতে অথবা প্রয়োজনের খাতিরে তাহাকে একান্ত করিয়া তুলিতে চাহেন নাই। নিজেই তিনি বলেন, 'অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে তাহার সকল খবর আসিয়া পৌছায় না।' আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার গড়নটা কবির গড়ন, সাহিত্যিকের গড়ন; যখনই বিশ্ব-জীবনের কোন কিছু তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, তখনই তিনি কাব্যে, গানে, বিচিত্র কর্ম ও চিন্তায় আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, আর কিছুরই অপেক্ষা রাখেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই কবি, রূপকার, রসস্রষ্টা; তাঁহার সমগ্র জীবনের দৃষ্টি কবির দৃষ্টি। জগৎ ও জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন কোনও বিশিষ্ট তত্ত্ব অথবা চিন্তাধারার ভিতর দিয়া ততটা নয় যতটা নিজের অন্তরের অনুভূতি দিয়া। তাঁহার অসংখ্য গান ও কবিতার কথা ছাড়িয়া দিয়া, শান্তিনিকেতনের উপাসনা ও উপদেশ, নানান্ তত্ত্ব ও চিন্তাধারাকে অবলম্বন করিয়া যে বিশিষ্ট সাহিত্য-রাজ্যটী গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে বিহার করিলেও সহজেই বুঝা যায়, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ ও জীবনের মধ্যে যাহা রসের, যাহা অনুভূতির সেইদিকেই তাঁহার কবিচিত্তের সহজ গতি। অনেক সুমহান্ সত্যের ইঙ্গিত হয় ত তিনি পাইয়াছেন, তাঁহার রচিত বিভিন্ন সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে তাহা প্রকাশও পাইয়াছে; কিন্তু এই পাওয়া বা প্রকাশ কোন চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়া, অথবা তত্ত্বের তন্তুজাল বুনিয়া বুনিয়া নয়, জ্ঞানের সুদুর্গম পথের যাত্রী হইয়া নয়—অন্তরের সহজ অনুভূতির বিপুল ঐশ্বর্য দিয়া, রসিকচিত্তের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া। যে যুক্তি-পর্যায়, যে প্রমাণমালা, যে বিচারের ভিতর দিয়া একটা তত্ত্বের, একটি সত্যের সন্ধান আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ তেমন করিয়া তাহার সন্ধান পান নাই। অথচ বিশ্বজীবনের অনেক নিগূঢ় রহস্যই, অনেক দুর্লভ দূরধিগম্য সত্যই তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই, এবং তিনি তাঁহার অননুকরণীয় কবিজনোচিত ভাব ও ভাষায় তাহা প্রকাশও করিয়াছেন। যুক্তি-শৃঙ্খলা বলিতে যাহা বুঝি, মনন-ক্রিয়ার পারম্পর্য বলিতে যাহা

বুঝি, তাঁহার প্রকাশের মধ্যে হয়ত সর্বত্র তাহা নাই, যে সরস উপমা-সাদৃশ্য তাঁহার রচনার একটা বিশেষ ভঙ্গী, তাহা হয়তো সর্বত্র সত্যও নয়, অকাট্য যুক্তি দিয়া হয়ত সব সময় তাহার প্রতিষ্ঠাও করা যায় না; কিন্তু সমস্ত যুক্তিকে অতিক্রম করিয়া হৃদয়ের মধ্যে যাহারা অনুভূতি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত দেখা দেয়, যাহার বোধ কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, অন্তরের মধ্যে যাহার স্পর্শ সূর্যালোকের মত স্পষ্ট, সেখানে তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবির অন্তরকে যাহা নাড়া দিয়াছে, পাঠকের অন্তরকেও তাহা নাড়া না দিয়া পারেনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের যে-কোনও বিশিষ্ট চিন্তাধারার পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে, এই কবি প্রকৃতির প্রকৃত রূপটি কি? সৌন্দর্যের মূল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ ধারণা আছে; যে-কেহ তাঁহার সাহিত্য ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তিনিই এই বিশেষ ধারণাটির খবর জানেন। "প্রভাত সঙ্গীত" রচনার সঙ্গে সঙ্গে ইহার খবর সর্বপ্রথম আমরা পাই; সূচনাটি কি করিয়া হইল, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাহা বলিতেছেন,—

> "সামান্য কিছু করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে-গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনও লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই—এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সঙ্গীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আভাস পাইতাম। * * একদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এইজন্য তাহার একটি সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ দেখিলাম। ইহা হইতেই একটি অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে—এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশ কাল হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সংস্করণ, ২২৯ ও ২৩৩-৩৪ পৃ)।

এই উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে যাহা অস্পষ্ট, সেই অনুভূতিই ক্রমে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া একটা বিশেষ তত্ত্বের রূপ ধারণ করিয়াছে।

ইহাই পরবর্তী জীবনের creative unity। পরবর্তী জীবনে সমস্ত সৃষ্টির মূলে এক বিরাট সৌন্দর্যময় ঐক্যানুভূতির কথা তিনি বহুবার বলিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যধর্মের মূলে-ও রহিয়াছে এই সৌন্দর্যময় ঐক্যানুভূতি—creative unity-র কথা। এই creative unity-কে এখন আপাতদৃষ্টিতে আমরা কবির সুদীর্ঘ চিন্তাধারাপ্রসূত একটা বিশেষ মতবাদ বলিয়া দেখি। এ মতবাদ সত্য কি না, ইহার বিরুদ্ধ মতবাদ কিছু আছে কি না, ইহা বিচার-গ্রাহ্য কি না, সে বিচার স্বতন্ত্র। কিন্তু একটা বিশেষ মতবাদ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, যে বিশেষ জ্ঞান ও তত্ত্বচিন্তার ফল বলিয়া জানি, রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্য-রহস্য, এই সৃষ্টি-রহস্যকে আমি তেমন কিছু মতবাদ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। একথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এই অনুভূতিলব্ধ সত্যকে নানা যুক্তি নানা বিচারের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু মূলত ইহা একটা আনন্দানুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যকে দেখিবার একটা সহজ দৃষ্টি, বিশ্বজীবনের রসকে ভোগ করিবার একটা বিশেষ ভঙ্গী, নিজের মধ্যকার সৌন্দর্যের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করিবার একটা বিশেষ রীতি।

সীমার সঙ্গে অসীমের, খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের, ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে বিশ্বজীবনের যোগের মধ্যে একটি নিগূঢ় সুনিবিড় সম্বন্ধের অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাছে অত্যন্ত সত্য, এবং এই অনুভূতিও রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটা বিশেষ মতবাদের রূপ ও অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ইহা যে একান্তই কবিগুরুর নিজস্ব তাহা নহে; আমাদের দেশের প্রাচীন মননধারার মধ্যে হয়ত এই মতবাদের পরিচয় আছে। তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে ইহা একটা বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিচার্য তাহা নহে। এই মতবাদের সঙ্গেই আবার রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার রহস্যও জড়িত; কিন্তু তাহাও আলোচ্য নয়। বলিবার কথা এই যে, এই সীমা-অসীমের সম্বন্ধ, এই জীবন-দেবতার রহস্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে ইহা কিছু তত্ত্ব বা মতবাদ নয়, কোন প্রকার ধর্মের সূত্র নয়, শুদ্ধ অনুভূতি মাত্র। অসীম আকাশ আঙিনার ক্ষুদ্র আকাশের মধ্যে ধরা দেয়, ততটুকুর মধ্যেই

তাহার বিচিত্র রূপ ফুটিয়া উঠে; আবার এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন আকাশই সুবিস্তৃত আকাশের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিশ্ব-জীবন আমার ব্যক্তি-জীবনের মধ্যে ধরা দিয়া তবে তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি লাভ করে, সেই আমার ব্যক্তি-জীবনই আবার বিশ্ব-জীবনের মধ্যে নিজেকে বিসর্পিত করিয়া নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতে চায়। এমনি করিয়াই সীমায় অসীমে, খণ্ডে পূর্ণে, ব্যক্তি-জীবনে বিশ্ব-জীবনে একটি অশেষ অপরূপ চিরন্তন লীলা চলিয়াছে; এই লীলাই সৃষ্টির সৌন্দর্য, ইহাই আনন্দ। এই সৌন্দর্য, এই আনন্দ, ইহার পরিপূর্ণ রসটিকে রবীন্দ্রনাথ আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন, একটি অপূর্ব সুগভীর রহস্যরূপে অনুভব করিয়াছেন। তত্ত্ব হয়ত ইহার মধ্যে আছে, তত্ত্বের আকারে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে একাধিকবার ব্যক্তও করিয়াছেন; কিন্তু, আমার ধারণা, সে শুধু তাঁহার কবি প্রকৃতির সহজ বোধ ও অনুভূতিকে যুক্তি ও প্রমাণের মধ্যে, জ্ঞানের ও চিন্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা দান করিবার জন্য। তাহা তাঁহার নিজের জন্য ততটা নহে, যতটা পরের কাছে এই অনুভূতিকে বোধ্য ও জ্ঞানলভ্য করিবার জন্য। তাঁহার জীবন-দেবতার রহস্যও মূলত এইরকম একটি অনুভূত সত্য এবং তাহাকেই তিনি নিজের অন্তরের মধ্যে পরম রমণীয় করিয়া রসের আধার করিয়া পাইয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ও সুগভীর অধ্যাত্মবোধের মূলেও আছে এই বিশেষ কবিপ্রকৃতি, রসের ক্ষুধা, ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির ক্ষুধা। তিনি যে এক শুভ্র নিরঞ্জন অদ্বিতীয় দেবতার স্পর্শ বারংবার হৃদয়ের মধ্যে লাভ করিয়াছেন, যাঁহার লীলায় তাঁহার কবিজীবন অপূর্ব ভাবরসে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং যাঁহার প্রকাশ তাঁহার অন্তরের মধ্যে সূর্যালোকের মত উজ্জ্বল, সেই শুভ্র নিরঞ্জন দেবতাকেও তিনি পাইয়াছেন তাঁহার কবিহৃদয়ের অনুভূতির মধ্যে নানা ভাবে, নানা রূপে—কখনও তিনি দেবতা, কখনও বন্ধু, কখনও সখা, কখনও লীলাসাথী। যৌগিক সাধনার বন্ধুর দুর্গম পথে তাঁহার দেবতা আসেন নাই, কোন বিশেষ ধর্মাচরণের অপেক্ষাও তিনি রাখেন নাই, বহু শাস্ত্র চর্চা, বহু ধ্যান নিদিধ্যাসন, বহু জ্ঞানের পথে ও সে-দেবতার পদচিহ্ন পড়ে নাই, 'ন মেধয়া, ন বহুধা শ্রুতেন', তিনি আসিয়াছেন তাঁহার সহজ অনুভবের মধ্যে। দেবতাকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়াছেন বলিব না, বলিব, তাঁহাকে তিনি পাইয়াছেন, ভোগ

করিয়াছেন, প্রকাশ করিয়াছেন। উপনিষদের অনুরক্ত রসিক পাঠক রবীন্দ্রনাথে উপনিষদ-তত্ত্বের মধ্যে বিচরণ করিবার আগ্রহ বড় দেখি না; দেখি, তিনি ডুব দিয়াছেন রসসমুদ্রের অতলে, সেখানে কোন তত্ত্ব নাই, কোন বিচার নাই, বিরোধ নাই। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ যখন উপনিষদ ব্যাখ্যা করেন, তখন সে-ব্যাখ্যায় উপনিষদ-তত্ত্ব ততটা পাই না যতটা আমরা পাই উপনিষদের আপ্ত-বাক্যকে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের নিজের মর্মের উপলব্ধির কথা। উপনিষদের ঋষিবাক্য তখন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ও ভাবে রূপান্তরিত হইয়া, অনুভূতিদ্বারা প্রাণবন্ত হইয়া অপূর্ব কাব্য হইয়া উঠে। জ্ঞানের সমস্ত পুঁজি নাড়িয়া, বিচার করিয়া বিবেচনা করিয়া যাহার সন্ধান আমাদের কাছে কিছুতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে না, তাহা তাঁহার কাছে ধরা দেয় অত্যন্ত সহজে, তাহা এক মুহূর্তে তাঁহার রসের ক্ষুধা, ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির ক্ষুধাকে তৃপ্তিতে ভরিয়া দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রকাশ জীবনের মধ্যে অপূর্ব রসে ও সৌন্দর্যে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে।

একদিন রবীন্দ্রনাথ বাঙলা দেশের, তথা ভারতবর্ষের, রাষ্ট্রীয় জীবন-যজ্ঞে পৌরোহিত্যের কাজ করিয়াছিলেন, স্বদেশী মন্ত্রের তিনিই ছিলেন উদ্গাতা। বাঙলা দেশে তখন একটা সুবৃহৎ ভাবের জোয়ার আসিয়াছিল, তেমন জোয়ার বুঝি এ-দেশে ইতিপূর্বে কখনও আসে নাই, তেমনভাবে বাঙ্লা দেশ বুঝি আর কখনও আন্দোলিত হয় নাই। সমস্ত বাঁধ ভাঙিয়া গেল, রবীন্দ্রনাথ ভগীরথের মত বাঙ্লা দেশের উপর দিয়া ভাগীরথীর ধারা বহাইয়া দিলেন। বিজয়ার দিনের আহ্বান শুনিয়া সমস্ত দেশ মাতিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে স্বদেশী সমাজ গড়িয়া উঠিল, ভিক্ষুকবৃত্তি ছাড়িয়া দেশ নিজের দিকে মুখ ফিরাইল, এ-সমস্তই তাঁহারই প্রেরণা পাইয়া; গানে কবিতায় প্রবন্ধে বক্তৃতায় বাঙ্লা দেশ যেন তাঁহার মুখে ভাষা পাইল। কিন্তু, কেন তিনি এমন করিলেন, কেন তিনি নিজের ঘরে শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে তৃপ্ত হইয়া রহিলেন না, এ-কথাটা বোঝা প্রয়োজন। আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না, কোনও প্রয়োজনের তাড়নায় রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় যজ্ঞে পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আগেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা তাঁহার

অন্তর্নিহিত আবেগ-সত্তার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা মাত্র। তাঁহার জীবনের মূলে আছে অনুভূতির আবেগ, প্রকাশের চেষ্টা, নিজের আনন্দবোধকে বিকশিত করিবার ব্যাকুল প্রয়াস। বাংলা দেশের স্বদেশীযজ্ঞ এক সময় তাঁহার অন্তরকে খুব একটা নাড়া দিয়াছিল, বিশ্ব-জীবনের এই খণ্ড ও সাময়িক বিকাশটি তাঁহার অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল, এবং তাহার ফলে তিনি অন্তরের মধ্যে সুবৃহৎ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার রসের ক্ষুধা, ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির প্রেরণা এবং অন্তরের আনন্দবোধকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুল আগ্রহ মনের মধ্যে জাগিয়াছিল। এই হিসাবে স্বদেশীযজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্য তাঁহার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছার একটা কর্মরূপ। যেদিন এই অনুভূতির আবেগ মিটিয়া গেল, আত্ম-প্রকাশের ইচ্ছা তৃপ্তি লাভ করিল, সেদিন তিনি এক মুহূর্তেই যজ্ঞের পৌরোহিত্য-পদ পরিত্যাগ করিলেন। একথা বলা চলিবে না যে রাষ্ট্রান্দোলনের ক্ষেত্রে দেশের সেবায়, দেশের শৃঙ্খলমোচনে তাঁহার সাহায্যের আর প্রয়োজন ছিল না; সে প্রয়োজন তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ত সে প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করেন নাই, নিজের সৃষ্টির আনন্দকে, আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকেই রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন।

আজ পূর্ণ এক যুগ ধরিয়া দেশে আবার আর এক জাতীয়যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, বহু লোক জীবন দিয়া, সেবা দিয়া, ক্ষতি দিয়া, অর্থ দিয়া, প্রাণ দিয়া সে যজ্ঞে আহুতি দিয়াছে। সকলেই জানেন, এই নূতন জাতীয়যজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের যোগ তেমন নাই; তাঁহার অন্তরাত্মা ইহাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণও করিতে পারে নাই। অনেকেই ইহাতে আশ্চর্যবোধ করেন, অনেকেই এজন্য তাঁহার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, দুঃখবোধ করিয়াছেন; দেশকে স্বদেশমন্ত্রে একদিন যিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার এই ব্যবহার শোভা পায় না একথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। আমার মনে হয়, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই; এবং এই ব্যবহার কিছু অশোভনও নয়। নিজের কাছে এ ব্যাপারে তিনি একান্তভাবে খাঁটি, মিথ্যাচরণের লেশমাত্র কোথাও নাই। আমি এইমাত্র বলিয়াছি, স্বদেশীযজ্ঞের পৌরোহিত্য রবীন্দ্রনাথ যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা দেশের কিছু প্রয়োজনে নয়, দেশের হিতসাধন যদি কিছু হইয়া থাকে,

তবে তাহা গৌণ, কিন্তু মূলে ছিল তাঁহার আত্মবিকাশের ইচ্ছা, প্রকাশের প্রেরণা, অন্তরের আনন্দবোধকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুল আগ্রহ। কবি-প্রকৃতির ইহাই স্বরূপ। স্বদেশীযজ্ঞ তাঁহার নিজকে ব্যক্ত করিবার একটা সুমহান সুযোগ দান করিয়াছিল; সেইজন্যই সেই যজ্ঞকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া রবীন্দ্রনাথের তখনকার জীবনে এক সাড়া পড়িয়াছিল, কাব্যে-গানে-গল্পে প্রবন্ধে-বক্তৃতায় তাঁহার প্রতিভা তখন বাঁধভাঙা দুকূলহারা নদীর মত ছাপাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে অনুভূতির প্রেরণা বহুদিন মিটিয়াছে, রাষ্ট্রীয় জীবনযজ্ঞে আহুতি দিয়া আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা বহুদিন তৃপ্তিলাভ করিয়াছে, এবং তাহার আনন্দ জীবনকে নূতনরূপে নূতনভাবে অভিব্যক্তিও দান করিয়াছে। আজ আর সেই অনুভূতির প্রেরণা, সেই প্রকাশের ইচ্ছাকে ভোগ করিবার আগ্রহও তাঁহার নাই, বিশ্বজীবনের সেই ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাও আর তিনি অনুভব করেন না। সেইজন্যই আজিকার অসহযোগ যজ্ঞ তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিল না, তাঁহার অন্তরের সত্তাকে নূতন চৈতন্যে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারিল না, সে চৈতন্য বহুদিন আগে হইতেই উদ্বোধিত হইয়া গিয়াছে। আজ তিনি বিশ্বজীবনের অন্যতর বৃহত্তর বিস্তৃততর ক্ষেত্রে অনুভূতির ক্ষুধা মিটাইতেছেন, আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা অন্যতর যজ্ঞক্ষেত্রে তৃপ্তিলাভ করিতেছে; আনন্দের রসভোগের ক্ষেত্র আজ আর রাষ্ট্রীয় যজ্ঞক্ষেত্র নয়। পঁচিশ বৎসর আগেকার রবীন্দ্রনাথকে আজ পঁচিশ বৎসর পর ফিরিয়া পাইতে চাহিলে আমাদের মূঢ়তাই প্রকাশ পাইবে। কারণ, কবিধর্মের স্বরূপই এই যে, কবি একবার যে-রস, যে-রহস্য, যে-ভাবে আস্বাদন করিয়াছেন, ঠিক সেই রস, সেই রহস্য সেইভাবেই আবার আস্বাদন করিবার আগ্রহ আর তাহার জাগে না। সেই Heraclitusর কথা—"a man cannot bathe twice in the same river", অথচ একথা বলিতে পারিব না যে, বাংলা দেশের স্বদেশীযজ্ঞের চেয়ে আজিকার নিখিল ভারতের অসহযোগযজ্ঞ কিছু ছোট জিনিস; আদর্শের দিক্ হইতে, ত্যাগের দিক্ হইতে, মর্মবেদনার গভীরতার দিক্ হইতে, সংগ্রামের কঠোরতার দিক হইতে এই অসহযোগ যজ্ঞ বাংলার স্বদেশীযজ্ঞ অপেক্ষা কিছু কম শ্রদ্ধেয় নয়; আন্দোলনের ব্যাপ্তির দিক্ হইতে দেখিতে গেলে সমগ্র ভারতবর্ষ আসমুদ্র হিমাচল এমন করিয়া পূর্বে আর কখনো আন্দোলিত হইয়াছে, ইতিহাসে এমন

দৃষ্টান্ত নাই। সাধারণ যুক্তির দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, এ যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিবার অধিকার কাহারও যদি থাকিয়া থাকে, তবে তাহা রবীন্দ্রনাথেরই; তিনিই ত তাঁহার 'স্বদেশী সমাজে' সর্বপ্রথম অসহযোগ-মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, গুর্জর সিংহের গর্জন তখনও শুনা যায় নাই। কিন্তু, এ-ত আমাদের সহজ বুদ্ধি, স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির কথা নয়; ইহা কবিপ্রকৃতির স্বরূপটিকে, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কবিধর্মকে বুঝিবার কথা। মতামতের কোনও অমিল অথবা বিরোধের জন্য তিনি এ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেন নাই, এই দেশব্যাপী সুবৃহৎ জীবনান্দোলন হইতে দূরে রহিয়াছেন, এ কথা আমি মনে করিতে পারি না। তিনি নিজে অবশ্য একাধিকবার বলিয়াছেন, খদ্দর ও চরকার মন্ত্র তাঁহার ভাল লাগে নাই; নেতিবাচক এই আন্দোলনের asceticism-ও হয় ত তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই; কিন্তু এ সমস্তই after-thought, গৌণ; আসল কথা স্বদেশীযজ্ঞের রবীন্দ্রনাথ আর আজিকার রবীন্দ্রনাথ এক মানুষ নহেন, এক রবীন্দ্রনাথ আর এক রবীন্দ্রনাথকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। ইহার জন্য দুঃখ করা মূর্খতা মাত্র এবং তাঁহাকে এজন্য দোষী করা একান্ত অন্যায়ও বটে। রবীন্দ্রনাথের সত্য যথার্থ কবিপ্রকৃতির কথা জানিলে আমরা হয় ত তাহা করিতাম না। কারণ, কবিপ্রকৃতির স্বরূপই এই প্রকার। কবি হইতেছেন বিচিত্রের দূত, চঞ্চলের লীলা-সহচর। এক যজ্ঞক্ষেত্র হইতে অন্য যজ্ঞক্ষেত্রে, একরূপ হইতে অন্যরূপে, এক ভাব হইতে অন্য ভাবে, এক রহস্য হইতে অন্য রহস্যে তাঁহার চিরন্তন লীলাভিসার চলিয়াছে। চলিষ্ণু সেই প্রকৃতি এক রসের আধার হইতে অন্য রসের আধারে ডুব দিয়া তাহার চিরন্তন সম্ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির আবেগ, প্রকাশের কামনা মিটাইতেছে, এবং তাহার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা বিচিত্র সৃষ্টিতে রূপায়িত হইতেছে।

আর একদিন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের তপোবনে শিশু বালকদের শিক্ষার জন্য এক আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; আজ তাহা শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ অতিক্রম করিতে চলিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকাদের শিক্ষাব্যাপারে এমন 'এক্‌সপেরিমেণ্ট' বাংলাদেশে আর কোথাও হয় নাই, ভারতবর্ষেও খুব বেশী হইয়াছে বলিয়া জানি না। প্রকৃতির অবাধ উন্মুক্ত লীলার মধ্যে, প্রকাশের

অপূর্ব বৈচিত্র্যের মধ্যে সুকুমার প্রাণগুলি যে স্বেচ্ছা-বিকাশের আনন্দ লাভ করে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষার প্রথম সূচনা কত সহজ, কত স্বাভাবিক, জীবনের বিকাশ কত সুন্দর! তিনি এই বালকবালিকাদের জন্য এক সময় 'সিলেবাস'-ও হয়ত প্রণয়ন করিয়াছেন, নিজে পড়াইয়াছেন, এমন কি পাঠ্য-পুস্তকও লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই কর্মচেষ্টার মূলে ইহারা অত্যন্ত গৌণ; মূলতঃ তিনি বিশ্বজীবনের লীলার মধ্যে শিশুমনের যে প্রথম আনন্দ সেইটিই ভোগ করিতে চাহিয়াছেন, বুদ্ধির ঊষার সঙ্গে সঙ্গে এই বালকবালিকাদল যে প্রকৃতির ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া বিচিত্রভাবে নিজেদের প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে কবির চিত্তই আনন্দে উদ্বোধিত হইয়াছে। এইখানেও তাহার কবিপ্রকৃতিরই জয়। ইহাদের সম্মিলিত জীবনধারাকেও তিনি একটি সমগ্র কবিতা করিয়া রচনা করিয়াছেন। এই যে আশ্রম-প্রাঙ্গণে নৃত্যগীত ও বিচিত্র উৎসবের লীলায় ঋতুতে ঋতুতে প্রাণের উৎসবে ইহারা মাতিয়া উঠে, ইহাদের জীবনের প্রকাশের যে এই সুন্দর সুঠাম রূপ, ইহার মধ্যেও ত রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির অভিব্যক্তিই আমি দেখিতে পাই। শিক্ষাসমস্যার কি মীমাংসা এখানে হইয়াছে বা হয় নাই শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় সম্বন্ধে এ বিচার অত্যন্ত গৌণ বলিয়াই মনে হয়। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রাণের একটি অপূর্ব প্রকাশ; বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র আনন্দলীলাকে শিশুজীবনে কি করিয়া সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহাদের আনন্দকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া নিজের অন্তরের রসভোগের ক্ষুধাকে, আনন্দ-প্রকাশের ব্যাকুলতাকে, অনুভূতির তৃষ্ণাকে সৃষ্টির কার্য্যে উদ্‌বুদ্ধ করা যায়, শান্তিনিকেতন তাহারই পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন,—

"এই আশ্রমের কর্মের মধ্যেও যেটুকু প্রকাশের দিক তাই আমার; এর যন্ত্রের দিক যাঁরা চালনা করছেন। মানুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে আমি রূপ দিতে চেয়েছিলাম। সেই জন্যেই তার রূপভূমিকার উদ্দেশে একটি তপোবন খুঁজেছি। নগরের ইঁটকাঠের মধ্যে নয়, এই নীলাকাশ উদয়াস্তের প্রাঙ্গণে, এই সুকুমার বালকবালিকাদের লীলা-সহচর হ'তে চেয়েছিলাম। এই আশ্রমে প্রাণসম্মিলনের যে কল্যাণময় সুন্দররূপ জেগে উঠেছে, সেটিকে প্রকাশ করাই আমার কাজ। এর বাইরের কাজ-ও কিছু প্রবর্তন করেছি, কিন্তু সেখানে আমার চরম স্থান নয়, এর যেখানটিতে রূপ সেইখানটিতে আমি। * * * এখানে আমি শিশুদের যে ক্লাস করেছি, সেটা গৌণ—প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের সুকুমার জীবনের এই যে প্রথম আরম্ভরূপ, এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি-সূচনায় যে উষারুণ দীপ্তি, যে নবোদ্গত অঙ্কুর, তাকেই অবারিত

করবার জন্ত আমার প্রয়াস, না হ'লে আইন কানুনের সিলেবাসের জঞ্জাল নিয়ে আমার মরতে হ'তো। এই সব বাইরের কাজ গৌণ। * * * কিন্তু লীলাময়ের লীলায় ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে কখনো ছুটী দিয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্বোধিত করবার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার সার্থকতা! * * * ("প্রবাসী"র জোড়পত্র জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, সপ্ততিতম জন্মতিথিতে কবির অভিভাষণ।)

ঠিক এই ভাবেই বিশ্বভারতীতে ও শ্রীনিকেতনে সকল নিয়মকানুন, কাজ-কর্ম সব কিছুর বাইরে যেটুকু প্রকাশের দিক্, সেইখানে রবীন্দ্রনাথ, 'যেখানটিতে রূপ সেইখানে তিনি'। বিশ্বভারতীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি সর্বদেশের সর্বজাতির, মহামানবের মিলনতীর্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার বহুদিনের একটি আনন্দ-স্বপ্নকে সেখানে রূপ দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার এই কর্মচেষ্টা কতখানি সার্থক হইয়াছে বা হয় নাই সে বিচারের কোনই প্রয়োজন নাই; কিন্তু যে-স্বপ্ন যে-আদর্শকে তিনি বিশ্বভারতীতে রূপ দিতে চাহিয়াছেন, তাহা যে প্রকাশের প্রেরণায় ব্যাকুল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সমগ্র বিশ্বের শিক্ষার ও সংস্কৃতির যাঁহারা গুরু, তাঁহারা সকলে আসিয়া একটি যজ্ঞক্ষেত্রে মিলিতেছেন, মন্ত্র দিতেছেন—মহামানবের কত বড় আনন্দের ইহা প্রকাশ! এই আনন্দকেই রবীন্দ্রনাথ রূপ দিতে চাহিয়াছেন, এবং মহামানবের এই আকুলতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিজের আনন্দও ব্যক্ত হইতেছে। এখানে প্রাচ্যবিদ্যার যে আলোচনা হইতেছে, এখানে কলাশালায় যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রদীপটি জ্বালা হইয়াছে, যে বিচিত্র গ্রন্থরাজি এখানে আহৃত হইয়াছে, এ সমস্তই বিশ্বমানবের বিচিত্র আনন্দাভিব্যক্তির রূপ। ইহার বিচিত্র বিচ্ছিন্ন পৃথক পৃথক অঙ্গ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নাই, কিন্তু পশ্চাতে যে একটি সমগ্র-রূপ আছে, সেইখানেই রবীন্দ্রনাথ। এই রূপটির মূলে আছে তাঁহার মহামানবের ঐক্যানুভূতির ক্ষুধা, রসভোগের ক্ষুধা, প্রকাশের ক্ষুধা। শ্রীনিকেতনেও তাই। এখানকার পশুশালায়, শস্যক্ষেত্রে, মাঠের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে হয়ত রবীন্দ্রনাথ নাই, কিন্তু ইহার সব কিছুর পশ্চাতে একটি সমগ্ররূপ আছে, সে রূপ শ্রীর, লক্ষ্মীর; এই লক্ষ্মীর রূপই রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয়ের আনন্দকে উদ্বোধিত করিয়াছে। মাটির মধ্যে, গাছের মধ্যে বিশ্বজীবনের মাধুর্য ও আনন্দের প্রকাশ তিনি অনুভব করিয়াছেন, তাহাকেই তিনি এখানে রূপ দান করিয়াছেন। গাছের বীজ মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হয়; বীজের মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে ব্যাকুলতা আছে, তাহাই

তাহাকে গাছে রূপান্তরিত করে। শ্রীনিকেতনে যে-জিনিষটি রূপ পাইয়াছে—পল্লীশ্রীর রূপ, গ্রামলক্ষ্মীর রূপ, তাহার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ এই আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছিলেন, এবং এই অনুভূতির প্রেরণাই এইভাবে নিজকে ব্যক্ত করিয়াছে। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে স্নিগ্ধ মঙ্গলানুষ্ঠানের ভিতর আশ্রমে যে বৃক্ষরোপণ উৎসব, হলকর্ষণ উৎসব ইত্যাদি তিনি করিয়া থাকেন, তাহার অনুষ্ঠানের সৌন্দর্যই যে শুধু উপভোগ্য তাহা নয়, রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির এই সবিশেষ পরিচয়টি-ও তাহার মধ্যে আছে।

(রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার দুই চারিটির মূলে তাঁহার কবি-প্রকৃতির স্বরূপটি ধরিতে চেষ্টা করিলাম।) কিন্তু তাঁহার এই কবিমানস যে শুধু তাঁহার চিন্তা ও কর্মচেষ্টার মধ্যেই জয়যুক্ত হইয়াছেই তাহা নয়। (তাঁহার সর্বপ্রকার রচনায়, কি ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায়, কি সমাজ ও রাষ্ট্রবিষয়ে বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে, 'বাতায়নিকের পত্রে', কি 'কর্তার ইচ্ছায় কর্মে', কি চিঠিপত্রে, কি তত্ত্বব্যাখ্যায়, কি সাহিত্য বিচার ও ব্যাখ্যানে, সর্বত্রই ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ কবিপ্রকৃতিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়কে যুক্তিদ্বারা, প্রমাণের সাহায্যে তিনি বুঝাইতে বা উপস্থিত করিতে চেষ্টা ততটা করেন না, যতটা করেন তাঁহার সহজ বোধশক্তিকে, অনুভূত সত্যকে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে তাঁহার অপূর্ব ভাবের অপরূপ ভাষার যাদুর সাহায্যে শ্রোতা ও পাঠকের একেবারে অন্তরের অন্তঃপুরে ঠেলিয়া দিতে; মনে হয়, ইহাই ত যুক্তি, ইহাই ত প্রমাণ। বুদ্ধি যেন স্তব্ধ হইয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে সাড়া পাইতে দেরী হয় না—সমস্ত ব্যাপারটা যেন একেবারে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। সরস ও অনায়াসলব্ধ analogy এবং অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁহার মত কৃতিত্ব আর কাহারও আছে বলিয়া জানি না; ইহারাই যেন সমস্ত যুক্তি-প্রমাণের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া বুদ্ধিকে নিরস্ত্র করিয়া দেয়। সুগভীর চিন্তাশীল রচনায় এমন কাব্যগুণের পরিচয় বোধ হয় অতুলনীয়। যে-কোনও লেখা পড়িলেই একথা বুঝিতে বাকী থাকে না যে ইহার লেখকের ভিতরকার গড়ন সাহিত্যিকের গড়ন, ভিতরকার রূপ কবির রূপ।)

কিন্তু, দৃষ্টান্ত উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। তবে, ভয় হয়, একটু ভুল বুঝিবার কারণ হয়ত থাকিয়া গেল। একথা যেন কেহ মনে না করেন, রবীন্দ্রনাথ কবি, কবিকুলগুরু ছাড়া আর কিছুই নহেন। আমি পূর্বারম্ভেই

বলিয়াছি, তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী, একথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যতখানি সত্য, আজিকার পৃথিবীর আর কোনও জীবিত মানুষের পক্ষেই তাহা ততখানি সত্য হয়ত নয়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সুবিপুল সর্বতোমুখী প্রতিভার সম্মুখে শুধু স্তব্ধ হইয়া যাইতে হয়। কত বিচিত্র দিকে তাঁহার প্রতিভা বিকাশ লাভ করিয়াছে, কোন্ দিক ছাপাইয়া কোন্ দিকটি যে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হঠাৎ কিছু ধারণাই হয়ত করা যায় না। একথা সত্য যে কোনও নির্দিষ্ট এক একদিকে কাহারও প্রতিভার দীপ্তি হয়ত রবীন্দ্রনাথকেও ম্লান করিয়াছে, কিন্তু সৃষ্টি, চিন্তা ও কর্মের সকলদিকে কাহারও প্রতিভা এমন অম্লান দীপ্তি লাভ করিয়াছে, পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত বর্তমান কালে আর ত দেখি না। প্রতিভার এই সুবিপুল ঐশ্বর্য শুধু রবীন্দ্রনাথের। বাংলা দেশের সমতলক্ষেত্রে তিনি যেন উত্তুঙ্গ গৌরীশঙ্করের সূর্যকরোজ্জ্বল শুভ্র শিখরের মত দাঁড়াইয়া আছেন; সে শিখরের উচ্চতাকে খর্ব করিতে পারে, এমন আর কেহ নাই। সেই দুরারোহ শিখরের তলদেশে দাঁড়াইয়া আমরা শুধু পুলকে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকি। (আমাদের জাতীয় জীবনে, বিশেষ করিয়া আমাদের বাংলা-দেশের জীবনধারায় তিনি ভাগীরথী-প্রবাহের সঞ্চার করিয়াছেন। যে জীবন ঘরের দাওয়ায়, পুকুর পাড়ে, বটের ছায়ে কাটিতেছিল, বৃহৎ পৃথিবীর জীবনস্রোতের সঙ্গে তিনি তাহার সংযোগ সাধন করিয়াছেন।) তিনি বাংলা ভাষা-সরস্বতীর লজ্জা ও জড়তা ঘুচাইয়া তাহার মধ্যে সুনিপুণ নৃত্যের গতিবেগ ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, এবং বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করিবার মর্যাদা দান করিয়াছেন।

> "গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া কবিতায়, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে যে সুবিপুল সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। শিক্ষিত বাঙালী যে ভাষা ব্যবহার করেন, বাঙালী কবিরা যে ছন্দ লইয়া নাড়াচাড়া করেন, মধ্যবয়স্ক বাঙালী যে উচ্চ অঙ্গের চিন্তাধারায় পরস্পর ভাববিনিময় করেন, তাহার প্রায় অধিকাংশই তাঁহার দান। অথচ তাহা এত অলক্ষিতে আমরা গ্রহণ করিয়াছি যে বিশেষ অনুধাবন না করিলে তাহা আমাদের চোখেই পড়ে না।" ("কবি পরিচিতি," ভূমিকা, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।)

একথা যথার্থ। কিন্তু ইহাই শুধু নয়। বাঙ্গালীর জীবনে একটি সুকুমার রুচি ও অনুভূতি, একটি শ্রী ও সৌন্দর্যের চেতনা, এবং তাহার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় একটি সুকুমার সৌষ্ঠব সৃষ্টির সজাগ চেষ্টা তিনি জাগাইয়াছেন।

কিন্তু এ-ত গেল বাংলা দেশের কথা। সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনেও তাঁহার প্রভাবের পরিমাণ কম নয়। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্র-জীবনের নবজাগ্রত চৈতন্যের মূলে রহিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ, একথা সকলেই জানেন, আমিও আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি। আর ভারতবর্ষের শিক্ষা, সাধনা, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তিনি যেমন করিয়া তাঁহার জীবনে ও কর্মে রূপদান করিয়াছেন, এমন আর কে করিয়াছে? ভারতবর্ষের বাহিরে বিশ্বসভ্যতায়ও তিনি যাহা দান করিলেন, তাহার মূল্য কিছু কম নয়। যে অজ্ঞাত লোকের রূপ ও রহস্য সেদিনও য়ুরোপীয় সাহিত্যকে, আবেগ-চঞ্চল করিয়াছে, যে-অলোক-পন্থা সে-সাহিত্যে একসময় একটা নূতন চেতনা আনিয়া দিয়াছিল, তাহার মূলে অন্য সাহিত্যগুরুদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও নাই, একথা কি করিয়া বলিব? কিন্তু এইখানেই তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রতিভার বিকাশ শেষ হইয়া যায় নাই; আমাদের দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, পল্লীশ্রীর সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে, দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার দানের কথা সকলেই জানেন। ভারতবর্ষের সাধনা ও ইতিহাসের মর্মস্থলকে তিনি আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, সুকঠিন দার্শনিকতত্ত্বের রহস্য তিনি আমাদের কাছে নিকটতর করিয়াছেন, মানুষের সঙ্গে বিশ্বজীবনের নিগূঢ় আত্মীয়তার সম্বন্ধকে তিনি আমাদের কাছে সহজ করিয়াছেন, এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সাহায্যে সৃষ্টির বিচিত্রতাকে একান্তভাবে উপভোগ করিয়াও তাহাকে এক শুভ্র নিরঞ্জনের মধ্যে উপলব্ধি করিবার যে রহস্য, তাহা আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই যে বিচিত্র চিন্তা ও কর্মের প্রবাহ, বিচিত্র প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মকে যখন একটু দূর হইতে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখি, কেবলই মনে হয়, এই সব-কিছুর মধ্যে একটিমাত্র রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যেন পাই—তিনি কবি, কবিকুলচূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ। আমার কেবলই মনে হয়, কবি রবীন্দ্রনাথই তাঁহার বিচিত্র চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার জনক। যেদিক হইতে তাঁহাকে দেখি, সেইদিক হইতেই মনে হয়, সকলের ঊর্ধ্বে কবি রবীন্দ্রনাথের শুভ্র সুউন্নত শির। তাঁহার জ্ঞানরাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য, তাঁহার বুদ্ধি ও চিন্তার দীপ্তি বর্তমান পৃথিবীর জ্ঞান ও চিন্তার জগতটিকে আলোকিত করিয়াছে। কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁহার মত অক্লান্তকর্মী কয়জন? এই সত্তর বৎসর বয়সেও কি তাঁহার কর্মচেষ্টার কোন বিরাম আছে? আর

এই কর্মপ্রচেষ্টাও তো কিছু গতানুগতিক পথ ধরিয়া নয়, এখানেও তাঁহার দুর্জয় প্রদীপ্ত প্রতিভার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। কিন্তু, আমি চেষ্টা করিলাম তাঁহার জীবন ও কর্মকে একটা সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিতে, সকল বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও কর্মকে দূর হইতে এক করিয়া। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন,

("নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। * * * নানাখানা ক'রে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে * * * আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হ'য়েছে। জীবনের দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায় কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নানা জনের গোচর হয়েছে। তা'তে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই।) * * * ("প্রবাসী", ক্রোড়পত্র", জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, সপ্ততিতম জন্মোৎসবে কবির অভিভাষণ)।

যাহা হউক, এই সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিলে কখনও ভুল হইবার কারণ নাই যে, রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান জগতের চিন্তাবীর ও জ্ঞানীশ্রেষ্ঠদের অন্যতম, বিশ্বমানবের সুদীর্ঘ যাত্রাপথের যাঁহারা অগ্রণী তাঁহাদের তিনি অন্যতম; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও আমাদের মনের মধ্যে জুড়িয়া বসিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সকলের উপরে রবীন্দ্রনাথ কবি, কবিকুলগুরু।

ভালই হইল যে, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ কবি। আমাদের সর্বপ্রথম কবি হইতেছেন ঋষি বাল্মীকি। আর আমাদের শাস্ত্রেও কবির যে-সংজ্ঞা বারবার দেওয়া হইয়াছে সে-সংজ্ঞা ত ঋষি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বুঝিবা তার চেয়েও বেশী, বুঝি বা কবিকে ঋষি অপেক্ষাও বড় আসনই দেওয়া হইয়াছে। কবি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

ত্রীণি ছন্দাংসি কবয়ো বি যে তিরে
পুরুরূপং দর্শতং বিশ্ব চক্ষণম,
অপো বাতা ওষধয়স
তান্যেকস্মিন্ ভুবন অর্পিতানি।

কবিগণ তিনটি ছন্দের সাধনা করেন। বিচিত্ররূপ, দর্শনীয় রূপ এবং বিশ্বলোচন সেই ছন্দ; তাহাই জল, বায়ু ও ওষধি। এক এই ভুবনেই এই তিনটি ছন্দ

অর্পিত (প্রতিষ্ঠিত)। আরও বলা হইয়াছে, কবি হইতেছেন জরা-মৃত্যু রহিত, কবিই আমাদের রক্ষা করেন তাঁহার দিব্য কাব্যদ্বারা।—

পশ্চাৎ পুরস্তাদধরাদ উতোত্তরাৎ
কবিঃ কাব্যেন পরিপাহি
সখা সখায়ম্ অজরো জরিম্নে
মর্ত্তাঁ অমর্ত্ত্যস্ত্বং নঃ

পশ্চাতে সম্মুখে, নীচে উপরে, হে কবি, তোমার কাব্যের দ্বারা তুমি আমাদের রক্ষা কর। সখা যেমন সখাকে রক্ষা করে, তেমনই হে অজর, হে অমৃত, জরাগ্রস্ত আমাদিগকে, মরণশীল আমাদিগকে তুমি রক্ষা কর। কবি হইতেছেন নিত্য নবীন, তিনি (চির) যুবা, বিশ্বা রূপাণি জনয়ন্, বিশ্বরূপ রচনা করিতে করিতে তিনি চলেন। তিনি সকল মর্মের মরমী, সকল রহস্যের সন্ধান একমাত্র তিনিই জানেন।

অমুত্র সন্নিহ বেত্থেতঃ সংস্তানি পশ্যসি

এখানে বাস করিয়া তুমি ওখানকার (মর্ম) জান, ওখানে থাকিয়া এখানকার (লীলা রহস্য) তুমি দেখিতে পাও। কবি যিনি, বিশ্বচিত্তের তিনি দূত; একটি মাত্র লোকে বাস করিয়া সর্বলোকের রহস্য তিনি জানিতে পান, দেখিতে পান। যে-রস ও রহস্যের, প্রেম ও সৌন্দর্যের, শোক ও বেদনার, দুঃখ ও আনন্দের দৃষ্টি দিয়া এই বিশ্বজীবনকে আমরা পাই ও ভোগ করি, সে-দৃষ্টি কবিই আমাদের দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সেই কবি।

॥ ১৩৩৮ ॥*

---

*প্রথম প্রকাশের তারিখ। বর্তমানে স্থানে স্থানে পরিবর্তিত ও পরিশোধিত। "জয়ন্তী-উৎসর্গ", বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৩৮।

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন

"চিত্রায়" দুইটি কবিতা আছে, একটী 'অন্তর্যামী', আর একটি 'জীবনদেবতা'। রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের সুগভীর একটি রহস্য এই কবিতা দুইটিতে প্রকাশ পাইয়াছে।

এ কি কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা' বলাও আমি বলি তাই
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে। ("চিত্রা")

এই কৌতুকময়ীটি কে? কে এই রহস্যময়ী কবির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া গানে কবিতায় ফুটাইয়া তুলিতেছে; কবির নিজের কোনও কথা নাই, কোনও ভাষা নাই, সব এই কৌতুকময়ীর রহস্য-লীলা! অথবা—

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?

দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষা সম— ("চিত্রা")

এই অন্তরতমই বা কে? কাহাকে তিনি দলিত দ্রাক্ষার মতন সমস্ত বুক নিঙড়াইয়া দুঃখ-সুখের লক্ষ ধারা পাত্র ভরিয়া পান করাইয়াছেন? কবি বলিতেছেন, এই অন্তরতম, এই কৌতুকময়ীই তাঁহার অন্তর্যামী, তাঁহার জীবন-দেবতা! কবির অনুভূতি সত্যই একটু অদ্ভুত! এই কৌতুকময়ী অন্তর্যামীকে তিনি নিজে খুঁজিয়া বাহির করেন নাই, অন্তরতম জীবনদেবতা নিজে তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন। অথচ কবির যাহা কিছু নর্ম কর্ম সকল কিছুর দেবতা এই অন্তরতম; কবির গানে কবিতায় যাহা ফুল হইয়া ফুটিয়াছে তাহা এই অন্তর-তমেরই পূজার জন্য। কবির জীবনটি যেন একটি বীণা; সে বীণার সুর বাঁধিয়া দিয়াছেন জীবনদেবতা, রাগিণী রচনা করিয়া দিয়াছেন তিনি, কিন্তু গান ফুটাইয়া তুলিতে দিয়াছেন কবিকে। তবে কি এই জীবনদেবতার, অন্তরতমের অধিষ্ঠান কবির মনের মধ্যে—তিনিই কি কবির সমস্ত অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ভাষায় কবিতায় ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছেন? তাঁহার ক্ষণিক খেলার লাগিয়াই কি প্রতিদিন বাসনার সোনা গলাইয়া গলাইয়া নিত্য নূতন মূর্তি রচনা করিতেছেন? বুঝি বা তাহাই হইবে, বুঝি বা অন্তরের মধ্যে সুতীব্র একটা অনুভূতি দেবতার রূপে তাঁহার সমগ্র জীবনের অধীশ্বর হইয়া বসিয়া আছে। বুঝি তিনিই আবার কখনও দেবীর রূপ ধরিয়া কবির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এবং কবি তাঁহারই চরণে দীন ভক্তের অর্ঘ লইয়া আসিয়াছেন—

* * * দেবি, নিশিদিন করি পরাণপণ
চরণে দিতেছি আনি'
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধন খানি।

* * *

তুমি যদি দেবি পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহ সুকোমল
একটি বিন্দু ফেল আঁখি জল
করুণা মানি'।
সব হ'তে তবে সার্থক হ'বে
ব্যর্থ সাধন খানি।

জীবনদেবতার আর এক রূপ সন্দেহ নাই, তবু জীবনদেবতাই বলিতে হইবে এই দেবীকেও। কবিজীবনের যত অকৃতকার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান, বিফল যত বাসনা সমস্তই তাঁহার চরণে উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাঁহারই কৃপায় সমস্ত সার্থক হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই জীবনদেবতা কে?

মানুষের মনে একটা সৃষ্টির প্রেরণা আছে। মানুষ গানে কবিতায় চিত্রে ভাস্কর্যে শিল্পে সাহিত্যে চিন্তায় কর্মে যাহা কিছু প্রকাশ করে তাহার মূলে রহিয়াছে এই সৃষ্টির প্রেরণা। এই প্রেরণাই তাহাকে সমস্ত কর্মে সমস্ত সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করে; ইংরেজীতে ইহাকে বলা হইয়াছে creative impulse। জীবনের মূলে সৃষ্টির এই প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ এক এক সময় অত্যন্ত গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছেন। পূর্বে যে তিনটি কবিতার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে এই অনুভূতিটিই রসে ও সৌন্দর্যে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টির এই প্রেরণাই তাঁহাকে সমস্ত কর্মে প্রবৃত্ত করে, সমস্ত কর্মে নিয়ন্ত্রিত করে; এই প্রেরণাই নিরন্তর তাঁহার অন্তরের মধ্যে বসিয়া মুখ হইতে ভাষা কাড়িয়া লইয়া আপনাকে ব্যক্ত করে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, সৃষ্টির এই যে প্রেরণা, এই যে creative impulse, ইহা কি একেবারেই স্বয়ংসিদ্ধ। এই প্রেরণা কি আপনিই মনের মধ্যে জাগে? বাহির হইতে কিছুই কি এ প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করে না? রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সৃষ্টির যে এই প্রেরণা, যে-প্রেরণাকে তিনি বলিয়াছেন কৌতুকময়ী অন্তর্যামী, সে প্রেরণা কি আপনা হইতে তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, বাহিরের কিছু কি তাহাকে উদ্বুদ্ধ করে নাই? মনে হয় তাহা নহে। তত্ত্বের দিক্ হইতে কোন্‌টা সত্য, বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হয়, সৃষ্টির এই প্রেরণা আপন হইতে মনের মধ্যে জাগে না। মন যে শুধু আপনা আপনি বাহিরের এই বিশ্বজীবনের মধ্যে একটা সৌন্দর্যকে দেখিয়া ও ভোগ করিয়া তৃপ্ত হয় তাহা নয়; বাহিরের এই বিশ্বজীবনের মধ্যেও এমন কিছু আছে, যাহা মনের মধ্যে এই সৌন্দর্যানুভূতিকে উদ্রিক্ত করে। মানুষের মন এবং বাহিরের এই বিশ্বজীবন এই দু'য়ের মিলনালিঙ্গনেই মানুষের মনে সৃষ্টিপ্রেরণা উদ্বুদ্ধ হয়। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই প্রেরণা বাহিরের বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, ইহাই যেন মনে হয়। বাহিরের বিশ্বজীবনের যে সৃষ্টিবৈচিত্র্যকে মনের মধ্যে আমরা একটি অখণ্ডরূপে

ভোগ করি, সেই ভোগানুভূতিটিই যেন আমরা ভাবে ও কথায় ফুটাইয়া তুলিতে চাই।

তাহা হইলে দেখিতেছি, সৃষ্টিপ্রেরণার মূলে একটা উৎস আছে; এই সৃষ্টিপ্রেরণাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে একটা অনুভূত সত্য। এই সত্যকেই কবি যেন তাঁহার কবিমানসের নিয়ন্তা বলিয়া মনে করিতেছেন। তিনি মনে করেন, যে গান তিনি রচনা করেন, যে কথা তিনি বলেন, যাহা কিছু তিনি সৃষ্টি করেন, তাহা এই অনুভূত সত্যের কৃপায়। এই অনুভূতিকেই তিনি সুখ-দুঃখের লক্ষ ধারা পাত্র ভরিয়া পান করাইয়াছেন; তাহারই চরণে তিনি জীবনের যত শ্রেষ্ঠ সাধের ধন উৎসর্গ করিয়াছেন; এবং সর্বশেষে তাহাকেই প্রশ্ন করিয়াছেন, এত যে তোমায় দিলাম, এত যে তোমার পূজা করিলাম, হে আমার অন্তরতম, তুমি তৃপ্ত হইয়াছ কি? এই অনুভূতিই আবার তাহাকে নিত্য নূতন লীলায় প্রবৃত্ত করিয়াছে, নিত্য নূতন কৌতুকে মাতাইয়াছে; ইহাকেই তিনি কৌতুকময়ী অন্তর্যামী বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই অনুভূতি যখন প্রবল হইয়াছে, যে মুহূর্তে মনে হইয়াছে আমার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া একজন অন্তরতম বসিয়া আছেন, তিনি অন্তরকে [illegible] হইতে ঠেলিয়া বাহির হইতেছেন সকল কথায় ও কর্মে, সেই মুহূর্তে কবি তাহার খেলার পুতুল হইয়া গিয়াছেন, একান্ত দীন [illegible] হইয়া পড়িয়াছেন। জীবনের তেমন সব মুহূর্তের একটি সুদীর্ঘ মুহূর্ত "চিত্রা"র কয়েকটি কবিতায় ধরা পড়িয়াছে।

এ কথা আমি বলিতেছি না যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিশ্বজীবনের অনুভূতি ও সৃষ্টি-প্রেরণা একই বস্তু। আমার কথা হইতেছে এই যে, বিশ্বজীবনের অনুভূতিই তাঁহাকে সৃষ্টির মূলে প্রেরণা দান করিয়াছিল, এবং সৃষ্টির এই প্রেরণা তিনি যৌবনের প্রথম উন্মেষ হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন। এই অনুভূতি জীবনের এক এক স্তরে এক এক বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে; একটি প্রবাহ একস্থানে আসিয়া বাধা পাইয়া আর এক দিকে স্রোতের গতি ফিরাইয়াছে, আর এক মুখে বাধা পাইয়া ভিন্ন মুখে গিয়াছে—কখনো শীতের [illegible] স্রোতায়, কখনো বর্ষার মত্ত ধারায়। আমার মনে হয়, বিশ্বজীবনের এই অনুভূতি প্রথম হইতেই বিচিত্র গানে ও সুরে, গল্পে ও কবিতায়, ভাবে ও কর্মে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, এখনও করিতেছে। তাঁহার কবিমানস বিশ্বজীবনের অনুভূতিদ্বারা উদ্বোধিত। অবান্তর হইলেও

এখানেই এ কথা বলিতে চাই যে, এই অনুভূত সত্যকেই কবি উত্তরকালে 'জীবনদেবতা' বলিয়াছেন।

কবিগুরুর অনেক পত্রাংশে ও "জীবন-স্মৃতি"-তে বাল্যজীবনে এই অনুভূতির প্রথম অস্পষ্ট আভাস আমরা জানিতে পারি। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সদর ষ্ট্রীটের রাস্তার পূর্ব-প্রান্তে ফ্রী স্কুলের বাগানের দিকে চাহিয়া যে অপূর্ব অনুভূতির স্পর্শ তিনি পাইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস সকলেরই জানা আছে; সে-কথা এখানে আর না-ই উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু আর দু'টি লেখাংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন আছে।

> "আমার নিজের খুব ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে, কিন্তু সে এতো অপরিস্ফুট যে ভাল করে ধরতে পারিনে। কিন্তু বেশ মনে আছে এক একদিন সকালবেলা অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠতো! তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল। গোলাবাড়ীতে একটা বাঁখারী দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তাম, মনে করতাম কি একটা রহস্য আবিষ্কৃত হবে। * * * পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, বাড়ীর ভেতরের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ—সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্দ্ধ পরিচিত প্রাণী নানান মূর্তিতে আমার সঙ্গ দান করত।"

আর একটি পত্রাংশ এইরূপ—

> "প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব ক'রে। এই তৃণ গুল্মলতা, জলধারা বায়ুপ্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্তন, জ্যোতিষ্কদলের প্রবাহ, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণী পর্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ী চলাচলের যোগ রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো, তাই এই ছন্দের যেখানেই যতি পড়ছে, যেখানে ঝঙ্কার উঠছে সেইখানেই আমাদের মনের ভেতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে। জগতের সমস্ত অণুপরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হতো, যদি প্রাণে ও আনন্দে অনন্ত দেশকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকতো, তা'লে কখনই এই বাহ্য জগতের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হতোনা। যাকে আমরা জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ জাতিভেদ নেই বলেই আমরা উভয়ে এক জগতে স্থান পেয়েছি, নইলে আপনিই দুই স্বতন্ত্র জগৎ তৈরী হ'য়ে উঠতো।"

প্রকৃতির মধ্যে একটা গভীর আনন্দ বহু কবিই অনুভব করিয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই আনন্দ একটা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি

প্রকৃতির সব কিছু রূপের সঙ্গে একটা নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছেন। এই বিশ্ব-প্রকৃতির যত কিছু রূপ, যত কিছু বিচিত্র প্রকাশ, সব কিছু যেন এক অখণ্ডরূপে তাঁহার অন্তরের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে; এবং সেই অখণ্ড রূপের সঙ্গে বাহিরের যত খণ্ড বিচিত্র রূপ সব কিছুর একটা নিবিড় 'নাড়ী চলাচলের যোগ' আছে। এই যে একটা অপূর্ব রহস্যের অনুভূতি, বলা নাই কহা নাই, এক একদিন হঠাৎ অকারণে মনের মধ্যে এই অনুভূতির স্পর্শ পাইয়া সমস্ত অন্তরাত্মা যেন একটা চঞ্চল পুলকে নাচিয়া উঠিত। অন্তরের সীমার মধ্যে বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতি যে একটা অনুভূতির স্পর্শদান করিয়াছে সেই অনুভূতিটাই বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বিচিত্র রূপের মধ্যে নিজেকে খুঁজিয়া পাইতে চায়। সেই অনুভূতি যে কি বস্তু, কি যে তাহার স্বরূপ কিছুই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না, অথচ ভিতর হইতে কি যেন একটা 'অর্দ্ধ পরিচিত প্রাণী' ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। এই যে অপূর্ব রহস্য, মনে হয় প্রকৃতির প্রত্যেক প্রকাশের মধ্যে বুঝি এই রহস্য আত্মগোপন করিয়া আছে; কিন্তু সত্য কথাটা এই যে, সে অপূর্ব রহস্য তাঁহার মনের মধ্যেই, অন্য কোথাও নয়; সেইখানেই এই রহস্যানুভূতি 'একটা বৃহৎ অর্দ্ধ-পরিচিত প্রাণীর মূর্ত্তি ধরিয়া' নিরন্তর তাহাকে সঙ্গদান করিতেছে। এই অর্দ্ধপরিচিত প্রাণীটির অনুভূতিই বিশ্বজীবনের অখণ্ড অনুভূতির প্রথম অস্পষ্ট ইঙ্গিত।

"প্রভাত-সঙ্গীতের" অনেক কবিতায়, বিশেষ করিয়া 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিতে এই ইঙ্গিত সর্বপ্রথম একটা সৌন্দর্যময় প্রকাশ লাভ করিল। যে-অনুভূতির স্পর্শে সমস্ত দেহ-মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, যে-অনুভূতি অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া মরিতেছে, সেই অনুভূতি একদিন সমস্ত অন্তর ভেদ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া বিশ্বপ্রকৃতির অসীম অফুরন্ত প্রকাশের মধ্যে নিজকে বিসর্জন করিয়া দিয়া সার্থক হইতে চাহিল। যে-বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বিচিত্র খণ্ড খণ্ড প্রকাশকে কবি নিগূঢ় আত্মবোধের বলে এক অখণ্ড রূপে নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন, সেই অনুভূতিটিই আবার 'একটা বৃহৎ অর্দ্ধপরিচিত প্রাণীর মূর্ত্তি ধরিয়া' তাঁহার ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া বিশ্বপ্রকৃতির খণ্ড খণ্ড সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকাশের মধ্যে নিজেকে পুনরায় ফিরিয়া পাইল।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি

* * * *

পরাণ পুরে গেল হরষে হ'ল ভোর
জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর। ("প্রভাত-সঙ্গীত")

অথবা— আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান।
না জানি কেনরে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ। ("প্রভাত সঙ্গীত")

সর্বত্রই এই অনুভূতির ইঙ্গিত আমরা পাই। এই যে অনুভূতি, ইহাকেই কবি উত্তর কালে 'জীবনদেবতা' বলিয়াছেন, এবং এই অনুভূতিই চিরকাল 'নানান্ মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে সঙ্গদান করিয়াছে'। "প্রভাত-সঙ্গীতে" দেখিতেছি এই অনুভূতি অত্যন্ত অস্পষ্ট, তখনও তাহার একটা রূপ বা মূর্ত্তি কবির মনের মধ্যে গড়িয়া উঠে নাই।

এই অনুভূতির মধ্যে একটা তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া খুব কঠিন নয়, এবং সে-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ও পরিচিত; এবং বহু কথায় ও কবিতায় কবি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশের ও বিদেশের কোনও কোনও চিন্তাধারার মধ্যেও সে তত্ত্বটি প্রকাশ পাইয়াছে। বাহিরের এই যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির সীমাহীন অগণন প্রকাশ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত হইয়া আছে, এই বিশ্বপ্রকৃতি যখন আমাদের অন্তরের মধ্যে ধরা দেয়, তখন তাহা একটা সীমার মধ্যে অখণ্ড অনুভূতির রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু এই অখণ্ড অনুভূতি কিছুতেই অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায় না, আপন সীমার মধ্যে আপনি চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং আকুল আবেগে সীমা লঙ্ঘন করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির অসীমতার মধ্যে বিচিত্র রূপে নিজকে উপলব্ধি করিতে চায়। আসল কথা হইতেছে, যাহা অসীম তাহা কিছুতেই সত্য অথবা সার্থক নহে, তাহার কোন রূপ নাই, সীমার মধ্যে ধরা দিয়া তবে তাহার রূপ, তবে

তাহার সার্থকতা ; এই সীমার মধ্যে ধরা না দিলে অসীমকে কিছুতেই উপলব্ধি করা যায় না। আবার যাহা কিছু সীমার মধ্যে আবদ্ধ, যাহা কিছু সীমার মধ্যে একটা রূপ গ্রহণ করিয়াছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা সেই সীমার বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া অসীম অরূপের মধ্যে নিজকে বিসর্জন না দিল এবং উপলব্ধি করিতে না পারিল ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা সার্থক হইল না। সীমা ও অসীম, রূপ ও অরূপ, অংশ ও সম্পূর্ণ এমনি করিয়া পাশাপাশি বাস করে ; আমাদের মরণশীল ব্যক্তিগত জীবন ও বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির শাশ্বত জীবন—এই দু'য়ের মধ্যেও এমনি একটা 'নাড়ী চলাচলের যোগ' আছে। এই ব্যক্তিগত জীবনের সীমাবদ্ধ অনুভূতির মধ্যেই আমরা বিশ্বপ্রকৃতির সীমাহীন শাশ্বত জীবন প্রত্যক্ষ করি। সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা আমাদের অন্তরের অনুভূতির মধ্যে ধরা দেয় না, তাহা না হইলে কি ব্যক্তিগত জীবন, কি বিশ্বজীবন কিছুরই কোন সার্থকতা থাকিত না। কবির পরিণত বয়সের একটি কবিতায় এই তত্ত্বটি* অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—

> ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
> গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে
> সুর আপনারে যোগ দিতে চাহে ছন্দে
> ছন্দ আপনি ফিরে যেতে চায় সুরে।

---

* কবির কাব্যে জীবন-দেবতার যে তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে খুব সংক্ষেপে সে তত্ত্বের ব্যাখ্যা এইখানে দিতে চেষ্টা করিয়াছি। 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড্ টমসনের বহি'—সমালোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ তত্ত্বের খুব সুন্দর একটু ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার ব্যাখ্যার মূলগত কোনই পার্থক্য নাই ; তবু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যাখ্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ একমত জানি বলিয়াই সে ব্যাখ্যাটি এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কবির কাব্যে জীবন-দেবতার যে আইডিয়া নানাস্থানে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যে তিনি (টমসন্ সাহেব) বুঝিতে পারেন নাই, একথা স্বীকার করিলে ক্ষতি ছিল না। ভারতবর্ষে আমরা গ্রামদেবতা, কুলদেবতা, গৃহদেবতা, ইষ্টদেবতাকে মানি। সে মানা fetish মানা নয়। আমাদের ভক্তিতত্ত্বে সীমাশূন্যতাকে অসীম বলে না। সকল সীমার মধ্যেই তিনি অসীম, এই জন্য ভক্তগণ সীমায় তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হন। অসীম আকাশ আমার গৃহসীমার মধ্যে বদ্ধ আকাশ রূপেই আমার বিশেষ প্রিয়—অথচ পরমাধিত সে আকাশ সীমাবন্দী নহে—পরমাকাশ অসীম না হইলে প্রত্যেক গৃহেরই মধ্যে তাহা খণ্ডাকাশ হইতেই পারিতনা। তেমনি পরমাত্মা অসীম বলিয়াই প্রত্যেক জীবাত্মার

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয় সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

প্রথম যখন একটা অনুভূতির স্পর্শ লাভ করা যায়, তখন অন্তরের মধ্যে হঠাৎ একটা খুব আকুল চঞ্চলতা জাগিয়া উঠে; স্পষ্ট একটা কিছু ধারণা হয়

তিনি বিশেষ—সেই কারণেই বিশেষ আত্মার পরমাত্মার সহিত বিশেষ মিলনেই,—সুতরাং সীমাবদ্ধ মিলনেই আমাদের আনন্দ। * * * ঘনিষ্ঠ আশ্রয় প্রত্যাশায় অনন্ত আকাশকে আমরা গৃহমধ্যে খণ্ড আকাশ করিয়া ধরিয়াছি, কিন্তু নিজের সীমার দোষে সেই খণ্ডতাকে আমরা বিকৃত করিতে পারি। আকাশকে একান্ত অবরুদ্ধ করিয়া কারাগারের আকাশ করা অসম্ভব নহে, তাহাকে আলোকহীন আকাশ করিতে পারি তাহাকে বিরূপের মধ্যে বদ্ধ করিয়া অসুন্দর করিতে পারি। কবি তাই তাঁহার কাব্যে মাঝে মাঝে বলিয়াছেন 'হে আমার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তোমাকে কি আমার জীবনের 'বিকৃতির' দ্বারা পীড়িত করিয়াছি? যদি করিয়া থাকি আমার এই জীবনের সীমাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া ইহাকে নূতন রূপ দাও।' অর্থাৎ আমার জীবনের সীমার মধ্যে যদি সুষমা থাকে, তবে যিনি অসীম তাঁহাকে সুন্দর করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া আমারই জীবনে প্রকাশ করিতে পারি। সেই প্রকাশেই আমার চরিতার্থতা। আর জীবনে যদি ছন্দের বিকার ঘটে তবে অসীমের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়।

"এই জীবনদেবতাকে কবি কখনও পুরুষ-ভাবে কখনও স্ত্রী-ভাবে দেখিয়াছেন। * * * যেমন গাছের সঙ্গে, পশুর সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, এমন কি অচেতন বিশ্ববস্তুর সঙ্গে পরস্পর নিগূঢ় ঐক্য উপলব্ধি করিতে ভারতীয় বুদ্ধিতে বাধে না, তেমনি ভগবানের স্বরূপের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ-প্রকৃতিকে একই সত্যের প্রকাশ বলিয়া অনুভব করিতে সে আতঙ্কিত হয় না। কবিও নিজে জীবনের মধ্যে যে সকল পরম আবির্ভাব, যে সকল নিবিড় রস নানা উপলক্ষ্যে অনুভব করিয়াছেন, নিঃসন্দেহেই তাহার মধ্যে কখনও পুরুষের কখনও নারীর ভাব পাইয়াছেন। সেই উভয় ভাবের মধ্যেই আনন্দের অসীমতা। এই জন্যই জীবন-দেবতাকে তাঁহার পক্ষে প্রিয়তম বলাও যত সহজ, প্রেয়সী বলাও তত সহজ।" "প্রবাসী" শ্রাবণ, ১৩৩৪, (পৃঃ ৫১৪-১৭)

না, অথচ অনুভূতির তীব্রতা এত বেশী যে, নিজকে কিছুতেই ধরিয়া রাখাও যায় না। "প্রভাত সঙ্গীতে" অন্তরের এই আকুল চঞ্চলতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এবং ক্রমে দেখিব, বিশ্বজীবনের সঙ্গে কবিচিত্তের নিগূঢ় আত্মীয়তা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যতই বাড়িতে লাগিল,ততই এই অনুভূতি আরও তীব্র আরও স্পষ্ট হইয়া সমস্ত কবিজীবনেকে অধিকার করিয়া বসিল। "প্রভাত-সঙ্গীতে" এই অনুভূতির যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত, "ছবি ও গানের" দু'একটী কবিতায়ও তাহার আভাস আছে। 'রাহুর প্রেম' কবিতাটিতে এই অনুভূতি যেন একটা মূর্তি গ্রহণ করিতে চাহিতেছে, যেন একটা রূপের মধ্যে ধরা দিতে চাহিতেছে এবং তাহার সঙ্গে কবি একটা প্রেম-বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছেন।

শুনেছি আমারে ভাল লাগেনা
নাই বা লাগিল তোর,
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোর রব আঁকড়িয়া
লৌহ শৃঙ্খলের ডোর !
তুই ত আমার সঙ্গী অভাগিনী,
বাঁধিয়াছি কারাগারে
প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে।

* * *

জগৎ মাঝারে যেথায় বেড়াবি
যেথায় বসিবি যেথায় দাঁড়াবি
কি বসন্তে শীতে, দিবসে নিশীথে
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধরে
একবার তোরে দেখিছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে ! ("ছবি ও গান")

—স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, "প্রভাত-সঙ্গীতে"র কুয়াসাচ্ছন্ন অনুভূতি যেন ক্রমে স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, মনের মধ্যে বেশ একটী রূপ লইতেছে এবং সেই রূপের সঙ্গে যোগ একটু একটু করিয়া নিবিড় হইতেছে। এ যেন একটা

প্রাণের মধ্যে একটা জীবনের মধ্যে আর একটা প্রাণ আর একটা জীবন নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহিতেছে; একটা চিরন্তন জীবন যেন একটা ক্ষণিক জীবনের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিবার প্রয়াস করিতেছে। এই ক্ষণিক জীবন যে দিকেই আঁখি মেলিয়া তাকায়, দেখিতে পায় কি শীতে কি বসন্তে, দিবসে কি নিশীথে, রোদনে কি হাসিতে, সম্মুখে কি পশ্চাতে, সর্বত্র যেন এই চিরন্তন জীবনের মূর্তি আঁকা রহিয়াছে, তাহারই আড়ালে সমস্ত ঢাকা পড়িয়াছে, সমস্ত জগৎ বিশ্বপ্রকৃতি যেন সেই 'অনন্তকালের সঙ্গীর' মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই চিরন্তন জীবন এই অনন্তকালের সঙ্গী বিশ্বজীবন যেন ইহারই মধ্যে মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে।

অনন্তকালের সঙ্গী আমি তোর
আমি যে তোর ছায়া
কিবা সে রোদনে, কিবা সে হাসিতে
দেখিতে পাইবে কখন পাশেতে
কখন সম্মুখে কখন পশ্চাতে
আমার আঁধার কায়া

* * *

যে দিকে চাহিবি, আকাশে আমার
আঁধার মুরতি আঁকা
সকলি পড়িবে আমার আড়ালে
জগৎ পড়িবে ঢাকা। ("ছবি ও গান")

এর পরে 'ছবি ও গানে'র যে কবিতাটি আমি উল্লেখ করিতে চাই, তাহা শুধু এই অনুভূতির বিকাশ হিসাবে নয়, রসাভিব্যক্তির দিক হইতেও মধুর এবং সুন্দর। 'নিশীথ জগৎ' সমগ্র কবিতাটির মধ্যে যেন একটা তীব্র আবেগ-কম্পিত বেদনাঙ্কিত ছবি প্রাণবান্ হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, নিবিড় মেঘের প্রান্তসীমায় বিদ্যুৎ থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে, মাথার উপর দিয়া 'উড়িছে বাদুর, কাঁদিছে পেচক'—এই ভীষণ দুর্যোগে শিশু মা'র হাত ধরিয়া গহন বনের পথে যাত্রা করিয়াছে। হঠাৎ 'খেলিবার তরে' মার হাত যেই ছাড়িয়া দিল অমনি পিছনে পড়িয়া

গেল—'বাছা বাছা' বলিয়া ডাকিয়া মা আর বাছার সন্ধান কোথাও পাইলেন না। মাতৃহারা শিশু এদিকে গহনবনের মধ্যে বসিয়া আছে—

সহসা সমুখ দিয়ে কে গেল ছায়ার মত,
লাগিল তরাস!
কে জানে সহসা যেন কোথা কোন্ দিক হ'তে
শুনি দীর্ঘশ্বাস।
কে বসে রয়েছে পাশে? কে ছুঁইল দেহ মোর
হিম হস্তে তাঁর? ("ছবি ও গান")

এই অদৃশ্য পুরুষটি কে? অন্ধকারে যত অদৃশ্য প্রাণী এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি সকলের মধ্যে যে সে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, শিশু নিজেও যে সেই অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে, অন্ধকারে নিজকেও ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছে না; কি করিয়াই বা পাইবে, তাহার আপন যে তাহার নিজের মধ্যেই ডুবিয়া আছে! এই গুপ্ত আপনাকে কিছুতেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

অন্ধকারে আপনারে দেখিতে না পাই যত,
তত ভালবাসি,
তত তারে বুকে করে বাহুতে বাঁধিয়া লয়ে
হরষেতে ভাসি।
তত যেন মনে হয় পাছে রে চলিতে পথে
তৃণ ফুটে পায়,
যতনের ধন পাছে চমকি কাঁদিয়া ওঠে
কুসুমের ঘায়!

এই 'যতনের ধন'কে সাথী বলিয়া মনে হয়, তাহাকে দেখিতে সাধ যায়—

সথারে কাঁদিয়া বলে—'বড় সাধ যায় সখা
দেখি ভাল কোরে
তুই শৈশবের বঁধু চিরজন্ম কেটে গেল
দেখিনু না তোরে
বুঝি তুমি দূরে আছ, একবার কাছে এসে
দেখাও তোমায়!'
সে অমনি কেঁদে বলে—"আপনারে দেখি নাই
কি দেখাব হায়"—("ছবি ও গান")

দেখাই যদি পাওয়া যাইত তবে তো সে অনুভূতি কবেই হাওয়ায় উড়িয়া যাইত—দেখা যায় না চেনা যায় না বলিয়াই ত তাহার যত রহস্য, তাহাকে দেখিবার জন্য চিনিবার জন্য আগ্রহের তীব্র আকুলতা!

আমি যে বলিয়াছি জীবনদেবতার অনুভূতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজীবনের অনুভূতির একটা নিবিড় যোগ আছে, "মানসী"র প্রথম কবিতাটিতে তাহার প্রমাণ আছে। এই যে অসংখ্য গানে ও কবিতায় মনের ভাবনা কামনাগুলি ফুলের মতন বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, ইহারা কি? কবির কথায়, ইহারা প্রত্যেকটি এক একটা 'আনন্দ ক্ষণের, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ'। এই আনন্দক্ষণটির প্রাণের সর্বোত্তম মুহূর্তটির স্পর্শ মনের মধ্যে কখন আমরা লাভ করি? 'উপহার' কবিতাটিতে কবি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই চিত্তের প্রান্তদেশে প্রতি মুহূর্তে জীবনের তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে, মুহূর্ত তার বিরাম নাই; দুঃখ-সুখের বিচিত্র সুর প্রতি মুহূর্তে অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হয়। সকলে মিলিয়া অন্তরকে ব্যাকুল করিয়া তোলে, 'বিচিত্র দুরাশা জাগাইয়া' চঞ্চল করিয়া দেয়। তখন কবি বাহিরের এই তরঙ্গাঘাতক্ষুব্ধ বিচিত্র সুর-ধ্বনিত অসীম বিশ্বপ্রকৃতিকে নিজের অন্তরের অনুভূতির সীমার মধ্যে একান্ত আপনার করিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহাকে আশা দিয়া ভাষা দিয়া ভালবাসা দিয়া অর্থাৎ তাঁহার নিজের সমস্ত হৃদয়-বৃত্তি দিয়া অভিষিক্ত করিয়া নিজের 'মানসী প্রতিমা' রূপে গড়িয়া তোলেন। এই মানসী প্রতিমাই কখনও সখা রূপে, কখনও প্রিয়তমা নারীর রূপে, কখনও অন্তরের দেবতা রূপে, কখনও জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে তাঁহাকে নিরন্তর সঙ্গ দান করে। বাহিরে এই বিশ্ব বিচিত্র গান, বিচিত্র দৃশ্য, বিচিত্র সৌন্দর্য লইয়া আমাদের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া আছে; কিন্তু সে সঙ্গীহারা বিরহী; একান্ত ব্যথায় সে কবির হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য কাঁদিয়া মরিতেছে। কবির মনেও তখন বিরহ জাগিয়া উঠে; তখন তাঁহার মর্মের মূর্তিমতী কামনা অন্তঃপুরবাস ছাড়িয়া সলজ্জ চরণে আসিয়া বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গদান করে। অন্তরের সঙ্গে বাহিরের এই ব্যাকুলিত মিলনের যে মুহূর্ত এই মুহূর্তটিই একটি আনন্দক্ষণের 'সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশে'র মুহূর্ত। এমনি মুহূর্তেই যত গান, যত কবিতা মনের কুঁড়ির ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হয়।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব   কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্য্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে   ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহ মন্ত্র গানে   কবির গভীর প্রাণে
জেগে উঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি' অন্তঃপুরবাসে   সলজ্জ চরণে আসে
মূর্ত্তিমতী মর্শ্বের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই   ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস
সে আনন্দ ক্ষণগুলি   তব করে দিনু তুলি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।   ("মানসী")

"মানসী"র শেষের কবিতাটিও খুব লক্ষ্য করিবার। কবি মনে করিতেছেন, তাঁহার অন্তরের মধ্যে নিত্য যে তাঁহাকে সঙ্গদান করিতেছে, তাহার উপর তিনি জয়ী হইয়াছেন ; তিনি যে মাধুরী এ জীবনে পাইয়াছেন সে তাহা পায় নাই। এই অলস সকাল বেলায়, অলস মেঘের মেলায় সারাদিনের জলের আলোর খেলার মধ্যে সর্বত্র যেন সেই অন্তর-সঙ্গীর 'ওই মুখ ওই হাসি ওই দু'নয়ন' ভাসিয়া উঠিতেছে, কাছে দূরে সর্বত্র মধুর কোমল সুরে তাহার ডাক শুনা যাইতেছে। কবি তো তাই ভাবেন, এ জীবনে তিনি যাহা পাইলেন তাহার অন্তরসঙ্গী তাহা পাইল না। কবি যে ভাবেন, তাঁহার নিজের কোন সীমা নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বের মধ্যে তিনি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন—কিন্তু যাহার প্রাসাদে তাঁহার এই অপূর্ব অনুভূতি তাহাকেই তিনি শুধাইয়াছেন—

তুমি কি করেছ মনে   দেখেছ, পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম ?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে   আদি অন্ত শেষ ক'রে
পড়া পুঁথি সম ?
নাই সীমা আগে পাছে,   যত চাও তত আছে
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি   এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পার ভ'রে।

আমাতেও স্থান পেত অবাধে সমস্ত তব
জীবনের আশা।
একবার ভেবে দেখ এ পরাণ ধরিয়াছে
কত ভালবাসা ("মানসী")

কিন্তু সেই সীমাহীন ভালবাসায় ভরা 'পরাণ' কি দেখিতে তুমি পাইবে—হঠাৎ কোন শুভ-মুহূর্ত্তে যে তাহার দেখা মিলে!

সহসা কি শুভক্ষণে অসীম হৃদয়রাশি
দৈবে পড়ে চোখে
দেখিতে পাওনি যদি দেখিতে পাবে না আর
মিছে মরি বকে'।

* * * *

আমি যাহা দেখিয়াছি, আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম সই
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমার তা' কই।" ("মানসী")

(কিন্তু "সোনার তরী"তেই সর্বপ্রথম এই অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা গেল। "মানসী"তে কবি যে 'মানসী-প্রতিমা' গড়িয়া তুলিয়াছেন, "সোনার তরী"তে তাহাই 'মানস-সুন্দরী' হইয়া দেখা দিল। এই কবিতাটি আমি সর্বপ্রথম উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-প্রেরণার রহস্যময়ীকে যেন আমরা দেখিতে পাই। আমরা দেখিয়াছি, পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, নড়াচড়া আন্দোলন, বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বিচিত্র প্রকাশ, সব জড়াইয়া একটি 'অর্দ্ধপরিচিত প্রাণী' তাঁহাকে নিরন্তর সঙ্গদান করিত; এই প্রাণীটির সঙ্গে তখন ভাল করিয়া পরিচয় ছিল না, তবু কি সন্ধ্যায়, কি প্রভাতে, কি গৃহকোণে, কি জনশূন্য গৃহছাদে, আকাশের তলে এই আধ-চেনাশোনা সঙ্গীটির সঙ্গে তাঁহার দেখা হইত, নানান্ বিচিত্র কথা বলিয়া সে তাঁহাকে ভুলাইত। বাল্যকালে এই সঙ্গীটি তাঁহার কাছে আসিয়াছিল নবীন বালিকা মূর্তি ধরিয়া—কবি জীবনের এই প্রথম প্রেয়সীকে, তাঁহার ভাগ্যগগনের সৌন্দর্য শশীকে, তাঁহার যৌবনের মানসসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

মনে আছে কবে কোন্ ফুল্ল যূথী বনে
বহু বাল্যকালে, দেখা হ'তো দুই জনে
আধ চেনা-শোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে; ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কি খেলা খেলাতে
সখি, আসিতে হাসিয়া তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকা মূর্ত্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি'
উষার কিরণ-ধারে সদ্যস্নান করি
বিকচ কুসুম সম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি'
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব কর্ত্তব্য হ'তে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথি পত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালা-কারা হ'তে; কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জ্জনেতে রহস্য ভবনে;
জনশূন্য গৃহ ছাদে আকাশের তলে,
কি করিতে খেলা, কি বিচিত্র কথা বলে
ভুলাতে আমারে স্বপ্নসম চমৎকার
অর্থহীন, সত্যমিথ্যা তুমি জান তার। ("সোনার তরী")

কিন্তু সে বাল্যজীবন কবির এখন আর নাই—তাঁহার বালিকা সঙ্গিনীও শৈশবের খেলাক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। কবির জীবনের বনে যৌবন-বসন্তের প্রথম মলয় বায়ু আজ নিশ্বাস ফেলিয়াছে, মনের মধ্যে নূতন আশা মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে, বিশ্বজীবনের অনুভূতি আজ নূতন রূপে তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে। এমন দিনে হঠাৎ কবি দেখিলেন, তাঁহার শৈশবের সঙ্গিনী

—খেলা ক্ষেত্র হ'তে
কখন অন্তর লক্ষ্মী এসেছে অন্তরে,
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি আছ মহিষীর মত। * *

* * * *

ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছো মোর মর্ম্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ("সোনার তরী")

(বাল্যের সঙ্গিনী আজ অন্তরের প্রিয়ারূপে দেখা দিয়াছে। বাল্য যাহার মধ্যে বিধৃত হইয়াছিল, আজিকার যৌবনও তাহারই মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে—অনুভূতি একই রহিয়া গিয়াছে, শুধু তাহার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে) কিন্তু অন্তরের এই প্রিয়া সে তো অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নাই, সে যে আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। হয় ত কবি-জীবনের এই প্রিয়া পূর্বজন্মেও কবির অন্তরের মধ্যে সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া ছিল—মৃত্যু-বিরহে সে মিলন-বন্ধন টুটিয়া গিয়া প্রিয়া তাঁহার সমস্ত বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই জন্যই কবি এই বিশ্বপ্রকৃতির যে দিকেই তাকাইতেছেন, প্রিয়ারই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ তিনি দেখিতে পাইতেছেন—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি; বসন্ত বাতাসে
চঞ্চল বাসন ব্যথা সুগন্ধ নিঃশ্বাসে
করিছ প্রকাশ; নিষুপ্ত পূর্ণিমা-রাতে
নির্জ্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধ শুভ্র বিরহ শয়ন। ("সোনার তরী")

কিন্তু অন্তরের মধ্যে প্রিয়ার এই অনুভূতির স্পর্শ শুধু লাভ করিয়া কবি যেন তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না; বাস্তব মূর্তিতে এই মানসী প্রিয়াকে তিনি দেখিতে চাহিতেছেন—তাহাকে তিনি তাই শুধাইতেছেন,

সেই তুমি
মূর্ত্তিতে দিবে কি ধরা? এই মর্ত্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?

অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব্ব ঠাঁই হ'তে, সর্ব্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি ? ("সোনার তরী")

এই সর্বময়ী বিশ্বপ্রকৃতির অনুভূতি কোনো বাস্তব মূর্তি ধরিয়া কোন দিনই দেখা দেয় নাই, কিন্তু কতরূপে যে এই অনুভূতির স্পর্শ কবি লাভ করিয়াছেন, কত ভাবে যে তাঁহার মানস-সুন্দরী তাঁহাকে দেখা দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। একদিন এই অন্তর-প্রিয়ার সঙ্গে তাঁহার ঝুলনমেলা, সেদিন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার 'পরাণ' তাঁহার বুকের কাছে বসিয়া আছে, থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া সে কবির বক্ষ চাপিয়া ধরিতেছে, এই নিষ্ঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে কবির হৃদয় নাচিতেছে, তাঁহার বুকের কাছে 'পরাণ' তাঁহার আকুলি ব্যাকুলি' করিতেছে। এতকাল তিনি ভয়ে ভয়ে এই পরাণসম মানসসুন্দরীকে যতনে পালন করিয়াছেন, পাছে তার ব্যথা লাগে, পাছে দুঃখ জাগে; সোহাগে তাহাকে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়া দিয়াছেন, যাহা কিছু মধুর সুন্দর তাহাই দু'হাত পূর্ণ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এত সুখ আজ তাঁহার প্রিয়াকে আলস্যরসের আবেশে মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে; স্পর্শ করিলে আজ আর সে সাড়া দেয় না, কুসুমের হার তাহার গুরুভার বলিয়া মনে হয়। 'কিন্তু এমন করিলে আমার মধুর বধূরে যে হারাইব, অতল স্বপ্নসাগরে ডুবিয়া যে মরিব ? তাহাকে যে আজ আবার নূতন করিয়া পাইতে হইবে'—

ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রি বেলা
মরণ দোলার ধরি রসি গাছি
বসিব দুজনে বড় কাছাকাছি
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলন খেলা
নিশীথ বেলা।

দে দোল্ দোল্!
দে দোল্ দোল্!
এ মহাসাগরের তুফান তোল্
বধুরে আমার পেয়েছি আবার
ভরেছে কোল্।

* * * *

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল্
দে দোল্ দোল্! ("সোনার তরী")

আজ দেখিলাম অন্তরে এ কি কল্লোল, আকাশে বাতাসে কি অট্টরোল—মানস-সুন্দরীর সঙ্গে কি অপূর্ব ঝুলনমেলা। কিন্তু আর একদিন দেখিতেছি এই মানস-সুন্দরীই তাঁহাকে কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তার কোন ঠিকানাই নাই—কিসের অন্বেষণে যে এই যাত্রা কবি নিজেই তাহা জানেন না; অথচ তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে অন্তর-লক্ষ্মী, সেই আজ তাঁহাকে নিরুদ্দেশ পথে ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছে। পথের মধ্যে অন্তরের সুন্দরীকে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন,

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?
বল কোন পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?
যখনি শুধাই ওগো বিদেশিনী
তুমি হাস শুধু মধুর হাসিনী
বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে
তোমার মনে?
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি'
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন কোণে,
কি আছে হেথায় চলেছি কিসের
অন্বেষণে! ("সোনারতরী")

আবার এ কথাও কবি জানেন, যত বিচিত্র হোক্ অন্তরের মধ্যে অনুভূতির এই প্রকাশ, বিশ্বপ্রকৃতির যত বিচিত্রতার মধ্যেই সে আপনাকে বিকশিত করিয়া সার্থক করিয়া তুলুক, অন্তরের মধ্যে সকল বৈচিত্র্য এক হইয়া গিয়া একটি মাত্র অখণ্ড রূপ গ্রহণ করিয়াছে, সেখানে তাহার বিচ্ছিন্ন পৃথক আর কিছুই নাই। এই একটিমাত্র অখণ্ড রূপ তাঁহার মানস-সুন্দরীর রূপ, অন্তর-তমের রূপ, জীবন-দেবতার রূপ। জগতের মধ্যে এ রূপের প্রকাশ বিচিত্র —সুদূর নীলগগনে নীহারিকাপুঞ্জের অযুত আলোকে তাহার রূপ ঝলসিয়া উঠিতেছে, ফুলকাননে সে আকুল পুলকে উল্লাসে মাতিয়া উঠিতেছে, দ্যুলোকে ভূলোকে সর্বত্র সেই চঞ্চলগামিনী চিত্রা চলচঞ্চল চরণে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। তাহার মুখর নূপুর সুদূর আকাশে থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠে; মধুর মন্দবাতাসে অলক গন্ধ উড়িয়া যায়, নৃত্যের তালে তালে মঙ্গল রাগিনী ঝঙ্কারিয়া উঠে। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে এত বিচিত্র যাহার লীলা, সে কিনা কবির অন্তরের মধ্যে দেখা দিল তার সমস্ত বিচিত্র প্রকাশকে এক অখণ্ডরূপে রূপান্বিত করিয়া—

> জগতের মাঝে কত বিচিত্র হে
> তুমি বিচিত্ররূপিণী!

* * *

কিন্তু

> অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
> তুমি অন্তর ব্যাপিনী!

দেখিলাম, বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের এক অখণ্ড অনুভূতি মানস-সুন্দরীর রূপ ধরিয়া কবির অন্তরকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে,সেই সুন্দরীকেই বাহিরে তিনি বিশ্বজীবনের সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে দেখিয়াছেন, এই সুন্দরীই তাঁহার জীবনকে বিকশিত করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—পদে পদে তাঁহাকে দিক্ ভুলাইতেছে, অজানা পথে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে,—কবির নিজের কোন কথা নাই, ভাষা নাই, তাহারই কথা লইয়া ভাষা লইয়া তাঁহারই মানস-সুন্দরী জীবনদেবতা তাঁহার অন্তরের সকল কথা সকল ভাষা ফুটাইয়া তুলিতেছে। এ কি অপূর্ব রহস্য, এ কি অদ্ভুত কৌতুক—এর কি কোন অর্থ আছে, কোন শেষ আছে?

এ কি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?
একদা প্রথম প্রভাত বেলায়
যে পথে বাহির হইনু হেলায়
মনে ছিল দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।

(কিন্তু)

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক
কোথা যাবো আজ নাহি পাই ঠিক
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে!

কিন্তু এত করিয়া যে তুমি আমাকে নিজেই বরণ করিলে, আমার অন্তরের মধ্যে বাস করিয়া আমাকে লইয়াই এত কৌতুক করিলে, তোমার হাতের পুতুল করিয়া এত খেলা যে খেলাইলে, আমার সমস্ত জীবনকে যে তুমি তোমার পূজার ফুল বলিয়া গ্রহণ করিলে—এত কিছু করিয়া আমাকে লইয়া তুমি তৃপ্তি পাইয়াছ কি? এ প্রশ্ন তো না করিয়া উপায় নাই

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম? ("চিত্রা")

আমাকে নিঃশেষে যদি তুমি লইয়া থাক, আমার যত শোভা যত গান যত প্রাণ সব যদি আজ শেষ হইয়া থাকে, আমার জীবনকুঞ্জে তোমার অভিসার-নিশা যদি ভোর হইয়া থাকে—তবে আমাকে আবার তুমি নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লও, আমার মধ্যে আবার নূতন করিয়া তোমার অভিসার আরম্ভ হউক—তুমি তো নিজেই নিত্য নূতন, আমার অনিত্যর মধ্যে তোমার নিত্য লীলা নিত্য বিকশিত হউক—

ভেঙ্গে দাও তবে আজিকার সভা
আন নব রূপ আন নব শোভা
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে। ("চিত্রা")

কিন্তু এ নব নব রূপের যে আর শেষ নাই, সীমা নাই—আর এই নব-নব-রূপ নব-নব-শোভার আবাহনেরও শেষ নাই। অন্তরের মধ্যে অন্তরতমের স্পর্শ নূতন নূতন ভাবে এক একবার অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই না কবি-জীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জবন আজ গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে ভরিয়া উঠিয়াছে—"চৈতালী"তে কবি তাই তাঁহার 'নিকুঞ্জ নিবাসে' আবার অন্তরতমকে আবাহন করিয়াছেন।

'প্রভাত সঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চৈতালী' পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের মধ্যে বিশ্বজীবনের যে অনুভূতি তাহার প্রকাশ ও পরিচয়টুকু আমরা লইতে চেষ্টা করিলাম। বহু কবিতার মধ্যে এই অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু যে কবিতাগুলিতে সেই আভাস স্পষ্ট, সেই কবিতাগুলি হইতেই কবিজীবনের এই অপূর্ব্ব রহস্যটিকে বুঝিতে চেষ্টা করা সহজ। দেখিলাম, কবি জীবনের প্রথম হইতেই বাহিরের বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে কবি-হৃদয়ের একটা 'নিবিড় নাড়ী চলাচলের যোগ'—তাহার সঙ্গে কবির কি যেন একটা আত্মীয়তা আছে। শুধু তাই নয়, যাহা কিছু তিনি চোখের ও মনের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, কানে শুনিতেছেন, স্পর্শে অনুভব করিতেছেন, এই পাখীর গান, বাতাসের শব্দ, আকাশের সূর্য্যচন্দ্র তারা, মানুষের চলা বলা, গাছ পালা, নদ-নদী যত কিছু সব মিলিয়া যেন একটা অখণ্ড রূপ লইয়া তাঁহার অন্তরের মধ্যে ধরা দিয়াছে—এই রূপ তাঁহার অর্ধপরিচিত এবং এই 'অর্ধপরিচিত প্রাণীটি' যেন নিরন্তর তাহাকে সঙ্গদান করিতেছে। কিন্তু অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সে নিজে সার্থকতা খুঁজিয়া পায় না, ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িতে চায় এবং বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত প্রকাশের মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে চায়। 'প্রভাত-সঙ্গীতে' এই কামনাটা প্রকাশ পাইয়াছে। বলিয়াছি, অন্তরের মধ্যে এই যে প্রাণীটি, ইহার পরিচয় প্রথম স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু ক্রমে যেন তাহার অস্তিত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে দেখা গেল বাহিরের বিশ্বজীবনের বিচ্ছিন্ন বিচিত্র খণ্ড খণ্ড প্রকাশ যে অখণ্ড অনুভূতির রূপ লইয়া কবির অন্তরের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে কবি একটা নিবিড় বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছেন—সে তাঁহার খেলার সাথী। কিন্তু এই বন্ধন নিবিড় হইতে যতই নিবিড়তর হইতে লাগিল এবং কবির বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, ততই যেন তাঁহার সখী কবি-প্রাণের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া কবির প্রেমের কারাগারে বন্দী হইতে লাগিল এবং ক্রমে বাল্যের সখী

কৈশোরের সঙ্গিনী যৌবনে অন্তরলক্ষ্মী মর্মের গৃহিনী হইয়া অন্তর মন্দিরে প্রবেশ করিল। তখন তাহার সঙ্গে কবির কত মিলন-বিরহের লীলা, কতসোহাগ-চুম্বন, এ যেন প্রায় প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনের দাম্পত্য-প্রেমের লীলা! এ লীলার মধ্যেও আবার মাঝে মাঝে অবসাদ দেখা দেয়, প্রতিদিনের স্পর্শে মাধুর্য তাহার নূতনত্ব হারায়। তখন আবার নূতন করিয়া পাইবার ইচ্ছা জাগে। মাঝে মাঝে আবার তাহাকে একটি গভীরতম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়; তুমি কি আমাকে লইয়া তৃপ্ত হইয়াছ, আমার কথিত ও অকথিত যত বাসনা, কৃত ও অকৃত যত কর্ম সব কিছু তুমি গ্রহণ করিয়াছ কি? কিন্তু এই প্রিয়তমার রূপ ছাড়া এই মানস-সুন্দরীর আর একটা রহস্যরূপ আমরা দেখিতে পাই। সে রূপ শুধু প্রিয়তমারই রূপ নয়, সেখানে যেন এই প্রিয়তমাই আবার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে দেখা দিয়াছে; আগে যাহা বলিয়াছি, এ যেন ব্যক্তি জীবনের মাঝখানে আর একটা জীবন এবং সেই আর একটা জীবনই যেন ব্যক্তি-জীবনের অধীশ্বর। মানস-সুন্দরীর, অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সে এক কৌতুক-ময়ীর রূপ, রহস্যময়ীর রূপ—কবি নিজে যাহা বলেন তাহা এই রহস্যময়ীর কথা, যে পথে চলেন সে পথের নির্দেশও করে এই কৌতুকময়ী, সে-ই তাহাকে অজানা নিরুদ্দেশ পথে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। এই রহস্যময়ী কৌতুকময়ী মানস-সুন্দরীই জীবনদেবতা—বাল্যে যে সখী, যৌবনে সে প্রিয়তমা। সকলেই এই বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের এক অখণ্ড রূপ। ইহার অনুভূতিই অন্তর-পুরুষের অনুভূতি, জীবনদেবতার অনুভূতি! ইনিই কবি জীবনের অধীশ্বর, ইনিই কবির অসংখ্য কথায় ও কবিতায়, গানে ও সুরে নিজেকে সার্থক অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন।

বস্তুতঃ কবিজীবনের অধীশ্বরের, জীবন-দেবতার অনুভূতি অত্যন্ত রস ও রহস্যময়, অপূর্ব সৌন্দর্যময় অনুভূতি না হইয়াই পারে না। কারণ, যাহাকে জীবন-দেবতার অনুভূতি বলিতেছি তাহার মধ্যে বিশ্বজীবনের যত রূপ যত রস, যত বর্ণ, যত গন্ধ, যত বিচিত্র প্রকাশ, যত রহস্য যত সৌন্দর্য, সব কিছুর অনুভূতি এক হইয়া অন্তর ব্যাপিয়া একটি মাত্র অনুভূতির রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং সে প্রতি মুহূর্তে বাহিরের বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া মরিতেছে। আর যে-কবির মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে 'নাড়ী চলাচলের যোগ' এত সত্য, যিনি তুচ্ছতম পদার্থের মধ্যেও অপূর্ব রস ও সৌন্দর্যের আস্বাদন

লাভ করেন, আকাশের নীহারিকাপুঞ্জ, উপরকার ছায়ালোক, বাড়ীর বাগানের নারিকেল গাছ সব কিছুর মধ্যে যিনি অনির্বচনীয় রস ও রহস্যের আভাস পাইতেন, তাঁহার কাছে এই জীবন-দেবতার অনুভূতি যে অপূর্ব অনির্বচনীয় রস রহস্য ও সৌন্দর্যের উৎস হইয়া সমস্ত জীবনকে কবিতার কুসুমে ফুটাইয়া তুলিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। হইয়াছেও তাহাই। "প্রভাত সঙ্গীত" হইতে আরম্ভ করিয়া "কথা ও কাহিনী", "কল্পনা", "ক্ষণিকা" পর্যন্ত সমস্ত জীবন গানে গানে কবিতায় কবিতায় একেবারে ছাইয়া গিয়াছে—কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। আর সে গান ও কবিতা উভয়ই অপূর্ব, কোনও তত্ত্ব নাই, কোনও তথ্য নাই, যেন একটি অফুরন্ত রস ও সৌন্দর্যের প্রবাহ; বাহিরের সঙ্গে অন্তরের, মানুষের সঙ্গে বিশ্বজীবনের সম্পূর্ণ মিলনের যে আনন্দ, সে আনন্দ যেন এই সময়কার কবিতাগুলির ভিতর হইতে আপনি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। সমস্ত জীবন যেন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে রসে ও সৌন্দর্যে, ভোগে ও প্রেমে একেবারে ডুবিয়া আছে, বিশ্বজীবনের অফুরন্ত রস উৎসের মধ্যে নিজকে ভাল করিয়া ভোগ করিবার, সার্থক করিবার একটা চঞ্চল আকুলতা মনের মধ্যে আবেগে কম্পিত হইতেছে। 'বসুন্ধরা', 'যেতে নাহি দিব', 'সমুদ্রের প্রতি', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'প্রবাসী' ইত্যাদি অনেক কবিতায় সেই আকুলতার আবেগ-কম্পন প্রকাশ পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতি সত্যই অপূর্ব রহস্যময়।

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
  লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
  কেন যে কব তা' কেমনে?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণ জলে
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
  বাহির হ'য়েছি ভ্রমণে।

* * * *

এ সাতমহলা ভবনে আমার
  চির জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
  বাঁধা যে গিঠাতে গিঠাতে। ("সোনার তরী")

এ কথা সকলেই জানেন যে বিভিন্ন ভাব-বিকাশ সত্বেও "প্রভাত সঙ্গীত" হইতে আরম্ভ করিয়া "কল্পনা", "ক্ষণিকা" পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন একান্তই রূপমাধুর্য রস-সৌন্দর্য্যানুভূতির জীবন। ইহার পর "নৈবেদ্য" "খেয়া" হইতে কবিজীবনের যে নূতন অধ্যায় সুরু হইল তাহার মুখে এই মাধুর্যরসপূর্ণ জীবনের কাছে কবিকে বিদায় লইতে হইল। এই বিদায়ের একটা বেদনা আছে, সে বেদনার ক্রন্দন "কল্পনা" ও "ক্ষণিকা"র অনেক কবিতাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু জীবন-দেবতার অনুভূতি এখনও যেন অন্তরের মধ্যে তার স্পর্শ বুলাইয়া রাখিয়াছে। তবু উপায় নাই, এই মানস-সুন্দরী প্রিয়তমার কাছ হইতে বিদায় লইতেই হইবে—যত নিষ্ঠুর যত কঠোর হোক্ তাহা—

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর
নির্ম্মম আমি আজি
আর নাহি দেরী ভৈরব ভেরী
বাহিরে উঠিছে বাজি।
তুমি ঘুমাইছ নিমীল নয়নে
প্রভাতে উঠিয়া শূন্য নয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে—

কবি তাহা জানেন, তবু—

সময় হয়েছে নিকট এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। ("কল্পনা")

কবি ত বাঁধন ছিঁড়িতে চান; কিন্তু পিছন হইতে কে তাঁহাকে ডাকে—তিনি ত মনে করিতেছেন, কাজ তাঁহার শেষ হইয়াছে, দীর্ঘ দিনমান কাটিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে, এখন তাহার বিদায়ের সময়—কিন্তু এমন সময় অন্তরের মধ্যে কে ডাকিয়া উঠে, কার আহ্বান শুনা যায়—এ কি জীবন-দেবতার?

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোরা স্বামিনী
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী।

জগতে সবারি আছে সংসার সীমার কাছে
কোনোখানে শেষ
কেন আসে মর্ম্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ।
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান
কোথা হ'তে তারো মাঝে বিদ্যুতের মত বাজে
তোমার আহ্বান? ("কল্পনা")

যাহা হোক, "নৈবেদ্য" হইতে সুরু করিয়াই এই রসমাধুর্যপূর্ণ জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ পূর্ণ হইল। বিশ্বজীবনের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে কবির সেই 'নাড়ী চলাচলের যোগ' আর অনুভব করা যাইবে না, তুচ্ছতম ক্ষুদ্র বস্তুটিতেও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিবার, ভূমাকে প্রত্যক্ষ করিবার সহজ আনন্দ' 'to see a world in a grain of sand' আর দেখা যাইবে না, সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায় ভরা এই পৃথিবী তা'র নানান্ রূপে কবির প্রাণে আর দোলা দিবে না—বহুদিনের জন্য এই অনুভূতি শুদ্ধ হইয়া গেল। "নৈবেদ্যে" যে জীবনের আরম্ভ, "গীতাঞ্জলী" "গীতিমাল্যে" সেই জীবনের পূর্ণতা। এই জীবনের মধ্যে বিশ্ব-প্রকৃতির নয়, বিশ্বপ্রকৃতির যিনি অধীশ্বর তাঁহার অনুভূতিই ক্রমশঃ সমস্ত অন্তরের মধ্যে মায়া-স্পর্শ বুলাইয়া দিল। বিশ্বজীবনের সমস্ত বিকাশের মূলে যিনি তিনিই এই সময়ের কবিজীবনকে আর এক সার্থকতায় ভরিয়া তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের ভাবধারার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা সকলেই এ কথা জানেন, কাজেই সবিস্তারে তাহা এখানে বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তবে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, ভাবধারার এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-দেবতার যে অপূর্ব রহস্যময় অনুভূতি তাহারও অনেকখানি পরিবর্ত্তন হইল। আর, না হইয়া উপায়ই বা কি? বিশ্বজীবনের সঙ্গে গভীর-নিগূঢ় আত্মীয়তা বোধ অপেক্ষাও গভীরতর রহস্যের মধ্যে মন যেখানে মগ্ন হইয়া গিয়াছে, সেখানে জীবন-দেবতার অনুভূতি ত কতকটা বিদায় লইতে বাধ্য; কারণ, জীবন-দেবতা রহস্যের সমস্ত অনুভূতিটুকু ত প্রতিষ্ঠিতই ছিল বিশ্বজীবনের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা-বোধের উপর, তাহার বিচিত্র প্রকাশকে এক অখণ্ড রূপে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিবার উপর।

এইখানে এই কথাটা বুঝা সহজ হইবে যে, বিশ্বজীবনের অনুভূতিই

ক্রমে বিশ্বদেবতার অনুভূতির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, হয়ত বা দু'য়ের মধ্যে একটু সত্য সম্বন্ধও রহিয়াছে। সে যাহাই হোক্, এ কথা ঠিক যে, এই দুই অনুভূতিকে আমরা এক বলিয়া কিছুতেই ভুল করিতে পারি না। জীবনদেবতার প্রকাশ বিশ্বজীবনের মধ্যে নয়, আমাদের মধ্যে, অর্থাৎ 'আমি' এই বিশেষ ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে, এইখানে তাহার লীলা এবং সেই লীলাকে আমি উপলব্ধি করি আমার অন্তরের বাহিরে বিশ্বজীবনের মধ্যে। 'আমি' এই ব্যক্তির ক্ষণিক জীবনকে জীবন-দেবতার প্রসাদে উপলব্ধি করি বিশ্বপ্রকৃতির চিরন্তন জীবনের মধ্যে। এই হিসাবে জীবন-দেবতা কবিজীবনেরই একটা বৃহত্তর গভীরতর জীবন। বিশ্বদেবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি আর যাহাই হোক ঠিক ইহা নহে। তবে এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয় যে, জীবন-দেবতার অনুভূতি ক্রমে বিশ্বদেবতার বৃহত্তর গভীরতর অনুভূতির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিল, ব্যক্তিজীবনের মধ্যে বিশ্বজীবনের যে উপলব্ধি তাহা বিশ্বজীবনে বিশ্বদেবতার উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। কারণ, "খেয়া" "গীতাঞ্জলী" "গীতিমাল্য" প্রভৃতির কোনও কোনও কবিতায় দেখা যায়, কবিজীবনের মধ্যে যে বৃহত্তর গভীরতর জীবনের অনুভূতি, সেই অনুভূতিই যেন কোথাও কোথাও বিশ্বদেবতার, ভগবানের অনুভূতি বলিয়া মনে হইয়াছে, অবশ্য ক্ষণিক একটা মুহূর্তে।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের রহস্যকে যে ভাবে আমি এখানে উপস্থিত করিয়াছি, তাহার মধ্যে একটা তত্ত্ব আপনি প্রকাশ পাইয়াছে, একটা সত্য আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে; এই সত্যের একটু আভাস আমি দিতে চেষ্টাও করিয়াছি। হয়ত রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার যে অপূর্ব রহস্য তাহা এই সত্যকে কতকটা আশ্রয়ও করিয়াছে। কিন্তু এ কথাটাকে কিছুতেই একান্ত করিয়া দেখিতে চাই না; ইহার মধ্যে বৈষ্ণব ভেদাভেদ দর্শন, অথবা উপনিষদের বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব কিংবা হেগেলীয় দর্শন কতখানি স্থান পাইয়াছে, কতখানি পায় নাই, সে বিচারের মধ্যেও ঢুকিবার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। এ রহস্য একান্তই অনুভূতির কথা—অনুভব দ্বারাই এ রহস্যকে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এ রহস্যের সঙ্গে যে অনুভূতি, যে কল্পনা জড়াইয়া আছে, তাহা একান্তই কবিচিত্তের একটা সহজ ভাববিলাস। আমি আগেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ কবি—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত নহেন; তাঁহার

কবিজীবনের উৎস কোনও নির্দিষ্ট তত্ত্ব অথবা সত্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান নহে, সে উৎস তাঁহার কবিচিত্তের অতি সহজ এবং অতি আশ্চর্য অনুভূতির ক্ষমতা। এই অদ্ভুত ক্ষমতার বলেই তিনি জগৎ ও জীবনের যত দুর্গম ও দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধান পাইয়াছেন—ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন। সেই জন্যই এই জীবন-দেবতার রহস্যের মধ্যে কোনও তত্ত্বের সন্ধান লইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না—কবিকে কিংবা কবির কাব্যকে বুঝিবার পক্ষে সে তত্ত্বজ্ঞান আমাদের কিছু সাহায্য করিবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু প্রসঙ্গের সূত্রটিকে আবার ধরিতে চাই। "কল্পনা-ক্ষণিকা"র সঙ্গে সঙ্গেই কি কবির অন্তরের মধ্যে তাঁহার জীবন-দেবতার, মানস-সুন্দরীর এই রহস্যময় অনুভূতিটি স্তব্ধ হইয়া গেল—আর কি এই অনুভূতি তাঁহার কবিচিত্তকে রস ও সৌন্দর্যের বর্ণে গন্ধে পত্রে পুষ্পে ভরিয়া দিবে না? আপাত-দৃষ্টিতে কিন্তু তাহাই মনে হয়,—মনে হয়, সত্য সত্যই বুঝি কবি এই অনুভূতিটিকে হারাইলেন। যে মানসী প্রিয়া একবার অন্তরতম হইয়া অন্তরবেদীটি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি কি সত্যই চিরকালের জন্য হারাইয়া যাইবেন, আর কি কোনও দিনই তাঁহার দেখা মিলিবে না? বিশ্বদেবতাই কি জীবনদেবতার আসন জুড়িয়া থাকিবেন?

এ কথা সকলেই জানেন যে, "গীতাঞ্জলী-গীতিমালা-গীতালি"র কবি রবীন্দ্রনাথ "বলাকা"য় এক নূতন জীবনে জন্মলাভ করিয়াছেন; এই নব জন্মলাভ বাস্তবিকই একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। আমরা এক সময় ভাবিয়াছিলাম, "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে"র রসবোধে সকল বিচিত্র রসবোধ বিলীন করিয়া দিয়া অনন্যশরণ বিশ্বদেবতার চরণে আত্মসমর্পণই বুঝি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের শেষ আশ্রয় হইল। তাহা হইলে মানবচিত্তের যাহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহাই হইত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তাহা হইল না। কেন হইল না, কি করিয়া "বলাকা"য় এই নবজন্মলাভ সম্ভব হইল, তাহা আমি অন্যত্র বলিয়াছি, এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিতে চাহি না। "বলাকা" চঞ্চল গতিবেগের কাব্য—প্রেম যৌবন ও সৌন্দর্যের জয়গান খুব উঁচুদরের একটা বুদ্ধির আবেদন লইয়া সেই কাব্যের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের এই গতিবেগ, প্রেমাবেগ, সৌন্দর্যাবেগ ফিরিয়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা আবার সেই জীবন-দেবতার রহস্যের অস্পষ্ট আভাস একটু ফিরিয়া পাইতেছি। 'মস্ত সাগর

পাড়ি দিল গহন রাত্রিকালে, ঐ যে আমার নেয়ে', এই কবিতাটির মধ্যে বোধ হয় এই অপরিচিত অন্তর-পুরুষটির অতি অস্পষ্ট পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক্, "বলাকা"র পরেই আসিয়াছে "পলাতকা"। "পলাতকা"য় দেখিতেছি বিশ্বজীবনের একটি অংশ-মানবজীবনের তুচ্ছ সুখ দুঃখ, তুচ্ছ ঘরকন্নার ইতিহাস আবার তাঁহাকে নূতন করিয়া দোলা দিতে সুরু করিয়াছে। মনে হয় "পলাতকা"র কবিতাগুলিতে শুধু নানা ভাবে নানা ছলে গল্পকথায় মানব-চিত্তের নানা অনুভূতির ভিতর দিয়া সংসারের বিচিত্র মাধুর্য রসপূর্ণ জীবনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার চেষ্টাই প্রকাশ পাইয়াছে। বুঝিতে পারিতেছি বাল্যের সখী, কৈশোরের সঙ্গিনী, যৌবনের মানস-সুন্দরী যে অনুভূতির রূপে রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছিল সে রহস্য সে অনুভূতি বুঝি ধীর পদসঞ্চারে অন্তর-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে বুঝি আসে, আসে, আসে।

"পূরবী"তে সে সত্যই আসিয়া পড়িল—বিশ্বদেবতার গভীরতর অনুভূতি তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। কি করিয়াই বা পারিবে—বিশ্বজীবন যে বিশ্বদেবতা অপেক্ষা প্রিয়তর, রবীন্দ্রনাথ যে মানব-জীবনের কবি, নিসর্গ-জীবনের কবি! "পূরবী"র ভাব রহস্য আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু এখানে তাহার একটু পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। যে কারণেই হোক, যে গভীর অধ্যাত্মানুভূতির ভিতর রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন ডুব দিয়াছিল সে জীবন তাঁহার ভাল লাগিল না; 'কান্নাহাসির গঙ্গা যমুনায়' তিনি ফিরিয়া আসিলেন, 'পুণ্য ধরার ধূলোমাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে' আবার নিবিড় 'নাড়ী চলাচলের যোগ' প্রতিষ্ঠিত হইল।

> এই যা দেখা এই যা ছোঁয়া, এই ভালো এই ভালো
> এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গা যমুনায়
> ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি ঘট ভরেছি নিয়েছি বিদায়।
> এই ভালো রে প্রাণের সঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
> পুণ্য ধরার ধূলোমাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে। ("পূরবী")

এই ইচ্ছা যখনি জাগিল তখন কবি সহজেই অনুভব করিলেন—

> আজ ধরণী আপন হাতে
> অন্ন দিলেন আমার পাতে
> ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে,

আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ! ("পূরবী")

এ যেন আবার সেই প্রথম যৌবনের অনুভূতি, বিশ্বজনের প্রাণকে নিজের প্রাণের মধ্যে অনুভব করিবার আকুতি! আর এ আকুতি, এ অনুভূতিই যদি ফিরিয়া আসিল তবে সেই লীলাসঙ্গিনী মানস-সুন্দরীর স্পর্শলাভের আর দেরী কত? সত্যই ত সেও ফিরিয়া আসিল—

দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হ'লো যেন চিনি
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা
ছিলে লীলাসঙ্গিনী? ("পূরবী")

এই লীলাসঙ্গিনী অতীতের সেই মধুর দিনগুলিতে কতদিন কত লীলার ছলে আসিয়া কবিকে বারবার দেখা দিয়া গিয়াছে, তার কঙ্কন-ঝঙ্কারে কবির বন্ধ দুয়ার কতদিন খুলিয়া গিয়াছে, বাতাসে বাতাসে তার ইসারা ভাসিয়া আসিয়াছে! কখনও আমের নবমুকুলের বেশে, কখনও নব মেঘভারে, কত বিচিত্ররূপে চঞ্চল চাহনিতে কবিকে বারেবারে ভুলাইয়াছে, কিঙ্কিনী বাজাইয়াছে। কিন্তু এতদিন পরে জীবনসন্ধ্যায় সে যে আসিল তাহাকে আমি বরণ করিয়া ঘরে লইতে পারিব কি, পারিলেই আর কতদিন!

দেখো না কি হায়, বেলা চলে যায়
সারা হ'য়ে এল দিন
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশী
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ উঠে নিঃশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়
সারা হ'য়ে এল দিন! ("পূরবী")

এই যে মানসী প্রিয়ার অনুভূতিকে ফিরিয়া পাওয়া—এই কথাটি "পূরবী"র অনেক কবিতাতেই খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। আনন্দে সৌন্দর্যে

মাধুর্যে এক সময় যে জীবন পরিপ্লুত হইয়াছিল জীবনের সেই আনন্দ ও সৌন্দর্য কোথায় হারাইয়া গিয়াছিল, আজ তাহা জীবন-সন্ধ্যায় অতি ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আবার আসিয়া গোপনে কবির ভাবের ও অনুভূতির রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বড় দ্রুত ক্ষণিকার মত সেদিনের আমার প্রিয়তমার ত্রস্ত আঁখিযুগল সুনিবিড় তিমিরের তলে ডুবিয়া গিয়াছিল, দুজনের জীবনের চরম অভিপ্রায় সেদিন পূর্ণ হয় নাই। হে আকাশ, আজ তোমার স্তব্ধ নীল যবনিকা তুমি তুলিয়া দাও, আমার মানসী প্রিয়াকে খুঁজিয়া লইতে দাও। একদিন আমার অন্তর ব্যাপিয়া তার রাজ্যপাট বিস্তৃত ছিল, আর একদিন এক গোধূলিবেলায় তার ভীরু দীপশিখাটি লইয়া কোন্ দিগন্তে যে সে মিলাইয়া গেল, কিছুই জানি না। আজ আবার সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

> আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
> আমার গানের ছন্দ গোপনে করিছে অধিকার,
> দেখি তার অদৃশ্য অঙ্গুলি
> স্বপ্ন অশ্রু সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি। ("পূরবী")

কোন্ অতীত দিনে কবেকার সেই প্রিয়া কবিকে তার শেষ চুম্বন দিয়া গিয়াছে। কবি সুদীর্ঘ বিচ্ছেদে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আজ যখন আবার তাহাকে মনে পড়িয়াছে তখন তিনি বড় আকুল হৃদয়ে এই বিস্মৃতির জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন। সেই শেষ চুম্বনের পরে কত মাধবী মঞ্জরী থরে থরে শুকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, কত কপোতকূজনমুখর মধ্যাহ্ন, কত সন্ধ্যা সোনার বিস্মৃতি আঁকিয়া দিয়া প্রতি মুহূর্তে বিস্মৃতির জাল বুনিয়া দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে কবি যদি তাঁর প্রিয়াকে ভুলিয়াই থাকেন, আজ তার জন্য তিনি ক্ষমা চাহিতেছেন। কিন্তু একথা তিনি জানেন সেই প্রিয়ার স্পর্শ তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবন সোনা হইয়া গিয়াছে।

> তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে ব'লে
> গানের ফসলে মোর এ জীবন উঠেছিল ফলে
> আজো নাই শেষ; * * *
> * * * * * * *
> * * * তোমার পরশ নাহি আর
> কিন্তু কি পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার

বিশ্বের অমৃত ছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায়ে পান। ("পূরবী")

কিন্তু আরও উল্লেখের প্রয়োজন আছে কি? কবি নিজেই স্বীকার করিলেন, এই মানস-সুন্দরীর অন্তর-প্রিয়ার স্পর্শলাভ ঘটিয়াছিল বলিয়াই গানের ফসলে এ জীবন ভরিয়া উঠিয়াছিল, আজও তার শেষ নাই; সত্যই "আজো নাই শেষ।" দিন শেষের সায়াহ্নের গোধূলি-আলোকে সেই অন্তরতম আবার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, আবার অন্তরের মধ্যে জীবনদেবতার পাট বিস্তৃত হইয়াছে, সেইজন্যই তো সত্তর বৎসর বয়সেও গানের ফসলের আর শেষ নাই; অফুরন্ত গান, অফুরন্ত কবিতা, অফুরন্ত রস, অফুরন্ত সৌন্দর্য ধারা-স্রোতের মতন নিরন্তর আমাদের সম্মুখ দিয়া বহিয়া যাইতেছে—সেই ধারাস্রোত হইতে ঘট ভরিয়া কলসী ভরিয়া সৌন্দর্যসুধা আমরা ঘরে ঘরে লইয়া যাইতেছি। বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে কবির ব্যক্তি-জীবন যে নূতন করিয়া জীবনদেবতার অনুভূতি লাভ করিল ইহার জন্য কি কোনও প্রমাণের আবশ্যক আছে? দিনের পর দিন মাসের পর মাস ঋতুর পর ঋতুতে আমরা কি দেখিতেছি না অফুরন্ত গানের অফুরন্ত কবিতার ফোয়ারা—আর সে গান সে কবিতাই বা কি—সে ফুলে সে ফসলে বিশ্বদেবতার অভিনন্দন নয়, বিশ্বজীবনের অভিনন্দন।

আমি যে ভাবে বুঝিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা রহস্যের পরিচয় সেইভাবে উপস্থিত করিলাম। আমার এ পরিচয় সত্য নাও হইতে পারে। কিন্তু যে কথাটি অস্বীকার করিবার উপায় নাই সেই কথাটি বলিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ করিব। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন যে ভাবধারার মধ্যে নানা বর্ণে নানা গন্ধে বিচিত্ররূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সে-ভাবধারার উৎস বিশ্বজীবনের অপূর্ব্ব রসরহস্যময় অনুভূতি; এই অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের বাল্য কৈশোর ও যৌবনকে নানান রঙে রাঙাইয়াছে, জীবনের সায়াহ্ন বেলাকেও এই অনুভূতিই বিচিত্র গোধূলিরঙে রাঙাইতেছে।*

---

* প্রথম রচনা কাল, বৈশাখ, ১৩৩৬। প্রথম প্রকাশের তারিখ, "ভারতবর্ষ", শ্রাবণ, ১৩৩৬, "কবি-পরিচিতি"-গ্রন্থ, ১৩৩৮। বর্তমানে স্থানে স্থানে পরিবর্তিত।

কাব্য-প্রবাহ

(১)

রবীন্দ্রনাথের কবিমানস অপূর্ব রসও রহস্যময়। তাঁহার কাব্যলোকের মধ্যে যাহাদের গতিবিধি আছে তাহারাই একথা জানেন, কবি তাঁহার চারিদিকে ভাব-কল্পনার একটি বিশিষ্ট জগতের মধ্যে চিরকাল বিহার করিয়া, কোনও নির্দিষ্ট ভাব উৎস হইতে রস আহরণ করিয়া অধিককাল তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার সুদীর্ঘ কবিজীবন এক ভাবস্তর হইতে অন্য ভাবস্তরে, এক অনুভূতি-রাজ্য হইতে অন্য অনুভূতি-রাজ্যে মুক্ত বিহঙ্গের মত উড়িয়া বেড়াইয়াছে। সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া, সকল গণ্ডি অতিক্রম করিয়া, বিশ্বের সকল ভাববস্তুর স্পর্শ এবং অনুভূতি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই কবিকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কি প্রেম, কি সৌন্দর্য, কি প্রকৃতি, কি অধ্যাত্মবোধ, সবকিছুর সঙ্গে একটা নিবিড় বন্ধন তাঁহার কাব্যের মধ্যে সর্বত্র স্বপ্রকাশ; যখন যে অনুভূতি, জীবনের যে পর্যায়ে যে ভাবৈশ্বর্য চিত্তকে অধিকার করিয়াছে, তখন তাঁহার কবিমানস তাহারই মধ্যে আপনাকে একান্তভাবে লীন করিয়া দিয়া তাহারই পরিপূর্ণ আবেগে চিত্তের সব তন্তুকে একেবারে ভরপুর করিয়া লইয়াছে, এবং তাহারই ফলে কবি ও কাব্য একে অন্যকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া চিরন্তন রসমূর্তিতে অনাগত কালের পানে তাকাইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিমানস কখনও ভোগলিপ্সার মধ্য দিয়া কখনও পরিপূর্ণ সৌন্দর্যানুভূতির মধ্য দিয়া, কখনও বা স্বদেশ-সাধনার যজ্ঞবেদীর পৌরহিত্য করিয়া, কখনও বা গাঢ় অধ্যাত্মবোধের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ভাব হইতে ভাবান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে স্থির পদক্ষেপে পথ চলিয়াছে; ইহার কোনও একটিকেই কবি কখনও পরম ও চরম অনুভূতি বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকেন নাই। ইহার প্রত্যেকটিই তাঁহার কবিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের এক একটি স্তর। "সন্ধ্যাসঙ্গীত" হইতে আরম্ভ করিয়া "পূরবী" পর্যন্ত কত বিচিত্র ভাবরাজ্যের ভিতর দিয়া যে কবিচিত্তের যাত্রা—, সে-যাত্রা কোনও কালে কোনও নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া সমাপ্তি লাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

কবির চঞ্চল চলিষ্ণু চিত্ত কোথাও এক নির্দিষ্ট স্থানে অধিক দিন বাস করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই; ইহা তাঁহার জীবনে যেমন সত্য, কাব্যেও তেমনি সত্য। সত্য বলিতে কি, তাঁহার কাব্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, অথবা জীবনকে কাব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কোনও উপায় নাই। অন্যান্য কবিদের পক্ষে যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁহার জীবনের বাহিরে তাঁহার কাব্যের কোনও অস্তিত্বই নাই; কাব্যই তাঁহার জীবনের গভীরতম সত্তা, তাঁহার অন্তর্নিহিত চৈতন্য।* এবং যেহেতু তাঁহার জীবন গতিবেগে চঞ্চল, তাঁহার কবিমানসও সেই হেতু চলার আবেগে স্পন্দিত।

> চিরকাল ধরে' দিবস চলিছে
> দিবসের অনুগামী
> শুধু আমি নিজ বেগ সামালিতে নারি
> ছুটেছি দিবস যামী। ("মানসী")

কবি নিজের বেগ নিজেই সামলাইতে না পারিয়া যেমন স্থান হইতে স্থানান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার কাব্যেও তিনি তেমনি ভাব ও কল্পনার আবেগে বারংবার ভাব হইতে ভাবান্তরে পাড়ি জমাইয়াছেন। কবি যখন "মানসী"র কবিতা রচনায় ব্যাপৃত তখন তিনি শ্রীযুক্ত প্রথম চৌধুরী মহাশয়কে একটি পত্রে (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭; ২৪ মে, ১৮৯৯) লিখিতেছেন:

> আজকাল যে-সকল কবিতা লিখ্‌চি, তা, ছবি ও গান থেকে এত তফাৎ যে, আমি ভাবি আমার লিখার আর কোনও পরিণতি হ'চ্চে না, ক্রমাগতই পরিবর্তন চলেছে। আমি বেশ অনুভব করতে পারচি, আমি যেন আর একটা পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে আসন্ন অবস্থায়

* রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সেই সেই অবস্থায় রচিত তাঁহার কাব্যের এমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে তাঁহার কাব্যকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার জন্য তাঁহার জীবনের কথা কিছু কিছু জানা দরকার হয়, আর কোনো কবির জীবন নিজ কাব্যের ধারাকে একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া চলে নাই। কবির জীবনের বড় বড় পরিবর্তনগুলি প্রথম কাব্যের মধ্য দিয়া নিগূঢ় ইঙ্গিত মাত্রে প্রতিফলিত হইয়া শেষে জীবনের ঘটনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। * * * কোনো কবির কাব্য যে তাহার জীবনকে ক্রমে ক্রমে রচনা করিয়া তুলিয়াছে, এবং সেই কাব্য যে জীবনের সচেতন কর্তৃত্বের কোনো অপেক্ষা রাখে নাই, এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর কোন কবির জীবনে ঘটিয়াছে কিনা জানি না। সেইজন্যই অন্য সকল কবির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমালোচনার সময়ে তাঁহার জীবনের কথা বেশী করিয়া পাড়িতে হয়। (অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্যপরিক্রমা," ২য় সং, ১৫৭-৫৮ পৃ)

> দাঁড়িয়ে আছি। এ রকম আর কতকাল চলবে, তাই ভাবি। অবশেষে একটা জায়গা তো পাব, যেটা বিশেষরূপে আমারই জায়গা। অবিশ্রাম পরিবর্তন দেখলে ভয় হয় যে, এতকাল ধরে এতগুলো যে লিখলুম, সেগুলো কিছুই হয়ত টিঁকবেনা—আমার নিজের যেটা যথার্থ চরম অভিব্যক্তি, সেটা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ এগুলো কেবল tentative ভাবে আছে।......("রবীন্দ্রজীবনী," ১ম খণ্ড, ২১৫-২১৬ পৃ)

এই যে পরিণতি হইতেছে না বলিয়া কবির আক্ষেপ, এ আক্ষেপ অর্থহীন। "মানসী"তে তিনি যে পরিবর্তনের সন্ধি স্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই পরিবর্তনের সন্ধিস্থল কবির জীবনে বারবার আসিয়াছে; এবং এই ক্রমাগত পরিবর্তনই তাঁহার কবিজীবনকে পরম পরিণতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে; অথবা একটু অন্যভাবে বলিতে পারা যায়, এই ক্রমাগত পরিবর্তনই পরম পরিণতি। যে-অবিরাম পরিবর্তন দেখিয়া কবি ভীত হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার কাব্যকে অপূর্ব জীবনৈশ্বর্য দান করিয়াছে, এবং এই অবিশ্রাম পরিবর্তনের ভিতরই কবিজীবনের চরম অভিব্যক্তি লাভও ঘটিয়াছে।

রবীন্দ্র-কাব্য পাঠ এক দুরূহ ব্যাপার। সাধারণ কবি-মানস ও কবি-কীর্তির মানদণ্ডে রবীন্দ্র-কাব্য তৌল করা প্রায় একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে; তাহার সমগ্রতা পরিমাপ করা আরও অসম্ভব। এই বিরাট কবিকীর্তির মূলে যে জাগ্রত চৈতন্যের লীলা আছে, প্রতিভার যে দিব্য ক্রীড়া আছে, তাহাকে বিশ্লেষণ করা হয়ত কঠিন নাও হইতে পারে, কিন্তু কাব্যরসিক পাঠকের কাছে এই বিশ্লেষণের মূল্য খুব বেশী নয়; কারণ বিশ্লেষণ যত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইবে, কবি ততই দূর হইতে আরও দূরে সরিয়া যাইবেন। রবীন্দ্রনাথের কবিকীর্তির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে এক মহারণ্যের, যে অরণ্য লতাগুল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মহামহীরুহের ঐশ্বর্যে শুধু বৈচিত্র্যময় নয়, শুধুই বিচিত্র রঙে ও রসে প্রাণবন্তই নয়, ভাব-গাম্ভীর্যে এবং আয়তন বিরাটতায় মহীয়ানও বটে। কিন্তু সেই বিরাট অরণ্যের মধ্যে একবার ঢুকিয়া পড়িলে তখন বিচ্ছিন্ন লতা পাদপগুলিই মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, প্রত্যেক পৃথক তরুলতা পৃথক পৃথক ভাবেই চিত্ত ও চক্ষুকে আকর্ষণ করে, মহারণ্য তখন তাহার সমগ্রতা হারায়, তাহার ভাব-গাম্ভীর্য তখন চিত্তগোচর হয় না। আবার বাহির হইতে সমগ্র ভাবে যখন সেই মহাটবী চিত্ত ও চক্ষুগোচর হয়, তখন প্রত্যেক পৃথক পৃথক লতাগুল্ম ও মহীরুহ তাহার রঙের বৈচিত্র্য ও রসের বৈশিষ্ট্য হারায়। রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলা যাইতে পারে।

রবীন্দ্র-কাব্য পাঠক মাত্রই এই বিরাট কবিকীর্তির মূলে একটি নিগূঢ় নিয়ম বা মূল সুর আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা কিছু অস্বাভাবিকও নয়, অসম্ভব ত নয়ই। কিন্তু বিপদ এই, সেই মূল সুরটির অথবা নিগূঢ় নিয়মটির স্থূল সুনির্দিষ্ট পথরেখা ধরিয়া যদি আমরা রবীন্দ্র-কাব্য-মহাটবীর ভিতর সঞ্চরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা কবির সৃষ্টি প্রাচুর্যের মধ্যে যে অগণিত রঙ ও বিচিত্র রসের লীলা ডাইনে বামে ছন্দিত ও নন্দিত তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব; এমন কি যে-সব অস্পষ্ট এবং সুকুমার পদরেখা স্থূল রেখাটির সমান্তরালে চলিয়াছে কিংবা তাহাকে নানাদিকে নানা ভাবে স্পর্শ করিয়া অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে তাহাদের আভাস-পরিচয়ও না পাইতে পারি। প্রত্যেক বৃহৎ প্রতিভা, বৃহৎ জীবনের মধ্যেই একটা কালক্রমিক বিকাশ, বিবর্তনের একটা ধারা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র কবি-কীর্তির মধ্যে এই বিকাশ, এই বিবর্তন ধারা অত্যন্ত স্পষ্ট; যাহারা কালক্রমানুযায়ী রবীন্দ্র-কাব্য মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন তাহারাই একথা জানেন; এমন কি এই বিবর্তন ধারাটি না জানিলে, না বুঝিলে রবীন্দ্র-কাব্যের সম্যক্ উপলব্ধিও হয় না। এই কালক্রমিক বিকাশ, এই বিবর্তন ধারার সঙ্গে পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যেই এই নিবন্ধের অবতারণা; কিন্তু পূর্বাহ্নেই একথা জানিয়া রাখা ভাল যে, এই পরিচয়ই রবীন্দ্র-কাব্যের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, ইহা স্থূল পথরেখার নির্দেশ মাত্র। ইহাও জানিয়া রাখা ভাল যে, এই বিবর্তন ধারা সর্বত্র এক নহে, রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কবি জীবন সর্বত্র একই ধারা অনুসরণ করিয়া চলে নাই। জীবনের এক এক পর্যায়ে তাঁহার কবি-মানস এক একটী ভাব বন্ধন স্বীকার করিয়াছে, আবার কিছুদিন পর সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনাকে সবলে মুক্ত করিয়াছে, মুক্ত করিয়াছে আবার নূতন করিয়া নূতন ভাববন্ধনে বাঁধা পড়িবার জন্য। এই বন্ধন-মুক্তি এবং মুক্তি-বন্ধনের প্রেরণাই অন্যদিক হইতে বলিতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি, তাঁহার কবিধর্ম, তাঁহার কবিজীবনের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। এই যে বন্ধন ও মুক্তি, মুক্তি ও বন্ধন, আমি আগেই বলিয়াছি, এর কোনও পরিণতি নাই, ক্রমাগত পরিবর্তনই এর পরিণতি। কবি নিজেও তাহা জানেন, তিনি জানেন তাঁহার এই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কোথাও শেষ হইবার নয়, শুধু 'পথ চলাতেই তাহার আনন্দ'। নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে নানা ছন্দে

এ কথা বারবার তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। তবু, তবু আবার বারবার নানাভাবে নানা ভঙ্গিতে নানা ছলে তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি ?
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী !
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী
তুমি হাস শুধু মধুর হাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি'
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন কোনে।
কী আছে হেথায়—চলেছি কিসের অন্বেষণে ?

রবীন্দ্র-কাব্যে এই প্রশ্নও অশেষ, এর উত্তরও অশেষ। বস্তুতঃ, রবীন্দ্র কবি-জীবনের যাহা ধর্ম, তাহাতে এ-প্রশ্নের শেষ কখনও হইতে পারে না, হইবেও না ; এর উত্তরেরও কোনও শেষ হইতে পারে না, হইবেও না। যে দিন হইবে সেদিন তাঁহার কবিজীবনের অবসান ঘটিবে।

রবীন্দ্র-কাব্য পাঠের আর একটি প্রধান অন্তরায়, আমাদের মনে কাব্যের মধ্যে তত্ত্বান্বেষণের সহজাত সংস্কার, বিশেষভাবে রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে। কাব্য তত্ত্ববিরহিত হইতে পারে কি পারেনা, এ-প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করা অবান্তর ; রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে তত্ত্বের শাসন আছে কি নাই সে-জিজ্ঞাসার আলোচনারও প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্র-কাব্য পাঠে তত্ত্বান্বেষণ চেষ্টা প্রবল হইয়া উঠিলে তাহাতে যে পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, আমি শুধু তাহারই ইঙ্গিত করিতে চাই। কবির কাব্যে তত্ত্ব নাই, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নাই, এ-কথা আমি বলি না, কেহই বলিবেন না, কিন্তু সে তত্ত্ব অণুভূত সত্য মাত্র এবং কবির কবি-মানসকে অতিক্রম করিয়া সে-তত্ত্বের, সে-জিজ্ঞাসার কোনও মূল্য নাই। সে-তত্ত্ব কবির কাব্য-নিরপেক্ষ নয়, কাব্যের বাহিরে তাহার কোনও সত্তা নাই। একথা বলিতেছি এই জন্য যে, রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে, কোনও নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট তত্ত্বের শাসন তাহার মধ্যে নাই, বরং মনে হইবে যে, তাহার কাব্য তত্ত্বকে যতটুকু আশ্রয় করিয়াছে তাহা অত্যন্ত গৌণ, তাহা শুধু তাঁহার কবি-মানসের মুক্ত স্বাধীন বিহারের জন্যই,

তাহার রস ও রহস্য কবিমানসের বিচিত্র লীলা প্রকাশ করিতে সহায়তা করিয়াছে মাত্র। তত্ত্ব তাঁহার কাব্যের উপজীব্য নয়, এই মুক্ত স্বাধীন স্বচ্ছন্দ লীলাই প্রধান উপজীব্য। তাঁহার জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে এই কথাই সত্য। মৃত্যু সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে, দুঃখ সম্বন্ধে, এবং অন্যান্য আরও অনেক কিছু সম্বন্ধে রবীন্দ্র-কাব্যে অনেক তত্ত্বের ইঙ্গিত ও নির্দেশ পাওয়া যায়, এবং একাধিক রবীন্দ্র-কাব্য পাঠক এক একটি তত্ত্বের সূত্র ধরিয়া কবির কবিতা কালানুক্রমিক সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাহার ফলে কেহ কেহ কোনও কোনও তত্ত্বের একটা ক্রমবিকাশের ধারা আবিষ্কার করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। আমি নিজেও একাধিকবার সে-প্রয়াস করিয়াছি। এ-জাতীয় প্রয়াসকে আমি মিথ্যা বা নিরর্থক বলি না; তবু একথা মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের সত্য পরিচয় এ-ভাবে পাওয়া যায় না, যাইতে পারেনা। রবীন্দ্রকাব্য সহস্রদ্যুতি; কোনও একটী নির্দিষ্ট আলোকরেখার দিক্ হইতে দেখিলে হীরকখণ্ডের অসংখ্য বিচিত্র দ্যুতি যেমন নয়নগোচর হয়না, তেমনি বিশেষ কোনও একটি তত্ত্বের দিক্ হইতে রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ করিলে তাহার অসংখ্য রঙ্ ও রেখার বৈচিত্র্য, প্রাণরসের প্রাচুর্য, কবি-মানসের স্বচ্ছন্দ লীলা, কিছুই আমাদের চিত্তগোচর হয় না। পাঠকের সমগ্র দৃষ্টি তাহাতে ব্যাহত হয়, রসোপলব্ধির ব্যাঘাত হয়, এবং তাহার ফলে কবি ও কাব্য দুইই আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়া যায়। রবীন্দ্র-কাব্য পাঠে এই বিশ্বাসই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।

(২)

পৃথ্বীরাজ পরাজয় (১২৭৯)
বনফুল (১২৮২-৮৩)
কবি-কাহিনী (১২৮৪)
রুদ্রচণ্ড (১২৮৫ ?)
শৈশব-সঙ্গীত (১২৮৪-৮৭)
বাল্মিকী প্রতিভা (১২৮৬)
ভগ্নহৃদয় (১২৮৭)
কালমৃগয়া (১২৮৭ ?)
সন্ধ্যা সঙ্গীত (১২৮৮)
প্রভাত সঙ্গীত (১২৮৯-৯০)

যে-পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোর কাটিয়াছে তাহা কাব্যাভ্যাসের পক্ষে খুব অনুকূল ছিল। ঠাকুরবাড়ী তখন গান, কাব্য ও সাহিত্য-চর্চার প্রধানতম কেন্দ্রস্থল, এবং বিদ্যালয়ের প্রতি বীতরাগ রবীন্দ্রনাথ, পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাই, এই গান, কাব্য ও সাহিত্য-চর্চার মধ্যে তিনি আপনার তৃপ্তি অন্বেষণে ব্যাপৃত। তের বৎসর বয়সেই গৃহশিক্ষকের সাহায্যে "কুমার সম্ভব," "শকুন্তলা", "ম্যাক্‌বেথ্", বিদ্যাপতির পদাবলী ইত্যাদি পড়া হইয়া গিয়াছে। শুধু পড়া নয়, অধীত বিষয় কাব্যে তর্জমার চেষ্টা ও চলিতেছে, কিছু কিছু কাব্য-রচনাও আরম্ভ হইয়াছে। নিজের বাড়ীতে স্বর্ণকুমারী, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ ও আলোচনা একদিকে, অন্যদিকে বিহারীলালের গীতিকাব্য ক্রমশঃ বালকচিত্তে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তাহা ছাড়া, যে-সময়টা একা একা আছেন তখন বসিয়া বসিয়া কল্পলোকের স্বপ্নজাল বুনিতেছেন বালসুলভ বিলাস মোহে; এই স্বপ্নজাল অধিকাংশই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া, কিশোর বয়সের কুয়াসাচ্ছন্ন হৃদয়বৃত্তি গুলিকে লইয়া। কতকটা এই রকম পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চর্চার সূত্রপাত হইল।

এগার কি বার হইতে আঠার-উনিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যত কাব্য অথবা কাব্যনাট্য তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা কম নয়।* কাব্য, গীতিকাব্য, কাব্যোপন্যাস, কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, গাথা ইত্যাদি সাহিত্য-রচনার সকল দিকেই কিশোর কবিচিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" এবং "বাল্মীকি প্রতিভা"ই কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া টিকিয়া আছে; আর বাকী

> সমস্তই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে গেলেও ঐতিহাসিকের নাগালের বাহিরে যায় নাই। অনুসন্ধান করিলে সেগুলি এখনো পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যই মহাকাল সেগুলি বিনাশ করিয়াছে—কারণ সাহিত্য হিসাবে সেগুলি নগণ্য।" (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র জীবনী", ১ম খণ্ড, ৫১পৃ, বিশ্বভারতী, ১৩৪০)।

প্রভাত বাবুর এই উক্তি যথার্থ। এগুলি যে কখনও মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় বাঙালী পাঠকের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এবং এখনও যে মাঝে মাঝে এখানে

---

* কালক্রম ও বিস্তৃত বিবরণের জন্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রজীবনী" ১ম খণ্ড, উক্ত গ্রন্থাকারের, "রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী" *(১৩৩৮), এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রবিরশ্মি" পূর্ব্বখণ্ড (১৩৪৪), দ্রষ্টব্য।

ওখানে কোনও কোনও রচনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, এজন্ত কবি নিজে অত্যন্ত লজ্জিত। "জীবন-স্মৃতি"তে, "সঞ্চয়িতা"র ভূমিকায়, নানা পত্রালাপে তিনি বারংবার এই লজ্জা ও সংকোচ স্বীকার করিয়াছেন, এবং অপরিণত বয়সের এই রচনাগুলিকে অত্যন্ত নির্মম ভাবে কষাঘাত করিয়াছেন। কবি নিজের প্রতি এতটা কঠোর না হইলেও পারিতেন। "পৃথ্বীরাজ-বিজয়" বাদ দিলে বাকী কয়েকটি রচনা তদানীন্তন বাঙ্‌লা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে একেবারে নগণ্য নয়। বাঙ্‌লা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসের দিক হইতে কবির এই কৈশোর কাব্য-প্রচেষ্টার যথেষ্ট মূল্য আছে। মধুস্দন 'পয়ার পায়ের বেড়ি' ভাঙিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত এক বিহারীলাল ছাড়া আর কেহ বাঙ্‌লা কাব্যলক্ষীর ছন্দজড়িমা ঘুচাইতে পারেন নাই কিংবা গীতি কবিতার অপূর্ব সম্ভাবনার স্বপ্ন কোনও কবিকে চঞ্চল করে নাই। বিহারীলালই বোধ হয় সর্বপ্রথম বাঙ্‌লা কাব্যে একটি নূতন ধারা প্রবর্তন করিলেন, এবং বিহারীলালের প্রেরণা পাইয়া সেই ধারায় রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের উন্মেষ হইল। এই কথার প্রমাণ কবির এই কৈশোর কাব্যাভ্যাসের মধ্যে পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া পরবর্তী জীবনে যে সব ভাব ও কল্পনা কবিকে আবেগ চঞ্চল করিয়াছে, তাঁহার জীবন ও কাব্যকে নানাভাবে নানারূপে স্পর্শ করিয়াছে, তাহাদের দু'একটির আভাসও এই রচনাগুলির ভিতর লক্ষ্য করা যায়। তবে তাহা আভাস মাত্রই, শ্রুত অথবা অধীত বাক্যমাত্রই, তখনও তাহারা অনুভূত সত্য হইয়া উঠে নাই, কিংবা সার্থক কাব্যরূপও লাভ করে নাই।

"বনফুল" কাব্যে একটি গল্প। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির যে সুগভীর সম্বন্ধ পরবর্তী জীবনে ও কাব্যে রবীন্দ্র-কাব্য-জিজ্ঞাসার একটা বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া আছে, এই কাব্যোপন্তাসে তাহার আভাস আছে। লিরিক প্রতিভার উন্মেষও ইহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

"কবিকাহিনী"ও "বনফুল"এর মত ট্র্যাজিক্ রোমান্স। যে ঐশ্বর্য, যে মাধুর্য মানুষের করায়ত্ত, সেই নিকটের ঐশ্বর্য অথবা মাধুর্যের মূল্য না বুঝিয়া অথবা অবহেলায় নিকটকে ছাড়িয়া মানুষ দূরে যায়, ঐশ্বর্য ধূলিমুষ্টি জ্ঞান করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, মাধুর্যকে তুচ্ছ করে, অথচ দূরে গিয়া পশ্চাতের জন্ত মন কাঁদিয়া উঠে, তখন নিকটের নাগাল আর পাওয়া যায়না, দূর ও মনকে শান্তি দিতে পারেনা—এই ভাবটি রবীন্দ্র-কাব্যে বহুস্থানে বহুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

কিশোর বয়সের "কবি-কাহিনী"তে তাহার অস্পষ্ট আভাস আছে। তাহা ছাড়া যে বিশ্বজীবন, বিশ্বপ্রেম তাঁহার পরবর্তী জীবন ও কাব্যকে একটী নূতন রূপ দান করিয়াছে তাহারও খুব বিস্তৃত আভাস এই রচনাটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা শুধু, আমি আগেই বলিয়াছি, শ্রুত বা অধীত বাক্য মাত্র, অনুভূত সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলিতেছেন,

> ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড় উপাদেয়, কারণ, ইহা শুনিতে খুব বড়, এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ, তাহা বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী, ১৫৭ পৃ)

কিন্তু এই যে 'বিশ্বপ্রেমের ঘটা' এই কাব্যটিতে দেখা যায়, তাহার কারণটুকু জানা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন কাটিয়াছিল 'ভৃত্যরাজক তন্ত্রের' শাসনের মধ্যে, তাহার মধ্যে স্নেহ মায়া ভালবাসা কিছুই ছিল না। কিশোর-চিত্তের বিচিত্র বর্ণের হৃদয়লীলার খবর সেখানে কেহ লইত না, স্নেহে প্রীতিতে সহানুভূতিতে অথবা সহজ বোধের সাহায্যে সেই লীলাকে স্পর্শ করিবার কেহ ছিল না। কিশোর চিত্তকে বাধ্য হইয়াই তখন আপনার মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, একটা 'বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে' বাস করা ছাড়া তাহার আর কিছু উপায় ছিল না। মনের এই অবস্থায় 'তিল তাল হয়ে' উঠে, সুখ দুঃখের অনুভূতি স্বপ্ন অথবা কল্পনামাত্র হইলেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া দেখা দেয়, এবং 'যাহা স্বতই বৃহৎ তাহা বাহিরের দিক বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য'। রবীন্দ্রনাথ কদাচ বাড়ীর বাহিরে যাইতে পারিতেন, সময় সময় যখন সুযোগ ঘটিত তখন কোনও ভৃত্য অথবা কর্মচারী সঙ্গে যাইত। বাহিরের এই জগত তাঁহার কাছে অজ্ঞাত ছিল বলিলেই চলে। বিশ্বজগতের সঙ্গে তাঁহার শৈশব ও কৈশোরের যে-সম্বন্ধ তাহা শুধু দরজা জানালার ফাঁকে ফাঁকে; সেই ফাঁক দিয়াই এই আলো বাতাস, রৌদ্রবৃষ্টি, আকাশ ও মাটি, লতা, গাছ, পশু, পক্ষী মানুষ, রূপরস গন্ধ তাঁহাকে শুধু স্পর্শমাত্র করিয়া যাইত, কিন্তু ইহাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ তাহার ছিল না। বিশ্বপ্রকৃতি

> "যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না,—সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল

প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই।"
"জীবনস্মৃতি," বিশ্বভারতী, ১৪ পৃ)।

প্রভাত বাবু যথার্থই বলিয়াছেন

"রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের কথা স্মরণ করিলে মনে হয় যে বালক রবীন্দ্রনাথ 'কবিকাহিনী'র মধ্যে কল্পনার সাহায্যে নিজের অনেক অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়া লইয়াছেন।" ("রবীন্দ্রজীবনী", বিশ্বভারতী, ১ম খণ্ড, ৬৬ পৃ)।

ঠিক্ এই কারণেই, কবির কৈশোরের সব ক'টি রচনাই 'বস্তুহীন ভিত্তিহীন,' উচ্ছ্বাসের বাষ্পে ভরা, এবং সবগুলিই ট্রাজেডি। এই বয়সটাই তো স্পর্শচঞ্চল চিত্তের পক্ষে দুঃখ-বিলাসের বয়স, এবং রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর যে-ভাবে কাটিয়াছে, তাহাতে এই দুঃখ-বিলাসের আকর্ষণ আরও প্রবল হইবারই কথা।

কিন্তু "কবিকাহিনী" অথবা এই বয়সের অন্যান্য রচনার ভাব যাহাই হউক, ইহাদের মধ্যে দু'টি জিনিষ সহজেই লক্ষ্য করা যায়, একটি কবির হৃদয় বৃত্তির সৌকুমার্য ও কল্পনার অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি, আর একটি তাঁহার লিরিক প্রতিভা; যে লিরিক্ প্রতিভা উত্তর জীবনে রবীন্দ্রনাথকে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে তাহার পরিচয় এই রচনাগুলি হইতেই আরম্ভ হইয়াছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

"রুদ্রচণ্ড" একটি ক্ষুদ্র নাটিকা, একটু মেলোড্রামাটিক, এবং এর কাব্যমূল্যও খুব বেশী নয়। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ "ভগ্নহৃদয়" নামে একটি গীতিকাব্য রচনা করেন; ইহার কাব্যমূল্য উপেক্ষা করা যায় না। "ভগ্নহৃদয়" নাটকাকারে লিখিত, কিন্তু কেহ ইহাকে নাটক বলিয়া ভুল করেন সেইজন্য কবি ভূমিকাতেই লিখিয়াছেন,

"নিম্নলিখিত কাব্যটিকে কাহারও যেন নাটক বলিয়া ভ্রম না হয়। দৃশ্যকাব্য ফুলের গাছের মত; তাহাতে ফুল ফুটে, কিন্তু সে-ফুলের সঙ্গে শিকড়, কাণ্ড, শাখা, পত্র, কাঁটাটি পর্য্যন্ত থাকা অনাবশ্যক। নিম্নলিখিত কাব্যটি ফুলের তোড়া। গাছের আর সমস্ত বাদ দিয়া কেবলমাত্র ফুলগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। নাটকাকারে কাব্য লিখিত হইয়াছে।" ("ভারতী", ১২৮৭, কার্তিক, ৩৩৬ পৃ)।

"ভগ্নহৃদয়" লেখা আরম্ভ হইয়াছিল প্রথম বিলাত-প্রবাস কালে, দেশে ফিরিয়া আসার পর শেষ করা হয়। যে কৈশোর কবি-ধর্মের প্রকাশ "কবিকাহিনী" তে আমরা দেখিতে পাই, তাহা "ভগ্নহৃদয়" কাব্যেও সুস্পষ্ট।

এই বয়সের সব ক'টি রচনাই হৃদয়োচ্ছ্বাসের বাষ্পে আচ্ছন্ন, সে কথা ত আগেই বলিয়াছি; "ভগ্নহৃদয়"এ এই উচ্ছ্বাস যেন আরও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও হৃদয়াবেগ অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট, এখনও তাহা মূর্তি গ্রহণ করে নাই। কবি নিজেই বলিতেছেন,

"ভগ্নহৃদয় যখন লিখ্‌তে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয়, যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে সেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মত কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হ'য়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগবী হ'য়ে উঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা' নয়—আমার আশে পাশে সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলে একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পলোকের খুব তীব্র সুখ দুঃখও স্বপ্নের সুখ দুঃখের মত। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিলনা, কেবল নিজের মনটাই ছিল—তাই আপন মনে তিল তাল হ'য়ে উঠ্‌তো।" (জনৈক বন্ধুর নিকট পত্র, "জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী, ১৮৭ পৃ)।

মনের এই অবস্থার পরিচয় অন্যত্র কবি নিজেই দিতেছেন,

"বাড়ীর লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা না আমার, না আর কাহারো মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে লেখাও তেমনি। মনের মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল বাষ্প আছে—সেই বাষ্পভরা বুদ্‌বুদরাশি, সেই আবেগের কোমলতা অলস কল্পনার আব র টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোনো রূপের সৃষ্টি নাই, কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে। কেবল টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া। তাহার মধ্যে বস্তু যাহা কিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদের অনুকরণ; উহার মধ্যে আমার যেটুকু, সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারী অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।" ("জীবনস্মৃতি," বিশ্বভারতী, ১৩৬)।

এমন সত্য ও সুন্দর আত্ম-বিশ্লেষণ কোনও কবি নিজের কাব্য সম্বন্ধে করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

চিত্তের যে অস্পষ্ট অপরিস্ফুট হৃদয়াবেগ হইতে "কবিকাহিনী", "রুদ্রচণ্ড" অথবা "ভগ্নহৃদয়"এর সৃষ্টি, ঠিক্ অনুরূপ অবস্থার মধ্যেই "শৈশব সঙ্গীত"এর সৃষ্টি। "শৈশব সঙ্গীত"এর কবিতাগুলি অনেকগুলিই গাথা জাতীয়, এবং এই গাথাগুলি এবং অন্যান্য কবিতাগুলি কবির আঠারো হইতে কুড়ি

বৎসরের মধ্যে লেখা। এগুলিও উচ্ছ্বাসের বাষ্পে ভরা, এবং গাথাগুলি প্রায় সবই ট্রাজেডি—বোঝা যাইতেছে, "বনফুল", "কবিকাহিনী", "রুদ্রচণ্ড", "ভগ্ন-হৃদয়" এর সঙ্গে "শৈশব সঙ্গীত"ও একই পর্যায়ের রচনা, একই চিত্তধারার সৃষ্টি। এই ধারা চলিয়াছে "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" পর্য্যন্ত, এবং "শৈশব সঙ্গীত" ও "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" যাহারা একটু অভিনিবেশে পাঠ করিয়াছেন, তাহারা জানেন এই দুই রচনার মধ্যে একটা খুব নিবিড় ভাব-ঐক্য আছে। কাব্য-সৃষ্টির দিক হইতে "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" সার্থকতর, একথা সত্য, কিন্তু তাহা কিছু ভাবৈশ্বর্যের জন্য নয়, চিত্তসমৃদ্ধির জন্য নয়; বরং যে অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট হৃদয়াবেগ পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়, "সন্ধ্যা-সঙ্গী"তে তাহা সমভাবেই বিদ্যমান, যে হৃদয় অরণ্যের মধ্যে কবি ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছেন সে অরণ্য এখনও তেমনি গহন তেমনি গভীর। তবু, "শৈশব সঙ্গীত"এর সঙ্গে "সন্ধ্যা সঙ্গীত"এর পার্থক্য একটা আছে, কিন্তু সে পার্থক্য শুধু প্রকাশ-ভঙ্গীর, কাব্যরূপের। প্রভাতবাবুও বলিতেছেন, "শৈশব সঙ্গীত"

> 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত'এর অব্যবহিত পূর্বের রচনা। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত'এর সঙ্গে তফাৎ শুধু বলিবার ভঙ্গীতেই প্রধান। * * * 'বনফুল' হইতে 'ভগ্নহৃদয়' পর্যন্ত কাব্যোপন্যাসগুলি, ও 'শৈশব সঙ্গীতে'র কবিতাগুলি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'এর সোপান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে ভাবের বিচ্ছেদ টানা কঠিন, যথার্থ পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত'এর বলিবার ভঙ্গীতে, সে-ভঙ্গী তাঁহার নিজস্ব।" (রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১০০—১০১পৃ)।

"ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" কবির ষোল বছর বয়সের লেখা, "কবিকাহিনী" রচনারও আগে। এই রচনাটি কবির কিশোর বয়সের অন্যান্য কাব্যরচনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এবং সেই হেতু পৃথকভাগে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত।

এই কিশোর বয়সে বিহারীলাল একদিকে তাঁহার আদর্শ ছিলেন, আমরা দেখিয়াছি; কবির মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল বিহারীলালের মতন কবি হইবার, এবং কতকটা বিহারীলালের অনুকরণই দেখা যায় তাঁহার "কবিকাহিনী", "রুদ্রচণ্ড", "শৈশব সঙ্গীত", "ভগ্নহৃদয়" প্রভৃতি রচনাগুলিতে, বিশেষভাবে ছন্দ ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে। কিন্তু আর একদিকে প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলীও তরুণ কবির চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছিল*; তাহাদের ভাষা ও ছন্দ কিশোর কবির স্পর্শকাতর সুকুমার মনকে অভিভূত করিয়াছিল, এবং বৈষ্ণব

কবিদের অনুকরণে কবিতা রচনা করিবার একটা প্রবল ইচ্ছার সঞ্চার করিয়াছিল। এই ইচ্ছার মধ্যেই "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"র সৃষ্টি। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে বম কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। বৈষ্ণব-সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা শৈশবেই সুরু হইয়াছিল।

"শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন, কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড় করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ্য বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোট বাঁধানো খাতায় নোট্ করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম। (রবীন্দ্রনাথ, "জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী, ১২১ পৃ)।

শৈশবেই এমন করিয়া বৈষ্ণব পদাবলী যিনি পড়িয়াছিলেন উত্তরজীবনে তাঁহার কাব্যে ভাবে ও ভাষায়, ছন্দে ও কল্পনায় বৈষ্ণব পদকর্তাদের স্পর্শ লাগিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এ পদগুলির মধ্যে কবি যে ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য, কল্পনার যে মুক্তি, যে বিচিত্র চিত্রসৃষ্টি, যে নিবিড় ভাবোপলব্ধি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কিশোর কবিচিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল; বৈষ্ণব কবিতার ভাষার সহজ ললিত গতি এবং গীতিমাধুর্যও তাঁহার কবিপ্রাণে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল—উত্তর জীবনেও কখনও তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই, এবং লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে কবির সমগ্র কবিজীবনে এই বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রভাব তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ একমাত্র কালিদাস ছাড়া ভারতবর্ষের প্রাচীন কবিদের মধ্যে এই বৈষ্ণব পদকর্তাদের মত আর কেহই রবীন্দ্রনাথের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্র-কাব্য যে একান্তই গীতধর্মী, তাহার মূলে এই বৈষ্ণব পদকর্তারা নাই, একথা বলা অত্যন্ত কঠিন। যাহা হউক, উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত কঠোর, এবং সম্ভবতঃ অন্যায়ও বটে। ভানুসিংহ ছদ্মনাম, এবং এই ছদ্মনামে অনেকেই প্রতারিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু কবি বলিতেছেন,

"ভানুসিংহ যিনিই হোন তাঁহার লেখা যদি বর্তমানে আমার হাতে পড়িত আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার

বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা ; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে উহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কসিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ গলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা অর্গানের বিলাতী টুংটাং মাত্র।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী, ১৪৫-৪৬)।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের ছন্দ, ভঙ্গী, কলাকৌশল ঠিকই আয়ত্ত করিয়াছিলেন ; সেই দিক দিয়া ভানুসিংহের দ্বারা যাহারা প্রতারিত হইয়াছিলেন তাহাদের খুব অপরাধী করা যায় না ; বিষয় নির্বাচনেও তিনি পদকর্তাদের সার্থক অনুকরণ করিয়াছিলেন ; কৃষ্ণের আপাতনিষ্ঠুর লীলা, রাধার বিরহ দুঃখ, অন্ধকার বৃষ্টিমুখরিত শ্রাবণরজনী, তরঙ্গিত যমুনা, বাঁশীর সুর, অভিসার, মিলন, কুঞ্জবন কিছুই বাদ পড়ে নাই ; পরিবেশ সৃষ্টির দিক হইতে কোনই ত্রুটি নাই। 'নীদ-মেঘপর স্বপন-বিজলি সম রাধা বিলসিত হাসি'—ষোল বৎসর বয়সের কবির হাতে এই ছবিও উপমা সুন্দর, সন্দেহ কি? তাছাড়া, দু'চারটি পদ আছে যাহা যে-কোনও বয়সের কবির পক্ষে গৌরব করিবার মতন ; 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথ যামিনীরে', 'মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান' ইত্যাদি পদ তো 'বাজাইয়া কসিয়া' দেখিলেও মেকী বলিয়া ধরা পড়িবার সম্ভাবনা কম। তবে, বৈষ্ণবপদকর্তাদের একটা জিনিস রবীন্দ্রনাথ সে-বয়সে ধরিতে পারেন নাই, কারণ তাহা অনুকরণ করা যায় না। তাহা তাহাদের অনুভূত সত্য, তাহাদের ভাবের অকৃত্রিমতা। আমরা বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, তাঁহার এই বয়সের সমস্ত রচনাই ভাবহীন বস্তুহীন, কল্পলোকের সৃষ্টি। "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"ও তাহা হইতে বাদ পড়ে নাই। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ পদকর্তাদের বহির্দিকটাই দেখিয়াছিলেন এবং সেই বহির্দিক তাঁহার মত প্রতিভার পক্ষে অনুকরণ করা কঠিন ছিলনা ; কিন্তু তাহাদের অন্তর্লোকের মধ্যে তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" অন্য সকল দিক দিয়া সার্থক হইলেও কবিমনের সত্য পরিচয় ইহাতে নাই, নিজের কবিমানস এখনও অনাবিষ্কৃত। ইহার অন্যথা কি করিয়া হইবে? কবির কাব্য রচনা এই বয়সে এখনও অনুকরণের পর্যায় অতিক্রম করিতে পারে নাই। কবি এখনও নিজের মধ্যে নিজে অবরুদ্ধ, বাহিরের স্পর্শ

যতটুকু আসিয়া লাগিতেছে তাহাতে বাহিরকে জানিবার ও বুঝিবার, তাহার রহস্তের অন্তরে প্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ হইতেছে না, বরং নিজের মধ্যেই অবরুদ্ধ হইয়া আবর্তের সৃষ্টি হইতেছে ; এখনও হৃদয়-অরণ্যের মধ্যেই তিনি ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতেছেন। এই অনুকরণের পর্যায় অতিক্রম করিলেন তিনি "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে", যদিও অবরুদ্ধ অবস্থাটা সেখানেও কাটিয়া যায় নাই। "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"ই সর্বপ্রথম কবি অন্য কবিদের রচিত 'কবিতার শাসন হইতে চিরমুক্তি লাভ করিলেন', তাঁহার 'মনের মধ্যে ফাঁকা একটা আনন্দের আবেগ আসিল'। এই যে অন্য কবিতার শাসন হইতে মুক্তি, এই মুক্তিই ক্রমশঃ তাঁহাকে মনের অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্তির দিকে, হৃদয়-অরণ্য হইতে মুক্তির দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। খানিকটা মুক্তিলাভ "সন্ধ্যা সঙ্গীতে" ঘটিল বটে, কিন্তু যথার্থ মুক্তি লাভ ঘটিল "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" অতিক্রম করিয়া "প্রভাত-সঙ্গীতে"। সেই জন্য মোহিতবাবু সম্পাদিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"র কবিতাগুলিকে যে 'হৃদয়-অরণ্য' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছিল।

কারণ, "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"ও (১২৮৮) কবির ভাব ও কল্পনা অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট, এখনও 'ভাবহীন বস্তুহীন' কল্পলোকের রাজত্বই চলিতেছে ; দুঃখ বিলাস এখনও কবিকে পরিত্যাগ করে নাই।

কিন্তু "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"র ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গী নূতন ; তাহার পূর্ববর্তী কবিতাগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কাব্য-রচনার যে-রীতি ও সংস্কারের মধ্যে কবি এতকাল আবদ্ধ ছিলেন তাহা খসিয়া পড়িয়া গেল, এবং তিনি নিজস্ব রীতি ও কলা-কৌশলের সন্ধান পাইলেন। একটা স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার মধ্যে তাঁহার কাব্য মুক্তি পাইল। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই এই মুক্তির আবেগানন্দ সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে।

"* * * বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিলনা, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল তখনকার অনেক কবিতা নূতন গ্রন্থাবলীতে বর্জন করা হইয়াছে— কেবল সন্ধ্যা-সঙ্গীতে প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা [মোহিতবাবু সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীর] হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

"* * * যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানিনা কেমন করিয়া, কাব্য রচনার যে-সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে সব কবিতা

ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি, তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা আপনি সেই সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তি লাভ করিল।

"* * * ছুটো একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারী একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল—বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।

"* * * এই সঙ্কীর্ণতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন একটা খালের মতো সীধা চলে না—আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতাম কিন্তু এখন লেশমাত্র সঙ্কোচ বোধ হইল না।* * *

"বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া ছিলেন তাহা তিনমাত্রা মূলক * * *।

"তিনমাত্রা জিনিসটা ছুই মাত্রার মতো চৌকা নহে, তাহা গোলার মতো গোল, এইজন্ত তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়, তাহার এই বেগবান গতির নৃত্য যেন ঘন ঘন ঝঙ্কারে নুপুর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশী করিয়া ব্যবহার করিতাম।* * * সন্ধ্যা-সঙ্গীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম।

*** কোনো প্রকার পূর্ব্ব সংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়াছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। * * * হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়াই যেন দেখিলাম আমার হাতে শৃঙ্খল পরান নাই। * * *

"* * * কাব্য হিসাবে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের মূল্য বেশী না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ, ভাষা, ভাব, মূর্ত্তি ধরিয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা খুসি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু খুসিটার মূল্য আছে।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী, সং, পৃ ২০৮—১২)।

যাহা হউক, এইটুকু বোঝা গেল, ছন্দের দিক্ হইতে, বহিরঙ্গের দিক্ হইতে "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"ই কবির চিত্ত পূর্ব সংস্কার হইতে মুক্তি পাইল, কবি নিজকে নিজে আবিষ্কার করিলেন, কিন্তু হৃদয়-অরণ্য হইতে মুক্তিলাভ এখনও ঘটিলনা। "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"র কবিতাগুলি পাঠ করিলেই দেখা যাইবে, কবির সমস্ত চিত্ত ব্যথাভারাক্রান্ত, অজানা ছুঃখভারে পীড়িত। কবিতাগুলির নামই তাহার প্রমান—'তারকার আত্মহত্যা', 'আশার নৈরাশ্য', 'পরিত্যক্ত', 'সুখের

বিলাপ', 'দুঃখ আবাহন', 'অসহ্য ভালবাসা', 'হলাহল', 'পরাজয় সঙ্গীত', ইত্যাদি। 'সন্ধ্যা' কবিতায়

বাধা বড়ো বাজিয়াছে প্রাণে
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়!
কাছে আয়—আরো কাছে আয়—
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায়। ("সন্ধ্যা-সঙ্গীত")

অথবা 'আশার নৈরাশ্য' কবিতায়

বলো, আশা, বসি মোর চিতে,
'আরো দুঃখ হইবে বহিতে,
হৃদয়ের যে-প্রদেশ হয়েছিল ভস্মশেষ
আর যারে হ'ত না সহিতে
আবার নূতন প্রাণ পেয়ে
সেও পুনঃ থাকিবে দহিতে।' ("সন্ধ্যা-সঙ্গীত")

অথবা 'পরিত্যক্ত' কবিতায়

চলে গেল সকলেই চলে গেল গো
বুক শুধু ভেঙে গেল দলে গেল গো। ("সন্ধ্যা-সঙ্গীত")

অথবা 'দুঃখ আবাহন' কবিতায়

আয়, দুঃখ, আয় তুই
তোর তরে পেতেছি আসন,
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি' টানি' উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস্ শোষণ;
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ
হৃদয়ে আয়রে তুই হৃদয়ের ধন। ("সন্ধ্যা-সঙ্গীত")

যে-দুঃখ বিলাসের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"র এর সমস্ত কবিতার সুর। কিন্তু ইহাকে শুধু দুঃখ বিলাসই বা কি করিয়া বলি? অস্পষ্টতার একটা বেদনা আছে; অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি মনের মধ্যে ব্যথার আবর্ত ঘোলাইয়া তোলে। ইহা শুধু বিলাস মাত্র নয়; ইহা মনের একটা বিশেষ অবস্থার সত্য, এবং সেই হেতু ইহার মূল্য ও আছে। "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"র

> "*** মূল নাই বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে কিনা মূল্য নাই বলিয়া তর্ক করা চলিতে পারে। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে না? কেন না কাব্যের ভিতর দিয়া মানুষ আপনার হৃদয়কে ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, সেই হৃদয়ের কোনো অবস্থার পরিচয় যদি কোনো লেখায় ব্যক্ত হয় তবে মানুষ তাহাকে কুড়াইয়া রাখিয়া দেয়—ব্যক্ত যদি না হয় তবেই তাহাকে ফেলিয়া দিয়া থাকে। অতএব হৃদয়ের অব্যক্ত আকুতিকে ব্যক্ত করায় পাপ নাই—যত অপরাধ ব্যক্ত করিতে না পারার দিকে। মানুষের মধ্যে একটা দ্বৈত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গম্ভীর অন্তরালে যে-মানুষটা বসিয়া আছে, তাহাকে ভালো করিয়া চিননা ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে তো লোপ করিতে পারিনা। বাহিরের সঙ্গে তাহার অন্তরের সুর যখন মেলে না—সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না তখন সেই অন্তরনিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানস প্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না—ইহার বর্ণনা নাই—এইজন্য ইহার যে রোদনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে—তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশী। সন্ধ্যাসঙ্গীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। * * *"

যাহাই হউক, "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"র শেষের কয়েকটি কবিতায় দেখা যাইতেছে, মনের এই অবস্থার সঙ্গে কবিচিত্তের একটা সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। কবি এই ব্যথাভারাক্রান্ত জীবন হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 'দুঃখের কঠোরতা' মাঝে মাঝে ঘুচিতেছে, মাঝে মাঝে মন শান্ত হইতেছে, বিহঙ্গের গান, তটিনীর কথা, 'বসন্তের কুসুমের মেলা' মাঝে মাঝে ভাল লাগিতেছে, অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে মন মাঝে মাঝে মুক্ত হইয়া বাহিরের জগতের স্পর্শ লাভ করিতেছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে সব ঢাকিয়া যাইতেছে। এই দুঃখময়ীকে আর তিনি চাহেন না, এই অস্পষ্টতা অপরিস্ফুটতার বেদনায় ভারাক্রান্ত দিনগুলি আর তাঁহার ভাল লাগে না; তিনি এইবার বহির্জগতের স্পর্শলাভের জন্য ব্যগ্র। দুঃখময়ীকে তিনি বিদায় দিতে চাহিতেছেন,

> যাও মোরে যাও ছেড়ে, নিওনা—নিওনা কেড়ে
> নিওনা নিওনা মন মোর,
> সখাদের কাছ হ'তে ছিনিয়া নিওনা মোরে,
> ছিঁড়োনা এ প্রাণের ডোর
> আবার হারাই যদি এই গিরি, এই নদী,
> মেঘ বায়ু কানন নির্ঝর।

আবার স্বপন ছুটে একেবারে যায় টুটে'
এ আমার গোধূলির ঘর,
আবার আশ্রয় হারা ঘুরে ঘুরে' হই সারা,
ঝটিকার মেঘখণ্ড সম,
দুঃখের বিদ্যুৎফণা ভীষণ ভুজঙ্গ এক
পোষণ করিয়া বক্ষে মম—
তা'হলে এ জনমে নিরাশ্রয় এ জীবনে
ভাঙা ঘর আর গড়িবেনা
ভাঙা হৃদি আর জুড়িবেনা! ("সন্ধ্যা-সঙ্গীত")

বারবার কবি প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আর এই দুঃখময়ীর কাছে পরাজয় তিনি স্বীকার করিবেন না, বারবার তাঁহার প্রতিজ্ঞা টুটিতেছে। তবু প্রাণপণ প্রয়াস করিয়া বাঁচিতেই হইবে, এইবার ফিরিয়া জগতের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতেই হইবে। কবি নিজেকেই নিজে বলিতেছেন,—

জাগ্, জাগ্, জাগ্, ওরে গ্রাসিতে এসেছে তোরে
নিদারুণ শূন্যতার ছায়া
আকাশ-গরাসী তার কায়া।
গেল তোর চন্দ্র সূর্য্য, গেল তোর গ্রহ তারা,
গেল তোর আত্ম আর পর,
এই বেলা প্রাণপণ কর!
এই বেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
স্রোতোমুখে ভাসিস্ নে আর।
যাহা পাস্ আঁকড়িয়া ধর
সম্মুখে অসীম পারাবার। ("সন্ধ্যা-সঙ্গীত")

'সংগ্রাম সঙ্গীত' কবিতায় এই ভাব আরও প্রবল হইয়াছে, সংগ্রামের সংকল্প জাগিয়াছে মনে।*

হৃদয়ের সাথে আজি
করিব রে করিব সংগ্রাম!
এতদিন কিছু না করিনু

*"সেই সময়কার একটি গদ্যেও এই ভাবের আভাস পাই। প্রবন্ধটির নাম 'আত্ম সংসর্গ'"। (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী"-বিশ্বভারতী, ১ম খণ্ড, ১২৪ পৃ)।

এতদিন বসে' রহিলাম
আজি এই হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম। ("সন্ধ্যা-সঙ্গীত")

এই সংগ্রামে কবির চিত্ত মথিত হইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি জয়ী হইলেন। তাহার সংবাদ পাওয়া গেল "প্রভাত-সঙ্গীতে"। সূচনাটা আরম্ভ হইল "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"র শেষের দিক হইতেই—হৃদয়ের সঙ্গে সংগ্রাম যখন আরম্ভ হইল, তখনই সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়িয়া গেল, একটা নূতন চিত্তজগতের প্রথম অরুণোদয় দেখা দিতেছে। "প্রভাত-সঙ্গীতে"র প্রথম কবিতা 'আবাহন সঙ্গীত'; এই কবিতাটির প্রথম দিকে "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"রই সুর ধ্বনিত হইতেছে,—

নিজের নিশ্বাসে কুয়াসা ঘনায়ে
ঢেকেছে নিজের কায়া
পথ আঁধারিয়া পড়েছে সমুখে
নিজের দেহের ছায়া।

* * *

মুখেতে রয়েছে আঁধার পুঞ্জিয়া
নয়নে জ্বলিছে বিষ
সাপের মতন কুটিল হাসিটী
লুকানো তাহার বিষ। ("প্রভাত-সঙ্গীত")

কিন্তু শেষের দিকে কবি এক নূতন জগতের আহ্বান শুনিতে পাইতেছেন, বিশ্বজীবন তাহাকে ডাক দিতেছে,—

ওর শোন ওই ডাকিছে সবাই
বাহির হইয়া আয়। ("প্রভাত-সঙ্গীত")

প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া "একটি একটি করিয়া সন্ধ্যা-সঙ্গীত লিখিতেছি, এমন সময় আমার মনের মধ্যে হঠাৎ একটা কী উলটপালট হইয়া গেল।" এই উলট্‌ পালট্‌-টাই "সন্ধ্যা-সঙ্গীত"ও তাহার পূর্ববর্ত্তী কবিজীবন হইতে "প্রভাত-সঙ্গীত" ও তাহার পরবর্তী কবিজীবনের যে সুগভীর পার্থক্য তাহার কারণ; তবে এই উলট্‌পালট্‌ 'হঠাৎ' হয় নাই, একদিনে হয় নাই। আমি এই একটু আগেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, মনের অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার একটা প্রবল প্রয়াস "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"র শেষের দিকেই আরম্ভ

হইয়াছে, এবং একটির পর একটি কবিতায় চিত্তের এই সংগ্রাম অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 'কোথা গো প্রভাত রবি-কর' বলিয়া "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"র শেষের দিকে একটা ক্রন্দন 'আমি-হারা' কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে, অন্যান্য কবিতায়ও আছে; ইহার অর্থ এই যে, প্রভাতের রবির কর একদিন প্রাণে আসিয়া প্রবেশ করিবে, কবি তাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছেন—তারপর সেইদিনটি সত্যই আসিল, সে-আনন্দের আবেগ কবি কিছুতেই আর নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, চমকিত হইয়া গাহিয়া উঠিলেন

> আজি এ প্রভাতে রবির কর
> কেমনে পশিল প্রাণের পর! ("প্রভাতসঙ্গীত")

"প্রভাত-সঙ্গীতে"র (১২৮৯-৯০) দ্বিতীয় কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', এবং এই কবিতাটিতেই "প্রভাত-সঙ্গীতে"র কবিজীবনের মূল সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। মোহিতবাবু সম্পাদিত কাব্য-গ্রন্থাবলীতে এই কবিতাটিকে যে 'নিষ্ক্রমণ' বিভাগে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহা যথার্থ। "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"র হৃদয়-অরণ্য হইতে কবির নিষ্ক্রমণ লাভ যে ঘটিল তাহার পরিচয় আমরা পাইলাম 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। রবীন্দ্র-কাব্যে এমন কতকগুলি বিশেষ কবিতা আছে যাহা বিশেষভাবে কবিজীবনের এক একটি নূতন অধ্যায়ের সূচক; 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' তেমন একটি কবিতা। মনের কোন্ অবস্থা হইতে এই কবিতাটির এবং "প্রভাত-সঙ্গীতে"র অন্যান্য কবিতার সৃষ্টি হইল তাহা কবি নিজেই অতি সুন্দর করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন—

> "একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীর ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ীর দেয়ালগুলা পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল একি কেবল সায়াহ্নের আলোক-সম্পাতের একটা জাদুমাত্র? কখনই তাহা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে—আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া ছিলাম তখন যাহা কিছুকে দেখিতে, শুনিতেছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমিই সরিয়া আসিয়াছি বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। * * * এমন

সময় আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম তাহা আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একমুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দ্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দ এবং সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেলনা। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। * * *

"আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গী, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারী আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইত ; সকলেই যেন নিখিল-সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। * * *

"সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই—এখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সঙ্গীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। * * * এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি,—

ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।

"আরো কিছু অধিক বয়সে 'প্রভাত-সঙ্গীত ' সম্বন্ধে একটা পত্র লিখিয়াছিলাম, সেটার এক অংশ এখানে উদ্ধৃত করি।—

'জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর'—ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্ব্বপ্রথম জাগ্রত হ'য়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়। * * * ক্রমে ক্রমে বুঝ্‌তে পারা যায় মনটা যথার্থ কী চায় এবং কী চায় না। তখন

সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সঙ্কীর্ণসীমা অবলম্বন করে জ্বল্‌তে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবী করে বসলে কিছুই পাওয়া যায়না, অবশেষে একটা কোনো কিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হ'তে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটি পাওয়া যায়। প্রভাত-সঙ্গীতে আমার অন্তর প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস, সেইজন্যে ওটাতে আর কোন কিছুর বাছবিচার নেই।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী, ২২৬-৩৬ পৃ)।

এই নূতন অভিজ্ঞতা হইতে "প্রভাত-সঙ্গীতে"র সৃষ্টি। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, হৃদয়-অরণ্যের অন্ধকার হইতে, কৈশোরের একান্ত আত্মকেন্দ্রিয় ভাববিলাস হইতে, কবি মুক্তি লাভ করিয়া বস্তুময় ভাবময় সত্য ও সার্থক বিশ্বজীবনের আনন্দানুভূতির জগতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উত্তর কালে তাঁহার কবিমানস যে বিপুল জগতের রস ও রহস্যের মধ্যে স্বেচ্ছাবিহার করিবে, সে জগতের সিংহদ্বার তিনি অতিক্রম করিলেন। "প্রভাত-সঙ্গীতে"র কবিতাগুলি বিচিত্র বিপুল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ভবিষ্যৎ তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত করিল, সবেগে সবলে অতীত জীবনের সমস্ত কুজ্ঝটিকা ছিন্ন ভিন্ন দীর্ণ কীর্ণ করিয়া। প্রথম যৌবনের মুক্তির আবেগ হইতে উত্থিত এই কবিতাগুলিতে অত্যুক্তি যথেষ্ট, মানসিক স্বাস্থ্যের উদ্দামতা সুস্পষ্ট, নবদীক্ষার উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ; সেই হিসাবে কবিতাগুলি কাব্য হিসাবে কতকটা দুর্বল। কবি এখনও প্রকৃত স্রষ্টা হইয়া উঠেন নাই; সৃষ্টির আবেগ শুধু তাহার মনে জাগিয়াছে, বিপুল একটি কবিপ্রাণ প্রথম আলোর স্পর্শে শুধু উদ্বেলিত হইয়াছে মাত্র, সত্তা স্থির গাম্ভীর্য লাভ করিতে পারে নাই।

'আহ্বান সঙ্গীত' কবিতাটিতে এই নূতন অভিজ্ঞতার প্রথম সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অতীতের দুঃখভারাক্রান্ত কুয়াসাচ্ছন্ন জীবন একান্ত মিথ্যা, এই বোধ তাহার মনে জাগিয়াছে; কবিকে কে যেন বলিতেছে,

> আর কতদিন কাটিবে এমন
> সময় যে চলে যায়।
> ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই
> বাহির হইয়া আয়!
> ('আহ্বান সঙ্গীত', "প্রভাতসঙ্গীত")

তারপর একদিন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হইয়া গেল। সেদিন কবি নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কোনই 'বাছ বিচার' আর রহিল না। শুধু

কথায়ই যে তাহা প্রকাশ পাইল, তাহা নয়, কবিতার ছন্দেও তাহা ফুটিয়া উঠিল ; যেমন উদ্দাম উচ্ছ্বসিত আবেগ, তেমনই উদ্দাম উচ্ছ্বসিত ছন্দ।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান !
না জানি কেনরে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ !
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ
ওরে, উথলি উঠেছে বারি
ওরে, প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

* * *

সহসা আজি এ জগতের মুখ
নূতন করিয়া দেখিনু কেন ?
একটি পাখীর আধখানি তান
জগতের গান গাহিল যেন।

* * *

আমি—ঢালিব করুণা ধারা,
আমি—ভাঙিব পাষাণ কারা,
আমি—জগত প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', "প্রভাত সঙ্গীত")

তারপর 'প্রভাত-উৎসব', 'অনন্তজীবন', অনন্তমরণ' 'পুনর্মিলন' 'প্রতিধ্বনি' 'মহাস্বপ্ন', 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' প্রভৃতি কবিতায় এই কথাটাই বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি কবিতায় (যেমন, 'অনন্ত জীবন', 'অনন্তমরণ', 'সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়'.) কবির একটি নূতন দিক্ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—তাহা তাঁহার সুগভীর বিজ্ঞান-বোধ। বর্তমান জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে পুরাণ গল্পের একটা অপূর্ব সামঞ্জস্যের মধ্যে কবির প্রাণ একটা আশ্রয় সৃষ্টি করিয়াছে; সৃষ্টি ও জীবন রহস্য সম্বন্ধেও একটা সুগভীর দৃষ্টি এই কবিতা কয়টির ভিতর সুস্পষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে, কবি যে নিজেকে

নিজে খুঁজিয়া পাইয়াছেন, নিজের বোধ যে জাগিয়াছে, একটা নূতন জগতে যে তিনি জাগিয়াছেন, সেই কথাটাই এই কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে। কবি যে বলিয়াছেন, বিশ্বজগতের খণ্ড খণ্ড দৃশ্যকে বস্তুকে 'আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম', সেই কথাটাই এই কবিতাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট। 'পুনর্মিলন' কবিতাটি অতীতের স্মৃতি বিজড়িত, সেই স্মৃতির সঙ্গে বর্তমান জীবনের যোগ তিনি সন্ধান করিতেছেন। একদিন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদ হইয়াছিল, হৃদয় নামক এক বিশাল অরণ্যে তিনি নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন; "প্রভাত-সঙ্গীতে" আসিয়া আবার প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার 'পুনর্মিলন' হইয়াছে —এই কথাটাই তিনি বলিতে চাহিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর পর "জীবন-স্মৃতিতে"ও তাহার পুনরুক্তি করিয়াছেন।

> "আমার শিশুকালেই বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ ও নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ীর ভিতর নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত। * * * তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল—চেতনা তখন আপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। * * * অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধদ্বার জানিনা কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন যাহাকে হারাইয়াছিলাম, তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতার পরিচয় পাইলাম। * * * এইজন্য আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাত-সঙ্গীতে যখন আবার পাইলাম, তখন তাহাকে অনেক বেশী পাওয়া গেল। * * *" ("জীবন-স্মৃতি", বিশ্বভারতী, ২৩৬-৩৮পৃঃ)।

'প্রতিধ্বনি' কবিতাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই "জীবন-স্মৃতি"তে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন ("জীবন-স্মৃতি", বিশ্বভারতী, ২৩১-৩৫)। অতিরিক্ত বলিবার কিছুই নাই।

যাহাই হউক, "প্রভাত-সঙ্গীতে" একটা পর্ব শেষ হইয়া গেল। শৈশব হইতে যে-হৃদয়ারণ্যের মধ্যে কবি নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার নিষ্ক্রমণ লাভ ঘটিল; বাহিরের বিচিত্র এই বিশ্বজগতের অর্গল তাঁহার নিকট মুক্ত হইল, এবং প্রথমটায় সদ্য মুক্তির আনন্দ উচ্ছ্বাসাতিশয্যের

ভিতর দিয়া নিজেকে যেন কতকটা অতিমাত্রায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। এখন হইতে কবিজীবনের নূতন পালা, নূতন পর্যায় আরম্ভ হইবে; একটির পর একটি করিয়া কবি নিজের সৃষ্টিকে নিজেই বারংবার অতিক্রম করিয়া যাইবেন। সত্য ও সার্থক কবিজীবন এখন হইতেই আরম্ভ হইবে, এবং এক এক নূতন ভাবপর্যায়ের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-মানসকে স্ফুট হইতে স্ফুটতর করিবেন।

(৩)

ছবি ও গান (১২৯০)
কড়ি ও কোমল (১২৯৩)
মানসী (১২৯৭)
চিত্রাঙ্গদা (১২৯৮)

যে বৃহত্তর বিশ্বজীবনের সিংহদ্বারের প্রবেশমুখে "প্রভাত-সঙ্গীত" রচিত হইয়াছিল, সেই বিশ্বজীবনের সঙ্গে কবি-মানসের নিবিড়তর পরিচয় ধীরে ধীরে সুরু হইল "ছবি ও গান" হইতে। ইহার কিছুদিন আগে কারোয়ারের সমুদ্রতীরে বসিয়া কবি "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নামে একটি কাব্য-নাটিকা রচনা করিয়াছেন। এই নাটিকাটি কথার তুলিতে আঁকা ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়; টুক্‌রা টুক্‌রা ছবি যেন একটি মালায় গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। "ছবি ও গান" ও ঠিক্ এই কথার রেখায় টানা ছবি। এই রচনাগুলিও আরম্ভ হইয়াছিল কারোয়ারের সমুদ্রতীরেই; সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া

> "চৌরঙ্গীর নিটকবর্তী সার্কুলর রোডের একটি বাগান বাড়ীতে আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বসতি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতালার জানালার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার বড় ভালো লাগিত, সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো মনে হইত।
>
> "নানা জিনিষকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনা পরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত। সে আর কিছু না, এক একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা। * * *

" * * * নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই "ছবি ও গান"-এ আরম্ভ হইয়াছে। গানের সুর যেমন সাদা কথাকেও গভীর করিয়া তোলে, তেমনি কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ্য লইয়া সেইটিকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা "ছবি ও গান"-এ ফুটিয়াছে। না, ঠিক্ তাহা নহে। নিজের মনের তারটা যখন সুরে বাঁধা থাকে তখনই বিশ্ব-সঙ্গীতের ঝঙ্কার সকল জায়গা হইতে উঠিয়াই তাহাতে অনুরণন তোলে। সেইদিন লেখকের চিত্তযন্ত্রে একটা সুর জাগিতেছিল বলিয়াই বাহিরের কিছু তুচ্ছ ছিল না। * * * " ("জীবন-স্মৃতি", বিশ্বভারতী, ২৫১—২৫৩ পৃ)।

"ছবি ও গানে"র অধিকাংশ কবিতা বাহিরে যাহা কিছু কবি দেখিতেছেন তাহাকে কথার রেখায় ধরিয়া এক একটি চিত্র রচনার চেষ্টা, কবির নবজাগ্রত চৈতন্যের প্রথম চিত্রলিপি। শুধু দৃষ্টি-ভঙ্গিমার নূতনত্বে নয়, ছন্দ কৌশলের দিক হইতেও কবি নূতন ক্ষমতা অর্জন করিয়াছেন; একটা স্বতঃ উচ্ছ্বসিত আনন্দও কবিতাগুলির মধ্যে সুপরিস্ফুট। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট একটি পত্রে কবি "ছবি ও গান" সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

"* * * আমার "ছবি ও গান" আমি যে কি মাতাল হ'য়ে লিখেছিলুম, তোমার চিঠি পড়ে' বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পেরেছ, এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভব করেচ। আমি তখন দিনরাত পাগল হ'য়ে ছিলুম। * * * আমার সমস্ত শরীরে মনে নব যৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল। * * * কেবলি একটা সৌন্দর্য্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছু ছিল না। * * * সত্যি কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনও আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। "ছবি ও গান" পড়তে পড়তে আমার মন যেন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, এমন আমার কোনো পুরাণো লেখায় হয় না। * * *" (৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭; ২১ মে, ১৮৯০; সবুজ পত্র, ১৩২৪, শ্রাবণ, ২৩৬—৩৯ পৃ)।

কিন্তু বসিয়া বসিয়া ছবি দেখা, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কথায় ছবি ও গানের মালা গাঁথিয়া তোলা, এ আর বোধ হয় মনকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছিলনা। বৃহত্তর সৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা মনের মধ্যে আবেগের সৃষ্টি করিতেছিল। এই চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিল গদ্যে, প্রবন্ধে, মসীযুদ্ধে, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ রচনায়। মানবজীবনের সকল দিক দিয়া নিজকে ব্যক্ত করিবার একটা আকুলতা মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে; এখন আর মন শুধু জানালার ধারে বসিয়া আপন মনে বিচিত্রদৃশ্যের ছবি আঁকিয়াই তৃপ্ত থাকিতে চাহিতেছেনা। ইতিমধ্যে দুই দুইটা মৃত্যু আসিয়াও কবির জীবনে

একটা নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন অনুভূতি দান করিয়া গেল; জীবনের সঙ্গে কবির একটা গভীর পরিচয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিয়া গেল। কিছুদিনের জন্য একটা বৈরাগ্য কবিচিত্তকে অধিকার করিয়াছিল।

"সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আরও গভীর রূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্ত জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারে চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারী একটা মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।" ("জীবন-স্মৃতি", বিশ্বভারতী, ২৭০ পৃ)।

যেমন করিয়াই হোক্, এই মৃত্যুর ভিতর দিয়া কবি বৃহত্তর জীবনলোকে উত্তীর্ণ হইলেন; 'উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘর' তাঁহাকে 'ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডী'র ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল। এখন হইতে মানব-জীবনের বিচিত্র রঙ্গলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতে আরম্ভ করিল; "কড়ি ও কোমলে"র নানান্ কবিতার ভিতর দিয়া এই কথাটাই নানা প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে। মানব জীবনের বিচিত্র লীলা রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার এবং তাহাকে 'সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্ত একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা "কড়ি ও কোমলে"র কবিতাগুলির' মর্মকথা, এবং এই মর্মকথাটি ব্যক্ত হইয়াছে গ্রন্থের প্রথম কবিতাগুলিতেই—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। ('প্রাণ', "কড়ি ও কোমল")

সত্যই, কবির কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—

"এখানে তো একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পরে দ্বার। পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকু মাত্র দেখিয়া কতবার ফিরিতে হয়, শানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে। মনের সঙ্গে মনের আপোষ, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। সেই সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে এবং তাহার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না।

"কড়ি ও কোমল" মানুষের জীবন নিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্য সভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী, ২৭৮—৭৯ পৃ)।

কিন্তু মানুষের জীবন নিকেতনের রহস্য-সভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য কবিচিত্তে এমন আকুলতা জাগিল কেন? কবি নিজেই বলিতেছেন,—

" * * * যেখানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইখানকার প্রবল সুখদুঃখের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য একলা ঘরের প্রাণটা কাঁদে।

"যে মৃদু নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মানুষ কেবলই মধ্যাহ্নতন্দ্রায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে সেখানে মানুষের জীবন আপনার পূর্ণ পরিচয় হইতে আপনি বঞ্চিত থাকে বলিয়াই তাহাকে এমন একটা অবসাদে ঘিরিয়া ফেলে। সেই অবসাদের জড়িমা হইতে বাহির হইবার জন্য আমি চিরদিন বেদনা বোধ করিয়াছি। * * *

"মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার বাধিত আকাঙ্ক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম, দূরবর্তী। কিন্তু তাহার সঙ্গে পৃথিবীর যোগ না যদি বাঁধিতে পারি, * * * তবে যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাই নূতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, * * * তাহা কেবলি জীবনের উপর চাপিয়া চাপিয়া পড়িয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

" * * * আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানা প্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

" এবার একটি পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ভালোমন্দ সুখ দুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মত হাল্কা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙা গড়া, কত জয় পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন। * * *" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী, ২৮২—৮৫ পৃ)।

"কড়ি ও কোমলে"র প্রথম কবিতা তারিখ হিসাবে প্রথম রচনা নয়; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই কবিতাটির মধ্যে "কড়ি ও কোমলে"র মর্মবাণীটি ব্যক্ত হইয়াছে, এবং এই কারণেই সম্পাদন-কর্তা আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় ইহাকেই পুরোভাগে স্থান দিয়াছিলেন। পরিবারের মধ্যে উপরি উপরি দু'টি মৃত্যু কবিকে গভীর ভাবে অভিভূত করিয়াছিল, একথা আমরা বলিয়াছি; কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি তাঁহার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে শুধু কিছুদিনের জন্যই। সুখ হোক্, দুঃখ হোক্ যে কোন ভাব অথবা অনুভূতি হোক্, কোনও কিছুই কবিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারেনা; তিনি যে তাহা ভুলিয়া যান, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার কবিচিত্ত তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায়। কবি জীবনের কোনও অবস্থাকেই চরম ও পরম বলিয়া স্বীকার করেন না। উত্তর জীবনেও মৃত্যুশোক বারবার তাঁহার জীবনকে আঘাত করিয়াছে, কিন্তু নিদারুণ দুঃখও তাহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই, একটা অপার অগাধ নির্লিপ্ততার মধ্যে তাঁহার চিত্ত সহজেই যেন আশ্রয় খুঁজিয়া পায়, মৃত্যুকে বারবার তিনি অস্বীকার করেন বারবার শুধু জীবনকেই ফিরিয়া পাইবার জন্য। সেইজন্যই "কড়ি ও কোমলে"র কবিতাগুলিতে বারবার জীবনের আহ্বানই শুনিতে পাওয়া যায়; মৃত্যুকে, পুরাতনকে বারবার তিনি পিছনে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহিতেছেন,—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই। ('প্রাণ', "কড়ি ও কোমল")

অথবা,

হেথা হ'তে যাও, পুরাতন।
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হ'য়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে। ('পুরাতন', "কড়ি ও কোমল")

অথবা,

বহুদিন পরে আজি মেঘ গেছে চলে
রবির কিরণ সুধা আকাশে উথলে।

স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি' উঠে
পুলক নাচিছে গাছে গাছে
নবীন যৌবন যেন প্রেমের মিলনে কাঁপে
আনন্দ বিদ্যুৎ-আলো নাচে। ('যোগিয়া', "কড়ি ও কোমল")

অথবা,

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর
সম্মুখে রয়েছে পড়ে যুগ যুগান্তর। ('ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি,'
"কড়ি ও কোমল")

অথবা,

নহে নহে, সেকি হয়! সংসার জীবনময়
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয়রে, নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়
তোর সুখ তোর হাসি গান। ('নূতন', "কড়ি ও কোমল")

মানবের মাঝে, জীবন্ত হৃদয়ের মাঝে কবি যেদিন স্থান পাইতে চাহিলেন, তখনই খণ্ড খণ্ড জীবনের মূল্য তাঁহার কাছে আর কিছু রহিলনা; জীবনের সমগ্রতার মধ্যে যে বিচিত্র রসলীলা দিকে দিকে উৎসারিত হইতেছে, তাহাই তাহার কবিচিত্তকে একান্ত করিয়া টানিতে লাগিল। "কড়ি ও কোমলে" সেইজন্য জীবনের এই বিচিত্রতার সন্ধান পাওয়া যায়; যৌবনের বিচিত্র স্বপ্ন, প্রেম, প্রকৃতি, নারী, সৌন্দর্য-রহস্য, শিশুজীবন, স্বদেশ, জীবনের গভীর তাৎপর্য কিছুই কবিচিত্তের স্পর্শ হইতে বাদ পড়ে নাই। 'বঙ্গবাসীর প্রতি', 'আহ্বান গীত' প্রভৃতি কবিতায় স্বদেশ সম্বন্ধে যে গভীর দেশনা ও অনুরাগ এবং যে অনন্যসাধারণ ভাবের ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বাঙ্‌লা এই জাতীয় কবিতায় বিরল। বান্দোরা হইতে (ইন্দিরা দেবীর নিকট) লিখিত কয়েকটি পত্র-কবিতায় জীবনের গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে কবির ভাব ও ভাবনা ব্যক্তিগত আন্তরিকতার স্পর্শে অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু কি এই জাতীয় কবিতা, কি শিশু-জীবন সম্বন্ধীয় কবিতা, কি প্রেম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গান ও কবিতা, সর্বত্রই লাগিয়াছে কবির যৌবনস্বপ্নের স্পর্শ।

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।
পরাণে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস।
যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিঃশ্বাস।

শত নূপুরের রুণুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে।
মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুল মুকুলে;
কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
যেন কোন উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

('যৌবন-স্বপ্ন', "কড়ি ও কোমল")

এই যৌবন-স্বপ্নই কবিমানসকে এমন একটা স্তরে উন্নীত করিয়াছে যাহার ফলে "কড়ি ও কোমলে"র কবিতাগুলিতে কবির সৃষ্টি-ক্ষমতার প্রথম আভাষ লক্ষ্য করা যায়; এই জন্যই সকল ভাব, সকল রূপ, সকল রস, দেখিতেছি, কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। এই যৌবন-স্বপ্নই কবিকে সৌন্দর্য-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে—সে-সৌন্দর্য নারীদেহে, সে-সৌন্দর্য প্রকৃতিতে, সে-সৌন্দর্য ভোগে ও মিলনে, প্রেমে ও মিলনাতীত বিরহে। ভুবনের প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি উন্মুক্ত প্রসারতায় এই সৌন্দর্য বিস্ফুরিত হইতেছে বলিয়াই কবি মরিতে চাহেন না, মানুষের মাঝে তিনি বাঁচিয়া থাকিতে চান। এই জন্যই নারী-দেহের সৌন্দর্য কবির কাছে তুচ্ছ ত নয়ই, বরং পরম রমণীয়, পরম উপভোগ্য, দেহের মিলনও পরম কাম্য। কারণ দেহের মিলন না হইলে ত দেহের আকর্ষণ হইতে মুক্তি নাই। কিছুদিন পরে লেখা একটি পত্রে কবি নিজেও বলিতেছেন,—

"* * * যারা সৌন্দর্য্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হ'তে অক্ষম তারাই সৌন্দর্য্যকে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে—কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে সৌন্দর্য্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত—কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না। * * *"

("ছিন্নপত্র", ২রা আষাঢ়, ১২৯৯)।

তা ছাড়া, যৌবনের প্রথম স্বপ্ন প্রথম আকাঙ্ক্ষাই ত ভোগের স্বপ্ন, ভোগের আকাঙ্ক্ষা; জীবন যদি সত্য হয়, যৌবন যদি সত্য হয়, তাহার

ভোগাকাঙ্ক্ষাও সত্য, কামনা বাসনাও সত্য। 'স্তন', 'চুম্বন', 'বিবসনা' 'বাহু', 'দেহের মিলন', 'তনু' 'পূর্ণ মিলন', 'বন্দী' প্রভৃতি কবিতায় এই ভোগবাসনা সৌন্দর্য ধারায় সিক্ত হইয়া অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে।

ফেল গো বসন ফেল—ঘুচাও অঞ্চল।
পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ
সুর বালিকার বেশ কিরণ বসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি—বিকচ কোমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।
('বিবসনা', "কড়ি ও কোমল")

অথবা,

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্ত সমীরে
কুসুমিত হ'য়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ সুধায় করে পরাণ পাগল।
* * *
হের গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হের নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির।
('স্তন', ১, "কড়ি ও কোমল")

অথবা

পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতা-বিহার-ভূমি কনক-অচল।
উন্নত সতীর স্তন স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্ত্তাভূমি করেছে উজ্জ্বল।
* * *
ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি
দেবশিশু মানবের ঐ মাতৃভূমি।
('স্তন', ২, "কড়ি ও কোমল")

অথবা

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।

* * *

সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহ মন চির রাত্রি-দিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

('দেহের মিলন', "কড়ি ও কোমল")

প্রভৃতি কবিতায় সর্বত্রই একটা ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু এটিও লক্ষ্য করিবার যে এই ভোগাকাঙ্ক্ষাও কতকটা রোমান্টিক, যৌনাকর্ষণ হইতে ভাবগত আকর্ষণই প্রবল। বিবসনা নারীর দেহে তিনি 'লাজহীন পবিত্রতার' সন্ধান করিতেছেন, নারীর স্তন-সুমেরুতে কবি 'দেবশিশু মানবের মাতৃভূমি' বলিয়া কল্পনা করিতেছেন, দেহের সায়রের মধ্যে তিনি ডুব দিতে চান হৃদয়কে স্পর্শ করিবার জন্য, তনুদেহের দিকে চাহিয়া কবির দৃষ্টি দূরে অতীত জীবনের স্মৃতির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়—দেহের জন্যই দেহের আকর্ষণ কোথাও উদগ্র হইয়া দেখা দেয় না; ভোগবাসনাও যেন সৌন্দর্য সৌরভের সঙ্গে মিশিয়া বাতাসে সঞ্চারিত হইয়া যায়, বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ হইতে চায় না। এই একান্ত রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উত্তর কবিজীবনে "সোনার তরী", "চিত্রা" "চৈতালী"তে আমরা দেখিব, এই একান্ত ভাবধর্মী রোমান্টিক দৃষ্টি রবীন্দ্র-কাব্যকে একটি শুচিশুভ্র সংযম দান করিয়াছে; দীর্ঘ অভিসারের পর বারবার তিনি দেহসায়রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই দেহভোগাকাঙ্ক্ষাকে বৃহত্তর সৌন্দর্য ভোগাকাঙ্ক্ষার মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, বস্তুদেহ ভাবদেহের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিরই আর একটা দিক "কড়ি ও কোমলে"র অন্য কয়েকটি কবিতাতেই দেখা যায়। কবির চিরবিরহী চিত্ত বাহুলতার বন্ধনে

পূর্ণমিলনের মধ্যে ও যেন অতৃপ্ত থাকিয়া যায়, একটা ঔদাস্ত যেন কবিচিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে, দেহ-সম্ভোগের মধ্যে যেন তৃপ্তি নাই, বাসনার ফাঁদ হইতে কবিচিত্ত মুক্তি পাইতে চায়। দেহের পরিপূর্ণ মিলন ত দুরাশার স্বপ্ন মাত্র ('পূর্ণ মিলন'), বাহুপাশ বন্ধন ত চিত্তের বন্দীদশা ('বন্দী'), দেহের মোহ, ভোগবাসনার মোহ ক'দিন থাকে, 'এ মায়া মিলায়' ('মোহ'), প্রেম যে ভোগবাসনার বিষ-নিশ্বাসে তিলে তিলে মরিয়া যায় ('পবিত্র প্রেম') দেহসম্ভোগের কুসুম শয়ন ত স্বপ্নরাজ্যের মরীচিকা, সে ত যে কোনও মূহুর্তে মিলাইয়া যায় ('মরীচিকা,)—এ ভোগবাসনার জীবন হইতে কবিচিত্ত মুক্তি চাহে, জাগ্রত হৃদয়, বৃহত্তর জীবনের জন্য কবিচিত্তে আকাঙ্ক্ষা জাগে ('স্বপ্নরুদ্ধ', 'অক্ষমতা', 'জাগিবার চেষ্টা' প্রভৃতি কবিতা)' স্বদেশের 'আহ্বান গীত', জীবনের গভীর সার্থকতার ইঙ্গিত তাহাকে আকর্ষণ করে, 'শেষ কথা'টি বলিবার জন্য মন তখন আকুল হইয়া উঠে। কত কথা ত বলা হইল, চিত্তের অসংখ্য আবেগ ও আকুতি অসংখ্য ভাবে প্রকাশ করা হইল, তবু শেষ কথাটি যেন বলা হইল না।

মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।

*   *   *

সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরী
আর বাজাব না বীণা চিরদিন তরে,

*   *   *

সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।

('শেষ কথা', "কড়ি ও কোমল")

কিন্তু শেষ কথা কি কিছু আছে ; শেষ কথা যদি বলা হইয়া যাইত, তাহা হইলে ত কবি কবেই নীরব হইয়া যাইতেন। "শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে ?"—পরবর্তী জীবনে কবি এই কথাই বারবার নানা ভাষায় বলিয়াছেন। এক ভাব পর্যায়ের সীমা শেষ হইয়া যায়, এই শেষের মধ্যে যে অশেষ আছে তাহা কবিকে নূতন পর্যায়ের সীমায় টানিতে থাকে ; রবীন্দ্রনাথের

কবিজীবনের সুদীর্ঘ ইতিহাস এই অশেষকে শেষ করিয়া প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টার ইতিহাস। নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে, নানা বিচিত্র অনুভবের ভিতর দিয়া তিনি অসীমের, অরূপের, অশেষের বিচিত্র রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন, করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু যতই তিনি বলিয়াছেন, যত চেষ্টাই তিনি করিয়াছেন, শেষ কিছুতেই আর হয় নাই, হইবার নয়।

কিন্তু "কড়ি ও কোমলে"ও কবি স্ব-প্রতিষ্ঠ হইতে পারেন নাই; তাঁহার কাব্য এখনও সত্য ও সার্থক সৃষ্টি হইতে পারে নাই। ছন্দের উপর যথেচ্ছ অধিকার এখনও জন্মায় নাই। এই আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয় লাভ ঘটিল— "মানসী"তে। "মানসী"তেই তিনি সর্বপ্রথম নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হইলেন, এবং তাঁহার প্রদীপ্ত কবি-প্রতিভার প্রথম উন্মেষ লক্ষ্য করা গেল। কি প্রেম, কি নিসর্গ, সব কিছু সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ দৃষ্টি-ভঙি তাহা এই সময় হইতেই একটা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিল, তিনি মানস-সুন্দরীর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। "মানসী"র নিসর্গ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি তাঁহার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, সুতীব্র অনুভূতি, সুগভীর ভাবগাম্ভীর্য এবং অপূর্ব ছন্দ সম্পদে সমৃদ্ধ। 'সিন্ধুতরঙ্গ', 'মেঘদূত' 'অহল্যার প্রতি' প্রভৃতি কবিতার যে ভাব ও ধ্বনি গাম্ভীর্য, চিন্তার যে গভীরতা, মনের যে উন্মুক্ত প্রসার এবং যে সবল কল্পনার ঐশ্বর্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ববর্তী কোনও কবিতাতেই দেখা যায় না, এবং পরবর্তী কালে "সোনারতরী", "চিত্রা", "চৈতালী", "কল্পনা" "বলাকা" ও "পূরবী"তে এই গুণগুলিই বিচিত্র ও ক্রমবর্দ্ধমান অভিজ্ঞতাদ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। শব্দ নির্বাচনের ক্ষমতা, ধ্বনি ও ছন্দকে হাতের ক্রীড়নক করিয়া নিজের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা, কথায় তুলিতে ছবি আঁকিবার ক্ষমতা সমস্তই "মানসী"র অধিকাংশ কবিতায় অপূর্ব নৈপুণ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'কুহুধ্বনি', 'বধূ', 'অপেক্ষা', 'একাল ও সেকাল' প্রভৃতি কবিতা তাহার প্রমাণ; তাহা ছাড়া এই জাতীয় কবিতায় কবিহৃদয়ের যে সুগভীর সহানুভূতি, প্রকৃতির সঙ্গে যে নিবিড় আত্মীয়তাবোধ প্রথম লক্ষ্য করা যায় তাহাই পরবর্তী জীবনে আরও ব্যাপক, আরও সমৃদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসকে অপরূপ সম্পদ দান করিয়াছে। বস্তুতঃ, "মানসী"ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক কাব্য সৃষ্টি।

"মানসী"র কবিতাগুলি ১২৯৪, বৈশাখ হইতে ১২৯৭, কার্তিকের মধ্যে লেখা, এবং অধিকাংশ কবিতাই গাজিপুরের নির্জনবাসে রচিত। প্রথম কবিতা 'উপহার' ১২৯৭ বৈশাখের রচনা, কিন্তু এই কবিতাটিতেই "মানসী"র এবং পরবর্তী কবিজীবনের মর্মবাণীটি ব্যক্ত হইয়াছে,—

নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিন রাত।

* * *

এ চির-জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি' শুধু অসীমের সীমা
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে' তুলি মানসী-প্রতিমা।

('উপহার', "মানসী")

বিশ্ব-জীবনের তরঙ্গাঘাত প্রতিমুহূর্তে কবিচিত্তকে স্পর্শ করিতেছে, এবং তাহার ফলে যে বিচিত্র অনুভূতি জন্মলাভ করিতেছে, কবি তাহাকেই বাণীরূপ দান করিতেছেন—ইহাই রবীন্দ্র-কবিজীবনের ইতিহাস। এই বাণীরূপ তাহার মানসী প্রতিমা। অনন্তকাল ও অনন্ত বিশ্ব-জীবন রবীন্দ্র কবি-চিত্তের পটভূমি; তাঁহার কবিমানস খণ্ড বস্তুকে খণ্ড জীবনকে লইয়া সৃষ্টি সূচনা করে, কিন্তু মুহূর্তেই তাহা ব্যাপ্ত হইয়া যায় অনন্তকালের মধ্যে, বিশ্বজীবনের অসীমতার মধ্যে,—

জগতের মর্ম হ'তে মোর মর্মস্থলে
আনিতেছে জীবন লহরী।

('জীবন-মধ্যাহ্ন', "মানসী")

অথবা,

বিশ্বের নিঃশ্বাস লাগি' জীবন কুহরে
মঙ্গল আনন্দ-ধ্বনি বাজে।

('জীবন-মধ্যাহ্ন', "মানসী")

ঠিক্ এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ কবিতায় যে উদার নিখিল ব্যাপ্তি, যে সুগভীর গাম্ভীর্য, যে সর্বানুভূতি ও বিশ্ববোধ লক্ষ্য করা যায়, এবং তাহার ফলে এই জাতীয় কবিতাগুলি যে রূপ ও রস-সমৃদ্ধি লাভ করে তাহা কবির প্রেমের কবিতায় অথবা দেশ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিতে পাওয়া যায় না। "মানসী"তে এই তিন জাতীয় কবিতাই আছে, কিন্তু রসিক পাঠক তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন নিসর্গ কবিতাগুলির সঙ্গে অন্য জাতীয় কবিতাগুলির রস-সমৃদ্ধির তুলনাই হইতে পারে না। পরবর্তী কবিজীবনে এই কথার আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। "মানসী"র প্রেমের কবিতাগুলিতে এবং পরবর্তী জীবনের প্রেমের কবিতায়ও প্রেমের বিচিত্র লীলারহস্যের পরিচয় যে নাই, তাহা নহে, কিন্তু যেহেতু সেই প্রেম কায়া-নৈকট্য হারাইয়া, বস্তুনিরপেক্ষ হইয়া ভাবলোকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, সেই হেতুই এই প্রেমের রসনিবিড়তা ক্ষুণ্ণ হয়, তাহার ঘন মাধুর্য নিসর্গ সৌরভের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, মানবচিত্ত তাহাতে রসাবেশে মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু প্রেমাস্পদকে পাইবার অথবা ভোগ করিবার আগ্রহে উদ্বেল উঠেনা, ভাবলোকের আসঙ্গ লিপ্সায়ই প্রেম চরিতার্থতা লাভ করে। ঠিক এই কারণেই, কীট্‌স অথবা চণ্ডীদাসকে আমরা যে-হিসাবে প্রেমের কবি বলি, রবীন্দ্রনাথকে সেই হিসাবে প্রেমের কবি বলিতে পারি না। অথচ যে দৃষ্টিভঙ্গির জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা রসনিবিড় হইয়া উঠিতে পারেনা, সেই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই কিন্তু নিসর্গ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি অপরূপ রসঘন রূপ লাভ করে। এই জাতীয় কবিতাগুলিতে যে মুহূর্তে বিশ্বের নিঃশ্বাস আসিয়া লাগে সেই মুহূর্তেই কবিতাগুলি অপূর্ব অনির্বচনীয় রূপলোকে রসলোকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

এই নিসর্গ কোনও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না, শুধু প্রকৃতি বুঝিতেছি না ; মানুষ, পৃথিবী, মানবজীবন, বিশ্বজীবন, সৌন্দর্য সমস্তই এই নিসর্গের অন্তর্গত, এবং ব্যাপক অর্থে প্রেমও। কিন্তু প্রেমের কবিতা বলিতে এখানে যাহা বুঝিতেছি তাহা শুধু আমাদের এই জড়-জগতের নর-নারীর দেহ-আত্মাকে লইয়া যে লীলা তাহাই বুঝিতেছি, এবং সেই অর্থেই শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে উপরের কথাগুলি প্রযোজ্য।

এই দেহ-আত্মাকে লইয়া প্রেমলীলার খুব গভীর পরিচয় যে "মানসী"র কবিতাগুলিতে আছে, এমন কথা বলা যায় না। 'ভুলভাঙা', বিরহানল",

'বিচ্ছেদের শান্তি', 'ক্ষণিক মিলন', 'সংশয়ের আবেগ', 'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি', 'গুপ্ত-প্রেম', 'ব্যক্তপ্রেম', 'নিষ্ফল প্রয়াস', 'সুরদাসের প্রার্থনা বা আঁখির অপরাধ', 'হৃদয়ের ধন', 'পূর্বকালে', 'অনন্ত প্রেম' প্রভৃতি কবিতায় এই প্রেম-লীলার সহজ অথচ বিচিত্র অনুভূতির পরিচয় কবিচিত্তের তরঙ্গিত ভাবাধারায় রূপান্তরিত হইয়া অপূর্ব গীতমাধুর্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'নিষ্ফল কামনা', এবং এই কবিতাটির মধ্যেই কবিচিত্তের রোমান্টিক ভাবকল্পনা যেন দানা বাঁধিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"বৃথা এ ক্রন্দন !
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা !
* * *
বৃথা এ ক্রন্দন !
হায় রে দুরাশা,
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস্ তাই ভাল,
হাসিটুকু, কথাটুকু
নয়নের দৃষ্টিটুকু, প্রেমের আভাস।
সমস্ত মানব তুই পেতে চাস্
এ কি দুঃসাহস !
কি আছে বা তোর
কি পারিবি দিতে।
আছে কি অনন্ত প্রেম ?
পারিবি মিটাতে জীবনের অনন্ত অভাব ?
* * *
ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে, অতি সঙ্গোপনে
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে, জীবনে মরণে,
শত ঋতু আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;

সুতীক্ষ বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?
লও তার মধুর সৌরভ
দেখ তার সৌন্দর্য্য বিকাশ,
মধু তার কর তুমি পান,
ভালবাস' প্রেমে হও বলী,
চেয়োনা তাহারে !
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।
শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনা বহ্নি নয়নের নীরে,
চল ধীরে ঘরে ফিরে যাই ! ('নিষ্ফল কামনা', "মানসী")

সত্য হোক, মিথ্যা হোক, নরনারীর দেহ-আত্মার লীলা সম্বন্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনা, ইহাই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি। ভোগবাসনা মানুষের মনে মোহ উৎপন্ন করে, মোহ হইতে জাগে বিভ্রম, এই বিভ্রম মানবের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে ম্লান করিয়া দেয়, বৃহতের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন করে। কাজেই 'নিবাও বাসনা বহ্নি'। প্রেম অনন্ত, নরনারীর দেহ-আত্মার লীলার মধ্যে তাহার খণ্ড অংশ মাত্র প্রকাশ পায়, তাহারই মধ্যে একান্ত ভাবে ডুবিয়া গেলে প্রেমের সমগ্রতা উপলব্ধি করা যায়না। এই খণ্ড প্রেম হইতে মুক্তি চাই; বাসনার আবেগ এবং মুক্তির কামনা এই দুয়ের হর্ষে ও ব্যথায় কবিচিত্ত আন্দোলিত। অনন্ত প্রেম চাই, সে প্রেমকে পাইতে হইলে নরনারীর দেহ-আত্মার লীলার শুধু সৌরভটুকু আহরণ কর, সৌন্দর্য-বিকাশটুকু দেখ, মধুটুকু পান কর, কিন্তু প্রেমাস্পদকে একান্ত করিয়া চাহিওনা। খণ্ড প্রেমে তৃপ্তি পাইবে না, পাওয়ার জন্য ক্রন্দন বৃথা, 'বৃথা এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা', 'জীবনের অনন্ত অভাব' আমাদের এই খণ্ড প্রেম দ্বারা মিটান যায়না। এই কথাই, এই দৃষ্টিভঙ্গিই "মানসী"র কবিতাগুলিতে নানা ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। "কড়ি ও কোমলে," এই দৃষ্টিভঙ্গির আভাস আমরা পাইয়াছি; "মানসী"তে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল। অজিতবাবু সত্যই বলিয়াছেন,

"* * * মানসীর প্রেমের কবিতাগুলিতে যদিও প্রেমের জীবনের খুব গভীরতার পরিচয় আছে * * * তথাপি সে প্রেম যে জীবনের সব নয়, তাহাকে যে চরম করিয়া তোলা চলে

না, এমন একটী ভাব মানসীর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে বারম্বার প্রকাশ পাইয়াছে।"
(অজিত কুমার চক্রবর্তী, "রবীন্দ্রনাথ")

যে-দুটি নরনারীর প্রেম চিরদিবসের অনন্ত প্রেমের মধ্যে অবসান লাভ করে, যে প্রেমের মধ্যে 'সকল প্রেমের স্মৃতি, সকল কালের সকল কবির গীতি' আসিয়া আশ্রয় লয়, যে প্রেমের মধ্যে আসিয়া মেশে 'নিখিলের সুখ, নিখিলের দুঃখ, নিখিলের প্রাণের প্রীতি' সেই দেহ-আত্মার প্রেম কতকটা নিবিড়তা হারাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি ?

স্বদেশ এবং আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনের অনুভূতি হইতেও "মানসী"র কয়েকটি কবিতা জন্মলাভ করিয়াছে। 'দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর', 'গুরু গোবিন্দ', 'নব বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ', 'ধর্ম প্রচার' প্রভৃতি কবিতাগুলিকে এ-পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। এই ধরণের কবিতা "কড়ি ও কোমলে"ও কিছু কিছু আছে। আমাদের খণ্ড খণ্ড কর্ম্ম ধীর মন্থর গতানুগতিক জীবন যাত্রার ছন্দ কবি চিত্তকে কখনও আকর্ষণ করিতে পারে নাই ; আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনের মিথ্যা আড়ম্বর, কাপুরুষতা, চিত্তের দৈন্য, ভিক্ষার প্রবৃত্তি, মূঢ় নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতিও তিনি কখনও সহ্য করিতে পারেন নাই—নানা প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে, বক্তৃতায় তিনি সর্বদা তাহা অকুণ্ঠ চিত্তে ব্যক্ত করিয়াছেন। অনেক সময় দেশবাসী তাহা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, কিন্তু কবি যাহা অনুভব করিয়াছেন, নির্ভয়ে তাহা ব্যক্ত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। সমসাময়িক কাব্য-রচনায়ও তাহার ছাপ পড়িয়াছে। কিন্তু "মানসী"তে এখনও দেশ, সমাজ ও জাতীয় জীবন কবির গভীর দরদ ও সহানুভূতির সার্থক কল্পনা ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির মধ্যে আসন লাভ করিতে পারে নাই। এখনও শুধু তিনি লঘু বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের ভিতর দিয়াই আমাদের স্বদেশবাসীর ক্ষুদ্রতা নীচতা ত্রুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তবু 'দুরন্ত আশা'র মধ্যে একটা সত্যও গভীর অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কবিতাটির মধ্যে একটা দুঃখ বরণের আকাঙ্খা, দুঃসাধ্য ব্রত উদযাপনের আনন্দ, বৃহত্তর জীবনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার একটা দুর্দম বাসনা, একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত অসভ্য জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৯২, ৩১এ জ্যৈষ্ঠের লেখা একটা পত্রেও এই ভাবটি ব্যক্ত হইয়াছে ("ছিন্নপত্র", বিশ্বভারতী, ১৩৭ পৃ)।

"মানসী"র নিসর্গ কবিতাগুলির মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিতে হইল, কারণ, এই কবিতাগুলির ভিতরই রবীন্দ্রনাথের কবিমানস সত্য ও সার্থক রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই কবিতাগুলিতে ছন্দ ও ধ্বনি সম্পদ, শব্দচয়ন নৈপুণ্য, এবং কথার তুলিতে ছবি আঁকার ক্ষমতার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। রসিক পাঠক যাহারা 'একাল ও সেকাল' 'মেঘদূত,' 'অহল্যার প্রতি' প্রভৃতি কবিতা পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই জানেন, কবি যেন এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রাচীন যুগের নিসর্গ মণিকোঠার রহস্য-কুঞ্চিকাটির সন্ধান আমাদের দিয়াছেন; কালিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রামায়ণ মহাভারতের জগৎ যেন মন্ত্রবলে আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে নূতন রসে ও ভাবে অভিষিক্ত হইয়া।

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী ('একাল ও সেকাল')

অথবা,

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরষায়—('বর্ষার দিনে')

অথবা,

"বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল—" ('বধূ')

অথবা,

প্রখর মধ্যাহ্নতাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনল শ্বসনা। ('কুহুধ্বনি')

অথবা,

সকাল বেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়। ('অপেক্ষা')।

অথবা,

আমি কুন্তল দিব খুলে'।
অঞ্চল মাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথ-নিবিড় চুলে। ('ভালো করে' বলে' যাও')।

অথবা,

অকূল সাগর মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবন তরণী। ('বিদায়')

প্রভৃতি কবিতায় যে শান্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য, যে করুণ কোমল সুকুমার শ্রী, নিসর্গের যে অনির্বচনীয় রূপ বিশ্বজীবনের অনন্তকালের পটভূমিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের অতুলনীয় সম্পদ, ইহাই রবীন্দ্র কবিতার মূল ঐশ্বর্য।

কিন্তু নিসর্গের শান্ত মধুর কান্তরূপ রচনাতেই রবীন্দ্র-প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নাই ; তাহার রুদ্ররূপ, মমতাহীন, নিষ্ঠুর রূপও কবিচিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছে, এবং পরবর্ত্তী জীবনে নিসর্গের এই দিকটার যে পরিচয় "বলাকা" অথবা "পূরবী"তে দেখা যায়, তাহার প্রথম আভাস মানসীর 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' 'প্রকৃতির প্রতি' 'সিন্ধুতরঙ্গ' প্রভৃতি কবিতায় পাওয়া যাইতেছে। "মানসী"র এই জাতীয় কবিতাগুলিতেও কবির অদ্ভুত শব্দচিত্র রচনার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় ; 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতাটি তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

"মানসী"তে দেখিতেছি, নরনারীর দেহ-আত্মার লীলা, নিসর্গের বিচিত্র সৌন্দর্য-মাধুর্য, স্বদেশ, সমাজ ও জাতীয় জীবন সব কিছুই কবিচিত্তকে স্পর্শ করিতেছে, কিন্তু সব কিছুর ভিতরেই যেন কবিচিত্ত একটু ব্যথায় বেদনায় ভারাক্রান্ত। প্রেমাস্পদের হৃদয় যে শুধু দেহের মধ্যে ধরা যায়না, এই অনুভূত সত্য যে-সব কবিতায় প্রকাশ পাইতেছে, তাহার মধ্যে কোথায় যেন একটু বেদনা বোধ আছে ; স্বদেশ সমাজ ও জাতীয় জীবনের যে সমস্ত ত্রুটি ও দৈন্যকে তিনি বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও একটু বেদনাবোধ প্রচ্ছন্ন আছে বই কি ? নিসর্গ কবিতাগুলির মধ্যেও তাহা বাদ পড়ে নাই।

শুধু এই বেদনাবোধ নয়, যাহা কিছু তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিতেছে, নরনারীর দেহ-আত্মার লীলা, নিসর্গের কান্ত মধুর প্রেম, সব কিছু হইতে মুক্তি পাইবার একটা আকুলতা "মানসী"র কয়েকটি কবিতায় দেখা যায়। একটা বৃহত্তর জীবনের মধ্যে দুঃখ বরণের জন্য, একটা দুর্দম উন্মুক্ত জীবনের জন্য ব্যাকুলতা 'দুরন্ত আশা' কবিতাটিতে সুস্পষ্ট, ইহা আগেই বলিয়াছি। যে প্রেম 'জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা' বলিবার জন্য ব্যাকুল, সেই প্রেম ও যেন কবিকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না ; নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যময় কাব্যময় জীবনের মধ্যে কবি আর আনন্দ পাইতেছেনা, এই সংকীর্ণ রুদ্ধ জীবন যেন তাহাকে পীড়িত করিতেছে। এই ধরণের জীবনে কবি অতৃপ্ত, এবং এই অতৃপ্তি অনেক কবিতাতেই লক্ষ্য করা যায় কিন্তু সবচেয়ে সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে

'ভৈরবী গান' কবিতাটিতে। বৃহত্তর জীবনের প্রখর দহন, নিষ্ঠুর আঘাত, পাষান কঠিন পথ তিনি কামনা করিতেছেন—অশ্রুসজল ভৈরবী গান আর তাহার ভাল লাগিতেছে না।

ওগো, এর চেয়ে ভাল প্রখর দহন
নিঠুর আঘাত চরণে
যাব আজীবন কাল পাষাণ কঠিন সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে। ('ভৈরবী গান')

কিন্তু "মানসী"তে যে দেহ-আত্মার প্রেমলীলায় কবি অতৃপ্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন, সেই প্রেমলীলাই "চিত্রাঙ্গদা"র উপজীব্য। "চিত্রাঙ্গদা"র নীতি দুর্নীতি লইয়া নানা আলোচনা একসময় হইয়াছিল, কিন্তু সে আলোচনা সাহিত্য রসালোচনার বিষয়ীভূত নহে। সাহিত্য-রসাভিব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে "চিত্রাঙ্গদা" যৌবন ও প্রেমলীলার অপূর্ব্ব গীতিকাব্য, এবং এই গীতিকাব্যে দেহ-আত্মার প্রেমলীলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি তাহাই অপূর্ব রূপ ও রসমাধুর্যে অভিষিক্ত হইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। গীতিকাব্য বলিলাম এই জন্য যে, "চিত্রাঙ্গদা"র বহিরঙ্গ অর্থাৎ সাহিত্যাকৃতিই শুধু কাব্য-নাটিকার, উহার সাহিত্য লক্ষণ গীতিকাব্যের। উত্তর কালে লিখিত 'কচ ও দেবযানী' যেমন বিশুদ্ধ গীতিকাব্য লক্ষণাক্রান্ত, "চিত্রাঙ্গদা" ও তেমনি গীতিকাব্যধর্মী, নাটকীয় চরিত্র রীতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও উহা নাট্যলক্ষণাক্রান্ত নহে।

নরনারীর প্রেমলীলা দেহকেই প্রথম কামনা করে, আকর্ষণ করে, মোহাক্রান্ত হইয়া দেহকেই একান্ত করিয়া পাইতে চায়, ইহা একান্ত সত্য; দেহধর্মের মূল্য নাই, একথা বলা চলে না। কিন্তু যে প্রেম দেহসর্বস্ব হইয়া উঠে, তাহাতে তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই, সে প্রেম মিথ্যা। দেহ যেমন সত্য, মনও তেমনি সত্য, আত্মা ও সত্য তেমনই, দেহগত প্রেম যেমন সত্য, দেহোত্তীর্ণ, দেহাতিরিক্ত প্রেমও তেমনই সত্য। এক মন, আত্মা, হৃদয়, দেহকে অতিক্রম করিয়া আর এক মন, আত্মা, হৃদয়কে পাইতে চায়, স্পর্শ করিতে চায় এবং তাহা যখন পারে তখনই প্রেমাস্পদকে পূর্ণভাবে জানা যায়, পাওয়া যায়, ভোগ করা যায়। দেহগত প্রেম

খণ্ডপ্রেম, তাহা ক্ষণিক, দেহ-আত্মার প্রেম পূর্ণ প্রেম, তাহা নিত্য। অর্জ্জুন যখন এই নিত্য পূর্ণ প্রেমের পরিচয় পাইলেন তখন তিনি ধন্য হইলেন, চিত্রাঙ্গদার নারী-জন্মও সার্থক হইল; শাশ্বত নরের সঙ্গে শাশ্বত নারীর মিলন হইল। ইহাই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি, দেহ-আত্মার এই প্রেমতত্ত্বই রবীন্দ্র চিত্তকে অধিকার করিয়াছে, এবং বার বার নানাস্থানে নানাভাবে এই তত্ত্বই বিচিত্ররূপে ও রসে তিনি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

কিন্তু "চিত্রাঙ্গদা" তত্ত্বসর্বস্ব ত নয়ই, বরং ইহার সৌন্দর্য ও রসমাধুর্য সমস্ত তত্ত্বকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত তত্ত্ব ইহার রসের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। হৃদয়-রহস্যের যে বিচিত্র ও গভীর পরিচয়, সৌন্দর্য প্রকাশের যে রসঘন রূপ "চিত্রাঙ্গদা"য় অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে সমস্ত ভাব-তত্ত্ব তুচ্ছ, নীতি দুর্নীতির প্রশ্ন অবান্তর। অতি সুন্দর অতি মধুর, অতি গভীর ভাবদ্যোতক খণ্ড খণ্ড অংশ উদ্ধৃত করিয়াও "চিত্রাঙ্গদা"র কাব্যমাধুর্যের পরিচয় দেওয়া যায় না; অর্জুন, চিত্রাঙ্গদা, মদন ও বসন্তের কথোপকথনের ভিতর দিয়া দুইটি হৃদয়ের যে-রহস্য স্তরে স্তরে প্রকাশ পাইয়াছে, যে ব্যঞ্জনা ও অর্থগরিমা তাহাদের বাক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, শব্দচয়নে, ধ্বনি-মাধুর্যে এবং ভাব-সংযমে যে নৈপুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহারা সকলে মিলিয়া "চিত্রাঙ্গদা"কে যে পূর্ণ অখণ্ড রসরূপ দান করিয়াছে তাহার পরিচয় কোনও খণ্ড অংশে পাওয়া কঠিন। এমন কি

হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী।

অথবা,

এই যে সঙ্গীত
শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্ত সমীরে
এ যৌবন যমুনার পরপার হতে
এই মোর বহুভাগ্য।

অথবা,

গৃহে নিয়ে যাবে? বলো না গৃহের কথা
গৃহ চির বরষের; নিত্য যাহা থাকে তাই
গৃহে নিয়ে যেয়ো।

অথবা,

বাহুবন্ধে
এসো বন্দী করি দোঁহে দোঁহা প্রণয়ের
সুধাময় চিরপরাজয়ে।

অথবা,

যখন প্রথম
তা'রে দেখিলাম, যেন মুহূর্তের মাঝে
অনন্ত বসন্ত পশিল হৃদয়ে। বড়
ইচ্ছা হ'য়েছিল, সে যৌবন-সমীরণে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্ব্ব পুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন।

ইত্যাদি অংশেও নয়!

(৪)

সোনার তরী (১২৯৮—১৩০০)
বিদায় অভিশাপ (১৩০০)
চিত্রা (১৩০০—১৩০২)
চৈতালী (১৩০২—১৩০৩)

"মানসী" ও "চিত্রাঙ্গদা"র প্রেম ও সৌন্দর্য উপভোগকে দেহোত্তীর্ণ করিয়া বৃহত্তর প্রেমলীলার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে পূর্ণ ও অখণ্ডরূপে পাইবার যে আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত আমরা পাই, তাহা "রাজা ও রাণী" নাটকেও লক্ষ্য করা যায়। এই আকাঙ্ক্ষা সার্থকতা লাভ করিল "সোনার তরী", "চিত্রা", ও "চৈতালী"তে এবং পরবর্তী কয়েকটি কাব্যে। এই কাব্য কয়টিতে

বিশেষভাবে "সোনার তরী" ও "চিত্রা"র দেহোত্তর প্রেম ও পরিপূর্ণ বিশ্ব-সৌন্দর্যানুভূতি অপূর্ব গরিমায় ও অনির্বচনীয় ভাব-গভীরতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সময়ের রচনা হইতে প্রথমেই যে জিনিসটি আপনি ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা হইতেছে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মবোধ, কবির একান্ত তন্ময় দৃষ্টি। সৃষ্টির অতি তুচ্ছতম জিনিসও কবির দৃষ্টি এড়াইতেছেনা, সকল কিছুর মধ্যেই তিনি অপরিসীম প্রেম ও সৌন্দর্যের বিকাশ দেখিতে পাইতেছেন, সকল পদার্থ মিলিয়া তাঁহার প্রাণে এক অপরূপ মায়ালোক সৃজন করিতেছে। কিন্তু শুধু এইটুকু মাত্র যদি হইত তবে ভাল করিয়া বুঝিবার তেমন কিছু হয়ত থাকিত না। এই ব্যাপকতর প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গভীরতর সত্য অতি ঘনিষ্টভাবে জড়াইয়া আছে। প্রেম ও সৌন্দর্য শুধু কবি-কল্পনায় ভাসিয়া বেড়াইবার অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া পক্ষ গুটাইয়া 'বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা, বহু দিবসের সুখ দুঃখ আঁকা, লক্ষ যুগের সঙ্গীতমাখা' এই সুন্দরী ধরণীর উপর স্থির হইয়া বসিয়াছে। সর্বত্র সকল প্রেম, সকল সৌন্দর্য বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার তীব্র চেষ্টা ও আবেগ। জীবনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করিতে না পারিলে সকল প্রেম, সকল সৌন্দর্য, সকল অনুভূতি যে ব্যর্থ হইয়া গেল। তাই "সোনার তরী", "চিত্রা", "চৈতালী", এবং পরবর্তী কালের "কল্পনা" "ক্ষণিকা" প্রভৃতি কাব্য ক'খানি জুড়িয়া সকল বৈচিত্র্যকে এক করিবার, খণ্ড খণ্ড সমস্ত ভাব চিন্তা ও অনুভূতির কবিত্বময় গভীর তত্ত্ব-রহস্যটি আবিষ্কার করিয়া তাহাকে এক অখণ্ডরূপে প্রকাশ করিবার, সকল বিচ্ছিন্ন আনন্দ, সৌন্দর্য ও প্রেমের অন্তর্গূঢ় মহিমা উপলব্ধি করিবার, তাহাকে ভাবময় রূপে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করিবার, সমস্ত প্রেম ও সৌন্দর্যকে ভোগলিপ্সা ও পার্থিব আনন্দ হইতে বিচ্যুত করিয়া সম্পূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ 'এবষ্ট্রাক্ট' মূর্তিতে হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করিবার সার্থক চেষ্টায় ভরিয়া উঠিয়াছে। "সোনার তরী" ও "চিত্রা" কাব্যেই তাহার জীবন নিজের মনের বস্তুহীন কল্পনার মধ্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বস্তুময় বৃহত্তর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের দৈনন্দিন জীবনের রূপও এক নূতন সৌন্দর্যময় আনন্দময়রূপে কবির চোখে ধরা পড়িল, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সবল কল্পনা ও গভীরতর ভাব-রহস্যে সমৃদ্ধিলাভ করিল, বাক্য পদ ও শব্দ ভাব-ব্যঞ্জনায় অনির্বচনীয় হইয়া উঠিল, ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির মূল্য যেন কবি এই প্রথম আবিষ্কার করিলেন।

শুধু ভাব-সমৃদ্ধিই এই কাব্য ক'খানির একমাত্র লক্ষ্যণীয় বিষয় তাহা নহে, যে ছন্দ ও অপূর্ব শব্দচয়ন-নৈপুণ্যকে আশ্রয় করিয়া এই ভাব রূপলাভ করিয়াছে, তাহাতেও এই সমৃদ্ধি সুপরিস্ফুট। ছন্দের যে তারল্য এতকাল কবিকে চঞ্চল তালে নাচাইয়াছে, যে অনির্দিষ্ট রূপ তাহাকে এতকাল স্থির হইতে দেয় নাই, সে চঞ্চলতা, সে অস্থিরতা এখন নিবৃত্তি লাভ করিয়া সর্বত্র একটা শান্ত সংযম ও অপূর্ব ধ্বনির গাম্ভীর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। "সোনারতরী"র 'পরশপাথর', 'যেতে নাহি দিব', 'সমুদ্রের প্রতি', 'মানস-সুন্দরী', 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতায়, "চিত্রা"র 'প্রেমের অভিষেক', 'এবার ফিরাও মোরে', উর্বশী', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতি কবিতায়, "চৈতালী"র সনেটগুলিতে "কাহিনী"র কবিতা-গুলিতে, "কল্পনা"র 'অসময়', 'দুঃসময়,' 'অশেষ', 'বর্ষশেষ', 'বৈশাখ', প্রভৃতি কবিতাগুলিতে এবং এই যুগের আরও অনেক কবিতায় এমন একটা সংযত শক্তি ও গাম্ভীর্য আপনি ধরা দিয়াছে যাহা পূর্বে কোথাও খুঁজিয়া পাইনা। জীবনের নূতন দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের এই অনির্বচনীয় ভঙিমা কবি নিজে সৃষ্টি করিলেন, এবং দুইয়ে মিলিয়া এই সময়ের কবি-জীবনকে অপূর্ব সমৃদ্ধি দান করিল। এই যুগের যে কোনও কাব্য পাঠ করিলেই রসিক বোদ্ধা পাঠকের মনে হইবে, কবি নিজের শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, এবং সে শক্তি সম্বন্ধে তিনি সচেতন। বস্তুতঃ রূপৈশ্বর্যে, আনন্দোল্লাসে, ভাবরহস্যে, মনন শক্তিতে, ধ্বনির গভীরতায়, ছন্দ-গরিমায়, কল্পনার সবলতায়, প্রতিভার দীপ্তিতে রবীন্দ্রনাথের এই যুগের কবিজীবন যে অখণ্ড সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিয়াছে তাহার তুলনা "বলাকা" ও "পূরবী"র কবি-জীবন ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না।

কিন্তু অপূর্ব অনির্বচনীয় এই কাব্যলোক হইতেও, উত্তর জীবনে আমরা দেখিব, কবি একদিন স্বেচ্ছায় বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, রসমাধুর্যে কানায় কানায় ভরা এই কবি-জীবনও তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। যে ভাবলোকে এই যৌবন ও সৌন্দর্য সম্পদ বন্দী হইয়াছিল, এবং পরে "বলাকা" ও "পূরবী"তে নূতন দানে, নূতন ভাব-তত্ত্বে ও নূতন ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হইয়া কি করিয়া তাহা মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা ক্রমশঃ পাইব।

"সোনারতরী-চিত্রা-চৈতালী"র যুগকে কেহ কেঁহ জীবন-দেবতা ভাব-তত্ত্বের যুগ বলিয়া থাকেন, এবং এই বই কয়টির অনেক কবিতাতেই তাঁহারা এই

ভাব-তত্ত্বের প্রকাশ দেখিয়া থাকেন। জীবন-দেবতা ভাব-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের অন্যত্র ('রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন' প্রবন্ধ) আমি করিয়াছি। এই কতকটা মিষ্টিক ভাব-রহস্যের উৎস যে কোথায় তাহাও কতকটা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে এইটুকু শুধু বক্তব্য যে, এই ভাব-তত্ত্ব এই যুগেরই বৈশিষ্ট্য নয়; বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের উৎসই এই ভাব-রহস্য। যে নিসর্গানুভূতি "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" হইতে আরম্ভ করিয়া "মানসী", "চিত্রাঙ্গদা" পর্যন্ত তাঁহার কাব্যে প্রাণরস সঞ্চার করিয়াছে, সেই নিসর্গানুভূতিই যত সত্য ও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে, জীবন-দেবতার ভাব-তত্ত্ব রহস্যও তত স্পষ্ট ও নিবিড়, সত্য, সার্থক ও গভীর হইয়াছে। "সোনার তরী" অপেক্ষাও "চিত্রা"য় "চৈতালী"তে ও "কল্পনা"য় ইহার স্পষ্টতর, গভীরতর পরিচয় আছে। এই ভাব-তত্ত্বের সৌন্দর্য্য ও রহস্য পরবর্তীকালে কখনও রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসকে পরিত্যাগ করে নাই। "খেয়া" "গীতাঞ্জলি" "গীতিমাল্য" "গীতালী"তে তাহা তাঁহার সুগভীর অধ্যাত্ম-রসানুভূতির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে মাত্র এবং ক্রমশঃ তাঁহার সমগ্র কাব্য-চেতনার অংশ হইয়া পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। জীবন-দেবতা শুধু তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী মাত্র হইয়া থাকেন নাই, তিনি কবির সঙ্গে একাসনে বসিয়া, এক চিত্তাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র জীবন, সমগ্র ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াতীত জগতকে রূপদান করিতেছেন। এই ভাব-তত্ত্ব কতটুকু সত্য, কতখানি বিজ্ঞান-গ্রাহ্য, রবীন্দ্র কাব্যালোচনার দিক্ হইতে সে-প্রশ্ন অবান্তর; তবে কালানুক্রমিক রবীন্দ্র-কাব্য পাঠ করিলে এই কথাই সত্য মনে হয় যে সুনিবিড় নিসর্গানুভূতিই জীবন-দেবতা ভাব-তত্ত্বের মূলে; এবং এই অনুভূতি সত্য ও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই "সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালী"র কবিতাগুলিতে, বিশেষভাবে যে-সব কবিতায় জীবন ও প্রকৃতির, ব্যাপকভাবে বলিতে গেলে নিসর্গের, সুগভীর রহস্য বিচিত্রভাবে সবল কল্পনায় এবং গভীর প্রেম ও আত্মীয়তায় প্রকাশ পাইয়াছে সেই সব কবিতাই এই যুগের কবি-মানসকে অপূর্ব দীপ্তিদান করিয়াছে। এই জন্যই এই যুগের নিসর্গ কবিতাগুলি শুধু অনির্বচনীয় অবর্ণনীয় প্রকৃতি-চিত্র অঙ্কিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অনুভূতি সত্য ও নিবিড় হইয়াছে বলিয়া তাহার মধ্যে একটা সুগভীর প্রেম, একটা করুণ কোমলতা, একটা বেদনা-আনন্দোজ্জ্বল দীপ্তিও সহজেই সঞ্চারিত

হইয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ একাত্ম হইয়া গিয়াছে, একের সুখ ও দুঃখ, বেদনা ও আনন্দ, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্যের কাছে সত্য ও নিবিড়, একের সৌন্দর্য ও প্রেম অন্যের ভাব-তত্ত্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং দুইয়ে মিলিয়া এক অনির্বচনীয় অনুভূতির সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষের প্রেম মুহূর্তে নিসর্গের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া যায়, নিসর্গের যত অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, যত দৃশ্য, যত কথা, যত গান মানুষকে নিজের আত্মার মধ্যে প্রেমে টানিয়া লয়, তাহার সঙ্গে ব্যথায় ও আনন্দে জড়াইয়া বাঁধে—কবির এই অনুভূত সত্যই "সোনার তরী" হইতে আরম্ভ করিয়া "কল্পনা" পর্যন্ত এবং পরে "বলাকা" ও "পূরবী"তে অপূর্ব ভাবে ও সৌন্দর্যে ব্যক্ত হইয়াছে। যে সমস্ত কবিতা এই কাব্যগুলিকে তাহাদের কাব্য-মূল্য দান করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই আমার এই উক্তির প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

'সোনার তরী' কবিতাটি লইয়া তত্ত্বালোচনা এত বেশী হইয়াছে যে, তাহার আবর্তে পড়িয়া পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেও খানিকটা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস করিয়াছেন—হয়ত তত্ত্বান্বেষী পাঠকদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য; কিন্তু শ্রাবণের ঘনবর্ষা, দুকূলভরা খরস্রোতা নদী, দ্রুত বহমান তরী, দুই তীরের বৃষ্টিমুখর কাশ বাঁশ সুপারীর বন, তীরের উপর কাটা ধানের স্তূপ, কর্মরত নগ্নগাত্র বৃষ্টিস্নাত কৃষককুলের নিরলস ব্যস্ততা, ধান বোঝাই নৌকা সমস্ত মিলিয়া মানুষের প্রাণে এক অব্যক্ত আকুলতার সৃষ্টি করে; তাহার সঙ্গে আসিয়া মেশে বর্ষার চিরন্তন সুগভীর বেদনা, এবং দুইয়ে মিলিয়া স্পর্শকাতর চিত্তে এক অপরূপ বেদনাপ্লুত রস ও সৌন্দর্যের অপূর্ব রাগিণী সৃষ্টি করে। সেই রাগিণীই 'সোনার তরী' কবিতাটিতে ধরা পড়িয়াছে। ইহার কাছে তত্ত্ব অবান্তর; তত্ত্ব নাই একথা বলিনা, কিন্তু যেটুকু আছে তাহা তুচ্ছ। এই সুনিবিড় রাগিণী যাহারা কবি-হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহারাই জানেন, মানুষ চায় তাহার সমস্ত সঞ্চিত ধন ও ঐশ্বর্য, এমন কি নিজেকেও ইহার কাছে বিসর্জন দিতে, ইহার হাতে তুলিয়া দিতে, এমন ভাব-মুহূর্ত মানুষের জীবনে আসে, কিন্তু মানুষ সব দিতে পারেনা, সমস্ত ধন, সমস্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষে তুলিয়া দিবার পরও মনে হয়, কোথায় যেন কি এখনও নিজকে ভারগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; তখন সে নিজকে চায় একান্ত ভাবে দান করিতে,

কিন্তু মধুর নিষ্ঠুর প্রকৃতি মানুষের সে-দান গ্রহণ করেন না, মানুষ তখন নিজের ভার লইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার অন্তর বেদনায় ভরিয়া উঠে।

যত চাও তত লও তরণী পরে।
আর আছে? আর নাই, দিয়েছি ভরে।
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে
এখন আমারে লহ করুণা করে।
ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি'
শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি',
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

এই যে শূন্য নদীর তীরে একা পড়িয়া থাকার বেদনা, মানুষ যে নিজকে একান্ত করিয়া দান করিতে পারে না, সে যে কোন কোন ভাব-মুহূর্তে মনে করে নিষ্ঠুর প্রকৃতি তাহার সঞ্চিত ঐশ্বর্য লইয়া যান, তাহাকে লন না, ইহা ত কোনও তত্ত্ব নয়, অনুভূত সত্য মাত্র, হয়ত যে-মুহূর্তের অনুভূতির মধ্যে ধরা দিয়াছে এই সত্য, পরমুহূর্তের অনুভূতির মধ্যে তাহা নাই। কাজেই তত্ত্ব লইয়া বিব্রত হইবার কারণও নাই, কবি যে বিব্রত হইয়াছেন তাহার প্রমাণও কবিতায় নাই। কিন্তু এই অতৃপ্তিও বেদনাটুকু জীবনের অমোঘ সত্য, এবং এই সুগভীর বেদনা শ্রাবণ-বর্ষার চিরন্তন বেদনার সঙ্গে মিলিয়া 'সোনার তরী' সৃষ্টি করিয়াছে। কাব্যরস ও সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য ইহাই যদি যথেষ্ট মনে না হয়, তাহা হইলে তত্ত্ব কতটুকু সাহায্য করিবে! 'সোনার তরী' নিসর্গের অনুভূতিই আমাদের কাছে নিকটতর করিতেছে, মানুষের চিত্তরহস্য, তাহার ভাব ও অনুভূতি যে নিসর্গানুভূতির সঙ্গে নিসর্গরহস্যের সঙ্গে কতখানি একাত্ম, রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত এই উপলব্ধিই আমাদের মনে জাগাইতেছে। রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের দিক হইতে এই কথাটুকুই আমাদের জানিবার, 'সোনারতরী'

কবিতা, অথবা এই যুগের অন্যান্য নিসর্গ কবিতাগুলি যে শুধু শব্দচিত্র মাত্র নয়, এইটুকুই বুঝিবার।

'শৈশব-সন্ধ্যা,' 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা', 'তোমরা ও আমরা' প্রভৃতি কবিতাকেও ব্যাপকভাবে নিসর্গ কবিতা বলা যাইতে পারে; ইহাদের মধ্যে যে অপরূপ সৌন্দর্য-চিত্র আছে, তাহা সেইখানেই শেষ হইয়া যায় না, মানুষের চিত্ত-রহস্যের সঙ্গে এই সৌন্দর্যের সম্বন্ধের মধ্যেই এই জাতীয় কবিতাগুলির কাব্য-মূল্য। এই যে মানুষের সঙ্গে নিসর্গের একাত্মতা, প্রেম, সৌন্দর্য, নিসর্গের যাহা কিছু একান্ত কামনার, মানুষই তাহার মূল্য নিরূপণ করে, মানুষের জন্যই তাহার যত মূল্য, এমন কি দেবতার যে মানুষের প্রেম অনন্তকাল ধরিয়া সঞ্চিত হইয়াছে, নিসর্গের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহাও মানুষের উপভোগের জন্যই, এই কথাই 'বৈষ্ণব কবিতা'য় ব্যক্ত হইয়াছে। মানুষের প্রেম, মানুষের ভালবাসা, মানুষের বেদনাই যে নিসর্গের অমোঘ সত্য, মৃত্যু ও বিচ্ছেদকেও তাহা যে অপরূপ অর্থদান করে, মানুষকে তুচ্ছ অথবা মহিমান্বিত করে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে 'যেতে নাহি দিব' এবং প্রতীক্ষা কবিতায়। নিসর্গের অমোঘ সত্য যে কি অনির্বচনীয় কাব্যরূপ লাভ করিতে পারে, 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি তাহার প্রমাণ, ইহার তুলনা বিশ্বসাহিত্যেও খুব বেশী নাই। প্রকৃতির সঙ্গে সুগভীর একাত্মতা প্রকাশ পাইয়াছে 'মানস সুন্দরী,' 'বসুন্ধরা' 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি কবিতায়, এবং তাহার আনন্দোল্লাস অপূর্ব ছন্দে ও ধ্বনিতে উৎসারিত হইয়াছে 'বিশ্বনৃত্য' ও 'ঝুলন' কবিতায়।

উল্লিখিত কবিতাগুলির প্রত্যেকটিই এমন এক একটি সম্পূর্ণ সৃষ্টি যে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ইহাদের ব্যাখ্যার অতীত, বর্ণনার অতীত, বচনের অতীত রস ও সৌন্দর্যের পরিচয় দিবার ব্যর্থ চেষ্টা আমি করিব না।

"সোনার তরী"তে যে কবি-মানসের পরিচয় আমরা পাইলাম, নিসর্গ-সাধনার যে আভাস আমরা পাইলাম, সে-সাধনা এখনও যথেষ্ট গভীরতা লাভ করে নাই, এখনও স্থিরদৃষ্টি এবং অচল আসন লাভ করে নাই; করে নাই যে তাহার প্রমাণ কবি নিজেই দিতেছেন "সোনার তরী"র সর্ব্বশেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য়। কবিচিত্ত যে-সোনার তরীর পিছু লইয়াছে, নিসর্গ-সাধনার যে-পথে নামিয়াছে, সে-পথ কোথায় শেষ হইবে, সে সোনার তরী কোন্ পারে ভিড়িবে?

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী ?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী ?

*　　*　　*

নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অকূল সিন্ধু উঠেছে আকুলি
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন কোনে।
কি আছে হোথায়—চলেছি কিসের
অন্বেষণে ?

('নিরুদ্দেশ যাত্রা')

"চিত্রা"য় মনে হইতেছে এ পথের শেষ কবি পাইয়াছেন, সোনার তরী পারে আসিয়া ভিড়িয়াছে, কিসের অন্বেষণে তিনি চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা তিনি জানিয়াছেন। নিসর্গের সঙ্গে একাত্মবোধ সম্পূর্ণ হইয়াছে ; যে-দ্বিধা, যে-সংশয়, যে-অনিশ্চয়তা "সোনার তরী"র কবিতাগুলিতে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে "চিত্রা"য় তাহা আর নাই। একটা সহজ সুখ, সরল আনন্দ, পরম স্থৈর্য ও নিশ্চয়তা "চিত্রা"র কবিতাগুলিকে আশ্রয় করিয়াছে ; 'সুখ', 'জ্যোৎস্নারাত্রে', 'প্রেমের অভিষেক', 'সন্ধ্যা' 'পূর্ণিমা,' 'সিন্ধুপারে' প্রভৃতি কবিতায় তাহার প্রমাণ আছে। এই একান্ত একাত্মবোধ যখন সম্পূর্ণ হইল, তখন কি যে যাদু কবিচিত্তকে রূপান্তরিত করিল, তাহা কবি নিজেও জানে না, তিনি শুধু জানেন, 'সুখের ব্যথায় তাঁহার বুক তখন কাঁপে,' 'তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায় চিত্ত মাতিয়া উঠে.' 'অসীম বিরহ অপার বাসনা বিশ্ববেদনা তাঁহার বুকে বাজে,' সমস্ত কিছুই তাঁহার কাছে কৌতুকময়ী অন্তর্যামীর অপরূপ কৌতুক বলিয়া মনে হয়—

এ কি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ি !
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

* * *

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে
শুনিতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত,
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।
সে মায়া মুরতি কি কহিছে বাণী,
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি'
রহস্যে নিমগন।

('অন্তর্যামী,' "চিত্রা")

'রহস্যে নিমগন' শুধু কবি নহেন, তাঁহার অগণিত পাঠকও। কি যাদু যে কবিচিত্তকে স্পর্শ করিল, কবি-মানস যে কি অপরূপ রূপান্তর লাভ করিল যাহার ফলে ভাষা ও ছন্দ পাইল নূতন রূপ ও প্রাণরস, প্রতিমা হইল নূতন; এই সঙ্গীত, এই লাবণ্য, এই ক্রন্দন কোথা হইতে অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ফুটিয়া উঠিল! একি অপরূপ বিস্ময়! কিন্তু বিস্ময় যাহাই হউক, নিসর্গের সঙ্গে এই একান্ত পরিপূর্ণ একাত্মবোধের ফলেই আমরা পাইলাম 'উর্বশী' 'স্বর্গ হইতে বিদায়,' 'বিজয়িনী' '১৪০০ শালে' প্রভৃতির মত কবিতা। ব্যাখ্যার অতীত, বিশ্লেষণের অতীত এই সব রচনার রস ও সৌন্দর্য ভাষায় কতটুকু প্রকাশ করা যায়, অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া কতটুকু দেখান যায়? 'উর্বশী'তে কবি মোহিনী নারীর 'এব্‌স্ট্রাক্ট' সৌন্দর্যের স্তব করিয়াছেন, নিছক অনাবিল সৌন্দর্যকে সমস্ত প্রয়োজন, সমস্ত মানব-সম্বন্ধের বিকার হইতে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া তাহার পূজা করিয়াছেন। উর্বশী পূর্ণসৌন্দর্যের প্রতিমা, বিস্ময় ও

আনন্দের পরিপূর্ণ সৃষ্টি, তাহার দ্যুতিই বৈদিক অতীত হইতে বর্তমান অতিক্রম করিয়া সীমাহীন অনাগত ভবিষ্যতের কল্পনার মধ্যে বিস্তৃত, বহুযুগ-সঞ্চিত বহুকবি-ঋষি-উদ্গাত স্মৃতি তাহার সঙ্গে জড়িত, মানবের চিরন্তন প্রেম ও সৌন্দর্য-বাসনার মধ্যে তাহার স্মৃতি বিধৃত। সৌন্দর্যের যে অনির্বচনীয়তা উর্বশীর মধ্যে আমরা তাহার রূপ প্রত্যক্ষ করি, এবং সেই মোহিনী মাধুরীকে বাহু-বন্ধনের মধ্যে ধরিতে চেষ্টা করি, কিন্তু একথা কবি জানেন, এবং আমরাও জানি।

ফিরিবেনা, ফিরিবেনা—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী

*   *   *

তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে

('উর্বশী', "চিত্রা")

কিন্তু এত হইল কবিতার অর্থ মাত্র, এই অর্থের মধ্যে রস কোথায়, সৌন্দর্য কোথায়? তাহারা যে রহিয়াছে অর্থ ছাড়াইয়া, শব্দ ছাড়াইয়া, অথচ ছন্দ শব্দ ও বাক্যের অপরূপ ব্যঞ্জনার মধ্যে, অনির্বচনীয় চিত্র সৃষ্টির মধ্যে, অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে, যে পুরাণ-স্মৃতি ইহার ফাঁকে ফাঁকে ধরা দিয়াছে তাহার মধ্যে, যে অপরূপ শব্দচয়ন-নৈপুণ্য ইহাতে আছে তাহার মধ্যে, সবল কল্পনার মধ্যে, সমস্ত কবিতাটির মধ্যে যে মোহ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মধ্যে।

সুর সভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশি!
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল
তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি' পড়ে তারা
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা!
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে।

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী
হে ভুবনমোহিনী উর্বশি!

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ শোণিমা
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতিলঘুভার।
অখিল মানস স্বর্গে অনন্তরঙ্গিনী
হে স্বপ্ন সঙ্গিনী।

ইহার সৌন্দর্য বিশ্লেষণের স্পর্দ্ধা আমি রাখি না।

উপরে "চিত্রা"র যে সমস্ত কবিতার নাম আমি করিয়াছি সে সমস্ত এবং অন্যান্য আরও অনেক কবিতায় কবির নিসর্গানুভূতির পূর্ণ পরিচয় যে-কোন রসিক পাঠকের কাছেই ধরা পড়িবে। "চিত্রা"র সমস্ত কাব্য-জীবন জুড়িয়া রবীন্দ্রনাথ নিসর্গের সঙ্গে একাত্মতা-জাত প্রেম ও সৌন্দর্যসুধা আকণ্ঠ পান করিলেন, "সোনার তরী" হইতেই তাহা আরম্ভ হইয়াছিল, "চিত্রা"য় আসিয়া তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিল। যে অনুভূত সত্য কবির সমস্ত জীবনকে এমন সম্পদ এমন ঐশ্বর্য দান করিল, সেই সত্যই ত কবির অন্তরতম জীবন-দেবতা। একটা সমগ্র কাব্য-যুগ ব্যাপিয়া কবি এই অন্তরতমের সঙ্গলাভ করিলেন, এবং তাঁহার জীবন প্রেম ও সৌন্দর্যে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু যে অন্তরতমের অনুভূতি তিনি পাইলেন, সেই অন্তরতম কি কবির সঙ্গ-লাভ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, তাহার কামনা বাসনা কি মিটিয়াছে, অন্তরতম কি পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন ; এ প্রশ্ন কোন এক ভাব-মুহূর্তে কবির চিত্তে জাগিয়াছে।

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম ?
দুঃখ সুখের লক্ষধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষা সম।

* * *

গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মুরতি নিত্য নব।

*   *   *

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে!
লেগেছে কি ভাল হে জীবন নাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম, আমার কর্ম
তোমার বিজন বাসে?

*   *   *

মানস কুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
মম যৌবন বনে?

('জীবন-দেবতা', "চিত্রা")

অন্তরতমের সকল তিয়াষ মিটিয়াছে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর কবি স্বয়ং; কারণ "চিত্রা"য় দেখিতেছি কবির নিজের সকল প্রেম ও সৌন্দর্য-তৃষ্ণা মিটিয়াছে, তাঁহার কবি-মানস পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাঁহার জীবন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"র কুয়াসাচ্ছন্ন জীবনের পরে "প্রভাত-সঙ্গীত" হইতে আরম্ভ করিয়া যে পথে কবিচিত্তের যাত্রা শুরু হইয়াছিল, স্তরে স্তরে বিচিত্র অভিজ্ঞতার, বিচিত্র অনুভূতির ভিতর দিয়া সে পথের শেষে আসিয়া তিনি পৌঁছিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। প্রেম-সাধনা সৌন্দর্য-সাধনার জীবন পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এবং, সার্থকতা লাভ করিয়াছে বলিয়াই কবির নিজের উপর বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে, নিজের শক্তি সম্বন্ধে তিনি সচেতন হইয়াছেন, তিনি যে যুগোত্তর জীবনোত্তর কবি তাহা জানিয়াছেন, অনাগত ভবিষ্যতের কবির সঙ্গে, অনাগত জীবনের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা যে নিবিড় ও গভীর তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রমাণ, '১৪০০ শাল' কবিতা।

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।

* * *

সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে
কত কথা পুষ্প প্রায়, বিকশি' তুলিতে চায়
কত অনুরাগে
একদিন শত বর্ষ আগে।
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে?
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে
হৃদয় স্পন্দনে তব, ভ্রমর গুঞ্জনে নব,
পল্লব মর্ম্মরে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।

('১৪০০ সাল', "চিত্রা")

"চিত্রা"র একটি কবিতা উল্লেখের বাকী আছে; সেটি হইতেছে 'এবার ফিরাও মোরে'। একটু অভিনিবেশ সহকারে রবীন্দ্র-কাব্য-জীবন আলোচনা করিলে কবিচিত্তের একটা বিশেষ ধর্ম সহজেই ধরা পড়ে, এবং এ ধর্ম তাঁহার কাব্যে যতটুকু সত্য তাঁহার জীবনেও ততখানি সত্য। একথা সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ বহুদিন একই স্থানে স্থির হইয়া বাস করিতে পারেন না, মাঝে মাঝে বাহিরের কর্ম নেশা, ভ্রমণের নেশা, নূতন দৃশ্য নূতন আবেষ্টন নূতন স্থানের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসে, এবং নিজের নিভৃত নিকুঞ্জ নিবাস হইতে তিনি ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়েন। বাহিরের জীবনের দিক্ হইতে ইহা সকলেরই চোখে পড়ে সহজেই। অন্তরের দিক হইতেও একথা সত্য। কবি নিজের কল্পলোক, অন্তর্লোকের মধ্যে বাস করিতেই ভালবাসেন, কিন্তু মাঝে মাঝে

বাহিরের বিচিত্র ঝড়-ঝঞ্ঝা দুঃখ-বেদনা-ক্রন্দন সংশয়-সংগ্রাম তাঁহাকে এমন গভীরভাবে স্পর্শ করে যে স্পর্শ-কাতর চিত্ত কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না; তখন তিনি অন্তর্লোক, কল্পলোক ছাড়িয়া বাস্তব সংসারের দৈনন্দিন আবর্তের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহেন। কবির কাব্যেও তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। শুধু শিল্পময়, কাব্যময়, সৌন্দর্যময় জীবন যে মাঝে মাঝে তাঁহার আর ভাল লাগে না, একথা বারবার তিনি কোন কোন পত্রে ও প্রবন্ধে বলিয়াছেন। এই ধরণের একটি ভাবমুহূর্ত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় ধরা পড়িয়াছে; সংসারে যত ব্যথিত, উৎপীড়িত, আশাহীন, ভাষাহীন মানুষ আছে তাহাদের ক্রন্দন কবিচিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে, কবি ইহাদের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিতে চাহেন,—

> এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
> হে কল্পনে, রঙ্গময়ি! দুলায়োনা সমীরে সমীরে
> তরঙ্গে তরঙ্গে আর! ভুলায়োনা মোহিনী মায়ায়।
> বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
> রেখো না বসায়ে!

কিন্তু এ ভাব-মুহূর্ত কাটিয়া যায়, কবি আবার তাঁহার অন্তর্লোকের মধ্যেই আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

"চৈতালি" প্রথম প্রকাশিত হয় মোহিতবাবু-সম্পাদিত রবীন্দ্র "কাব্য-গ্রন্থাবলী"র মধ্যে। ইহার নাম সম্বন্ধে কবি "কাব্য-গ্রন্থাবলী"র ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন,—

"চৈতালি-শীর্ষ কবিতাগুলি লেখকের সর্ব্বশেষের লেখা। তাহার অধিকাংশই চৈত্র মাসে লিখিত বলিয়া বৎসরের শেষ উৎপন্ন শস্যের নামে তাহার নামকরণ করিলাম।"

হয়ত কবি একথা মনে করিয়া থাকিতে পারেন যে এই কবিতাগুলি তাঁহার কবিজীবনের শেষ ফসল; এই ধরণের ধারণা উত্তর জীবনে বার বার কবির মনে জাগিয়াছে। তবে, সত্য সত্যই "চৈতালি" একটী সুদীর্ঘ জীবন-পর্যায়ের শেষ ফসল বলিলে অন্যায় কিছু বলা হয় না।

"চিত্রা"তেই আমরা দেখিয়াছি, এক জীবন তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্য-সুধায় জীবন একেবারে কানায় কানায়

ভরিয়া উঠিয়াছে, বুঝি বা উপছাইয়া পড়িয়া যাইবে, এমন মনে হইতেছে। "চৈতালি"র প্রথম কবিতাতেই কবি তাই বলিতেছেন, আমার জীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জ বনে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধরিয়াছে, পূর্ণ পরিপক্ক ফলে সমস্ত জীবন ফলবান্ হইয়া উঠিয়াছে, এখনই বুঝি তাহা ফাটিয়া পড়িয়া যাইবে এমনই মনে হইতেছে, অথচ তাহা ফাটিয়া পড়িতেছে না। তুমি তোমার শুক্তিরক্ত নখর দ্বারা এই বৃন্তগুলি ছিন্ন কর, দশন দংশনে পূর্ণ ফলগুলি টুটাইয়া দাও।

আজ মোর দ্রাক্ষা কুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্ত্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল,
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

* * *

শুক্তি রক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেল বৃন্তগুলি,
সুখাবেশে বসি' লতামূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথা কাজে যেন অন্য মনে
খেলাচ্ছলে লহ তুলি' তুলি'
তব ওষ্ঠে দশন দংশনে
টুটে যাক্ পূর্ণ ফলগুলি।

('উৎসর্গ', "চৈতালি")

যে-মুহূর্তে মনের মধ্যে এই অনুভূতি জাগিল, যে মুহূর্তে মনে হইল একটা জীবন তাহার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত হইতেই সেই জীবন হইতে মুক্তি পাইবার, সেই জীবন অতিক্রম করিবার একটা ইচ্ছা মনের গহনে মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল। "চৈতালি"তেই তাহার প্রথম আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আভাস মাত্রই, তাহা এখনও রূপ পরিগ্রহ করে নাই, এবং "কল্পনা"র আগে সে-রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিনা, যদিও "চৈতালি" এবং

"কল্পনা"তেও পাশে পাশেই এমন কবিতা আছে যাহার মধ্যে আমরা "সোনার তরী-চিত্রা"র জীবনের নিসর্গানুভূতিরই পরম-প্রকাশ দেখিতে পাই। ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়, কারণ এক জীবন হইতে অন্য জীবনে কবিচিত্তের যাত্রাপথ এত সহজ ও সরল নয়। প্রথমতঃ, যে জীবন হইতে মুক্তি কবি কামনা করিতেছেন, সে কামনা রূপ পরিগ্রহ করিতে সময় লয়, এবং দ্বিতীয়তঃ রূপ পরিগ্রহ করা হইলেও অনাগত জীবনের মূর্তি সহসা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। জীবনান্তর যে হইবে "চৈতালি"তে তাহার আভাস কিছু কিছু আমরা পাই, কিন্তু তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল "কল্পনা"য়, কিন্তু "খেয়া" এবং "নৈবেদ্য"র আগে অনাগত জীবনের মূর্তি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল না। "চৈতালি"র পর হইতে "খেয়া"র পূর্ব পর্যন্ত যে-কবিজীবন সে-জীবনকে আমরা এই হেতু একটা জীবনসন্ধি-যুগ বলিতে পারি।

"চৈতালি"তে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে চতুর্দশপদী কবিতাগুলি; কতকটা আলগা ভাবে সনেট্-ও ইহাদের বলা যাইতে পারে। "কড়ি ও কোমলে"ই চতুর্দশপদী রূপের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এবং পরে "নৈবেদ্য"তে ইহার সুনির্দিষ্ট রূপ ধরা পড়ে। এই ছোট ছোট কবিতাগুলি যাহারা ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তাহারাই বুঝিতে পারিবেন, "সোনার তরী-চিত্রা"র জগৎ হইতে কবি ক্রমশঃ দূরে সরিয়া আসিতেছেন, মনের ভাবনা, কল্পনা ও অনুভূতি ধীরে ধীরে ভিন্ন রূপ লইতেছে। "চৈতালী"র প্রথম কবিতাতেই দেখিতেছি যে-সুরটি ধ্বনিত হইতেছে তাহা পূর্ণতার সুর, তৃপ্তির সুর। এই পূর্ণতা, এই তৃপ্তি আসিয়াছে একটি অখণ্ড নিসর্গানুভূতি হইতে; মানুষ, প্রকৃতি, প্রেম, সৌন্দর্য, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, কোনও বস্তুই বিচ্ছিন্ন নয়, একে অন্যের সঙ্গে নিবিড় প্রেমে আবদ্ধ, কোথাও কোনও ছেদ নাই—এই অনুভূতি হইতে। "চৈতালী"র ছোট ছোট কবিতাগুলিতেও এই পূর্ণতার সুরটি ধরা পড়ে। মানুষ ও প্রকৃতি দুইয়ে মিলিয়া এই কবিতাগুলিকে অপরূপ মাধুর্য দান করিয়াছে। শুধু নিসর্গ নয়, মানবতার মহিমাও এই কবিতাগুলিতে সুস্পষ্ট; "চিত্রা"র 'স্বর্গ হইতে বিদায়,' "সোনার তরী"র 'বৈষ্ণব কবিতা' প্রভৃতি কবিতায় মানব-মহিমা যে-ভাবে পূজা পাইয়াছে "চৈতালী"তে দেখিতেছি সেই মানব-মহিমাকে কবি উপলব্ধি করিতেছেন আরও তুচ্ছতর বস্তু ও ঘটনার মধ্যে, এবং পরে "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে এই উপলব্ধি

আরও সত্য, আরও স্পষ্ট হইতেছে। কবি মনে করেন, এই মানব-মহিমার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হইয়াছিল প্রাচীন ভারতের সাধনা ও ঐতিহ্যের মধ্যে, ভারতীয় প্রতিভার প্রধান বিশেষত্বই এই মানব-মহিমা। এই পরিপূর্ণ মানব-মহিমার আদর্শের সঙ্গে যখন তিনি আমাদের বর্তমান বাঙ্গালী জীবনের তুলনা করেন, তখন আমাদের জীবনের পঙ্গুতা, খর্বতা ও দৈন্য তাঁহাকে পীড়িত করে। আমরা যখন বিশ্বের অখণ্ড সমগ্রতার কথা ভুলিয়া জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া 'দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে ক্ষয়' করি তখন কবিচিত্ত ক্ষুব্ধ হয়, পরিপূর্ণ মানব-মহিমার খর্বতায় চিত্ত পীড়িত হয়; সে-বেদনার আভাস "চৈতালি"র অনেক কবিতায় সুস্পষ্ট।

এই মাত্র "চৈতালী"র কবি-মানসের যে পরিচয় উল্লেখ করিলাম, তাহার পূর্ণতর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে। এইজন্য একাধিক রবীন্দ্র-টীকাকার "চৈতালী"কে "নৈবেদ্য" কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ বর্ণনা সত্য। যে মানব-মহিমা, যে মাটীর প্রতি আকর্ষণ, প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি যে মুগ্ধ সশ্রদ্ধ দৃষ্টি "চৈতালি"র কবিতাগুলিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহারই পরিপূর্ণ প্রকাশ আমরা লাভ করি "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে। তাহা হইলেই আমরা দেখিতেছি, একটা জীবন পর্যায় শেষ হইতে না হইতেই আর একটা জীবনের অরুণাভাস ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে। তাহার আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ "চৈতালি"র কবিতাগুলির মধ্যে সহজেই ধরা পড়ে; এই সুগভীর শান্তি, স্নিগ্ধ দীপ্তি, এবং সমাহিত চৈতন্য যাহা "কল্পনা"-গ্রন্থে আরও সুস্পষ্ট।

(৫)

কথা (১৩০৪—১৩০৬) *
কাহিনী (১৩০৪—১৩০৬) *
কণিকা (? —১৩০৬)
কল্পনা (১৩০৪—১৩০৬)
ক্ষণিকা (১৩০৬ ?—১৩০৭)

* "প্রথম প্রকাশিত 'কাহিনী' গ্রন্থে নাট্যকাব্য ও কয়েকটি কবিতা ছিল; মাঝে সে গ্রন্থ প্রচলিত ছিলনা। 'কথা' ও বর্তমানে প্রচলিত আছে। তবে 'কথা ও কাহিনী' নামে যে-গ্রন্থ বর্তমানে সুপরিচিত—তাহার 'কাহিনী' অংশ নূতন সংগৃহীত পুস্তক। মোহিতচন্দ্র সেন ১৩১০

"কথা"-গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া "কণিকা" পর্যন্ত যে কবি-জীবন তাহাকে একটা জীবনসন্ধি-যুগ বলা যাইতে পারে, একথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ; এবং তাহার কারণ নির্দেশ করিতেও চেষ্টা করিয়াছি। ইহার সত্যতা আমাদের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ পাইবে। "সোনার তরী-চিত্রা"র প্রেম ও সৌন্দর্য-তন্ময় জীবন ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইবে, তাহা শুধু কবির কাব্য-চেতনার অংশ মাত্র হইয়া থাকিবে ; এখন হইতে জীবন নবতর সাধনার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে, জীবনকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা ধীরে ধীরে জাগিবে। "কথা" ও "কাহিনী"-গ্রন্থ হইতেই ইহার সূত্রপাত, কিন্তু পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় "কল্পনা"-গ্রন্থে। সৌন্দর্য-তন্ময় ছিল যে চিত্ত, নিসর্গ-সাধনায় নিমগ্ন ছিল যে চিত্ত সেই চিত্ত ক্রমশঃ একটা মহাজীবনকে উপলব্ধি করিবার জন্য কি ভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, একটা শান্ত সমাহিত সাধনা কি করিয়া ধীরে ধীরে কবিচিত্তকে সবলে টানিতেছে, তাহার ইতিহাস বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

"কাহিনী","কথা","কণিকা" রচনার সঙ্গে সঙ্গেই "কল্পনা"র জগৎও পাশা-পাশি চলিতেছিল, কাজেই গ্রন্থ প্রকাশের ক্রম পর পর হইলেও সব কয়টি গ্রন্থই মোটামুটি ভাবে একই মানস-জগতের সৃষ্টি। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে একই মনের প্রকাশ বিচিত্রভাবে এই সময়ের রচনাগুলিতে ধরা পড়িয়াছে, অথচ রূপের দিক হইতে "কাহিনী"র সঙ্গে "কণিকা"র অথবা "কথা"র সঙ্গে "কল্পনা"র কত প্রভেদ।

"কাহিনী"তে কয়েকটি নাট্যকবিতা আছে, কিন্তু ইহাদের নাটকীয় গুণ খুব অল্পই ; 'গান্ধারীর আবেদন' 'সতী' 'নরকবাস' 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' এবং 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' সব কয়টি রচনাই একান্তভাবে গীতধর্মী। অন্যত্র আমি ইহাদের সম্বন্ধে বিশদতর আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সাহিত্যরসের

সালে যখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ ও সম্পাদন করেন, তখন পুরাতন বইগুলির অনেক ভাঙাচোরা হয়। সেই সময় 'কাহিনী'র নাট্যগুলিকে পৃথক করিয়া 'নাট্যকাব্য' বলিয়া গ্রন্থ প্রণীত হয় ; আর কতকগুলি কাহিনী 'সোনার তরী', 'চিত্রা' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া 'কাহিনী' নামে একটি খণ্ড প্রস্তুত করেন। পরে ১৯১০ সালে [ইণ্ডিয়ান্] পাবলিশিং হাউস 'কথা ও কাহিনী' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন।" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী" ১ম খণ্ড, ৩৪২—৪৩ পৃ।

দিক হইতে ইহাদের নিছক কবিতা হিসাবে আলোচনা করাই সঙ্গত। এক 'লক্ষীর পরীক্ষা' ছাড়া আর চারিটি নাট্য-কবিতার উপাদানই আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে আহৃত, এবং সব ক'টিতেই কবি প্রচলিত লোকধর্ম, সমাজধর্ম প্রভৃতির বিরুদ্ধে মানবের চিরন্তন সত্য নিত্যধর্মের জয়ঘোষণা করিয়াছেন।

"কথা"-গ্রন্থের উপাদানও আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে আহৃত, এবং আমাদের অতীত ইতিহাসের অসংখ্য ছোট ছোট আপাতঃ তুচ্ছ ঘটনা ও কাহিনীর মধ্যে যে ত্যাগ, ক্ষমা, বীরধর্ম এবং মানব-মহত্ত্বের অন্যান্য যে সব গুণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই এই সুন্দর গাথা ও কবিতাগুলির প্রাণরস জোগাইয়াছে। মানব-মহত্ত্বের, মানবের চিরন্তন সত্য নিত্যধর্মের যে মহান্ রূপ আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে থাকিয়া থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার উপলব্ধিতে ধরা দিয়াছে, এবং "কাহিনী" ও "কথা"-গ্রন্থে তাহাই রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য কিশোর বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। বৈষ্ণব পদকর্তাদের জগৎ, কালিদাসের জগৎ, তাঁহার কাছে অত্যন্ত পরিচিত ছিল, এবং তাহা হইতে প্রেমও সৌন্দর্যসুধারস তিনি কম আহরণ করেন নাই। তাঁহাদের জগৎকে তিনি নিজের চিত্তের মধ্যে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কল্পনায় রঞ্জিত করিয়াছেন, এবং তাহারা তাঁহার কাব্য-চেতনার অংশ হইয়া গিয়াছে। "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" হইতে আরম্ভ করিয়া "চিত্রা" পর্যন্ত কত অসংখ্য কবিতায় যে এ-কথার প্রমাণ আছে, তাহা পাঠককে দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, যে প্রাচীন ভারতীয় জগৎও জীবনের পরিচয় এই সব কাব্যে আমরা পাই, সে-জগৎও জীবন, এবং "চৈতালি" হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর জীবনে রচিত কাব্যে যে অতীত ভারতীয় জীবন ও জগতের পরিচয় পাওয়া যায়, এই দুই জগৎ ও জীবন এক নয়। পূর্বজীবনের রচিত কাব্যে ভারতীয় সাধনার যে খণ্ড অংশ তাঁহার কবিচিত্তে প্রাণরস সঞ্চার করিয়াছে, অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাহা প্রেম ও সৌন্দর্য সাধনা, নিসর্গ সাধনা। কিন্তু উত্তর কবিজীবনে ভারতীয় সাধনার গভীরতর দিক ক্রমশঃ কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে, ইহাই বিশেষভাবে আমাদের বোধের মধ্যে ধরা দেয়। "চৈতালি" হইতেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছে; এই গ্রন্থের অধিকাংশ চতুর্দশপদী কবিতায়

তাহার প্রমাণ আছে। তিনি যে ক্রমশঃ ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনাদর্শের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন, আমাদের খণ্ড বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রজীবন যে কবিকে পীড়িত করিতেছে, মানবের চিরন্তন মহিমা ও মহত্ত্ব যে শত আবরণ ভেদ করিয়াও তাঁহার মন ও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছে এবং কল্পনাকে সবল করিতেছে, মানুষের এই তুচ্ছ সংসারের মধ্যেই যে দেবতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, "কুমার-সম্ভবে"র অসমাপ্ত গানই যে তাঁহার ভাল লাগিতেছে, এ-সমস্ত হইতেই বোঝা যায়, তাঁহার কবিচিত্ত কোন্‌দিকে মোড় ফিরিতেছে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শুধু প্রেম, সৌন্দর্য, এমন কি নিসর্গ সাধনাও কবিকে আর তৃপ্তি দিতে পারিতেছেনা, তাঁহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেনা, ভারতীয় ঐতিহ্যের সৌন্দর্য ও নিসর্গ সাধনার মূল্য তাঁহার কাছে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসও অন্য দিক্ দিয়া, গভীরতর দিক্ দিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছেন; পূর্বজীবনের 'মেঘদূতে'র সঙ্গে "চৈতালী"র 'কালিদাসের প্রতি', 'কুমার-সম্ভব গান', 'মানসলোক', 'কাব্য' এই চারিটি কবিতা তুলনা করিলেই একথার সত্যতা ধরা পড়িবে। বেশ বোঝা যাইতেছে, জগৎ ও জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার, তাহার মর্মমূলে প্রবেশ করিবার, মানব-সৌন্দর্য শুধু নয়, মানব মহত্ত্বকে গভীর ভাবে জানিবার একটা চেষ্টা কবিচিত্তে জাগিয়াছে। এই তপস্যা রূপ ধরিল 'কাহিনী' ও 'কথা'-গ্রন্থে ভারতীয় ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিয়া, এবং সেই ঐতিহ্যেরও সেই দিক যে দিকে মানব-মহত্ত্ব বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই মানব-মহত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্র-কবিচিত্ত সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপন করিল। এই কথাটি উপলব্ধি করিলে 'কাহিনী' ও 'কথা'র মূল্য নির্ধারণ সহজ হইবে। অবশ্য খণ্ড খণ্ড প্রত্যেকটি কবিতার একটা স্বাধীন মূল্য আছে, একথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু সমগ্রভাবে, রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের দিক্ হইতে "কাহিনী" ও "কথা" (এবং "কণিকা") গ্রন্থের উপরোক্ত এই বিশেষ মূল্য আছে, একথা স্বীকার না করিলে রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের প্রবাহ বোধ-গোচর হইবেনা।

"কল্পনা"-কাব্য রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব অপরূপ সৃষ্টি। নিছক কল্পনার সৌন্দর্যের দিক্ হইতে ইহার কবিতা[illegible] কবিতা অপেক্ষা কম উপভোগ্য নয়, কারণ এতদিনে ইতিমধ্যে [illegible] কাব্য-চেতনার অংশ হইয়া

গিয়াছে, কিন্তু 'কল্পনা"র কবিতাগুলি উপভোগ্যতর হইয়াছে অন্য কারণে। "কথা" ও "কাহিনী" গ্রন্থেই আমরা দেখিতেছি, মহাজীবনের আহ্বান কবির কানে আসিয়া পৌছিয়াছে, মানব-মহত্ত্বের গভীর আবেদন তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে, শান্ত সমাহিত তপস্যার জীবনের প্রতি তাঁহার কবিচিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, একটা নিগূঢ় গভীর চেতনা তাঁহার সমগ্র কবি-মানসকে রূপান্তরিত করিবার উপক্রম করিতেছে। "কল্পনা" গ্রন্থে "সোনার তরী-চিত্রা"র সৌন্দর্য-তন্ময়তার সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে নবলব্ধ এই নিগূঢ় গভীর চেতনা, এবং দুইয়ে মিলিয়া কবির কাব্য-চেতনাকে যে নূতন রূপদান করিল তাহাই "কল্পনা"র কবিতাগুলিকে অপরূপ ঐশ্বর্যে ভরিয়া দিল।

গানগুলি বাদ দিলে "কল্পনা"য় কবি-চিত্তের দুইটি ধারা সহজেই ধরা পড়ে; একদিকে "সোনার তরী-চিত্রা"র প্রেম ও নিসর্গ-সাধনার প্রকাশ স্মৃতি ও ঐতিহ্য-সম্পদে, শব্দ ও ধ্বনিগাম্ভীর্যে, ছন্দের লালিত্যে, ভাবগরিমায় এবং সৌন্দর্য-মহিমায় অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে,—'বর্ষামঙ্গল', 'স্বপ্ন', 'মদনভস্মের পূর্বে', 'মদনভস্মের পরে', 'পসারিণী', 'শরৎ' প্রভৃতি কবিতা তাহার প্রমাণ। আর একদিকে, যে নিগূঢ় গভীর সমাহিত চৈতন্যের কথা আগে উল্লেখ করিয়াছি, সেই চৈতন্য আপনাকে প্রকাশ করিতেছে 'দুঃসময়', 'ভ্রষ্টলগ্ন' 'বিদায়', 'অশেষ', 'বর্ষশেষ', 'অসময়', 'বৈশাখ', 'রাত্রি' প্রভৃতি কবিতায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও নিসর্গ-সাধনার প্রকাশ জড়াইয়া নাই একথা বলা যায় না। আসল কথা, কোনও কাব্যকে, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র-কাব্যকে কোনও বিশেষ চিহ্নে, কোনও বিশেষ নামে চিহ্নিত অথবা নামাঙ্কিত করা যায় না। নানা বিভিন্ন ধারা, আপাতবিরোধী ভাব ও অনুভূতি একই কবিতায় হয়ত একটা সমগ্ররূপ ধরিয়া প্রকাশ পায়, বিশেষ ভাবে কবিজীবনের যুগসন্ধিকালে যে-সব কাব্যের রচনা কবির সেই সব কবিতায়। তবু আলোচনা ও বিশ্লেষণ যখন আমরা করিতে বসি তখন নিজেদের বোধের সুবিধার জন্য প্রবলতর ভাবও অনুভূতি অনুসারেই কাব্য-পর্যায়ের নামকরণ আমরা করিয়া থাকি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা ভুলিলে চলিবে না, কবির কাব্যে যে-মনের প্রকাশ আমরা দেখি সে-মনের মধ্যে জড়াজড়ি করিয়া থাকে বিচিত্র ভাব ও অনুভূতির ধারা, শতেক যুগের স্মৃতি, শতেক যুগের গীতি, রসের সরু মোটা সহজ জটিল উপলব্ধি; তবু, সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য, সকল বিচিত্রতা সকল জটিলতা

অতিক্রম করিয়া এক এক সময় এক একটা সুর, এক একটা অনুভূতি প্রবলতর হইয়া প্রকাশের মধ্যে ধরা দেয়। "কল্পনা"য় ভাবও উপলব্ধির এই জটিলতা ও বৈচিত্র্য খুব স্পষ্ট, এবং খুব স্বাভাবিকও, কারণ, আমি পূর্বেই বলিয়াছি "কল্পনা"-কাব্য জীবনের একটী যুগ-সন্ধি-ক্ষণের সুগভীর প্রকাশ। সেই হেতু "কল্পনা"র কতগুলি কবিতায় ভাব ও রসের প্রকাশ একভাবে ধরা দিয়াছে, কতগুলি কবিতায় অন্যভাবে।

নিসর্গ-মহিমার অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে 'বর্ষামঙ্গল'-কবিতায়।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবন বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে,
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা। ('বর্ষামঙ্গল', "কল্পনা")

ইহার ধ্বনি ও ছন্দে, পদ-বিন্যাসে, শব্দ-চয়নে ও চিত্র-গরিমায় মত্ত নববর্ষার যে সুগভীর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় ইহার শব্দার্থের মধ্যে পাওয়া যায় না, যে মোহ-মাধুর্য্য ইহাকে আশ্রয় করিয়াছে তাহার সৃষ্টি হইয়াছে অতীত ভারতের বর্ষা-বিজড়িত স্মৃতি-ঐতিহ্য হইতে, তাহার উপাদান জোগাইয়াছে শতেক যুগের কবি; ঘনবর্ষার ধারায় যে গীত ধ্বনিত হয় তাহা ত এই কবিদেরই গীত—

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে।
শতেকযুগের গীতিকা। ('বর্ষামঙ্গল' "কল্পনা")

এই যে প্রাচীন যুগের স্মৃতি-ঐতিহ্য ইহা রবীন্দ্র-কবি-মানসের একটি বিশেষ অংশ, একটি বিশেষ সম্পদ। "মানসী-সোনার তরী-চিত্রা"র অনেক কবিতাতেই এই স্মৃতি-ঐতিহ্য মোহ-মাধুর্য বিস্তার করিয়াছে; "কল্পনা"য়ও তাহার পরিচয় কম নয়; 'বর্ষামঙ্গল', 'চৌরপঞ্চাশিকা', 'স্বপ্ন', 'মদন ভস্মের পূর্বে'; 'ভ্রষ্টলগ্ন' প্রভৃতি কবিতার মাধুর্য এই স্মৃতি-ঐতিহ্য হইতেই আহরিত হইয়াছে।

'স্বপ্ন' কবিতাটিকে একটি কোমল মধুর স্নিগ্ধ প্রেমের কবিতা বলা যাইতে পারে, এবং এক হিসাবে 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতাটিকেও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য আছে; দেহ-আত্মা-লীলার যে-প্রেম অত্যন্ত নিবিড় ইন্দ্রিয়-মিলনের মধ্যে প্রকাশ পায় সেই একান্ত মর্মান্তিক প্রেমের পরিচয় রবীন্দ্র-কাব্যে নাই, একথা আমি এই আলোচনাতেই অন্যত্র বলিয়াছি। দেহ-আত্মা-মিলনের মধ্যে যে সৌন্দর্যমাধুর্য সেইটুকু পান করিয়াই রবীন্দ্রনাথ পরিতৃপ্ত, তাহার বেশী তিনি চাহেন না, এবং এই সৌন্দর্য মাধুর্য আস্বাদনের পর মুহূর্তেই তাঁহার প্রেম নিসর্গ মাধুর্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে, একটা শান্ত সংযমের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া যায়, ইন্দ্রিয় বন্ধ টুটিবার উপক্রম করিয়াও টুটিয়া যায় না, ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অসংখ্য কবিতায় তাহার প্রমাণ আছে, "কল্পনা" গ্রন্থে 'স্বপ্ন' কবিতায়ও আছে। প্রিয়ার দেহ-সৌন্দর্য অতি কোমল অঙ্গুলি দিয়া কবি আঁকিলেন, পরিবেশ সম্পূর্ণ হইল, উদ্বেলিত হৃদয় একে অন্যের সম্মুখীন হইল।

> দুজনে ভাবিনু কত দ্বারতরুতলে
> নাহি জানি কখন কি ছলে
> সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
> আমার দক্ষিণ করে,—কুলায় প্রত্যাশী
> সন্ধ্যার পাখীর মত, মুখখানি তার
> নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
> নমিয়া পড়িল ধীরে ;—ব্যাকুল উদাস
> নিঃশব্দে মিলিল আসি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস।

কিন্তু তার পরেই—

> রজনীর অন্ধকার
> উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
> দীপ দ্বারপাশে
> কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
> সিপ্রা নদীতীরে
> আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে

একদিকে এই প্রেম ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে কবিচিত্ত থাকিয়া থাকিয়া সুধা আহরণ করিতেছে—এ যে বহুদিনের বহু বৎসরের সাধনাভ্যাস, ইহাকে ছাড়িতে চাহিলেই ত মুহূর্তেই ছাড়া যায় না, তাহার বেদনা হইতে মুক্তিও পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া অন্যদিকে যে নিগূঢ় গভীর চৈতন্য চিত্তকে ক্রমশ অধিকার করিতেছে তাহা এখনও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই; এই অস্পষ্টতার অনিশ্চয়তারও একটা বেদনা আছে। এই দুই বেদনার দ্বন্দ্ব-ক্রন্দন "কল্পনা"র অনেক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। এই জীবন-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া কবিতাগুলি নূতন ভাব-রূপও পাইয়াছে, এবং ছন্দ-রূপও অপূর্ব শক্তি এবং গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।

'দুঃসময়', 'অসময়', 'অশেষ', 'বিদায়', 'বৈশাখ', 'রাত্রি', 'বর্ষশেষ' প্রভৃতি কবিতায় এই দ্বন্দ্ব-বেদনা স্বপ্রকাশ। এই যে নিগূঢ় চৈতন্য চিত্তকে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে, কবি তাহা জানেন, কবি জানেন 'মুখর বন-মর্মর গুঞ্জিত, কুঞ্জ কুন্দ কুসুম রঞ্জিত' প্রেম ও সৌন্দর্য-সাধনার জীবন এখন দূরে সরিয়া যাইতেছে। এখন অসময়, বড় দুঃসময়, এখন 'অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে, ফেন হিল্লোল কল কল্লোলে দুলিছে', এখন 'মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্থরে, দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা', এখন 'সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে, এখন সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া', এতদিন 'বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি, এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে'। কিন্তু বন্ধ্যা সন্ধ্যার অস্পষ্ট ম্লানিমা বেশীদিন কবিচিত্তকে আচ্ছন্ন বুঝি করিয়া রাখিতে পরিল না; কোন্ অপরিচিত জগতের, কোন্ নিগূঢ় শক্তির অমোঘ আহ্বান বুঝি শুনা যাইতেছে—সে আহ্বান কবিকে শান্তি ও সুপ্তির মধ্যে থাকিতে দিবে না, ক্লান্ত দেহমনকে বিশ্রাম দিবেনা। কবি বুঝি কোনও ভাবমুহূর্তে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের কাজ তিনি শেষ করিয়াছেন, বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিয়াছে, দিনাবসানের শ্রান্ত ক্লান্ত দেহমন রাত্রির কোলে বিছাইয়া দিয়া বিশ্রাম লাভ করিবেন,—কিন্তু এ যে কত মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন তাঁহার নিষ্ঠুর কঠোর জীবন-দেবতা। তাহার আহ্বান বিদ্যুতের মত কবির কানে আসিয়া বাজিল। জীবনের শেষ কি আছে, এক জীবন-পর্যায়ের শেষকে আর এক নূতন মহাজীবন ডাকিতেছে,—

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা   সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপ শিখা
দিনের কল্লোল'পর   টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।
ওপারের কালো কূলে   কালী ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমির তলে   চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা।
নয়ন পল্লব 'পরে   স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে
থেমে যায় গান ;
ক্লান্তি টানে অঙ্গে মম   প্রিয়ার মিনতি সম
এখনো আহ্বান

*   *   *

রহিল রহিল তবে   আমার আপন সবে
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যাদীপালোক   পথ চাওয়া দু'টি চোখ
যত্নে গাঁথা মালা।

*   *   *

রাত্রি মোর, শান্তি মোর   রহিল স্বপ্নের ঘোর
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ
আবার চলিনু ফিরে   বহি ক্লান্ত নতশিরে
তোমার আহ্বান।

*   *   *

হবে, হবে, হবে জয়   হে দেবী করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বান বাণী   সফল করিব রাণী
হে মহিমময়ি।
কাঁপিবেনা ক্লান্তকর   ভাঙিবেনা কণ্ঠস্বর
টুটিবেনা বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি   দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি
দীপ নিবিবেনা।

কর্ণধার নবস্রোতে নবসেবকের হাতে
করি যাব দান
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান। ('অশেষ', "কল্পনা")

নূতন মহাজীবনের আহ্বানকে কবি স্বীকার করিলেন যে মুহূর্তে তাহার পর মুহূর্তেই পুরাতন জীবন হইতে 'বিদায়' লইতে হইল। এতকালের খেলা ও বাসনা ছাড়িয়া তিনি চাহিলেন শান্তি, হাসি-অশ্রু পরিত্যাগ করিয়া চাহিলেন 'উদার বৈরাগ্যময় বিশাল বিশ্রাম', প্রেম-সৌন্দর্য-গীত-মুখরিত জগৎ ছাড়িয়া 'পরম নির্বাক নিস্তব্ধ জগতের' মধ্যে আশ্রয় লাভ করিতে চাহিলেন। মহাজীবন যে কোন্ দিকে ইঙ্গিত করিতেছে, কোথায় কোন্ নিগূঢ় সুগভীর রহস্যের জগতে কবিচিত্তকে লইয়া যাইতেছে তাহা ত এই সব কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট; অধিকতর স্পষ্ট 'বর্ষশেষ' 'বৈশাখ', 'রাত্রি' প্রভৃতি কবিতায়। যে সুগভীর অনুভূতি এই সব কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার কাছে পূর্ববর্তী প্রেম ও সৌন্দর্য-তন্ময়তার জীবন যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

'বর্ষশেষ' কবিতাটি '১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত'। ঝড়ের বর্ণনা হিসাবে এবং চিত্র-মহিমায় কবিতাটি অপরূপ; ঝড়ের পূর্বাভাস, তাহার বিক্ষোভ, তাহার ক্রন্দন, তাহার উন্মত্ততা, তাহার উল্লাস এবং সর্বশেষে শেষ গুচ্ছে তাহার শান্ত বিরতি স্তরে স্তরে তালে লয়ে এমন সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে যে শুধু ব্যাখ্যা করিয়া অর্থ করিয়া ইহার কাব্য-মহিমা উদ্ঘাটিত করা অসম্ভব বলিলেই চলে। যে দ্বিধা, যে সংকোচ, যে বিদায়-বেদনা 'অশেষ' কবিতায় এখনও অবশিষ্ট ছিল তাহা যেন এই দুর্দম দুর্দান্ত ঝড়ে একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল তাহার ঠিকানাও পাওয়া গেল না। যে মহাজীবন, নিগূঢ় সুগভীর রহস্যময় জীবন কবিকে আহ্বান করিল, 'বর্ষশেষ' কবিতায় তাহাকে তিনি প্রণাম করিলেন,—

হে নূতন, এস তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে,
ব্যাপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোর স্তূপে।

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,—
তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ুগর্জে আসে,
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে
বিদ্ধ করি হানে,
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে।

*　　　*　　　*

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল।
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হ'য়েছ প্রকাশ
প্রণমি তোমারে।
তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল
অক্লান্ত অম্লান।
সদ্যোজাত মহাবীর, কি এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্র-চ্যুত তপনের
জ্বলদর্চি-রেখা
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্দ্ধমুখে, পড়িতে জানিনা
কি তাহাতে লেখা। ('বর্ষশেষ', "কল্পনা")

(এই যে বর্ষশেষের ঝড় এ ত কবির নিজের জীবনেরই ঝড়। জীবনের এক অধ্যায়ের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা ধুইয়া মুছিয়া গিয়া আর এক নব অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইতে চলিয়াছে। এই কবিতাটির ইতিহাস ও তাৎপর্য সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,

"১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটি প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি……এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে

হ'বে—ঝড় এসে শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনি ভাবে, চির নবীন যিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্যে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থাম্‌ল। বল্‌লুম—অভ্যস্তকর্ম্ম নিয়ে এই যে এতদিন কাটালুম, এতে তো চিত্ত প্রসন্ন হ'লনা। যে-আশ্রম জীর্ণ হ'য়ে যায়, তাকেও নিজের হাতে ভাঙ্‌তে মমতায় বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিত্‌কে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝলুম বেরিয়ে আস্‌তে হ'বে ..." (শান্তিনিকেতন পত্রিকা," ১৩৩২, বৈশাখ)।

এই অবস্থা সম্বন্ধে কবি অন্যত্র লিখিতেছেন,—

"এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্ম্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চল্‌ল, ততই পূর্ব জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগ্‌ল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল। এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কি-রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল, এই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।" ('আমার ধর্ম', "প্রবাসী", পৌষ, ১৩২৪)।

রুদ্রের আহ্বান যে জীবনে আসিয়াছে, মহাজীবনের যে গভীর সুগম্ভীর রূপ কবিচিত্তকে আলোড়িত করিয়াছে, 'বৈশাখ' কবিতায়ও তাহার প্রমাণ আছে—রুদ্র, ভৈরব, বৈরাগী জীবনের রূপ। কিন্তু "কল্পনা"-গ্রন্থে কল্পনার সবল ও মহিমান্বিত প্রকাশ দেখা যায় 'রাত্রি' কবিতাটিতে। কবি অবগুণ্ঠিতা শর্বরীর ধ্যান মৌন সভায় সভাকবি হইতে চাহিতেছেন, রাত্রির যে ধ্যান গম্ভীর মূর্তি তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, সেই ধ্যানগাম্ভীর্যের জগতে তিনি উত্তীর্ণ হইতে চাহিতেছেন।

মোরে কর সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা!
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।
তোমার তিমিরতলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্যোগ
ভ্রমিতেছে জগতে জগতে
আমারে তুলিয়া লও সেই তার ধ্বজচক্রহীন
নীরব ঘর্ঘর মহারথে

* * * *

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্দ্ধরাত্রে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হ'তে
আন্দোলিয়া ঘনতন্দ্রারাশি।
পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণা-কাতর,
চকিতে বিদ্যুৎ রেখাবৎ
তোমার নিখিল-লুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ।
জগতের সেই সব যামিনীর জাগরূকদল
সঙ্গীহীন তব সভাসদ
কে কোথা বসিয়া আছে আজি রাত্রে ধরণীর মাঝে
গণিতেছে গোপন সম্পদ,
কেহ কারে নাহি জানে, আপনার স্বতন্ত্র আসনে
আসীন স্বাধীন স্তব্ধচ্ছবি;
হে শর্বরী সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সভার
মোরে করি দাও সভাকবি। ('রাত্রি', "কল্পনা")

"কল্পনা"র শেষ কবিতা ১৩০৬ সালের শেষাশেষি রচিত হয়, এবং "নৈবেদ্য" গ্রন্থের প্রথম কবিতা রচিত হয় ১৩০৭ সালের শেষাশেষি। "কল্পনা"র জীবন হইতে "নৈবেদ্য"র জীবনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক পরিণতি আছে, যে ধ্যানমৌন গভীর সুগম্ভীর জীবনের আকুতি "কল্পনা"য় লক্ষ্য করা যায় তাহার পরিণতি "নৈবেদ্য" হইতেই সূত্রপাত। কিন্তু এই স্বাভাবিক বিবর্তনের মাঝখানে একটি অপরূপ কাব্যগ্রন্থ কয়েকমাসের ফাঁকের মধ্যে একটি স্থায়ী আসন দখল করিয়া বসিয়া আছে, সেটি "ক্ষণিকা"। "ক্ষণিকা" নামটি সার্থক। একজীবন হইতে অন্য জীবনে রূপান্তরের মাঝখানে কয়েকমাসের জন্য ক্ষণিকার মতই "ক্ষণিকা"র উদয় ও অস্ত। "ক্ষণিকা" বিস্ময়কর কাব্য; আরও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়, কি করিয়া এই আপাতঃ চটুল কৌতুক-বিলাস-পূর্ণ কাব্যটি এমন গভীর সুগম্ভীর আবর্ত বিবর্তের মাঝখানে আসিয়া নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল,এই ভাবিয়া। কবিও বুঝিতেছেন, প্রেম ও সৌন্দর্য-তন্ময়, রসমাধুর্য-ময় গতজীবনের কাছে বিদায় লইতেই হইবে, কিন্তু বুঝিলেও বিচ্ছেদের বেদনা হইতে ত সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়না, এবং সে বেদনা সহজে সান্ত্বনা লাভ

করিতেও চাহেনা। "ক্ষণিকা"র কবি ভাবিতেছেন, অতি তুচ্ছ কথায় বার্ত্তায় হাসিয়া খেলিয়া এই বেদনা ভারকে লঘু করা যায় কিনা। ক্ষণিক দিনের আলোকে ক্ষণিকের গান গাহিয়াই কবি তৃপ্ত হইতে চাহিয়াছেন, নিজের কথাটা, নিজের ব্যথাটা ঠাট্টা করিয়া হাল্কা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন, যে তপঃক্লিষ্ট জীবনের মহিমা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে সেই জীবনকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া পরিহাসছলে যেন বলিতেছেন, 'আমি হ'বনা তাপস, হ'ব না, হ'ব না, যাহাই বলুন যিনি, আমি হ'বনা তাপস, নিশ্চয় যদি না মেলে তপস্বিনী' ; কিন্তু এই সব আপাতঃ চটুলতা ও পরিহাসের তলে তলে গত-জীবনের প্রিয়া-বিরহের কি যে অসহ গভীর বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া মরিতেছে তাহাকে কবি কিছুতেই আর গোপন করিতে পারেন নাই।

এই ধরণের অভিজ্ঞতা ত সাধারণ মানুষের জীবনে ও বারবার ঘটে। যে মানুষ প্রেম ও সৌন্দর্য-তন্ময় জীবনের সহজ ভাব ও রসের মাধুর্যের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতে থাকে, তাহারই জীবনে যখন একদিন কঠোর কঠিন গভীর সুগম্ভীর মহাজীবনের, মহান আদর্শের, মহান্ ত্যাগের আহ্বান আসিয়া সমস্ত অন্তরকে মূল ধরিয়া টান দেয়, তখন হঠাৎ ক্ষণিকের মত এই কথা মনে হয়, কোথায় কোন্ অনিশ্চয়তার মধ্যে, সুকঠিন নির্মম জীবনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িব, কাজ কি এই সুকঠোর তপস্যায়, তাহার চেয়ে এই ত বেশ আছি সহজ সৌন্দর্য মাধুর্যের মধ্যে, এই তৃপ্তির মধ্যে। কিন্তু এইখানেই কথা শেষ হইয়া যায়না। মুখে এই কথা বলিলেও মনের মধ্যে অতীত জীবন হইতে বিচ্ছেদের বেদনা বাজিতে থাকে, এবং ভবিষ্যৎ জীবন অনুক্ষণ ডাকিতে থাকে। এই দুই দিক্ হইতে টানের মুখে পড়িয়া স্পর্শ-কাতর চিত্ত অত্যন্ত পীড়িত বোধ করে ; এই পীড়ার আভাস "ক্ষণিকা"র প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় বিদ্যমান। সাধারণ মানুষের জীবনে অতীত জীবনের পিছন টানই হয়ত সত্য হয়, অথবা ক্ষণিকের চটুলতা ও কৌতুক বিলাস চিরন্তন হইয়া যায়, কিন্তু কবির জীবনে সত্য হইল, প্রবল হইল, ভবিষ্যতের অমোঘ কঠোর সুগম্ভীর আহ্বান।

"ক্ষণিকা"য় ক্ষণিক কালের জন্য কবি সহজ সাধনার পথে নামিয়াছেন। কৌতুক ও মর্মানুভূত সত্য হাত ধরিয়া পাশাপাশি চলিয়াছে "ক্ষণিকা"র কবিতাগুলিতে। এই ধরণের পাশাপাশি চলা কতক পরিমাণে দেখা যায় "কণিকা" গ্রন্থে, এবং প্রায় সমসাময়িক "চিরকুমার সভা" প্রহসনে। হাল্কা

ভাব ও ছন্দের সঙ্গে গভীর তত্ত্বের সমাবেশ "কণিকা"র প্রায় সব কবিতাতেই—কতকটা epigramএর ধরণে বলা। কিন্তু এই ভাবজগৎ সম্পূর্ণতা পাইল "কণিকা"-গ্রন্থে। হসন্ত শব্দের নির্বাধ ব্যবহারে ছন্দ পাইল এক অপূর্ব লঘুরূপ যাহা বাঙ্‌লা কবিতায় ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই—লঘু কথা লঘু ছন্দে লয়ে অত্যন্ত সহজভাবে বলা—বাঙ্‌লা গীতিকাব্য যেন এক সম্পূর্ণ নূতন রূপ পাইল তীক্ষ্ণ শাণিত বিদ্যুতোজ্জ্বল প্রকাশ-ভঙ্গিমায়। ব্যথা, বিচার, সন্ধান, সমস্যা, চিন্তা,—সব কিছুকে যেন কবি দূরে ঠেলিয়া দিয়া ক্ষণিক দিনের আলোকে, অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গানের মধ্যে নিজকে ডুবাইয়া দিলেন। কিন্তু বলার চটুল ভঙিমার ফাঁকে ফাঁকে যখন কবির অন্তরের মর্মস্থলে আমাদের দৃষ্টি পড়ে তখন বুঝিতে পারা যায় কোন্ গভীর বেদনার উৎস হইতে কবির চটুল কৌতুক কথাগুলি উৎসারিত হইতেছে। কবি বলিতেছেন,

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়
ফুটে আর টুটে পলকে
তাহাদেরি গান গা'রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।
('উদ্বোধন', "ক্ষণিকা")

অথবা,

হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি
ছুটিনে কাহারো পিছুতে
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই কিছুতে।
('উদাসীন', "কণিকা")

অথবা,

শপথ করে ছেড়ে দিলাম আজই
যা আছে মোর বুদ্ধি বিবেচনা

বিদ্যা যত ফেল্‌বো ঝেড়ে ঝুড়ে
ছেড়ে ছুড়ে তত্ত্ব আলোচনা !

* * *

ভদ্রলোকের তক্‌মা তাবিজ ছিঁড়ে
উড়িয়ে দেবে মদোন্মত্ত হাওয়া !
শপথ করে বিপথ ব্রত নেব—
মাতাল হ'য়ে পাতাল পানে ধাওয়া ! ('মাতাল,' "ক্ষণিকা")

অথবা,

মনেরে আজ কই, যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে । ('বোঝাপড়া', "ক্ষণিকা")

অথবা,

চাইনেরে মন চাইনে !
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই,
যে হাসি আর যে কথাটাই,
যে কলা আর যে ছলনাই,
তাই নেরে মন তাই নে । ('অচেনা' "ক্ষণিকা"

কিন্তু আর একটু গভীরতর কথা শুনা যাইতেছে,—

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই ।

* * *

ঠাট্টা করে ওড়াই সখি
নিজের কথাটাই ।
হাল্‌কা তুমি কর পাছে
হাল্‌কা করি ভাই
আপন ব্যথাটাই । ('ভীরুতা', "ক্ষণিকা"

অথবা,

বাহিরে থাকে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল ।

গ্রন্থের মাঝামাঝি ও শেষের দিকে চটুল বিলাস ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া যেন মনে হইতেছে। 'কল্যাণী,' 'সমাপ্তি', 'পরামর্শ', 'অন্তরতম', 'আবির্ভাব' প্রভৃতি কবিতায় একটা শান্ত সৌন্দর্য, সমাহিত চৈতন্য সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়িয়াছে। 'পরামর্শ' কবিতায়

অনেকবার ত হাল ভেঙেছে
পাল গিয়াছে ছিঁড়ে
ওরে দুঃসাহসী!
সিন্ধু পানে গেছিস্ ভেসে
অকূল কালো নীরে
ছিন্ন রসারসি।
এখন কি আর আছে সে বল?
বুকের তলা তোর
ভরে উঠছে জলে।
অশ্রু সেঁচে চল্‌বি কত
আপন ভারে ভোর
তলিয়ে যাবে তলে। ('পরামর্শ', "ক্ষণিকা")

কবি নিজেকে নিজে বুঝাইতেছেন, এখন তরী না হয় ঘাটেই বাঁধা থাকুক, কাজ কি দুঃসাহসে ভর করিয়া নূতন পথে যাত্রা? কিন্তু মিথ্যা নিজেকে এই প্রবোধ দেওয়া?

হায়রে মিছে প্রবোধ দেওয়া
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।

* * *

ঘাটে সে কি রইবে বাঁধা
অদৃষ্টে যাহার
আছে নৌকা ডুবি।

সংশয় তাহা হইলে ঘুচিয়া গেল! তরী তো ভাসিল। অন্তরতম জীবন-দেবতার আহ্বানই অমোঘ সত্য হইল। অচঞ্চল গভীর জীবনই দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল; কিছুতেই আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা গেল না, নৈবেদ্য নিবেদনের জন্য কবি প্রস্তুত হইলেন।

আমি যে তোমায় জানি, সে ত কেউ জানে না
তুমি মোর পানে চাও, সে ত কেউ মানে না।

*　　*　　*

তোমার পথ যে তুমি চিনায়েছ
সে-কথা বলিনে কাহারে ;
সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তব দুয়ারে।
স্তব্ধ তোমার উদার আলয়,
বীণাটি বাজাতে মনে করি ভয়,
চেয়ে থাকি শুধু নীরবে ;
চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
ফিরে আসি তব গরবে।

('অন্তরতম', "কণিকা")

'সমাপ্তি' কবিতায় কবি বলিতেছেন,

কখন যে পথ আপনি ফুরাল
সন্ধ্যা হ'ল যে কবে
পিছনে চাহিয়া দেখিনু, কখন
চলিয়া গিয়াছে সবে।

একদিন কবি প্রেম ও সৌন্দর্যের দৃষ্টি দিয়া বিশ্বজীবনকে দেখিয়াছিলেন, সেই 'বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী'র লেখা কি ললাটে অঙ্কিত আছে? যতদিন তিনি পথে পথেই ছিলেন, অনেকের সাথে তাঁহার দেখা হইয়াছে, কিন্তু

সব শেষ হ'ল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।

এইবার তুমি আর আমি একার জীবন আরম্ভ হইল। প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্যমাখা যৌবন বিদায় লইল—হয়ত সে জীবন আবার ফিরিয়া আসিবে, হয়ত আসিবেনা। কবি কি সে কথা নিশ্চয় করিয়া জানিতেন?

(৬)

নৈবেদ্য (১৩০৪ ও ১৩০৭)
স্মরণ (১৩০৯)
শিশু (১৩১০)
উৎসর্গ (১৩০৮ ও ১৩১০)
খেয়া (১৩১২-১৩)

"নৈবেদ্য"-গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি কবিতা ১৩০৪ বঙ্গাব্দে লেখা হয়, এবং পরে ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে নবপর্যায় "বঙ্গদর্শন"এ সেগুলি একত্র প্রকাশিত হয়।* কিন্তু অধিকাংশ কবিতা ১৩০৭ সালে রচিত, এবং এই কবিতাগুলিতেই "নৈবেদ্য"র মূল সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, ১৩০৪ সালে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে দুই তিনটি ছাড়া আর সবগুলিরই উপাদান জোগাইয়াছে কবির দেশাত্মবোধ। "চৈতালি"র (১৩০৩) চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতেই আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন ভারতের সাধনা ও ঐতিহ্যের মধ্যেই কবি মানব-মহিমার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন; দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁহার স্পর্শ-কাতর কবিচিত্তকে আলোড়িত করিয়াছিল। "চৈতালি"র অব্যবহিত পরবর্তী কালেই রচিত "কথা" ও "কাহিনী"-গ্রন্থেও দেখা যায়, আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে মানব-মহত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ধরা দিয়াছে, কবি তাহাদের মধ্যে বিহার করিতেছেন, এবং সেই সব আপাতঃ তুচ্ছ ঘটনা কবির অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। "নৈবেদ্য"র প্রথম পর্বের কবিতাগুলি ঠিক্ এই সময়েই রচিত, কাজেই এই কবিতাগুলিতে কতকটা সেই সুরই ধ্বনিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। তবে "নৈবেদ্য"র এই চতুর্দশপদী কবিতাগুলি ভাব-গভীরতায় আরও পূর্ণতর, আরও দৃঢ় এবং স্পষ্ট, কারণ জীবনের আদর্শই যে ক্রমশঃ দৃঢ়, স্পষ্ট এবং পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। এই পর্বের কবিতাগুলির কয়েকটি খুব উল্লেখ যোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূর্যাস্ত-সন্ধ্যায় দক্ষিণ-আফ্রিকায় ব্রিটিশ-বুয়র যুদ্ধ উপলক্ষে ব্রিটিশ

---

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র জীবনী," ১ম খণ্ড, ৩৫২—৫৩ পৃ।

সাম্রাজ্যবাদের ক্রূর নিষ্ঠুর উন্মত্ততা কবি এবং কবির দেশবাসীর মনে পীড়া ও উত্তেজনার সঞ্চার করিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ কখনও পরজাতি নিপীড়নের অস্ত্র এই সাম্রাজ্যবাদকে ক্ষমার চক্ষে দেখেন নাই, যেখানে যখন মানবাত্মা পীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়াছে কবি বজ্রনির্ঘোষে তখন তাঁহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

"নৈবেদ্য"-গ্রন্থে পর পর তিনটি কবিতায় এই প্রতিবাদ সুস্পষ্ট কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে,

> শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
> অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
> অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
> ভয়ঙ্করী। দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী
> তুলিছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
> গুপ্ত বিষদন্ত তা'র ভরি' তীব্র বিষে।
>
> (৬৩নং, "নৈবেদ্য", বিশ্বভারতী সং)

> এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগ রেখা
> নহে কভু সৌম্য রশ্মি অরুণের লেখা
> তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
> সন্ধ্যার প্রলয় দীপ্তি। চিতার আগুন
> পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
> বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
> মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।
>
> (৬৬ নং, "নৈবেদ্য", বিশ্বভারতী সং)

"নৈবেদ্য"র সব কবিতাই প্রার্থনা। স্বদেশ এবং স্বদেশ-মহিমা সম্বন্ধে প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে কয়েকটি কবিতায়; সব ক'টিই একটা মহান অধ্যাত্ম আদর্শে বাঁধা, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছে বহুকণ্ঠ-গীত বহুজন-বন্দিত এই কবিতাটিতে,—

> চিত্ত যথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
> জ্ঞান যথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
> আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস শর্বরী

বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হ'তে
উচ্ছ্বাসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালি রাশি
বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসি'
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

(৭২ নং, "নৈবেদ্য", বিশ্বভারতী সং)

কোনও রাষ্ট্রীয় অথবা অর্থনৈতিক স্বর্গের প্রার্থনা কবি কোথাও করেন নাই, তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন উন্নত মানব-মহিমার স্বর্গ, সেই স্বর্গ যে-স্বর্গে মানবের চিত্ত ভয়শূন্য, মানুষের শির অনবনত, জ্ঞান যেখানে মুক্ত। আর একটি কবিতায় তিনি প্রার্থনা করিতেছেন,—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্বতুচ্ছ ভয়,—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

(৬৮ নং, "নৈবেদ্য", বিশ্বভারতী সং)

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সাধনা তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনা হইতে পৃথক নয়। আমার মনে হয়, মহাজীবনের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিবার একটা প্রবল আকাঙ্খা যে কবির মনের ভিতর ক্রমশ রূপ গ্রহণ করিতেছিল, সেই আকাঙ্খাই প্রথম স্বদেশ-সাধনার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু যখন সেই খণ্ড সাধনার ক্ষেত্র তাঁহাকে আর শান্তি ও তৃপ্তিদান করিতে পারিল না তখন তিনি এমন একটা জগতে আসিয়া নবজন্ম লাভ করিলেন, দ্বিজত্ব পাইলেন, যে-জগতের প্রান্তসীমায় পৌঁছিবার পূর্বেই পার্থিব জনের নিকট হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ ঘটিল। সেই জগতের-যাত্রা মুহূর্তে "নৈবেদ্য"র দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত (১৩০৭)।

এই দ্বিতীয় পর্বের কবিতাগুলির মধ্যে একটা স্পষ্টতর পূর্ণতর অধ্যাত্ম-জীবনের আকুতি স্বপ্রকাশ; যে-গভীর ধর্মবোধ, ভাগবত-সাধনার প্রেরণা এই কবিতাগুলিতে দেখা যায় তাহা উপনিষদ দ্বারা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধন-জীবন দ্বারা অনুপ্রেরিত। এই "নৈবেদ্য"-গ্রন্থ যে 'পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে' উৎসর্গীকৃত তাহার সার্থকতা ও ঐখানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনা মানুষ ও সংসার-নিরপেক্ষ সাধনা নহে, দেবেন্দ্রনাথেরও তাহা ছিলনা। সেই "কড়ি ও কোমল" হইতে আরম্ভ করিয়া "চৈতালি"ও পরবর্তী কাব্যে যখন মহাজীবন তাঁহাকে ডাক দিয়াছে তখনও মানুষের জয়গানই তিনি গাহিয়াছেন। যে-কবি যৌবনে বলিয়াছিলেন

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই—

অধ্যাত্ম-জীবনের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সেই কবির পক্ষেই বলা সম্ভব হইল,

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। * * *
* * * ইন্দ্রিয়ের দ্বার।
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমারি আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া।
(৩০ নং, "নৈবেদ্য," বিশ্বভারতী সং)।

কতকগুলি প্রার্থনায় উপনিষদের ভাব ও তত্ত্ব কবির ভাষায় নূতন রূপ পাইয়াছে,—

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ, কি আনন্দ বলে
উচ্চারি' উঠিলে উচ্চে,—"শোন বিশ্বজন
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে

মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময় : তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারে, অন্যপথ নাহি।"

* * *

* * * হে মৃত ভারত
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

(৬০ নং, "নৈবেদ্য", বিশ্বভারতী সং)

আমাদের ভারতীয় অধ্যাত্ম-আদর্শ বারবার বলিয়াছে, শাস্ত্রজ্ঞানের মধ্যে, পুঁথির পাতার মধ্যে, আচারের মরুবালিরাশির মধ্যে, ধর্মসংস্কারের মধ্যে ভাগবত-সাধন নাই, ভাগবত-উপলব্ধি নাই। কবিও এই কথা নানান্ কবিতায় নানান্‌ভাবে বলিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ মানবমহিমা, মহাজীবন, পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবোধ, ভাগবতোপলব্ধি। এই পরিপূর্ণ সমগ্রতার আদর্শকে লাভ করিবার জন্যই প্রতিদিন সকল অবস্থার ভিতরে জীবন-স্বামীর সম্মুখে আসিয়া তিনি দাঁড়াইতে চাহিতেছেন,—

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমার সম্মুখে,
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমার সম্মুখে,—

(১নং, "নৈবেদ্য," বিশ্বভারতী সং)

"নৈবেদ্য"-গ্রন্থের প্রথম দিকের সবগুলিই প্রার্থনা-সঙ্গীত। বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, কবির চিত্ত শান্ত অচপল সমাহিত দৃষ্টি লাভ করিয়াছে, লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, নহিলে এমন পূর্ণ প্রার্থনা ধ্বনিত হইতে পারিতনা।—

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ।

(১৩নং, "নৈবেদ্য," বিশ্বভারতী সং)

এই প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলির মধ্যে আত্মসমর্পিত ভক্তের বিচিত্র আকুতি নানা সুরে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ যে করে প্রভু যে তাহার হাতেই তুলিয়া দেন তাঁহার পতাকাটি বহন করিবার ভার।

সমর্পিত জীবনের দায়ীত্বভার যে কত বেশী কবি তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন, এবং সেই জন্য এই আকুল প্রার্থনা তাঁহার মনে জাগে,—

তোমার পতাকা যারে দাও, তা'রে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহিনা মুকতি।
দুঃখ হ'বে মোর মাথার মাণিক
সাথে যদি দাও ভকতি।
(২০নং, "নৈবেদ্য," বিশ্বভারতী সং)

কিন্তু প্রার্থনার এই ভক্তি সমস্ত ভাবমূহুর্ত অধিকার করিয়া নাই; ক্রমশঃ যেন এই ভারবোধ, দায়ীত্ববোধ সহজ হইয়া আসিতেছে—একটা সহজ আনন্দ, পরিপূর্ণ আসঙ্গবোধ ক্রমশঃ যেন চিত্তকে অধিকার করিতেছে, এবং ভাগবতোপলব্ধিও সহজ ও সরল হইয়া আসিতেছে। বিশ্বজীবনের যে অনন্ত কল্লোল এতদিন কবিচিত্তে প্রেরণা জাগাইয়াছে, সেই অনন্ত কল্লোল, অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল সব কিছুই যে দেবতার আসনের চতুর্দিকে এই উপলব্ধি কবিচিত্তে জাগিয়াছে (২৩নং)। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার, মন ও কল্পনার দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া কবি বিশ্বজীবনকে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই না অন্তর্যামী দেবতা তাঁহার চিত্তের মধ্যে আসিয়া আসন বিছাইতে পারিয়াছেন (৩২ ও ৩৩নং), গত জীবনের একটি দিন, একটি বেলাও কবির ব্যর্থ হয় নাই,—

নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে সকল ক্ষণ
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্যামী দেব!
(২৪নং, "নৈবেদ্য," বিশ্বভারতী সং)

সমস্ত বিশ্বজীবনের 'যুগ যুগান্তের বিরাট্ স্পন্দন' কবির নাড়ীতে নাড়ীতে নৃত্য করিতেছে, অনন্ত প্রাণ, আত্মার অপরূপ জ্যোতি ও মহিমা তিনি ক্রমশঃ

উপলব্ধি করিতেছেন (২৬নং), এবং মাঝে মাঝে নিজেই চমকিয়া উঠিতেছেন এই অপরূপ লীলায়,—

দেহে আর মনে প্রাণে হ'য়ে একাকার
এ কী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার ?
এ কি জ্যোতি ? এ কি ব্যোম্-দীপ্ত দীপ জ্বালা
দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা ?
এ কি শ্যাম বসুন্ধরা, সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্বতে কঠিন, তরুপল্লবে কোমল
অরণ্যে আঁধার ? এ কি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ ?
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ !
তোমারি মিলন শয্যা, হে মোর রাজন্
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্র কান্ত ! ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ ?
(২৭নং, "নৈবেদ্য", বিশ্বভারতী সং)

উপলব্ধি যে ক্রমশঃ সহজ ও সরল হইয়া আসিতেছে, কবি নিজেই তাহা স্বীকার করিতেছেন,—

তোমার ভুবন মাঝে ফিরি মুগ্ধ সম
হে বিশ্ব মোহন নাথ !
(৩১নং, "নৈবেদ্য" বিশ্বভারতী সং)

কবিচিত্তও সর্বদা যেন অন্তর্যামী দেবতার দিকেই উন্মুখ হইয়া আছে, এবং থাকিয়া থাকিয়া শত কর্মকোলাহল হাস্য পরিহাসের মধ্যেও মাঝে মাঝে যোগমগ্ন ধ্যানরত হইয়া পড়িতেছে,—

কালি হাস্যে পরিহাসে গানে আলোচনে
অর্দ্ধরাত্রি কেটে গেল বন্ধুজন সনে ,
আনন্দের নিদ্রাহারা শ্রান্তি বহে লয়ে
ফিরি আসিলাম ঘরে নিভৃত আলয়ে

দাঁড়াইনু আঁধার অঙ্গনে! শীত বায়
বুলায় স্নেহের হস্ত তপ্ত ক্লান্ত গায়
মুহূর্তে চঞ্চল রক্তে শান্তি আনি দিয়া।
মুহূর্তেই মৌন হ'ল স্তব্ধ হ'ল হিয়া
নির্বাণ প্রদীপ্ত রিক্ত নাট্যশালা সম।
চাহিয়া দেখিনু ঊর্দ্ধপানে; চিত্ত মম
মুহূর্তেই পার হ'য়ে অসীম রজনী
দাঁড়াল নক্ষত্রলোকে। হেরিনু তখনি—
খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিত মনে
তব স্তব্ধ প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে।

(৩৫নং, "নৈবেদ্য", বিশ্বভারতী সং)

কিন্তু কবির এই যে সমাহিত চিত্ততা ইহার মধ্যে ভাবাবেশের স্থান কোথাও নাই, জ্ঞানহারা ভাবোন্মাদ মত্ততায় যে-ভক্তির প্রকাশ সেই ভক্তি এই যোগী কবি চাহেন না (৪৫নং)। কৈশোরে একদিন বিহ্বল হর্ষে ভাবরস তিনি পান করিয়াছেন, পুষ্পগন্ধে মাখা নানাবর্ণ মধু তাঁহার চিত্তে আনন্দরস জোগাইয়াছে; সেই বিহ্বলতা সেই ভাবাবেশ আজ কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার কোনও দুঃখ নাই—আজ তিনি সত্যের কঠিন নির্মম মূর্তিই দেখিতে চান (৪৬নং), ভাবের ললিত ক্রোড় ছাড়িয়া আঘাত সংঘাত মাঝে আসিয়া দাঁড়াইতে চান (৪৭নং), বীর্যবান্ জ্যোতিমান্ পূর্ণ মনুষ্যত্বই তাহার কাম্য, এবং তাহাই ভগবৎ নির্দেশ। সেইজন্যই তাঁহার প্রার্থনা

এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্বতুচ্ছ ভয়,—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর
দীন প্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি * * *
* * *
এ বৃহৎ লজ্জা রাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি কর দূর।

(৪৮নং, "নৈবেদ্য", বিশ্বভারতী সং)

অথবা,—

হে রাজেন্দ্র, তোমা কাছে নত হ'তে গেলে
যে ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়, সেথা বাহু মেলে
লহ ডাকি সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন
শৈলপথে,—

(৪১নং, "নৈবেদ্য", বিশ্বভারতী সং)

অথবা,—

এ মৃত্যু ছেদিতে হ'বে এই ভয় জাল
এই পুঞ্জ পুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জনা। ওরে জাগিতেই হ'বে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে
এই কর্মধামে।

(৬১নং, "নৈবেদ্য", বিশ্বভারতী সং)।

অথবা,—

* * * ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে, যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য জ্বলি' উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। * * *
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।

(৭০ নং, "নৈবেদ্য" বিশ্বভারতী সং)।

অথবা,—

দুর্দিন ঘনায়ে এল ঘন অন্ধকারে,
হে প্রাণেশ। দিগ্বিদিক্ বৃষ্টিবারি ধারে
ভেসে যায়, কুটিল কটাক্ষে হেসে যায়
নিষ্ঠুর বিদ্যুৎ শিখা,—উচ্চরোল বায়
তুলিল উতলা করি' অরণ্য কানন।
* * * দুঃখের বেষ্টনে
দুর্দিন রচিল আজি নিবিড় নির্জন,
হোক আজি তোমা সাথে একান্ত মিলন।

(৮৫ নং, "নৈবেদ্য", বিশ্বভারতী সং)।

অথবা,—

> তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
> সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
> দৃঢ় বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
> প্রভু মোর। বীর্য দেহ সুখের সহিতে,
> সুখেরে কঠিন করি'; বীর্য দেহ দুখে,
> যাহে দুখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
> পারে উপেক্ষিতে; ভকতিরে বীর্য দেহ
> কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
> পুণ্যে ওঠে ফুটি'; বীর্য দেহ ক্ষুদ্র জনে
> না করিতে হীনজ্ঞান,—বলের চরণে
> না লুটিতে; বীর্য দেহ, চিত্তেরে একাকী
> প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি'।
> বীর্য দেহ তোমার চরণে পাতি' শির
> অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।

(৯৯ নং, "নৈবেদ্য", বিশ্বভারতী সং)।

ইহাই জাগ্রত বলিষ্ঠ সত্যসন্ধানী জীবনের প্রার্থনা। ভক্তিতে সমস্ত দেহ মন আনত হইয়া পড়িয়াছে অন্তর্যামীর চরণে, কিন্তু এ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মনিরপেক্ষ নয়, এ ভক্তি ভাবোন্মাদ মত্ততা নয়, রসাবেশ নয়, এ ভক্তির অন্তরে রহিয়াছে বীর্য ও জ্যোতি। এই যে একটি মুক্ত বলিষ্ঠ জাগ্রত 'অমত্ত গম্ভীর সত্য-সন্ধানী' আত্মার সৃষ্টি আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম "নৈবেদ্য"র কবিতাগুলিতে, এইখানেই এই কাব্যটির সার্থকতা। মনুষ্যত্বের একটি পরিপূর্ণ আদর্শ এই কবিতাগুলির মধ্যে অপূর্ব বলিষ্ঠ ভাষা ও ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিল। কবির এক নূতন পরিচয় আমরা পাইলাম। "কথা" বা "কাহিনী" গ্রন্থে বা অন্যান্য কবিতায় পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে-আদর্শ যে-সাধনা তিনি ইতস্ততঃ সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সে-আদর্শকে সে-সাধনাকে তিনি যে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিলেন তাহার প্রমাণ "নৈবেদ্য"র এই পর্যায়ের কবিতাগুলি। রবীন্দ্র-কাব্যে যাহারা বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার প্রভাব দেখিতে পান তাহারা যদি "নৈবেদ্য"-গ্রন্থের ভক্তি-সাধনার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন তাহা হইলে তাহাদের মতামত সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। যে-ভক্তি বীর্যে পরিপূর্ণ, মানব-মহত্ত্বের আদর্শে জ্যোতিষ্মান্, জ্ঞানের আলোয় ভাস্বর, কর্মের

প্রেরণায় বলিষ্ঠ, আমাদের ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যে সেই ভক্তিবাদের বন্দনা করা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথও সেই মার্গের সাধনা করিয়াছেন, পরবর্তী বৈষ্ণব মার্গের সাধনা নয়; অন্ততঃ "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে তাহার পরিচয় নাই। যে-জীবন তিনি কামনা করিতেছেন তাহা এই সময়কার একটি কবিতায় অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে; তাঁহার এই সময়কার প্রার্থনা,—

যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দৃপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব!
মৃত্যু বরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।

('নববর্ষের গান', "বঙ্গদর্শন", জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯)

১৩০৯, ৭ অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর মৃত্যু হয়; কবির তখন বয়স একচল্লিশ। কবির স্পর্শ-কাতর চিত্তে স্ত্রীর মৃত্যু নিশ্চয়ই খুব গভীর হইয়া বাজিয়াছিল, কিন্তু সুবিস্তৃত রবীন্দ্র-সাহিত্যে এক "স্মরণ" গ্রন্থের কবিতাগুলি ছাড়া আর কোথাও স্ত্রী-সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই, একান্ত নিবিড় ব্যক্তিগত বিরহজনিত দুঃখ এই কবিতাগুলি ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না, জীবনেও আর কোথাও কোনও প্রকাশ নাই। রবীন্দ্র-প্রকৃতি যাহারা জানেন, তাহারা এ-কথা সাক্ষ্য দিবেন যে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। যে-শোক, যে-দুঃখ একান্ত ব্যক্তিগত, intensely personal, তাহা চিরকাল তাঁহার অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেই তিনি অভ্যস্ত; যেখানে যতটুকু ব্যক্তিগত শোক দুঃখ ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ততটুকুর প্রকাশই কবির রচিত সাহিত্যে ও জীবনের বাহিরের অভিব্যক্তিতে ধরা পড়ে, তার বেশী নয়, এবং সেখানে ব্যক্তিগত শোক দুঃখ সহজে ধরা পড়িতে চায়না, এবং ধরা পড়িলেও তাহার গভীরতা পরিমাপ করা যায় না। *

* "রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি যে আঘাত পাইয়াছিলেন তাহার একমাত্র প্রকাশ কবিতায়। তাঁহার সুবিস্তৃত সাহিত্যে স্ত্রীর সম্বন্ধে কোথাও উল্লেখ নাই, কোনো গ্রন্থ তাঁহাকে

"স্মরণ"-গ্রন্থের কবিতাগুলি অত্যন্ত শান্ত, সংযত ও সংক্ষিপ্ত, শোকের উচ্ছ্বাস কোথাও নাই, প্রেমের উদ্‌ভ্রান্ততার পরিচয় কোথাও নাই। তাহার কারণ বুঝিতে পারা একটুও কঠিন নয়, যদি একথা মনে রাখা যায় কবি ইতিমধ্যে "নৈবেদ্য"র সাধনার মধ্যে বহুদিন কাটাইয়া আসিয়াছেন, একটা শান্ত সংযম তাঁহার সমগ্র জীবনকে অধিকার করিয়াছে। সমস্ত কবিতাগুলি মিলিয়া যেন একটি পূর্ণ অশ্রুবিন্দু নয়নকোনে টলমল করিতেছে—শোকের দুঃসহ আবেগেও বদন প্রশান্ত, অমত্ত, গম্ভীর।

মৃত্যু যে আসিতেছে তাহার আভাস যেন কবি পূর্বাহ্নেই পাইয়াছিলেন। "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে

পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে,
তব আহ্বান করি সে বহন
পার হয়ে এল পারে।

(১৮নং, "নৈবেদ্য", বিশ্বভারতী সং)

অথবা,—

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর ; আজি তা'র তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে
সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি'
জীবন আঁকাড় ধরি আপনার বলি
দুই ভুজে।

(৯০ নং, নৈবেদ্য", বিশ্বভারতী সং)

উৎসর্গ করেন নাই, কিন্তু স্মরণের কবিতাগুলি তাঁহাদের প্রেমকে অমরত্ব দান করিয়াছে। * * * রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিয়োগে যে কাতরতা অনুভব করিলেন, তাহা জীবনের আর কোথাও প্রকাশ করেন নাই—একবার মাত্র কেবল কাব্যের মধ্যেই তাঁহার অনুভবগুলিকে অমর করিলেন। তিনি কখনো নিজের দুঃখ শোক কাহারও কাছে প্রকাশ করেন না; অতি-বেদনার সময়ে তাঁহাকে কর্মে রত দেখিয়াছি ; তাঁহার বেদনাকে তিনি অন্যের কাছে বিন্দু-মাত্র প্রকাশ করিয়া বেদনার গুরুত্বকে হ্রাস করিতে চান না। শোকের বেদনাকে বহন করিয়াও তৃপ্তি আছে। * * * কবিতাগুলি ব্যক্তিগত হইলেও তাহার মধ্যে বিশ্বের বিচ্ছেদ বেদনা এমন ভাবে ফুটিয়াছে যে, যে বিরহী সেই কেবল ইহা অনুভব করিবে তাহা নহে, যে সুখী সেও অকারণ অশ্রু ফেলিবে। * * *

*(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী," ১ম খণ্ড, ৩২৪-২৫ পৃ)

অথবা,—

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও
ওগো একি প্রণয়েরি ধরণ !

("বঙ্গদর্শন", ১৩০৯, ভাদ্র, ২৫৫ পৃ, ৪৮ নং, "উৎসর্গ")

এই সব কবিতা পড়িলে এই কথাই মনে হয়, মৃত্যুর পূর্বাভাস তিনি পাইয়াছিলেন, এবং ধীরে ধীরে তাহার জন্য প্রস্তুতও হইতেছিলেন। তারপর যখন মৃত্যু-জনিত বিচ্ছেদ পূর্ণ হইয়া গেল, তখন মরণের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া প্রেম এক নূতন-রূপ পরিগ্রহ করিল,—

মৃত্যুর নেপথ্য হ'তে আরবার এলে তুমি ফিরে
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ মন্দিরে
নিঃশব্দ চরণ পাতে! ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণ স্নানে। * * *
* * * মরণের সিংহদ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া।

(১১নং "স্মরণ", ই. পা. হা. সং)

জীবনও মরণ একই সঙ্গে প্রেম-বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গেল, মৃত্যুর মাধুরী জীবনের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া গেল,—

তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।
চির বিদায়ের আভা দিয়া
রাঙায়ে গিয়াছ মোর হিয়া,
এঁকে গেছ সব ভাবনায় সূর্যাস্তের বরণ চাতুরী।
জীবনের দিক্ চক্র সীমা
লভিয়াছে অপূর্ব মহিমা
অশ্রুধৌত হৃদয় আকাশে দেখা যায় দূর স্বর্গ পুরী।

(১৩নং, "স্মরণ," ই. পা. হা. সং)

রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর মৃত্যুকালে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বয়স দশ ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের বয়স আট। এই মাতৃহীন শিশু সন্তান দু'টি এখন একান্ত ভাবেই পিতার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল; পিতার কাছে পিতা এবং মাতা

দুজনারই স্নেহলাভ করিতে আরম্ভ করিল। শোক-অশ্রু-ধৌত জীবনে ইহারাই তখন পরম সান্ত্বনা, ইহাদের অবলম্বন করিয়াই তখনকার দিনগুলি কাটিতেছে। বিচ্ছেদের পর পরম শান্তির মধ্যে মধুর বাৎসল্যরস ইহাদের ঘিরিয়া অপরূপ রূপ লাভ করিল। এইখানেই "শিশু"-গ্রন্থের সৃষ্টি ; কিন্তু কেবল মধুর বাৎসল্যরসই "শিশু"র শেষ কথা নয়, ইহার সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে এক অপূর্ব রহস্য-রস। শিশুকে তিনি দেখিতেছেন বিশ্বজীবনের একটি খণ্ড অংশ রূপে, ভাগবত-দীপ্তির একটি পরম প্রকাশ দেখিতেছেন তিনি শিশুর মধ্যে। "শিশু"র কবিতা শিশুর মুখের কথা নয়, শিশুমনের কথাও নয়, শিশুকে আশ্রয় করিয়া বাৎসল্যরস রহস্যরস যাহার মধ্যে মূর্তি লইয়াছে তাহার মুখের কথা, মনের কথা ; শিশুর যাহা সহজ খেয়াল মাত্র সেইখানে জাগিয়াছে কবির মনে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা, তাহার মূলে তিনি দেখিয়াছেন পরম রহস্য ; কোনও কোনও কবিতায় ব্যথার আভাসও সুস্পষ্ট। এই জন্যই শিশুচিত্তের পরিচয় হিসাবে নয়, নিছক কাব্য হিসাবে "শিশু" বাঙ্‌লা সাহিত্যের চির সম্পদ, অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়। মধুর বাৎসল্যরসের পরিচয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে অপ্রতুল নয়, কিন্তু সে রসের সঙ্গে কোনও রহস্যের পরিণয় হয় নাই, কোনও জিজ্ঞাসার আভাস সেখানে নাই, কিংবা এমন কাব্যরূপের পরিচয়ও তাহাতে নাই।

"উৎসর্গ"-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালে, কিন্তু ইহার অধিকাংশ কবিতাই রচিত হইয়াছিল ১৩০৮ ও ১৩১০ সালে, যখন মোহিতবাবু "কাব্যগ্রন্থ" সম্পাদনে নিয়োজিত ছিলেন ; কবিতাগুলির মধ্যে কোনও ভাবের যোগাযোগ বিশেষ নাই, থাকিবার কথাও নয়! তাহার কারণ, "উৎসর্গে"র অধিকাংশ কবিতা রচিত হইয়াছিল মোহিতবাবু সম্পাদিত "কাব্যগ্রন্থে"র এক একটি গুচ্ছের এক একটি ভূমিকারূপে। সমস্ত গ্রন্থটির একটা সমগ্রতা না থাকিলেও ইহার মধ্যে এমনি কয়েকটি কবিতা আছে, যাহা শুধু কাব্য হিসাবে মূল্যবান্ নয়, রবীন্দ্র-কবিজীবনের মর্মবাণীও তাহাদের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।*

---

* মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় রবীন্দ্রনাথের যে "কাব্যগ্রন্থ" সম্পাদন করেন তাহাতে কবির কবিতাগুলি ভাবানুযায়ী গুচ্ছবদ্ধ করিয়া সাজান হইয়াছিল, এবং এক একটি গুচ্ছের এক একটি নামকরণ করা হইয়াছিল।

"রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি কবিতা গুচ্ছের একটি করিয়া ভূমিকা কবিতায় লিখিয়া দেন ; সেই

"খেয়া"-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে; কবিতাগুলি লেখা আরম্ভ হইয়াছিল ১৩১২ সালের আষাঢ় মাস হইতেই। ১৩১০ সালেই "শিশু" ও "উৎসর্গ" গ্রন্থের কবিতাগুলি লেখা সব শেষ হইয়া যায়; মাঝখানে বৎসরাধিক কাল কবিজীবন অপেক্ষাকৃত স্তব্ধ। এই স্তব্ধতা বহির্জগতে এক কাল বৈশাখীর পূর্বাভাস, অন্তর জগতে এক নূতন জীবন যাত্রা-সূচনার পূর্ব মুহূর্ত। কবি যে লিখিয়াছেন,

বাহির হইতে দেখোনা এমন করে'
দেখোনা আমায় বাহিরে!
আমায় পাবেনা আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজোনা আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবেনা আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে!
*　　　*　　　*
কবিরে পাবেনা তাহার জীবন চরিতে।

(২১নং, "উৎসর্গ", ই, প্রেস, শোভন সং কাব্যগ্রন্থ)

কবিতাটি গ্রন্থমধ্যস্থিত কবিতাগুলির অর্থ ব্যক্ত করিয়াছে। যেমন 'যাত্রা' শ্রেণীর কবিতার প্রারম্ভে আছে—

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
বাহির হ'নু তিমির রাতে,
তরণী খানি বাহিয়া।

"হৃদয়ারণ্য নামে কবিতাগুলির অধিকাংশই 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র—ইহার ভূমিকায় আছে, 'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে'। * * * 'হৃদয়ারণ্য' হইতে বাহির হইয়া যেখানে কবি আসিলেন—সেখানকার কবিতাগুলির নাম 'নিষ্ক্রমণ'; হৃদয়ারণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কবি 'বিশ্বের' মধ্যে আসিলেন। ইহার ভূমিকায় আছে 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'। এইরূপে প্রত্যেকটি শ্রেণীর মুখবন্ধ স্বরূপ একটি কবিতা আছে। এই কবিতাগুলি 'উৎসর্গ' নামে ১৩২১ সালে প্রকাশিত হয়; কিন্তু ইহার অধিকাংশ কবিতাই রচিত হইয়াছিল ১০০৮ ও ১৩১০ সালে। ১৩০৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসে যে গুলি রচিত হয়, সেগুলি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'স্মরণ' নামে প্রথম সন্নিবেশিত হয়।

"'শিশু' গ্রন্থখান সম্পূর্ণ নূতন। আলমোড়া বাসকালে ইহার অনেকগুলি রচিত; রবীন্দ্রনাথ সেখান হইতে লিখিয়া মোহিত বাবুকে কবিতাগুলি পাঠাইতেন। মোহিত বাবু এই 'শিশু' কবিতা ও 'সোনার-তরী' প্রভৃতি হইতে শিশুর উপযুক্ত কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া 'শিশু' কাব্যখণ্ড প্রণয়ন করেন। ১৩১০ সালের আশ্বিন মাসে 'শিশু' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।"

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রজীবনী," ১ম খণ্ড, ৩০৩ পৃ)।

এ-কথা "খেয়া"র কবিজীবন সম্বন্ধে যতখানি সত্য, রবীন্দ্র-কবিজীবনের আর কোনও পর্ব সম্বন্ধেই তত সত্য নয়। "খেয়া"-গ্রন্থ রচনার সময়ে কবির বাহিরের জীবন সম্বন্ধে যত তথ্যই জানা থাকুনা কেন, কোন তথ্য অথবা তত্ত্বের মধ্যেই "খেয়া"র মর্মকথাটি ধরা পড়িবেনা, "খেয়া"-র কবিকে তদানীন্তন জীবন-চরিতের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। অথচ সে জীবন-চরিতটুকু না জানিলে কবির জীবন যে আবার কত রহস্যময়, কত গভীর, কত বিপরিতমুখীন্ তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকের শেষাশেষি বাঙ্‌লা দেশে একটা নবজীবনের সাড়া জাগিতেছিল; বাঙালী জীবনে শতাব্দী ধরিয়া যে গ্লানি ও অপমান, যে দুঃসহ বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল তাহা একদিন বঙ্গচ্ছেদের নির্মম আদেশকে উপলক্ষ্য করিয়া দেশের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল; এক মুহূর্তে দেশের মূর্তি বদলাইয়া গেল। শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, সর্ববিষয়ে যেন দেশ সচেতন হইয়া উঠিল, একটা প্রবল ভাবোন্মাদনায় দেশ মাতিয়া উঠিল, এবং সে উন্মাদনা ভাষা পাইল রবীন্দ্রনাথের গানে, বক্তৃতায়। বাঙ্‌লা দেশের সেই কয়েক বৎসরের (১৩১১--১৩১২) ইতিহাস যাহারা জানেন, তাহারাই একথা বলিবেন, রবীন্দ্রনাথই ছিলেন সেই স্বদেশী-যজ্ঞের প্রধান উদ্গাতা। যে সমস্ত গানকে আশ্রয় করিয়া বাঙালীর মর্মবাণী সেদিন ভাষা পাইয়াছিল, সে সব গান প্রায় সমস্তই রবীন্দ্রনাথের রচনা, এবং এই সময়কার রচনা। 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে', 'যদি তোর ডাক্ শুনে' কেউ না আসে, 'বাঙলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি,' 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বোনা', 'বাংলার মাটি, বাংলার জল', 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হ'বে', 'বিধির বিধান কাটবে তুমি', ইত্যাদি সমস্ত গানই ১৩১১-১৩১২ বঙ্গাব্দে রচনা। কিন্তু শুধু গান লিখিয়াই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নাই। এই দুই তিন বৎসর সমানে চলিয়াছে প্রবন্ধ ও বক্তৃতা, এবং তাহাদের বিষয় আমাদের শিক্ষা, আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম, আমাদের রাষ্ট্রজীবন, আমাদের জীবনাদর্শ। এই সময়ই শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয় ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছে, 'স্বদেশী সমাজে'র পরিকল্পনাও এই সময়ে। অর্থাৎ আমাদের দেশাত্মবোধ স্বাজাত্যবোধ জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি একেবারে তাহার মর্মস্থলে প্রবেশ করিবার, ভারতীয় ইতিহাস ও সাধনার ধারা ও অর্থটিকে

বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকেও তাহা বুঝাইলেন। 'স্বদেশী সমাজ', 'ছাত্রগণের প্রতি সম্ভাষণ', 'সফলতার সদুপায়', 'অত্যুক্তি' 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'ঘুষাঘুষি', 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত', 'নববর্ষ', 'ব্রাহ্মণ', 'চীনাম্যানের চিঠি', 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য', 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি', 'রাজকুটুম্ব', 'দেশীয় রাজ্য', 'বিজয়া সম্মিলন', 'বিলাসের ফাঁস', 'রাজভক্তি', 'রাজনিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন', 'শিক্ষা সমস্যা', 'আবরণ', 'জাতীয় শিক্ষা', 'ততঃ কিম্', 'পথ ও পাথেয়', প্রভৃতি সুবিখ্যাত প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও আলোচনা গুলিও এই সময়েরই (১৩০৯—১৩১৪) রচনা। কিন্তু গান, বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও ও আলোচনাতেই তাহার স্বদেশ-কর্মৈষণা শেষ হইয়া যায় নাই। সভায় সভাপতিত্ব অথবা প্রধান বক্তার কাজ, রাজপথে গণ-যাত্রায় পুরোধা হইয়া যোগদান, রাখিবন্ধন দিবসের নায়কত্ব সব কিছুর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথকে। সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সমস্যা এবং ঘটনাও তাঁহার কবিচিত্তকে যে প্রবলভাবে আন্দোলিত করিতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় "বঙ্গদর্শন" ও "ভাণ্ডারে"র সাময়িক প্রসঙ্গের বিচিত্র মন্তব্যগুলির মধ্যে। বস্তুত, বাহিরের কর্মপ্রবাহের মধ্যে পূর্বজীবনে অথবা উত্তরজীবনে রবীন্দ্রনাথ আর কখনও নিজকে এমনভাবে জড়িত করেন নাই।

বাহিরের জীবনে যখন এইরূপ উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা, বিচিত্র কর্মপ্রবাহ চলিতেছে ঠিক তখন ঘরের জীবনে মৃত্যু আসিয়া একে একে তাঁহার একান্ত আপনার জনদের ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে গেলেন স্ত্রী, ১৩১০ সালে গেল প্রিয়তমা কন্যা রেণুকা, ১৩১১ সালে গেলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩১৪ সালে গেল কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথ। অথচ এই যে একের পর এক মর্মান্তিক বিচ্ছেদ বাহিরে জীবনে ইহার কোনও পরিচয় নাই, বাহিরের কর্মপ্রবাহ যথারীতি চলিতেছে। কিন্তু অন্তর-জীবনেও কি ইহার পরিচয় নাই? সেখানে কি এইসব মর্মান্তিক বিচ্ছেদ কোথাও তাহাদের পদচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই—a deep grief hath humanised his soul, ইহার পরিচয় কি অন্তর-জীবনে নাই? কাব্যে অথবা কর্মে অথবা তাঁহার এই সময়কার বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে এই সব deep griefর পরিচয় কোথাও নাই, একথা সত্য, কিন্তু অন্তর-জীবনে যে একটা আমূল আবর্তন চলিতেছে তাহার আভাস "খেয়া"-গ্রন্থে এবং পরবর্তী কয়েকটি

কাব্যগ্রন্থে সুস্পষ্ট। "নৈবেদ্য"-নিবেদন ত আগেই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যাঁহার চরণে এই নৈবেদ্য নিবেদিত হইয়াছে তাঁহাকে আরও নিবিড় করিয়া পাইবার আকুল আগ্রহ ক্রমশঃ সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিতেছে। সেই তিনি এখনও রহস্যের আবরণে আবৃত, এখনও তাঁহার উপলব্ধি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, রহস্যের ভিতর দিয়াই, অস্পষ্টতার ভিতর দিয়াই এখনও তাঁহার আনাগোনা চলিতেছে, দেবতা আসিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে, এখনও আসিয়া পড়েন নাই। একের পর এক মৃত্যু হয়ত সেই আগমনকে নিকটতর করিতেছে। মৃত্যুও রহস্যময়, আর দেবতার আনাগোনাও রহস্যময়, দুইই বোধ ও বুদ্ধিগোচর হয় কেবল রূপকের মধ্য দিয়া। সেই জন্যই "খেয়া"র অধিকাংশ কবিতাই রূপকের ভিতর দিয়া এক অনির্বচনীয় রহস্যের অভিব্যক্তি। "খেয়া"র কবিতা সেই জন্যই সর্বত্র ততটা অর্থগ্রাহ্য নয় যতটা বোধগ্রাহ্য, অনুভূতিগ্রাহ্য; রূপক এবং রহস্যের বাক্যার্থ কতটুকু, মর্মার্থই তাহার সবখানি, এবং সেই মর্মার্থ ধরা পড়ে শুধু ভাবব্যঞ্জনার মধ্যে।

"নৈবেদ্য"-গ্রন্থের গান ও কবিতাগুলিতে বিশেষভাবে দুইটি ভাবতরঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি কবিতায় আমরা দেখিয়াছি কবি মানব-মহত্ত্বের এবং পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বাদর্শের বন্দনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার মাতৃভূমিকে সেই স্বর্গে উন্নীত করিতে চাহিতেছেন 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির', জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেখানে মানব-জীবন শতধা খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্রীকৃত নয় তাঁহার এই আদর্শ কর্মরূপ লাভ করিল বাঙ্‌লার স্বদেশী-যজ্ঞকে উপলক্ষ্য করিয়া; রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা সেইজন্য শুধু patriotism নয়, সঙ্কীর্ণ nationalism নয়। তাঁহার সমসাময়িক গানে প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, আলোচনায় স্বাদেশিকতার যে-রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শের, চিরন্তন মানব-মহিমার। কিন্তু "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে আর একটি ধারাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার। কতগুলি কবিতায় অন্তর-জীবনে ভাগবতোপলব্ধির একটা আকুলতা অত্যন্ত স্পষ্ট। ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাগবত-সাধনাও যে কবিচিত্তকে একান্তভাবে নিজের গভীরতার মধ্যে টানিয়া লইতেছে, "নৈবেদ্য"র অধিকাংশ কবিতায় তাহা গভীর ভাবে ধরা পড়িয়াছে;

অন্তর-জীবনের এই ফল্গুধারার পরিচয় স্বদেশী-যজ্ঞের বিচিত্র কর্মপ্রবাহের মধ্যে কোথাও ধরা পড়ে না, পড়িবার সুযোগ ও নাই।

কিন্তু কর্মপ্রবাহের বিচিত্র উত্তেজনার মরুভূমির মধ্যে এই ধারা হারাইয়া গিয়াছিল, একথা মনে করিবারও কোন কারণ নাই।

বাহিরের জীবনে তিনি অসংখ্য মানুষের মধ্যে একজন মাত্র, সেখানে বিচিত্র কোলাহলের মধ্যে সকলের সঙ্গে তিনি সমসুখদুঃখভাগী, তাহাদের সকলের সঙ্গে নিজেকে তিনি জড়াইয়াছেন। কিন্তু আন্তরজীবনে তিনি একা, সেখানে তাঁহার সঙ্গী কেহ নাই, থাকার প্রয়োজনও নাই—সেখানে একা একা প্রতিদিন তিনি অন্তর-দেবতার সম্মুখীন্ হইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বোঝাপড়া চলিতেছে। বাহিরের জীবনে যখন তিনি বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল, কর্মনিরত, ঠিক সেই সময় আন্তরজীবনে তিনি শান্ত, স্থির, অচঞ্চল, মধুর। "খেয়া"য় সেই আন্তর-জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, ঠিক যেমন বহির্জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার এই সময়ের প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, আলোচনায়। যে আত্মগত অনুভূতির প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে, তাহাই একান্ত হইয়া, যথার্থ কাব্যরূপ লইয়া প্রকাশ পাইল "খেয়া"য়। "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে প্রার্থনা আছে, উপদেশ আছে, ব্যাখ্যান আছে; কিন্তু "খেয়া"য় আছে যথার্থ কবিতা; রূপে রূপকে রসে রহস্যে গীতিমাধুর্যে "খেয়া" অপূর্ব কাব্য। আধ্যাত্মিক আকুতি "নৈবেদ্য"-গ্রন্থেও আছে, কিন্তু রূপক, রহস্য ও গীতিমাধুর্য এই আকুতিকে "খেয়া"য় যে কাব্যমূল্য দান করিয়াছে, তাহার তুলনা "নৈবেদ্য" গ্রন্থে নাই, "গীতাঞ্জলী-গীতিমাল্যে"ও নাই। নিসর্গ-চৈতন্য, আধ্যাত্মিক আকুতি এবং মিষ্টিক অনুভূতির এই মিলন, ইহাও আরম্ভ হইল এই "খেয়া"-গ্রন্থ হইতে।

"খেয়া"র প্রায় প্রত্যেক কবিতাই একটু বিষাদ হতাশে ভারাক্রান্ত। এ-বিষাদ ব্যর্থতা-জনিত নয়, এ-হতাশা বঞ্চনা-জনিত নয়। কবি ভাবিতেছেন, এই যে কর্মজীবনের চঞ্চলতা, এই যে বিক্ষোভ, উন্মাদনা, এই যে আবর্ত, জীবনের লক্ষ্য তো ইহার মধ্যে নাই, তৃপ্তিও নাই; জীবন ত আজিও ফুলে ফসলে ভরিয়া উঠিলনা, অথচ এদিকে দিনের আলো ত ফুরাইয়া আসিল! এই প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্যময় জীবন, এই কর্মময় জীবনের তট হইতে খেয়া পার হইয়া অধ্যাত্মজীবনের তটে না পৌছিলে ত জীবনে তৃপ্তি নাই, জীবনের লক্ষ্যকে ত পাওয়া যাইবে না; ঘাটের কিনারায় আসিয়া বসিয়াছেন অথচ

ওপারে লইয়া যাইবার খেয়া ত এখনও এ জীবনের তটে আসিয়া ভিড়িতেছেনা ; "খেয়া"র কবিতায় যে বিষাদ ও হতাশ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহা এই অনুভবের জন্যই। প্রথম কবিতায়ই কবি বলিতেছেন,—

ঘরেই যারা যাবার তা'রা কখন গেছে ঘর পানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে ;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে !
ফুলের বাহার নাইক যাহার ফসল যাহার ফল্‌ল না,
অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো সাঁজের আলো জ্বল্‌লনা
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়
ওরে আয় !
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনের শেষের শেষ খেয়ায় !

('শেষ খেয়া', "খেয়া")

'শুভক্ষণ' কবিতায়

রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে
সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বল কি মতে ?

* * *

রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখ পথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বল কি মতে ?

('শুভক্ষণ', "খেয়া")

অথবা, 'আগমন' কবিতায়

ওরে দুয়ার খুলে দে রে—
বাজা শঙ্খ বাজা !
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা !

বজ্র ডাকে শূন্য তলে
বিদ্যুতেরি ঝলক ঝলে
ছিন্ন নয়ন টেনে এনে
অভিনব তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলে
দুঃখ রাতের রাজা।
('আগমন', "খেয়া")

অথবা,

ওগো, নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি
কখন্ যে গেছ বিহানে
তাহা কে জানে!
আমি চরণ শব্দ পাইনি শুনিতে
ছিলেম কিসের খেয়ালে
তাহা কে জানে!

* * *

রুদ্ধ দুয়ার ঘরে কতবার
খুঁজেছিল মন পথ পালাবার
এবার তোমার আশা পথ চাহি
বসে রব খোলা দুয়ারে,—
তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়া
ধরিয়া রাখিব আমারে।
হে মোর পরাণ বঁধু হে
কখন যে তুমি দিয়ে চলে যাও
পরাণে পরশ মধু হে।
('মুক্তিপাশ', "খেয়া")

অথবা

হের হের মোর আকুল অশ্রু—
সলিল মাঝে
আজি এ অমল কমল কান্তি
কেমনে রাজে!

* * *

আজি একা ব'সে ভাবিতেছি মনে
ইহারে দেখি
দুখ-যামিনীর বুক চেরা ধন
হেরিনু একি!
ইহারি লাগিয়া হৃদ্ বিদারণ
এত ক্রন্দন এত জাগরণ
ছুটেছিল ঝড় ইহারি বেদন
বক্ষে লেখি!
দুখ যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু একি!
('প্রভাতে', "খেয়া")।

প্রভৃতি কবিতায় পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে, খেয়া পার হইবার জন্য কবিচিত্ত উন্মুখ-প্রতীক্ষায় দিন গুণিতেছে। প্রায় সমস্ত কবিতাই এই প্রতীক্ষার সুরে গাঁথা। 'গোধূলি লগ্ন', 'নিরুদ্যম', 'জাগরণ' 'মিলন' 'পথের শেষ', 'দিনশেষ', 'সমাপ্তি', 'প্রতীক্ষা', 'অনুমান', 'খেয়া' প্রভৃতি কবিতায় এই প্রতীক্ষার আভাস সুস্পষ্ট; কবিচিত্ত অধ্যাত্ম-জীবনকে গ্রহণ করিবার জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। বাহিরের কর্মকোলাহল, বিচিত্র উন্মাদনা ও উত্তেজনা তাহার কাছে বোঝা বলিয়া মনে হইতেছে, নিজকে নিজে আপন-গড়া কর্মশালায় বন্দী বলিয়া মনে করিতেছেন,—

ভেবেছিলেম আমার প্রতাপ
করবে জগৎ গ্রাস,
আমি র'ব একলা স্বাধীন
সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনী দিন
লোহার শিকল খানা—
কত আগুন কত আঘাত
নাইক তা'র ঠিকানা।

গড়া যখন শেষ হয়েছে
কঠিন সুকঠোর,
দেখি আমায় বন্দী করে
আমারি এই ডোর ।
('বন্দী', "খেয়া")

অথবা

যেখানে যা-কিছু পেয়েছি., কেবলি
সকলি করেছি জমা.—
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব,
কেহ নাহি করে ক্ষমা
এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু
নামাও ।
ভাবের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে
এ যাত্রা মোর থামাও ।
('ভার', "খেয়া")

'বিদায়' কবিতায় কবি স্পষ্টই বলিতেছেন,

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই ।
কাজের পথে আমি তো আর নাই ।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে,
জয়মাল্য লওনা তুলি' গলে
আমি এখন বনচ্ছায়া তলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিওনা ভাই ।

* * *

তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সে-সব মিছে হয়েছে মোর কাছে ।
রত্ন খোঁজা রাজ্য ভাঙা গড়া
মতের লাগি দেশ বিদেশে লড়া
আলবালে জল সেচন করা
উচ্চ শাখা স্বর্ণ চাঁপার গাছে ।
পারিনে আর চলতে সবার পাছে ।
('বিদায়', "খেয়া")

'পথের শেষ' কবিতায়ও কবি বলিতেছেন, একদিন পথের নেশায় তাহাকে পাইয়াছিল, পথ তাঁহাকে ডাক দিয়াছিল, 'নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ' তাঁহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া ছিল। কিন্তু,

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটু পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়া তরী ভাসা
জেনেছি আজ চলেছি কা'র লাগি,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
('পথের শেষ', "খেয়া")।

কবি এখন অনন্যচিত্ত, তাঁহার অন্তর-আঁখির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে 'সব পেয়েছি'র দেশের কল্পনা, যে-দেশে

নাইক পথে ঠেলাঠেলি
নাইক ঘাটে গোল,
ওরে কবি এইখানে তোর
কুটির খানি তোল্।
ধুয়ে ফেলরে পথের ধুলো,
নামিয়ে দে রে বোঝা,
বেঁধে নে তোর সেতার খানা
রেখে দে তোর পোঁজা
পা ছড়িয়ে বসরে হেথায়
সারাদিনের শেষে,
তারায়-ভরা আকাশ তলে
সব-পেয়েছির দেশে।
('সব-পেয়েছির দেশ', "খেয়া")।

(৭)

গীতাঞ্জলি (১৩১৩—১৩১৭)
গীতিমাল্য (১৩১৫-১৬ ; ১৩১৮-২১)
গীতালি (১৩২১)

"খেয়া"তে কবির এক নবজন্মলাভের সূচনা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু শুধু ভাবের জগতেই কবি নবজন্মলাভ করিলেন, এমন নয়, রূপের জগতেও কবির নবজন্মলাভ ঘটিল। ছন্দের সচল অথচ সংযত গতিবেগ, শান্ত গভীর গাম্ভীর্য অন্তর্হিত হইয়া ভাব এখন গানের সুরে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। গানের সুর যেখানে ভাবের বাহন সেখানে কথার লীলার স্থান অত্যন্ত কম, দু'টি একটি কথা শুদ্ধ মনের পরিপূর্ণতা হইতে অজ্ঞাতে বাহির হইয়া পড়িয়া কানের কাছে কেবলই অস্পষ্ট গুঞ্জনে মুখর হইয়া উঠে; মুখ ফুটিয়া সকল কথা বলিবার অবসর থাকেনা, প্রয়োজনও হয় না। সুর সেখানে সকল কথা মন হইতে টানিয়া বাহির করে, সকল অকথিত বাণী, সকল মূক কথাকে ভাষা দান করে, ছন্দলীলার স্থান সেখানে নাই। "খেয়া" হইতে, বিশেষ করিয়া "খেয়া"র পর হইতেই এই সুরের জগতের সৃষ্টি হইল, এবং সুদীর্ঘ বৎসরের পর বৎসর কবি সুরের সেই অনির্বচনীয় রাজ্যে নিজকে একেবারে ডুবাইয়া দিলেন। কবির এই পরিবর্তন বিস্ময় উদ্রেক না করিয়া পারেনা। যে-কবিকে আমরা শুনিয়াছি গভীর জ্ঞানলব্ধ কথা গম্ভীর উদাত্ত ধ্বনিতে শুনাইতে, যাহাকে দেখিয়াছি উর্বশীর সৌন্দর্য নয়ন ও মন ভরিয়া উপভোগ করিতে, বসুন্ধরার সুবিস্তৃত বক্ষে আপনাকে বিস্তারিত করিতে, বিজয়িনীর দৃপ্ত বিজয়-মহিমা প্রাণ ভরিয়া আঁখি-ভরিয়া দেখিতে, কালবৈশাখীর ঝড়ের উন্মত্ততায় নাচিতে, সেই বিচিত্র, বলিষ্ঠ,সৌন্দর্যপিপাসু কবিচিত্তের আজ এ কি হইল! এ কি বিরাট অন্তহীন গভীর প্রেম ও আবেগ কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিল যাহার ফলে সমস্ত দেহমন বালিকা বধূর মতন কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, সমস্ত বল অন্তর্হিত হইয়া গেল, নিজকে একান্ত দীন কাঙাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল! কোথায় গেল বুদ্ধির যত দীপ্তি, ভাষার যত শক্তি ও উচ্ছ্বাস, কল্পনার সবল উদ্দীপনা! সমস্ত অলঙ্কার এক মুহূর্তে পড়িল খসিয়া, সমস্ত বাহুল্য অন্তর্হিত হইয়া গেল, সমস্ত বুদ্ধি ও জ্ঞান লজ্জা মুখ লুকাইল;

কবি যেন হৃদয়কে একেবারে অনাবৃত করিয়া দেবতার সম্মুখে অঞ্জলি করিয়া তুলিয়া ধরিলেন, যে কয়টি কথা সুরের রূপ ধরিয়া চিত্ত বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল তাহা একান্তই সহজ, সরল, অনাবৃত, বিরলসৌষ্ঠব।

"সোনার তরী-চিত্রা-কল্পনা-ক্ষণিকা"র কবি, মানব ও প্রকৃতির, প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি, বিচিত্র রসানুভূতির কবি যে "খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতমাল্য-গীতালি"তে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অধ্যাত্মজীবনে দ্বিজত্ব লাভ করিলেন, তাহা কিছুই অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যজনক ব্যাপার নহে। সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেম-আনন্দ সকল রসের সায়রে যিনি এতদিন ডুবিয়া ছিলেন তিনি যে প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্য-স্বরূপকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবেন, সকল রসের মূলে পৌঁছিতে চাহিবেন, ইহা ত খুবই স্বাভাবিক। এই প্রচেষ্টা "খেয়া" হইতেই সুরু হইয়াছিল, "গীতাঞ্জলি"তে তাহা একটা স্পষ্ট রূপ ধারণ করিল, পরিপূর্ণ সার্থকতা পাইল "গীতিমাল্য"তে। কয়েকটি ঋতু উৎসবের গান এবং আরও কয়েকটি গান ও কবিতা ছাড়িয়া দিলে "গীতাঞ্জলী"র প্রত্যেকটি গানে ও তাহাদের সুরে রসস্বরূপকে পাইবার জন্য অন্তরের কি আকুলতা, সর্বত্র তাঁহার অস্তিত্বকে অনুভব করিবার জন্য কি তীব্র আবেগ, নিজের সকল অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া জীবনকুসুমটি দেবতার পায়ে উৎসর্গ করিবার জন্য কি প্রাণপাত নিবেদন! কিন্তু "গীতাঞ্জলি"তে এই অধ্যাত্ম-সাধনায় কবিচিত্তের সহজ আনন্দ, সরল উপলব্ধি, অপরূপ লীলার কোনও আভাস আমরা পাইনা; পাই সাধনার বেদনা ও তাহার বিভিন্ন স্তর, পাই সংগ্রামের আভাস, পাই ব্যর্থতার বিরহের অস্পষ্ট ক্রন্দন। অথচ যতদিন পর্যন্ত জীবনে এই সাধনার আনন্দ সহজ হইয়া না উঠিল, উপলব্ধি সরল না হইল, দেবতার বিচিত্র ও অপরূপ লীলা সমস্ত চিত্তকে রাঙাইয়া রসে ভরিয়া না দিল, সমগ্র জীবনের হাসিখেলার সঙ্গে ভাগবত্ উপলব্ধির আনন্দ জড়াইয়া মিশিয়া না রহিল ততদিন লীলা ও সৌন্দর্যানুভূতির কবি রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। সে তৃপ্তি ও শক্তি, সে শান্তি ও আরাম, সেই মুক্তি ও আনন্দ লাভ হইল "গীতিমাল্যে"। "গীতাঞ্জলি" ও "গীতিমাল্য" নাম দুটিতেও আমার এই কথার প্রমাণ ও সার্থকতা আছে। কাব্য ও সৌন্দর্যের দিক হইতে, সহজ, স্বচ্ছ আনন্দ ও উপলব্ধির দিক হইতে, অধ্যাত্ম-জীবনের সার্থকতার দিক হইতে "গীতিমাল্য" যে "গীতাঞ্জলি" হইতে শ্রেষ্ঠ একথা বলিতে আমার কোনও দ্বিধাবোধ নাই।

"গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি" সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। এই গ্রন্থকয়টির প্রায় সব কবিতাই গান; কথার মূল্য কিছু নাই একথা বলিনা, কিন্তু যেহেতু কথার যাহা কিছু ব্যঞ্জনা তাহা সুরের মধ্যে,সেই হেতু কথা কতকটা গৌণ হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। কথা ও সুর মিলিয়া সৃষ্টি করিয়াছে এই গ্রন্থ কয়টির কাব্যজগৎ, শুধু কথার মধ্যে ইহাদের সৌন্দর্য ধরা পড়েনা, সুর ইহাদের অপরিহার্য অঙ্গ, এবং সেই হিসাবেই ইহারা বিচার্য।

"খেয়া"-গ্রন্থে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি উন্মুখ চিত্তের অধীর প্রতীক্ষা। "গীতাঞ্জলি"তে দেখিতেছি এই উন্মুখ অধীর প্রতীক্ষা বিরহের ক্রন্দনে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। বিরহের বেদনা, দেবতাকে একান্ত না পাওয়ার দুঃখ "গীতাঞ্জলি"র গানগুলির উপর সুগভীর ছায়াপাত করিয়াছে। নানা অবস্থায় নানা পরিবেশের মধ্যে কবি নানাভাবে দেবতার সান্নিধ্যলাভ করিতে চাহিয়াছেন, নানান্ ভাবে কবি তাঁহাকে পাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কোথাও যেন পাওয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, সত্যকার সম্পূর্ণ উপলব্ধি যেন এখনও হয় নাই; সেই জন্যই একটা ব্যথা ও বেদনার সুর "গীতাঞ্জলি"র অনেক গানেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট। দুঃখ আঘাত বিপদের ভিতর দিয়া যে-সাধনা সে-সাধনাকে কবি স্বীকার করিয়াছেন, এবং সে-সাধনার ভিতর দিয়া, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া দেবতার স্পর্শ তিনি চাহিয়াছেন; দুঃখ আঘাত বেদনা যে দেবতারই স্পর্শ এই উপলব্ধি তাঁহার চিত্তে জাগিয়াছে। আবার নিজের অহঙ্কারকে চূর্ণ করিবার যে-সাধনা সে-সাধনাকেও কবি স্বীকার করিয়াছেন এবং নিজের সকল অহঙ্কারকে চোখের জলে ডুবাইয়া দিবার সাধনা অভ্যাস করিয়াছেন। আবার কর্মযোগের যে-সাধনা সে-সাধনাও কবি স্বীকার না করিয়া পারেন নাই; এ কথা তাঁহার উপলব্ধির মধ্যে ধরা দিয়াছে যে, আমাদের দেশে ভগবান্ তাঁহার সুউচ্চ স্বর্ণ-সিংহাসন ছাড়িয়া নামিয়া আসিয়াছেন 'সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারা-দের মাঝে', নামিয়া আসিয়াছেন সেইখানে যেখানে

* * * মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙে কাটছে যেথা পথ
খাটছে বারো মাস ("গীতাঞ্জলি")

সেইখানে ভগবান্‌কে তিনি স্পর্শ করিতে চাহিয়াছেন। "গীতাঞ্জলি"র

গানগুলিতে তাই বেশীর ভাগ কবির এই সাধনার ইঙ্গিতই পাওয়া যায়; পরিপূর্ণ উপলব্ধির আনন্দের বার্তা অত্যন্ত কম; সাধনার যে পরিপূর্ণ ফল তাহা "গীতাঞ্জলি"তে নাই বলিলেই চলে। সেইজন্যই "গীতাঞ্জলি"র গান ও কবিতা রসসমৃদ্ধ হইতে পারে নাই, সহজ আনন্দরসের আভাস ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। "গীতাঞ্জলি"তে তাই রসের কথা অপেক্ষা সাধনার কথা বড়, আনন্দ অপেক্ষা বেদনার কথা অধিক।

"কাব্য হিসাবে এই সাধনার ইঙ্গিত সম্বলিত কবিতাগুলি নিকৃষ্ট। * * * বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলিতে কবির অধ্যাত্ম-সাধনার বার্তার ভাগই বেশী, পরিপূর্ণ উপলব্ধির বাণী কম। * * * বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র যে-সকল গানে কবির অধ্যাত্ম-সাধনার আভাস ইঙ্গিত আছে সেগুলি পরে পরে সাজাইলে কবির সাধনার একটা সুস্পষ্ট চেহারা ধরিতে পারা যায়। মোটামুটি সাধনাং তিনটি ধারা আমি ধরিতে পারিয়াছি। * * *

'গীতাঞ্জলি'র এই সাধনার কবিতাগুলি কবিতা হিসাবে নিকৃষ্ট সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহাই আশ্চর্য যে কবির সমস্ত স্বরূপটি কেমন সহজে কেমন অনায়াসে এই কাব্যের মধ্যে ধরা দিয়াছে। এ যেন কবির প্রতিদিনের ডায়ারী—শুধু প্রভেদ এই যে, মানুষ ডায়ারী লিখিবার কালে প্রায়ই আপনার সম্বন্ধে কিছু না কিছু সচেতন না হইয়া যায় না। এই কাব্যে কবির অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম অভিজ্ঞতাগুলি পরে পরে বাহির হইয়া আসিয়াছে। * * * শিল্পীর মত কেবল শিল্পের শ্রেষ্ঠ ফল দান করিয়া কবি বিদায় লন নাই, তিনি এই কাব্যে আপনাকে সম্পূর্ণ করিয়া দান করিয়াছেন। এইখানেই 'গীতাঞ্জলি'র বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্যই পশ্চিমে এই শ্রেণীর অন্যান্য সকল কাব্যের অপেক্ষা 'গীতাঞ্জলি'র সমাদর এত অধিক হইয়াছে। এই কাব্যে মানুষের জীবনের মধ্যে কবির সাধনা গিয়া আঘাত করিয়াছে। * * *"

(অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্য পরিক্রমা", ২য় সং, ১৩৮—১৪১ পৃ)

সকলেই জানেন ইংরাজী "গীতাঞ্জলি" উপলক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন, এবং এই গ্রন্থ সম্বন্ধেই সমগ্র পাশ্চাত্যজগৎ প্রশংসামুখর হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজী "গীতাঞ্জলি" বাংলা "গীতাঞ্জলি"র সব গানের অনুবাদ নয়; "নৈবেদ্য" ও "খেয়া" গ্রন্থের অনেক কবিতা, "গীতাঞ্জলি"র অনেক গান, এবং "গীতিমাল্যে"রও ১৫।১৬টি গানের অনুবাদ ইংরাজী "গীতাঞ্জলি"তে স্থান পাইয়াছে, তবে "গীতাঞ্জলি"র গানের অনুবাদই সব চেয়ে বেশী। কিন্তু সে যাহাই হউক, "গীতাঞ্জলি"র মধ্যে পাশ্চাত্য জগৎ এমন কি মায়ামন্ত্রের সন্ধান, কি সোণার কাঠির স্পর্শ পাইল যাহার ফলে সমস্ত

পিপাসু আত্মা এক মুহূর্তে একেবারে বিস্ময়ে স্তব্ধ ও অভিভূত হইয়া পড়িল! ইহার হেতু কি সে-সম্বন্ধে অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং আমি মনে করি তাঁহার অনুমান ও বিচার মোটামুটি সত্য। * কাজেই এ-সম্বন্ধে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু আমরা যাহারা ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা ও উপলব্ধির পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াছি, অতীন্দ্রিয় জগৎ ও অধ্যাত্ম-চেতনার রাজ্য যাহাদের কাছে অপরিচিত নয়, তাহাদের কাছে "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র অধ্যাত্ম-সাধনা ও উপলব্ধির মর্মবাণী এমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। অতীন্দ্রিয় লোকের রূপ ও রহস্য, অধ্যাত্ম-সাধনার বেদনা, বিরহানন্দ, ইত্যাদি বিচিত্র গূঢ় অনুভূতি আমাদের মধ্যযুগের কবি-সাধক অথবা সাধক-কবিদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাণীর ভিতর, বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলীর ভিতর অহরহই আমাদের মন ও প্রাণকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে আদি ও মধ্যযুগে অনেক কবিই ছিলেন সাধক, অনেক সাধকই ছিলেন কবি, কাজেই আমাদের দেশের ধর্মসাধনা রূপ ও রস-সাধনাকে জীবন হইতে নির্বাসন দেয় নাই; ভারতীয় ধর্মসাধনা এই হেতুই কোনও দিনই একান্ত শুষ্ক নীরস হইয়া উঠে নাই। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আদি যুগে, ব্রাহ্মধর্মে একসময়ে আত্যন্তিক নীতি-বোধ ও পাপবোধের ফলে ভারতীয় ধর্মসাধনা শুষ্ক নীরস জীবন-নিরপেক্ষ এক মরুপথকেই জীবনপথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সে-পথ চিরন্তন পথ বলিয়া আমাদের দেশ কখনও গ্রহণ করে নাই। মধ্যযুগের ধর্মসাধনা একেবারেই সে-পথকে অস্বীকার করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের পরি-বেশের মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি হইলেন মূলতঃ কবি, তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনা এবং উপলব্ধি রূপ ও রস-সাধনাকে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারে নাই, বরং তাহাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার জগৎ, অতীন্দ্রিয় লোকের বিচিত্র রস ও রহস্যের জগৎ পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টিতে এক নূতন গ্রহলোক আবিষ্কার বলিয়া মনে হইলেও আমাদের ভারতীয় মানসের দৃষ্টিতে এমন কিছু নূতন নয়; সে জগৎ আমাদের কাছে নূতন জগৎ নয়, শুধু নূতন করিয়া নূতন ভাষায় নূতন ভঙ্গিমায় আমাদের কাছে তাহা উপস্থিত করা হইয়াছে মাত্র। "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-

* অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্য পরিক্রমা", ১২১—১৩৯ পৃ।

গীতালি"র কবি-সাধক রবীন্দ্রনাথ এই হিসাবে নানক-কবীর দাদু-রজ্জব চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস প্রভৃতি সাধক-কবিদেরই সমগোত্রীয়। বিশ্বজীবনের সকল রূপের মধ্যেই অপরূপের লীলা এই সাধক-কবিদের অধ্যাত্ম-দৃষ্টির সম্মুখে ধরা দিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথও জীবনের ও নিসর্গের সকল রূপের মধ্যে এক নিত্য অপরূপের লীলাই দেখিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার অধ্যাত্ম-মানসের আশ্রয় হইতেছে প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশ, মানব-জীবনের বিচিত্র লীলা। "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র প্রায় প্রত্যেক গানে ও কবিতায় তাহার প্রমাণ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

"গীতাঞ্জলী-গীতিমাল্য-গীতালি" রচনার পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ ধর্মসঙ্গীত অনেক রচনা করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে কতগুলি ব্রাহ্মসমাজে এবং ব্রাহ্ম-সমাজের বাহিরেও খুব পরিচিত, বহুল পরিমাণে গীত ও ব্যাখ্যাত। 'অন্ধজনে দেহ আলো', 'শুনেছে তোমার নাম', 'জানি হে কবে প্রভাত হবে' ইত্যাদি গান কবির যৌবনের রচনা, যখন অধ্যাত্ম-চেতনা কবিচিত্তকে স্পর্শও করে নাই। এই ধরণের ধর্মসঙ্গীত রচনা "মানসী"-র যুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল;

> "কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের পূর্বেকার ধর্মসঙ্গীতগুলি প্রচলিত ব্রহ্মোপাসনার ভাব অবলম্বন করিয়াই রচিত। তখন কবির স্বকীয় কোন অধ্যাত্ম অনুভূতি জাগে নাই—তিনি আপনার অভিজ্ঞতাকে আপন বাণীরূপে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন নাই। সুতরাং তখনকার গানগুলি প্রচলিত উপাসনার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার আধুনিক গানগুলি যে তাঁহার কাব্যজীবনের চরম পরিণতি স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা তো প্রথাগত নহে, আত্মগত—দশের জিনিস নহে, একেলার।" (অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্য পরিক্রমা," ১১০—১২২ পৃ)

পূর্বেকার ধর্মসঙ্গীতগুলি ধর্মপ্রবণ চিত্তে ধর্মবোধের সঞ্চার কতটুকু করে বা করেনা, আমাদের বিচার্য তাহা নহে, কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, সে-সঙ্গীতগুলি রবীন্দ্রনাথের নিজের অধ্যাত্ম-চৈতন্যের কথা নয়, প্রচলিত ধর্মধারণার কথা। কিন্তু "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র গানগুলি কবির স্বীয় অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার কথা, মর্মছেঁড়া বাণী, জাগ্রত অধ্যাত্ম-চৈতন্যের গোপন গুঞ্জন।

ইতিপূর্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগীয় সাধক-কবি কবীর-নানক-রজ্জব-দাদু-মীরাবাঈ-চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস প্রভৃতির সমগোত্রীয়। ভক্তি-রসাশ্রিত গান ইহারা অনেক রচনা করিয়াছেন, নিজেরা গাহিয়াছেন, ভক্তশিষ্যেরা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছে, গাহিয়া ধর্মসাধনায় শক্তি লাভ করিয়াছে; এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করিয়া সে-সব গানের কিছু কিছু পদ আমাদের চিত্ততটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু সে-সব অধ্যাত্ম-রসাশ্রিত গান ও রবীন্দ্রনাথ রচিত গানগুলি কি একই রূপাশ্রিত, তাহারা কি একই মূল্য বহন করে? বোধ হয় নয়; কারণ যে-সব সাধক-কবিদের কথা বলিলাম, তাঁহারা সকলেই জীবনে শুধু ঐ ভক্তিসাধনা, অধ্যাত্ম-সাধনাই করিয়াছেন, ভক্তিরস অধ্যাত্ম-রসই জীবনের একমাত্র রস বলিয়া জানিয়াছেন; অন্য কোন রস বা সাধনা তাঁহাদের জীবনকে স্পর্শ করে নাই, করিলেও তাহা কাব্যের মধ্যে উৎসারিত হয় নাই। কিন্তু জীবনের বিচিত্র রস ও সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় লাভ ঘটিয়াছে, তিনি নিসর্গের কবি, নরনারীর দেহ-আত্মার প্রেমলীলার কবি, জীবনের বিচিত্র রস ও রহস্যের কবি। তিনি "সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি-কল্পনা-ক্ষণিকা"র কবি; তিনি ত শুধু "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র কবি নহেন।

"যিনি প্রকৃতির কবি, মানবপ্রেমের কবি, যিনি সকল বিচিত্র রস নিগূঢ় জীবনের গান গাহিয়াছেন, তিনিই যে এখন রসনাং রসতমঃ, সকল রসের রসতম ভগবৎ প্রেমের গান গাহিতেছেন—ইহাতেই ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের ভক্তিসঙ্গীতের সঙ্গে এই নূতন ভক্তিসঙ্গীতের প্রভেদ ঘটিয়াছে। এমন ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটিয়াছে কিনা জানিনা। কারণ ধর্ম চিরকালই জীবনের অন্যান্য বৈচিত্র্য হইতে আপনাকে সরাইয়া সরাইয়া লইয়া সযত্নে সন্তর্পণে আপনাকে এক কোণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। * * * জীবনের সকল রস, সকল অভিজ্ঞতার এমন আশ্চর্য প্রকাশ জগতের অন্য কবির মধ্যেই দেখা গিয়াছে। পরিপূর্ণ জীবনের গান যিনি গাহিয়াছেন, তিনি যখন অধ্যাত্ম উপলব্ধির গান গাহেন, তখন এসরাজের মূল তারের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাশাপাশি যে তারগুলি থাকে তাহারা যেমন একই অনুরণনে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে এবং মূল তারের সঙ্গীতকে গভীরতর করিয়া দেয়, সেইরূপ অধ্যাত্ম উপলব্ধির সুরের সঙ্গে জীবনের অন্যান্য রসোপলব্ধির সুর মিলিত হইয়া এক অপূর্ব অনির্বচনীয়তার সৃষ্টি করে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথকে যে-সকল বিলাতী সমালোচক খৃষ্টান ভক্ত কবিদের সঙ্গে বা হিব্রু প্রফেট্‌দের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, তাঁহাদের তুলনা যেমন সত্য হয় নাই, সেইরূপ যাঁহারা এতদ্দেশীয় ভক্ত কবিদের সঙ্গে তাঁহার তুলনা,

করেন, তাঁহাদেরও তুলনা ঠিক বলিয়া মনে করিনা। বরং আধুনিক কালের যে সকল কবি জীবনের সকল বিচিত্রতার রসানুভূতিকে অধ্যাত্মরসবোধের মধ্যে বিলীন্ করিয়া দিতে চান্— সেই সকল কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তুলনীয় হইতে পারেন।" (অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, "কাব্য পরিক্রমা", ১৫৩—১৫৪ পৃ)

অনেকেই "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র কবি রবীন্দ্রনাথকে বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু ঠিক উপরোক্ত কারণেই এই তুলনা খুব সত্য ও সার্থক নয়, ঠিক্ যেমন সত্য ও সার্থক নয় উপনিষদের ঋষি-কবিদের সঙ্গে তাঁহার তুলনা। অথচ উপনিষদের অধ্যাত্মযোগ কিংবা বৈষ্ণব লীলাতত্ত্ব তাঁহার কবিমানসকে নূতন ঐশ্বর্য দান করিয়াছে, একথাও অস্বীকার করা চলে না। "গীতাঞ্জলি"র অনেক গানে বিরহের সুগভীর ব্যথা ও বেদনা, "গীতিমাল্যে"র কোন কোন গানে মিলন ও বিরহের আনন্দ খুব স্পষ্ট; বৈষ্ণব পদকর্তাদের ভাবজগৎ, কল্পনার-জগৎ "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র অনেক গানেই ছায়াপাত করিয়াছে, তবু একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, মূর্তিসাপেক্ষ যে-প্রেম বৈষ্ণব-পদাবলীতে মান, বিরহ, মিলন, অভিসার প্রভৃতি বিচিত্র রসকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে, ঠিক সেই প্রেমই রবীন্দ্র-কবিমানসের উপজীব্য নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেম রহস্যময়, তাঁহার দেবতাও রহস্যময়, নব নব বিচিত্র তাঁহার রূপ, গভীর বিচিত্র রহস্যের মধ্যে কোথায় কখন যে তাঁহার প্রকাশ ক্ষণে ক্ষণে ধরা দেয় তাহা কবি নিজেও ভাল করিয়া জানেন না। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই রহস্যের আভাস পাওয়া যায় না, তাহাদের বিচিত্র প্রেমলীলা যেন অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট; তাহাদের সব কথাই যেন আমাদের জানা, বুদ্ধির ও কল্পনার গোচর, কোন্ পথ যে কোন্ বাঁকে মোড় ফিরিবে, সবই যেন আমরা জানি। বৈষ্ণব পদকর্তাদের সহজ ভক্তির সুরও রবীন্দ্রনাথের গানগুলিতে ধরা যায় না। তাঁহার কারণও আছে। বৈষ্ণব পদকর্তারা একটি প্রচলিত ধর্মমত ও বিশ্বাসকে জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা সহজ ভক্তি-সাধনাকেও তাহার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, এবং সহজেই তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন প্রচলিত ধর্মমত ও বিশ্বাসকে স্বীকার করিয়া যাত্রা সুরু করেন নাই, সেই জন্য বৈষ্ণবের

সহজ ভক্তিও তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব হইতেই সঞ্চারিত হয় নাই; সহজ হইবার সাধনা তিনি করিয়াছেন, কিন্তু নিজেই আবার দারুণ অস্বস্তিতে বলিয়াছেন,

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা
দুটো তারে
জীবন বীণা ঠিক সুরে তাই
বাজে না রে। (১২৯, "গীতাঞ্জলি")

এই যে সরু মোটা দুইটি তারে জীবন-বীণা জড়াইয়া যাওয়া, ইহাও ত এক অধ্যাত্মলীলা। এই লীলার প্রকাশ বৈষ্ণব-পদাবলীতে নাই। সেই জন্য "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"তে যে বিরহের দুঃখ বেদনা, মিলনের যে আনন্দ, ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে নিবিড় সঙ্গোপন আলাপন তাহার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহ মিলন প্রভৃতি বিচিত্র রসের একটি গভীর সাদৃশ্য থাকিলেও, একথা স্বীকার করিতে হয়, এই দুই অধ্যাত্ম-সাধনার ধর্ম এক নয়। রবীন্দ্র-অধ্যাত্মরসের বৈচিত্র্যও বৈষ্ণব অধ্যাত্ম-সাধনায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ-তত্ত্বের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু উপনিষদের অধ্যাত্মযোগতত্ত্বও "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র অধ্যাত্মরসকে অনুপ্রাণিত করে নাই; উপনিষদের অধ্যাত্মযোগ গভীর জ্ঞানসাপেক্ষ, ধ্যানসাপেক্ষ—জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

"উপনিষদের সাধনা এই অন্তর্মুখীন ধ্যানপরায়ণ সাধনা—অধ্যাত্মযোগের সাধনা। উপনিষদের ব্রহ্ম—দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং। তিনি লীলারসময় বিশ্বরূপ ভগবান নহেন। * * * উপনিষদের যোগতত্ত্বে বেদান্তশাস্ত্র তৈরি হইতে পারে কিন্তু তাহা হইতে কাব্যকথা সমুৎসারিত হয়না।" (অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্যপরিক্রমা", ২য় সং, ১৫০—৫১ পৃ)।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, "গীতাঞ্জলি"র গানগুলিতে সাধনার বেদনা, ব্যর্থতা ও বিরহের ক্রন্দনের সংবাদই বেশী পাওয়া যায়; অথচ অধ্যাত্ম-সাধনার পরিণত ফলটির সন্ধান পাওয়া যায়না। সাধনার বৈচিত্র্যকে আমাদের দেশ স্বীকার করিয়াছে বটে, এবং বিভিন্ন পন্থা লইয়া কলহ কোলাহলও কম করে নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনা সর্বদাই লক্ষ্য রাখিয়াছে পরিণত

ফলটির দিকে, এবং তাহার মাপকাঠিতেই সাধন-পন্থার মূল্য নির্ধারণ করিয়াছে। যে-জীবনে ভাগবতোপলব্ধি আসিয়াছে, সেই জীবনের রস ও আনন্দ হিল্লোলই আমাদের দেশের অধ্যাত্মচিত্তে আনন্দসঞ্চার করিয়াছে এবং অধ্যাত্ম-জীবনে জনসাধারণকে আকর্ষণ করিয়াছে; এই রস ও আনন্দ হিল্লোলই মুখ্য, সাধনপন্থা গৌণ, সে পন্থার ব্যথা এবং বেদনাও গৌণ। এই হিসাবে ভারতীয় চিত্তে "গীতাঞ্জলি" খুব বৃহৎ মূল্য বহন করেনা। এই কথাটাই শ্রদ্ধেয় অজিতচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় খুব সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন,—

* * * আমাদের দেশের লোক সাধনার বিচিত্রতাকে * * * বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, একটা বিষয়ে এদেশের লোকের বোধ সুপরিণত হইয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনার ফলটিতে ঠিক পাক ধরিল কিনা, তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝি। কথায় আমাদের চিড়া ভিজাইতে পারেনা। আমাদের দেশের লোক শ্রুতিধারণের মত করিয়া যে-সকল ভক্তদের বাণী ও সঙ্গীত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহা শ্রবণ মাত্র আমরা এবিষয়ে জাতির প্রতিভা বুঝিতে পারিব। * * *

"আমরা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনবৃক্ষের পরিণামের দিকে চাহিয়া আছি, একটা 'গীতাঞ্জলি'কেই আমরা সেই জীবন মহাবৃক্ষের পরিণত ফল বলিতে যাইব কেন? 'গীতাঞ্জলী'কে পশ্চিম বেশী বুঝিয়াছে, একথা তাহারা গর্ব করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেও আমরা তাহা সত্য নয়, জানি। * * * আমরা যে কবিকে তাঁহার সমগ্র কাব্যজীবনের ভিতর হইতে দেখিতেছি—তাঁহার জীবনের পশ্চাতে যে বহুযুগের অধ্যাত্ম রসধারা তাঁহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে তাহাকে দেখিতেছি,—কিছুই আমাদের কাছে ঝাপ্‌সা নহে। আমরা জানি তাঁহার প্রাণের মূল জীবনের সুখদুঃখময় সকল বিচিত্র রসের মধ্যে কতদূরে গভীরতম তলে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছে এবং সমস্ত বিশ্বের আলোকে সমীরণে নানা আঘাতে বিকাশ লাভ করিয়া দিকে দিকে সেই বিচিত্র জীবনের রসপুষ্ট কাব্যের শাখা প্রশাখা কি আশ্চর্য পত্রপুষ্পে শোভিত হইয়া আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। ক্রমে যখন শাখাগ্রভাগে পরিণত জীবনের ফল ধরিল, তখন তাহার কাচা রং আমরা দেখিয়াছি—তখনও তাহা রসে মধুর হয় নাই, জীবনের ভোগের বৃন্তে তাহার জোড় দৃঢ়বদ্ধ। ক্রমে ভিতরে ভিতরে রসে যখন সে পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন ভিতরের সেই পূর্ণতা তাহার বাহিরে আত্মদান রূপে অত্যন্ত অনায়াসে যখন প্রকাশ পাইল, তাহার ভোগের বৃন্ত শিথিল হইল—তখন তাহার সেই বিশ্বের কাছে নিবেদিত অঞ্জলিকে আমরা যে চিনি নাই, একথা স্বীকার করিনা। কিন্তু সেই অঞ্জলিকেই সম্পূর্ণ বলিতে যাইব কেন? সে তো রসের ভারে একেবারে অবনত হয় নাই —তাহার রসের কথার চেয়ে তাহার সাধনার কথা বেদনার কথা যে অধিক। এই নবপ্রকাশিত "গীতিমাল্যে"র গানগুলি রসে টুসটুসে ফলের মত—স্পর্শমাত্রেই যেন

ফাটিয়া পড়িবে। ইহার মধ্যে সাধনার বিশেষ কোন বার্তা নাই—সেইজন্য বেদনার মেঘ মলিনিমা নাই।" ("কাব্যপরিক্রমা", ২য় সং, ১৪২—৪৩ পৃ)।"

আগেই বলা হইয়াছে "গীতাঞ্জলি"তে শুধু 'সাধনার কথা, বেদনার কথা', শুধু ভাগবত বিরহের ক্রন্দনই বড় হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম চৌদ্দটি গান ১৩১৩ হইতে ১৩১৫'র মধ্যে রচিত, বাকী সবগুলিই আষাঢ়, ১৩১৬ হইতে শ্রাবণ ১৩১৭'র মধ্যে লেখা। "গীতাঞ্জলি"র মূল সুর শেষোক্ত পর্যায়ের গানগুলির মধ্যেই ধরা পড়ে। ভাগবত বিরহের আভাস আমরা "খেয়া" গ্রন্থেই লক্ষ্য করিয়াছি; সেখানেই আমরা দেখিয়াছি কবির অপরিসীম ব্যাকুলতা, অধীর প্রতীক্ষা। "গীতাঞ্জলি"তে সেই ব্যাকুলতা, সেই প্রতীক্ষা কান্নায় যেন ফাটিয়া পড়িল,

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো
বিরহানলে জ্বালোরে তা'রে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা
এই কি ভালে ছিল রে লিখা,
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।
("গীতাঞ্জলি", বিশ্বভারতী সং, ১৭নং)

ভাগবত অনুভূতি লাভ এখনও ঘটে নাই, সেই তাঁহাকে পাওয়া এখনও হয় নাই, অথচ পাইবার জন্য সমস্ত চিত্ত উন্মুখ; অধীর বিরহী চিত্ত দুয়ার খুলিয়া সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে তাঁহার মৃদু পদধ্বনি শুনা যাইতেছে, মাঝে মাঝে তাঁহার মধুর সৌরভ গায়ে আসিয়া লাগিতেছে, অথচ তিনি আসিতেছেন না, মনোমন্দিরে আসিয়া বসিতেছেন না—ইহার বেদনা কবিকে পীড়িত করিতেছে। নানা পরিবেশের মধ্যে, নানা অবস্থায় এই বেদনার ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছে,—মেঘাচ্ছন্ন দিবসে

তুমি যদি না দেখা দাও
করো আমায় হেলা
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল বেলা

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখো
একা দ্বারের পাশে। ("গীতাঞ্জলি", ১৬নং)

অথবা, শ্রাবণ ঘনঘটায়

হে একা সখা, হে প্রিয়তম
রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপন সম
যেয়োনা মোরে হেলায় ঠেলে।
("গীতাঞ্জলি", ১৮নং)

অথবা,

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার ("গীতাঞ্জলি", ২০নং)

অথবা,

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবেনা
এবার হৃদয়মাঝে লুকিয়ে বোসো, কেউ জানবেনা,
কেউ বলবেনা। ("গীতাঞ্জলি", ২৩নং)

অথবা,

শুধু আসন পাতা হ'লো আমার
সারাটি দিন ধরে
ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা, তারে
ডাক্‌বো কেমন করে।
আছি পাবার আশা নিয়ে
'হয়নি' আমার পাওয়া। ("গীতাঞ্জলি", ৩১নং)

অথবা,

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে,
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল
কুঁড়ি ধরে শুধু নাহি ফোটে ফুল
আমার জীবনে তব সেবা তাই
বেদনার উপহারে। ("গীতাঞ্জলি", ৭২নং)

তোমার সাথে নিত্য বিরোধ
আর সহেনা,—
দিনে দিনে উঠ্‌ছে জমে
কতই দেনা। ("গীতাঞ্জলি", ১৪৯নং)

কোনও কোনও গানে নিজের অসম্পূর্ণতার বেদনা, সাধনার ত্রুটির আভাসও আছে, নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ করিয়া দিবার প্রার্থনাও আছে। তাঁহাকে পাওয়া হয় নাই, কিন্তু তাঁহারই পথ চাহিয়া আছেন, এই 'পথ চাওয়াতেই আনন্দ', এই পথ পানে চাহিয়া থাকিতেও ভাল লাগিতেছে,—

প্রভু, তোমা লাগি' আঁখি জাগে;
দেখা নাই পাই
পথ চাই
সেও মনে ভালো লাগে। ("গীতাঞ্জলি", ২৮নং)

ধনে জনে কবি জড়াইয়া আছেন, তবু মন সব ছাড়িয়া সব কিছু'র মধ্যে একান্ত ভাবে তাঁহাকেই চাহিতেছে। কবি প্রতি মুহূর্তেই ভাবিতেছেন, তাঁহার আসার সময় হইয়াছে, এখন মলিনবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে,—

এখন তো কাজ সাঙ্গ হ'লো
দিনের অবসানে,
হ'লোরে তাঁর আসার সময়
আশা এলো প্রাণে।

স্নান করে আয় এখন তবে
প্রেমের বসন পরতে হ'বে,
সন্ধ্যাবনের কুসুম তুলে
গাঁথতে হবে হার
ওরে আয়, সময় নেই যে আর।
("গীতাঞ্জলি", ৪১নং)

অথবা,

তোরা শুনিস্‌নি কি শুনিস্‌নি তার পায়ের ধ্বনি,
ঐ যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।
গেয়েছি গান যখন যতো
আপন মনে ক্ষ্যাপার মতো
সকল সুরে বেজেছে তা'র
আগমনী
সে যে আসে, আসে, আসে। ("গীতাঞ্জলি", ৬২নং)

কিন্তু সাধনার আনন্দের আভাস যে কোথাও নাই, একথা সত্য নয়। মাঝে মাঝে দেবতার স্পর্শ তিনি পাইতেছেন, চিত্ত তখন বিপুল আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে, বিরহও তখন মধুর বলিয়া মনে হইতেছে,—

গায়ে আমার পুলক লাগে
চোখে লাগে ঘোর,
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে
রাঙা রাখীর ডোর।
* * *
আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়ন জলে
বিরহ আজ মধুর হ'য়ে
করেছে প্রাণ ভোর।
("গীতাঞ্জলি", ৪২নং)

অথবা,

জগত আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
ধন্য হ'লো ধন্য হ'লো মানব-জীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হয়েছে মগন। ("গীতাঞ্জলি", ৪৪নং)

অথবা,

আলোয় আলোকময় ক'রে হে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হ'তে আঁধার
মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা,
যে দিক্ পানে নয়ন মেলি
ভালো সবি ভালো।
("গীতাঞ্জলি", ৪৫নং)

কিন্তু এমন সার্থক আনন্দক্ষণের প্রকাশ "গীতাঞ্জলি"তে খুব বেশী নাই; এই যে মাঝে মাঝে নিজের ঘরের দুয়ারে দেবতার পদধ্বনি তিনি শুনিয়াছেন, ঘুমের ভিতর, প্রভাত স্বপ্নের মধ্যে দেবতার স্পর্শ তাঁহার গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে অথচ মুখোমুখি দেখা তাঁহার সঙ্গে হইলনা, তাহার আনন্দ এবং বেদনা দুইই দুঃসহ।

সে যে পাশে এসে ব'সেছিলো
তবু জাগিনি।
কি ঘুম তোরে পেয়েছিলো
হতভাগিনী!

* * *

কেন আমার রজনী যায়
কাছে পেয়ে কাছে না পায়
কেন গো তার মালার পরশ
বুকে লাগেনি। ("গীতাঞ্জলি", ৬১নং)

অথবা,

সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ বরণ পারিজাত লয়ে হাতে
নিদ্রিত পুরী পথিক ছিল না পথে
একা চলি' গেলে তোমার সোনার রথে
বারেক থামিয়া, মোর বাতায়ন পানে
চেয়েছিলে তব করুণ নয়ন পাতে।

*　　*　　*

কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি উঠি
আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চলে
দেখা বুঝি আর হ'লোনা তোমার সাথে
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।

("গীতাঞ্জলি", ৭৭নং)

"নৈবেদ্য"-গ্রন্থে আমরা দেখিয়াছি একটি মুক্ত সবল প্রাণের প্রার্থনা; "গীতাঞ্জলি"তে সে প্রাণ ভক্তিতে আনত হইয়াছে, একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, একথা সত্য, কিন্ত এই ভক্তি দুর্বল প্রাণের করুণ আত্মনিবেদন মাত্র নয়, হীনবল দাসচিত্তের অশ্রুজলের নৈবেদ্য নয়। কবি বলিতেছেন,

আমার এ প্রেম নয়ত ভীরু
নয়ত হীন বল,
শুধু কি এ ব্যাকুল হ'য়ে
ফেল্‌বে অশ্রুজল?

*　　*　　*

নাচ যখন ভীষণ সাজে
তীব্র তালের আঘাত বাজে,
পালায় ত্রাসে পালায় লাজে
সন্দেহ বিহ্বল।
সেই প্রচণ্ড মনোহরে
প্রেম যেন মোর বরণ করে,
ক্ষুদ্র আশার স্বর্গ তাহার
দিক্ সে রসাতল।

("গীতাঞ্জলি", ৮৯নং)

কবির প্রার্থনা,

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সে কি সহজ গান ?
সেই সুরেতে জাগ্‌বো আমি
দাও মোরে সেই কান।

* * *

সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্ত বীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝঙ্কারে।
আরাম হ'তে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান্‌।

("গীতাঞ্জলি", ৭৪নং)

অথবা,

অমোঘ যে ডাক্‌ সেই ডাক্‌ দাও
আর দেরী কেন মিছে ?
যা আছে বাঁধন বক্ষে জড়ায়ে
ছিঁড়ে পড়ে যাক্‌ পিছে।
গরজি গরজি শঙ্খ তোমার
বাজিয়া বাজিয়া উঠুক এবার
গর্ব টুটিয়া নিদ্রা ছুটিয়া
জাগুক তীব্র চেতনা।

("গীতাঞ্জলি", ৭৭নং)

অথবা,

লাগে না গো কেবল যেন
কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ করোনা।

জ্বলে উঠুক সকল হুতাশ,
গর্জি উঠুক সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ
পূর্ণতা বিস্তারো।

("গীতাঞ্জলি", ৯০নং)

এই সবল সতেজ নিবেদন হইতেই হয়ত এই অনুভূতি কবিচিত্তে জাগিয়াছে যে আমাদের এই প্রতিদিনের ধূলামাটির সংসারে সকলের মাঝখানেই তাঁহার আসন। এই অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাছে কিছু নূতনও নয়। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি ত তাঁহার নয়, সংসারের ধূলামাটি ছাড়িয়া ত তিনি সাধনার ধন লাভ করিতে চাহেন না। "গীতাঞ্জলি"তে তাঁহার নিবেদন,

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়
সেথায় আপন আমারো।

("গীতাঞ্জলি", ২৪নং)

অথবা,

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে সবার নীচে
সব হারাদের মাঝে।

("গীতাঞ্জলি", ১০৭নং)

অথবা,

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হ'বে সকলের সাথে অন্নপান
অপমানে হ'তে হ'বে তাহাদের সবার সমান।
("গীতাঞ্জলি", ১০৮নং)

অথবা,

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারের দেবালয়ের কোনে
কেন আছিস্ ওরে?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস্ সঙ্গোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
ক'রছে চাষা চাষ,—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁর মতন শুচি বসন ছাড়ি'
আয় রে ধূলার পরে।
("গীতাঞ্জলি", ১১৯ নং)

কিন্তু বিরহের বেদনাবোধ, অথবা ভাগবত অস্তিত্বের অনুভূতিই ত সাধনার সবটুকু কথা নয়, শেষ কথা ত নয়ই। বোধ ও বুদ্ধির মধ্যে ভাগবত-প্রতিষ্ঠা হয়ত হইয়াছে, কিন্তু জীবন জুড়িয়া যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত না হইল, উচ্ছ্বসিত আনন্দে দেহচিত্তমন যতক্ষণ পর্যন্ত নৃত্যময় হইয়া না উঠিল, সমগ্র জীবনের হাসি খেলার সঙ্গে তিনি নিত্যসঙ্গী হইয়া না

রহিলেন, প্রিয় হইতেও প্রিয়তম হইয়া বক্ষলগ্ন হইয়া না রহিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি কোথায়, কোথায় তৃপ্তি, কোথায় আরাম, কোথায় আনন্দ ? এই শান্তি, এই তৃপ্তি, এই আনন্দ, এই আরাম "গীতাঞ্জলি"তে নাই। "গীতাঞ্জলি" অসমাপ্ত সুরের, অসমাপ্ত সাধনার কাব্য। এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ যাহারা অনুসরণ করিয়াছেন তাহারা স্বীকার করিবেন, কবিজীবনের এক একটি পর্যায় স্তরে স্তরে বিচিত্র ভাবরসের ভিতর দিয়া প্রত্যেক স্তরের বিচিত্র সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত করিয়া, সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত করিয়া অবশেষে তাহার সহজ স্বাভাবিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, এবং সমাপ্তির সীমায় পৌছিয়া পরমুহূর্তে ই আবার সেই সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন প্রবাহের সূচনা করিয়াছে। নিত্য নূতন করিয়া, নূতন সৃষ্টির মধ্যে বিহারই রবীন্দ্র-কবিজীবনের ধর্ম, কিন্তু কোনও নূতন সৃষ্টিই ততক্ষণ তাহার মানসদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয় নাই যতক্ষণ না পূর্বতন সৃষ্টির সমগ্র রস তিনি নিঃশেষে পান করিয়াছেন, যতক্ষণ না তিনি তাহার সমস্ত সম্ভাবনা পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "কল্পনা-নৈবেদ্য-খেয়া" হইতে যে নবজীবন-প্রবাহের সূচনা হইয়াছিল, "গীতাঞ্জলি"র সুরের মধ্যে তাহার সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষে আত্মপ্রকাশ করে নাই, সে-জীবন এখনও পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নাই, একটা বিশেষ স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে মাত্র।

এই আত্মপ্রকাশ, এই পূর্ণ পরিণতি লাভ ঘটিল "গীতিমালা" ও "গীতালি" তে। এই দু'টি গ্রন্থের অধিকাংশ গানগুলির মুক্তগতি, কোমল সৌন্দর্য, উদ্বেলিত আনন্দ, স্বচ্ছ সহজ আবেগ এবং সুনিবিড় ঐক্যানুভূতি যে কোনও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারেনা। "গীতাঞ্জলি"তে যে ভক্ত কবি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় দেবতাকে চাহিয়াও ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, "গীতিমালা"-গ্রন্থে সেই ভক্ত কবি দেবতাকে বন্ধু মানিয়া তাঁহার দুই হাত ধরিলেন। কবে যে একদিন

ফুটলো কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলেম অন্যমনে। (১৭নং)

কবে যে একদিন কোন্ শুভমুহূর্তে দেবতা আসিয়া তাহার অন্তরে আসন বিছাইয়া গিয়াছেন, তাহা কি কবি নিজেই জানেন ? কিন্তু সোনার কাঠির

ছোঁয়া লাগিয়া সব যে সোনা হইয়া গেল, দুঃখ, বেদনা, দহন জালা সব যে একমুহূর্তে জুড়াইয়া গেল, আনন্দে খুশীতে সমস্ত দেহচিত্তমন যে নাচিয়া উঠিল,—

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা। (১৩নং)

অথবা,

সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধা সরসে। (২২নং)

অথবা,

মনে হ'লো আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে
মনে হ'লো সকল দেহ
পূর্ণ হ'লো গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশির নত
ফুটলো পূজার ফুলের মত
জীবন নদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীম দেশে। (৩৫নং)

অথবা

প্রাণে খুসির তুফান উঠেচে
ভয় ভাবনার বাধা টুটেচে
দুঃখকে আজ কঠিন ব'লে
জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে
উধাও হ'য়ে হৃদয় ছুটেচে। (৩৬নং)

অথবা,

তোমারি নাম বল্‌বো নানা ছলে
বল্‌বো একা বসে, আপন
মনের ছায়া তলে

* * *

বিনা প্রয়োজনের ডাকে
ডাক্‌বো তোমার নাম
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পূরবে মনস্কাম। (৩২নং)

অথবা,

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুরে ভরিলে ভাষা ভোলা গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশীতে
জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে—
সেই সুরে মোরে বাজাও। (৩৯)

অথবা

তোমায় আমায় মিলন হ'বে ব'লে
আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হ'বে বলে
ফুল্ল শ্যামল ধরা।

* * *

তোমায় আমায় মিলন হ'বে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির স্বয়ম্বরা। (৪২)

কিন্তু আর দৃষ্টান্ত উল্লেখের কিই বা প্রয়োজন আছে? "গীতিমাল্য"-গ্রন্থের প্রায় সকল গান ও কবিতায়ই এই তৃপ্তির, এই আনন্দের সুর সহজেই ধরা পড়ে। সহসা এই তৃপ্তি, এই আনন্দ আসিল কোথা হইতে? ১৩১৬

বঙ্গাব্দের শেষাশেষি কবি য়ুরোপ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় যাত্রা স্থগিত রাখিতে হইল, কবি চলিয়া গেলেন শিলাইদহ। সেখানে অসুস্থতার মধ্যে কতগুলি গান ও কবিতা রচনা করিলেন (৪নং—২১নং); বাহিরের কাজকর্ম চঞ্চলতা সমস্তই তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—

কোলাহল ত বারণ হ'লো
এবার কথা কানে কানে
এখন হ'বে প্রাণের আলাপ
কেবল মাত্র গানে গানে। (৮নং)

গানে গানে প্রাণের আলাপ যখন সুরু হইল তখন ধীরে ধীরে যে ছিল অজানা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাকে অত্যন্ত নিকটে পাইলেন,—

নাম হারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলেনি কেউ আমাকে।

* * *

জানি যেন সকল জানি
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে। (৯নং)

মনে হইল,

অপূর্ব তার চোখে চাওয়া
অপূর্ব তার গায়ের হাওয়া
অপূর্ব তার আসা যাওয়া গোপনে। (১১নং)

ধীরে ধীরে কবি তাঁহাকে পাইলেন; উপলব্ধির শান্তি ও তৃপ্তি লাভ ত ঘটিল, কিন্তু এই তৃপ্তি, এই শান্তির মধ্যেও কবি অতৃপ্তির চিরগতি প্রার্থনা করিলেন, বেদনার আঘাত প্রার্থনা করিলেন,

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো—আরো দাও প্রাণ।

* * *

আরো বেদনা আরো বেদনা
দাও মোরে আরো চেতনা
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে কোরো ত্রাণ মোরে কোরো ত্রাণ। (২৮নং)

"গীতিমাল্য" গ্রন্থের শান্তি ও তৃপ্তির মধ্যে এই বেদনাময় চৈতন্যের প্রার্থনা থাকিয়া থাকিয়া উঁকি মারিতেছে।

২৮ নং হইতে ৪১নং পর্যন্ত গানগুলি ইংলণ্ড যাইবার পথে, ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ড হইতে ফিরিবার পথে রচিত। বাকী গানগুলি প্রায় সবই শান্তিনিকেতন অথবা রামগড়ে রচিত, সর্বশেষেরটি কলিকাতায়। "গীতিমাল্য"-গ্রন্থের গানগুলি সম্বন্ধে অজিতবাবু বলিতেছেন,

> "কবির সৌন্দর্যসাধনা যেমন কড়ি ও কোমল ও চিত্রাঙ্গদার ভোগপ্রদীপ্ত বর্ণ-উজ্জ্বলতায় প্রথম সূচনা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সোনার তরী-চিত্রার 'মানস সুন্দরী', 'উর্বশী' প্রভৃতি কবিতার বর্ণপ্রাচুর্যে ও বিলাসে বিচিত্র হইয়া অবশেষে কণিকার বর্ণবিরল ভোগবিরত সুগভীর স্বচ্ছতায় পরিণতি লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়া ক্রমশঃ কবির অধ্যাত্ম সাধনা এই গীতিমাল্যে বিচিত্রতা হইতে ঐক্যে,বেদনা হইতে মাধুর্যে, বোধ প্রাখর্য হইতে সরল উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে। ("কাব্যপরিক্রমা", ১৬৫ পৃ)।

সত্যই, "গীতিমাল্য"র গানগুলির মধ্যে কোনও তত্ত্বকথা নাই, কোনও সাধনার কথা নাই, ইহারা স্বচ্ছ, ভারমুক্ত, সহজ আনন্দময়।

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখ থুয়ে। (৪৫নং)

অথবা,

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে
আমার সকল ব্যথা রঙীন্ হ'য়ে
গোলাপ হ'য়ে উঠ্‌বে। (৪৯নং)

অথবা,

শ্রাবণের ধারার মতন পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে
তোমারই সুরটি আমার মুখের পরে, বুকের পরে
* * *
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার পরে ভুখের পরে। (৬৮নং)

অথবা,

তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে
এল এল এল গো। (ওগো পুরবাসী)
বুকের আঁচলখানি ধুলায় পেতে
আঙিনাতে মেল গো। (৯৮নং)

এই সব গানে তত্ত্ব কথা, সাধনার কথা কোথায়? উপলব্ধি এত গভীর, এত পরিপূর্ণ, এত সরল যে ইহার মধ্যে বসিয়াই স্থির সার্থক তৃপ্তিতে ও শান্তিতে বলিতে পারা যায়,—

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ
তোমায় করি গো নমস্কার।
* * *
এই কর্ম-অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই গন্ধ-গহন সন্ধ্যা-কুসুম-মালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার। (১১১নং)

"গীতালি"র সব ক'টি গানই (১০৮) ১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ হইতে ৩রা কার্তিকের মধ্যে রচিত। "গীতালি"র সব গানেই একটা শান্তি ও সার্থকতার সুর ধ্বনিত; দেবতার সঙ্গে বিচিত্র লীলা, বিচিত্র গভীর রহস্য নিসর্গ সৌন্দর্যদ্বারা মণ্ডিত। সাধনার বেদনা ও দুঃখের কথা কবি আজ একেবারে ভুলিতে চাহিতেছেন,

যখন তুমি বাঁধছিলে তার
সে যে বিষম ব্যথা
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
সকল দুখের কথা। (১৭নং)

প্রেম এত নিবিড় যে কবি আর সহ্য যেন করিতে পারেন না,—

আমি যে আর সইতে পারিনে
সুর বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে। (১১নং)

অথবা,

বক্ষ আমার এমন ক'রে
বিদীর্ণ যে কর
উৎস যদি না বাহিরায়
হ'বে কেমনতর? (৩২নং)

রহস্য-লীলার আভাসও আছে অনেক গানে,—

পুষ্প দিয়ে মার যারে
চিনল না সে মরণকে
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে যে
ধরে তোমার চরণকে! (৭৩নং)

অথবা,

কোন্ সাহসে একেবারে
শিকল খুলে দিলি দ্বারে,
জোড় হাতে তুই ডাকিস্ কারে
প্রলয় যে তোর ঘরে ঢোকে। (১০নং)

কবির 'হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে' তাঁহার প্রিয়তম নিদ্রিত; তাঁহাকে তিনি প্রণয়ের আকর্ষণে আহ্বান করিতেছেন জাগিবার জন্য। কিন্তু সে আহ্বানে কোনও শঙ্কা নাই, কোনও বেদনা নাই সেই সুরে, পরিপূর্ণ প্রেমও বিশ্বাসে নিবিড় সেই আহ্বান,—

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন পরে—
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।
রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী—
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।

* * *

মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে
মিলাব এ-হাত তব দক্ষিণ হাতে—
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।
হৃদয় পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে
প্রিয়তম হে জাগো, জাগো, জাগো। (৫০নং)

প্রেম যেথানে এত নিবিড় সেইখানেই পরম বিশ্বাসে, সবল গর্বে বলা চলে,—

ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
* * *
প্রভাত সূর্য্য এসেছ রুদ্র সাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে
মৃত্যুর হোক্ লয়।
তোমারি হউক জয়। (১০১নং)

অথবা,

আজ ত আমি ভয় করিনে আর
লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।
নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধু পারে
তবু তুমি সেইত আমার তুমি,
আবার তোমায় চিনব নূতন করে। (৯৭নং)

ভাগবত উপলব্ধি ত এইবার পরিপূর্ণতা লাভ করিল, সাধনা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল; এইবার সকৃতজ্ঞ অঞ্জলি নিবেদনের পালা,—

এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির প্রাঙ্গনে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারা জীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী

জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যাদীপ মুখে,
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত, তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে শ্রাবণ বরিষণে ;
কারও হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে ; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বার বার এসেছে প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চ'লে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম ;
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম। (১০৮নং)

জীবন ত এইখানে পৌঁছিয়া একটা পরিপূর্ণতা লাভ করিল ; কৈশোরের চঞ্চলতা যৌবন উন্মেষের অনিশ্চিত বিরহ উন্মাদনা, যৌবন-মধ্যাহ্নের তীব্র প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতি এবং ভোগ ও বিলাস প্রাচুর্য, যৌবন-সায়াহ্নের ভোগ বিরতি, তারপর পরিণত জীবনের অধ্যাত্ম আকুতি, অধ্যাত্ম সাধনা এবং সর্বশেষ ভাগবত উপলব্ধি—এই ত সাধারণ মানুষের জীবন পর্যায়। কবি ত ইহাদের প্রত্যেকটিই পরিপূর্ণ করিয়া, নিঃশেষ করিয়া পাইলেন, জীবনের সমস্ত সুধা আহরণ করিলেন। পথের শেষ ত পাইলেন, আর কি বাকী রহিল ?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি পথের শেষ চাহিয়া ছিলেন ? (তিনি ত চিরচঞ্চল, চির পথিক ; এই পথের শেষ কি তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারিল ? "গীতিমাল্য"র শান্তি ও তৃপ্তির মধ্যেও যে তিনি অতৃপ্তির চিরগতি প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি যে চাহিয়াছেন, 'আরও আরও আরও আলো, আরও আরও আরও প্রাণ' তাঁহার যাত্রা যে অশেষের সন্ধানে, অসীমের পানে ; এই সীমা কি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে ? কবিকণ্ঠের গান "গীতিমাল্যে" বলিতেছে, 'পথ আমারে পথ দেখাবে, এই জেনেছি সার', কবি যে বলিতেছেন, 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না'। "গীতালি"তে চিরপথিকের কাছে সম্মুখ পথের আহ্বান যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল, পথ ত এইখানেই ফুরাইয়া যায় নাই, সীমা যেন অসীমের দিকে ডাকিতেছে,)—

আমি পথিক, পথ আমারি সাথী

* * *

যত আশা পথের আশা
পথে যেতেই ভালবাসা
পথে চলার নিত্যরসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি। (৮৩নং)

অথবা,

পথে পথেই বাসা বাঁধি
মনে ভাবি পথ ফুরাল

* * *

কখন দেখি আঁধার ছুটে
স্বপ্ন আবার যায় যে টুটে
পূর্বদিকের তোরণ খুলে
নাম ডেকে যায় প্রভাত আলো। (৯৪নং)

অথবা,

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া! (৯৫নং)

অথবা,

জীবনরথের হে সারথি,
আমি নিত্যপথের পথী,
পথে চলার লহ নমস্কার। (৯৮নং)

আরও তিনি জানিয়াছেন, অথবা পুরাতন জানাকেই নূতন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন,—

পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই ত তোমার গেহ।

* * *

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই ত স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই ত আমার তুমি। (৯৯নং)

এই উপলব্ধি যখন জাগিল তখন পুরাতন ধূলিময় স্বর্গভূমি, সুখদুঃখময় ধরণীর প্রতি বহু পুরাতন প্রেম নূতন করিয়া জাগিল, পুরাতন পথ নূতন হইয়া

চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, সীমারেখা অস্পষ্ট হইয়া অসীমের দিকে ছড়াইয়া গেল। আধ্যাত্মিক সাধনার চরম পরিণতির সুউচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া চির-পরিচিত ধরণীর দিকে তাকাইয়া এই গান কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

আবার যদি ইচ্ছা কর
 আবার আসি ফিরে
দুঃখ-সুখের ঢেউ খেলান
 এই সাগরের তীরে।

আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধূলার পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে
 ভাসি নয়ন নীরে।

কাঁটার পথে আঁধার রাতে
 আবার যাত্রা করি,
আঘাত খেয়ে বাঁচি, কিম্বা
 আঘাত খেয়ে মরি।

আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে,
নূতন প্রেমে ভালবাসি
 আবার ধরণীরে। (৮৩ নং)

জীবন-দেবতা তাহাই ইচ্ছা করিলেন।

(৮)

বলাকা (১৩২১—২৩)
 পলাতকা (১৩২৫)
শিশু ভোলানাথ (১৩২৮)

"গীতামাল্য" গাঁথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন কাব্য সৃষ্টির সূত্রপাত হইল, সে'টি "বলাকা"। ১৩২১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের মধ্যে "গীতিমাল্য"

গাঁথা সমাপ্ত হইল; "গীতালি"র সবগুলি গান ও কবিতা আষাঢ় হইতে কার্তিক মাসের মধ্যে রচিত। এই কয়মাস কেবল অফুরন্ত গানের ফোয়ারা, সঙ্গে সঙ্গে বলাকার আরম্ভ। "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-"র কবি রবীন্দ্রনাথ কি করিয়া যে হঠাৎ "বলাকা"য় জন্মলাভ করিলেন তাহা বাস্তবিকই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

মানুষ সারাজীবন সুখদুঃখ, মিলন বিরহ, আশা ও নৈরাশ্যের ভিতর দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া যখন কিছু'র মধ্যেই চরমশান্তি লাভ করিতে পারে না, তখন সে ভগবানকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করে, এবং তাঁহার সহিত মিলনের আনন্দ ছাড়া আর কোনও কিছুরই অপেক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা রাখেনা। ইহাই সাধারণ মানুষের কথা, কবি জীবনেও প্রায় তাহাই ঘটিয়া থাকে। দেশের কবিদের কথা ছাড়িয়া দিয়াও বিদেশের কবি, যাঁহারা মানব জীবনের বিচিত্র পর্যায়ের সূক্ষ্মরস ও অনুভূতির মধ্যে জীবন যাপন করিয়াছেন এমন কবিদের মধ্যে—যথা ব্রাউনিঙ, ফ্রান্সিস্ টম্পসন্, ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যান—দেখা গিয়াছে তাঁহারা নানা বৈচিত্র্যময় রসানুভূতিকে সর্বশেষ অধ্যায়ে অধ্যাত্ম রসানুভূতিতে ডুবাইয়া দিবার মানবচিত্তের যে একটা স্বাভাবিক গতি আছে, তাহারই সুস্পষ্ট আভাস প্রদান করিয়াছেন। আমরাও হয়ত ভাবিয়াছিলাম, "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র রসবোধে বিচিত্র রসবোধ বিলীন করিয়া দিয়া অনন্তশরণ ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনই বুঝি রবীন্দ্র-কবি-চিত্তের শেষ আশ্রয় হইল। তাহা হইলে মানব-মনের যাহা পরিণতি তাহাই হইত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তাহা হইল না। কেন হইল না, তাহার আভাস পূর্বেই দিয়াছি, এবং রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে যাহাদের পরিচয় আছে, তাহাদের কাছে সে-কারণ অবিদিত নয়। রবীন্দ্রনাথ চিরচঞ্চল, তাঁহার চিরপথিক কবিচিত্ত কোনও নির্দিষ্ট ভাবক্ষেত্র হইতে অধিকদিন রস আহরণ করিয়া নিজকে সতেজ রাখিতে পারে না, কেবল অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে নূতন নূতন রসাস্বাদ করিবার আকুল প্রেরণা তাঁহাকে পাগল করিয়া তোলে। অধ্যাত্মরস-বোধ ও অধ্যাত্ম উপলব্ধির একটা স্বচ্ছ, সহজ, ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই স্থির শান্ত গতিবিহীন আনন্দক্ষেত্র তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। গীতামাল্য"র শেষের দিকে এবং "গীতালি"তে আধ্যাত্মিক রসানুভূতিকেও ছাড়াইয়া মাঝে মাঝে স্বপ্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে

নিসর্গ সৌন্দর্য-প্রেরণা; "গীতালির"র শেষের দিকে ত আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি, পথের আহ্বান আবার তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সময়েই অন্য দিকে "বলাকা"য় নূতন করিয়া ফিরিয়া পাওয়া নিসর্গ সৌন্দর্য বোধ এবং পুরাতন ধরণীর প্রতি মমত্ববোধের সঙ্গে সঙ্গে কবিজীবনকে যৌবনের উৎসবে ধীরে ধীরে পুনরাহ্বান করিবার চেষ্টাও দেখা দিয়াছে। আমার মনে হয় তার একটা কারণ ছিল; অবান্তর হইলেও সে-কথা এখানে বলা প্রয়োজন মনে করি।

একথা বোধ হয় কবির অজ্ঞাত ছিলনা যে, আমাদের এই জড়তার দেশে কিংবা পশ্চিমের কর্মচঞ্চলতার দেশে সর্বত্রই জীবনের শেষ অবস্থায় যে পরমব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিবার মানবচিত্তের একটা স্বাভাবিক পরিণতি লক্ষ্য করা যায় তাহার মধ্যে খানিকটা দুর্বলতা, অসহায়তা এবং নির্ভরতার একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে এবং যৌবনের তেজোময় স্বাধীনতা ও অকারণে উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগকে অস্বীকার করিবার একটা চেষ্টা আছে। ভাল হউক, মন্দ হউক, আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ ইহার সবখানি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। এবং বোধ হয় সেইজন্যই "গীতিমাল্য" ও গীতালি"র অনেক গানেই তিনি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাবকে বিসর্জন দিয়া নিজের স্বাধীন সত্ত্বাকে ভগবানের সঙ্গে একাসনে স্থান দিবার আভাস দান করিয়াছেন। দেবতার নিকট হইতে যে তিনি আঘাত ও বেদনা প্রার্থনা করিয়াছেন, দুঃখ সংঘাত ও সংগ্রামের মধ্য দিয়াই যে তিনি ভাগবত উপলব্ধি কামনা করিয়াছেন, এবং দেবতার রুদ্ররূপও যে তাঁহার কাছে সমান প্রিয় তাহার মধ্যেও বোধ হয় এই মনোভাবের পরিচয় আছে। আমার বিশ্বাস মনের এই ভাবপন্থাই পরে "বলাকা"য় তাঁহাকে যৌবনের জয়গানে এবং গতিবেগের প্রশস্তিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই সময় য়ুরোপের ক্ষমতা-মদ-মত্ত যৌবন যে প্রাণের তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়াছিল তাহার প্রতি কবির আন্তরিক অশ্রদ্ধা থাকিলেও যৌবনের সেই অদ্ভুত চাঞ্চল্য ও সংঘাত যে কবিচিত্তকে একটুও দোলা দেয় নাই এবং "বলাকা"য় তাহার ছায়াপাত হয় নাই, একথাই বা কে বলিবে? যেমন করিয়াই হোক, "বলাকা"র রবীন্দ্রনাথ "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র রবীন্দ্রনাথ হইতে পৃথক—শুধু ভাবৈশ্বর্যে পৃথক নহেন, কথা কৌশলেও পৃথক। "বলাকা"র ছন্দ যেন যৌবনেরই ছন্দ, দৃপ্তবেগে কলনৃত্যে ছুটিয়া চলিয়াছে,

যেন ভাদ্রের ভরা জোয়ারের বিরাট নদী। আর যৌবন যে ফিরিয়া আসিল তাহা ত কবি নিজেই স্বীকার করিলেন,—

বহু দিনকার
ভুলে যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কী মনে ক'রে
পত্র তা'র পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সঙ্গীতের ইঙ্গিতের সাথে।

("বলাকা", ১৩নং)

কিন্তু একটা কথা এইখানেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন। মানুষের গভীরতর জীবনের, অধ্যাত্মজীবনের অন্তর ও বাহিরের অনেক অমরতত্ত্ব, সৃষ্টিনিহিত অনেক সুগভীর রহস্য কবিচিত্তের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া কবি ক্রমশঃ স্বদেশও স্বসমাজের গণ্ডির ভিতর হইতে বিশ্বজীবনের বিচিত্র কর্ম ও চিন্তার রাজ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই বৃহত্তর জীবনের নাড়ীস্পন্দনের সঙ্গে তাঁহার যোগ ক্রমশঃ নিকটতর ও গভীরতর হইতেছিল এবং তাহার ফলে বিচিত্র গভীর চিন্তাও তাঁহার মনকে আলোড়িত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। "বলাকা"র প্রায় সকল কবিতাগুলিতেই প্রেম, যৌবন, সৌন্দর্য অথবা জীবনগতিবেগের জয়-গানের অদ্ভুত প্রকাশ ভঙিমার আড়ালে সেই সকল তত্ত্ব ও সত্য, চিন্তাও কল্পনা অতি নিপুণভাবে আপন অস্তিত্ব জানাইতেছে। মাঝে মাঝে তত্ত্বপ্রচারের চেষ্টাও আছে একথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে কি? লক্ষ্যণীয় বিষয় তাই "বলাকা"র কবিতাগুলিতে খুব উঁচুদরের একটা 'intellectual appeal' যাহা মানুষের চিন্তার প্রসব স্থানটিকে নাড়া না দিয়া পারেনা।

১৩২৩ বঙ্গাব্দের মধ্যেই প্রায় "বলাকা"র সব রচনা শেষ হইয়া গেল। "পলাতকা"র সবগুলি কবিতা ১৩২৫ বঙ্গাব্দে লেখা। রবীন্দ্রনাথ যদি আজও "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র জীবনে বাস করিতেন তাহা হইলে তাঁহার হাত হইতে কিছুতেই এ সময় "পলাতকা" সৃষ্টি সম্ভব হইত না। সকল হাসিকান্না, সুখদুঃখ তিনি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ত দেবতার চরণেই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন; অধ্যাত্মানুভূতির মধ্যেই ত সকল অনুভূতি বিলীন

হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু "পলাতকা"য় দেখিতেছি মানব জীবনের সুখ দুঃখ অতি তুচ্ছ ঘরকন্নার ইতিহাস আবার তাঁহাকে নূতন করিয়া দোলা দিতে আরম্ভ করিল; সে-গুলিকে তিনি সকল সুখ দুঃখ, হাসিকান্না, মিলন বিরহের যিনি কাণ্ডারী তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাই দেখিতে পাইতেছি শৈল'র শিশুহাতের ক'টি আঁচড় কবির বুকেও চিরদিনের জন্য দাগা দিয়া গেল; আর, রেল ইস্‌টিশনের কুলী মেয়ে রুক্‌মিণীকে ফাঁকি দিয়া বঞ্চিত করিবার দুঃখ কি শুধু বিনু'র স্বামীর বুকেই চিরস্থায়ী হইয়া রহিল, কবির চিত্তও কি সেইজন্য ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল না? মনে হয় "পলাতকা"র কবিতাগুলিতে শুধু নানাভাবে, নানাছলে, গল্পকথায় মানবচিত্তের নানা খুঁটিনাটির ভিতর, সংসারের বিচিত্র মাধুর্যরসপূর্ণ জীবনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার চেষ্টাই প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা না হইলে এর পরই "শিশু ভোলানাথ"-গ্রন্থে শিশুজীবনের আনন্দলোকের রহস্য উদ্ঘাটনের মধ্যে কবি নিজে যে আনন্দলাভ করিলেন এবং সেই জীবনের মধ্যে যে আনন্দউৎসের সন্ধান সকলকে জানাইলেন তাহা সম্ভব হইত কি?

কিন্তু আমার বক্তব্য ইহা নয় যে, অধ্যাত্ম-জীবনে অতৃপ্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত অন্যদিকে গতি ফিরাইয়াছিল। আমি শুধু বলিতে চাই, জীবনের বিচিত্র রসানুভূতিকে কবি যে স্বাভাবিক গতিতে অধ্যাত্ম রস বোধের মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সর্বজনানুমোদিত সর্বশেষ আশ্রয় তাঁহার কবিচিত্তকে অধিক দিন অমৃতরস জোগাইতে পারিল না। তাই, তিনি যে-জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন তাহাতে এই দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের বিচিত্র রসানুভূতিই বড় হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাতে গভীরতর জীবনের রসবোধ অতি বিপুল ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিল, এবং সকল রসের মধ্যেই অতিদূরের ইন্দ্রিয়াতীত জগতের একটি ক্ষীণ অথচ গভীর গম্ভীর ধ্বনি অনুরণিত হইতে লাগিল।

১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে "সবুজপত্র" মাসিক সাহিত্য পত্রিকার সূচনা রবীন্দ্রজীবনে এক নূতন জোয়ার আনিল। "বঙ্গদর্শন" ও "সাধনা"র যুগে যেমন করিয়া কবিজীবনে বান ডাকিয়াছিল, কাব্যে-গল্পে-প্রবন্ধে-বক্তৃতায় জীবনের প্রতিমুহূর্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল, তেমনই "সবুজপত্র" উপলক্ষ্য করিয়া

আবার কাব্য-গল্প-প্রবন্ধের বান ডাকিল। একদিকে "বলাকা"র কবিতা রচনা; যেখানে যখন আছেন তখনই এক একটি করিয়া কবিতা রচনা করিয়া চলিতেছেন, এবং "সবুজপত্রে" তাহা প্রকাশিত হইতেছে; অন্যদিকে প্রবন্ধ, গল্প, গান, উপন্যাস রচনা, ধর্ম-সমাজ-সাহিত্যালোচনায় বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ।*; 'হালদার গোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রী'র পত্র', 'ভাই ফোঁটা', 'শেষের রাত্রি' প্রভৃতি সুবিখ্যাত গল্প এই সময়কার রচনা; "চতুরঙ্গ" উপন্যাসও এই সময়ের রচনা, এবং ইহার কিছুদিন পরেই (বৈশাখ, ১৩২২) "ঘরে বাইরে" উপন্যাসের সূচনা। "ফাল্গুনী" নাটকের সৃষ্টিও এই সময়ে। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা', 'বাস্তব', 'লোকহিত', 'আমার জগৎ', 'মা মা হিংসী', 'কর্মযজ্ঞ', 'পল্লীর উন্নতি' 'শিক্ষার বাহন', 'ছাত্র-শাসনতন্ত্র' প্রভৃতি সুপরিচিত প্রবন্ধ এবং বক্তৃতাও এই সময়কার রচনা। তাহা ছাড়া অনুবাদ, সভা সমিতিতে বক্তৃতা, নানা আলোচনা, বিতর্ক, নাট্যাভিনয়, অধ্যাপনা ইত্যাদি ত চলিতেছেই।

১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে "সবুজপত্র" বাহির হইল; ভূমিকায় সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখিলেন—

> "আমাদের বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্রমণ্ডিত নব শাখার উপর অবতীর্ণ হন, তাহলে আমরা বাঙ্গালী জাতির সবচেয়ে বড় অভাব তা' কতকটা দূর করতে পারব। আমরা যে আমাদের সে-অভাব সম্যক উপলব্ধি করতে পারিনি তার প্রমাণ এই যে আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য্য ব'লে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা ব'লে, আলস্যকে ঔদাস্য ব'লে, শ্মশান-বৈরাগ্যকে ভূমানন্দ ব'লে, উপবাসকে উৎসব ব'লে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় ব'লে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্বলের বল। যে দুর্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না, কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে। * * * বাঙালীর মন যা'তে বেশী ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন। মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে।

ভাষা প্রমথবাবুর সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাব যেন রবীন্দ্রনাথেরই; এ-ধরণের কথা ত আমরা কবির মুখে বারবার শুনিয়াছি। যাহাই হউক "সবুজপত্রে"র

---

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র জীবনী", ২য় খণ্ড, ৫৩—৬২ পৃ।

যাত্রা শুরু হইল "বলাকা"র প্রথম কবিতা 'সবুজের অভিযান' ললাটে আঁকিয়া। সুদীর্ঘ ভাগবত সাধনা ও তপশ্চর্যার শান্ত সমাহিত শক্তি ও আনন্দে দেহচিত্তমন যখন পরিপূর্ণ তখন কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইল যৌবনের আহ্বান, যে-যৌবন অবুঝ, জীবন্ত, অশান্ত, যে-যৌবন প্রচণ্ড, প্রমুক্ত, যে-যৌবন অমর। কবিতা হিসাবে এই কবিতাটি অথবা প্রায় দুইবৎসর পরে লেখা 'যৌবনরে, তুই কি র'বি সুখের খাঁচাতে' (৪৫নং), ইহার কোনওটিই খুব উল্লেখযোগ্য নয়; কিন্তু যে ভাব-ইঙ্গিত এই কবিতা দুইটির মধ্যে মুক্তি লাভ করিয়াছে, রবীন্দ্র কবিজীবন এবং কাব্য-প্রবাহের দিক হইতে তাহার একটা বিশেষ মূল্য আছে।

সকল রবীন্দ্র-পাঠকই জানেন, কবি চিরকাল প্রেম, যৌবন ও সৌন্দর্যের পূজারী, কিন্তু পূর্বজীবনে যে-যৌবনের পূজা তিনি করিয়াছেন সে-যৌবন প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ বাসনানুরাগী; সে-যৌবনের পরিচয় আমরা পাই "কড়ি ও কোমল" হইতে আরম্ভ করিয়া "চিত্রা" পর্যন্ত। সে যৌবন-বসন্ত আসিয়াছিল তাহার সঙ্গে লইয়া

* * * কত কোলাহল
ল'য়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণ তলে কলহাস্ত তুলে'
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চন পারুলে,
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে। (২৫নং)

তাহার মধ্যে ছিল সুতীব্র মোহ, ছিল রক্তিম বিহ্বলতা। তাহার পর এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে, "নৈবেদ্য-খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য গীতালি"র সুদীর্ঘ সাধনার স্তর তিনি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, এবং এই সাধনায় তিনি লাভ করিয়াছেন শক্তি, লাভ করিয়াছেন রুদ্রের প্রসাদ। তাই, সেই যৌবন-বসন্ত

* * * আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে,
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে, নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্চ্ছিত হ'য়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে। (২৫নং)

"গীতিমাল্য" অথবা "গীতালি"তে যে তৃপ্তি ও শান্তি তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও কবি হয়ত দেখিয়াছিলেন, অনুভব করিয়াছিলেন, একটা শুদ্ধ শান্তি বিলাস, তৃপ্তির মোহ, যাহা হয়ত তাহার মনে হইয়াছিল জড়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়তারই আর একটা দিক্। সেই জন্যই সেই শান্তি ও তৃপ্তির মধ্যেও "গীতিমাল্য" "গীতালিতে" তিনি বারবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন দুঃখের আঘাত, রুদ্রের লাঞ্ছনা; তিনি চাহিয়াছিলেন অতৃপ্তির চিরগতি, নব নব বেদনাময় চৈতন্য। এখন যেন তাহাই চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিল।

চিত্তের এই ভাব পরিবর্ত্তনের একটা কারণ বাহিরের দিকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই সামাজিক প্রগতি সম্বন্ধে স্বাধীন উদারনীতি পোষণ করিয়া আসিয়াছেন; ধর্মসম্বন্ধেও তিনি স্বাধীন মতাবলম্বী, কোনও প্রচলিত ধর্মমতই তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, এবং তাঁহার চিন্তানুযায়ী যখন তিনি যাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, অকুণ্ঠ ও নির্ভীক চিত্তে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, অনেক সময় তাহার মতামত প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করিয়াছে। স্বদেশ ও স্বসমাজ সম্বন্ধেও একথা সত্য। তাঁহার স্বকীয় ধর্মসাধনায়ও তিনি কোন প্রচলিত ধর্মমত অথবা সাধনপদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই, বরং "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"তে বারবার বলিয়াছেন, 'ওদের কথা আমি বুঝিনা, এবং সে-সব কথা শুনলেই আমার চোখের সম্মুখে সব অন্ধকার হইয়া যায়, কিন্তু আমি তোমার কথা খুব সহজেই বুঝি'; এক কথায় তিনি সর্বদাই নিজের অন্তরের আলোকে পথ দেখিয়া চলিয়াছেন। এই ধরণের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আমাদের চিরাচরিত সামাজিক বোধও বুদ্ধি সহজে সহ্য করিতে রাজী নয়, এবং রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় কথা যখনই যাহা বলিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও হইয়াছে। বাঙ্‌লা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে মানুষের মনে একটা প্রবল দেশাত্মবোধ ও অভিমান জাগিয়াছিল; এই বোধ ও অভিমান ক্রমশঃ রূপ লইল একটা উৎকট রক্ষণশীল মনোভাবের মধ্যে, এবং তাহা প্রমাণ করিবার জন্য শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের অভাব হইল না। দেশ, সমাজও ধর্মের যাহা কিছু ভাল বা মন্দ সমস্তই নির্বিচারে সমর্থন করিবার একটা প্রবল প্রবৃত্তি আমাদের শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে দেখা গেল, এবং আমাদের গণ্য ও মান্যলোকেদের অনেকেই এই মনোভাবের আশ্রয় লইলেন। তাঁহারা নির্বিচারে প্রমাণও প্রচার করিলেন আমাদের

জাতিগত জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলিয়া, আলস্যকে ঔদাস্য বলিয়া, দৈন্যকে ঐশ্বর্য বলিয়া, আত্মপ্রবঞ্চনাকে আত্মপ্রসাদ বলিয়া। রবীন্দ্রনাথ হয়ত অনুমান করিলেন, তাঁহার অধ্যাত্মসাধনায় নবলব্ধ শান্তি ও তৃপ্তির, আরাম ও আনন্দের মধ্যে হয়ত এই ধরণের রক্ষণশীল মনোভাবের সমর্থন আছে। যাহাই হউক, যে-কারণেই হউক, রবীন্দ্রচিত্ত এই ধরণের মনোভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া প্রচণ্ড, প্রমুক্ত, অশান্ত, অমর যৌবনের জয়গান করিল এবং গতিবেগের প্রশস্তি উচ্চারণ করিল। বার্দ্ধক্যের অথবা অলসের জড়ত্ব নয়, যৌবনের অশান্তিই সত্য; শান্তি ও তৃপ্তির স্থিতি নয়, গতিবেগের আনন্দই সত্য। তাহারই কাব্যময় প্রকাশ "বলাকা"। প্রবন্ধে ও বক্তৃতায়, গল্পে ও উপন্যাসেও এই নূতন মর্মবাণীই ব্যক্ত হইল। 'সবুজের অভিযান' কবিতায় যাহা বলিলেন, তাহাই বিস্তৃত করিয়া বলিলেন 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে,—

> "সমাজে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ বাঁধিবোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে। * * * আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া গিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলি বাধা। * * * দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা (সমাজপতিরা) আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক্, জঞ্জাল সরিয়া যাক্, কাঁটা দলিয়া যাক্, পথ খোলসা হউক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্য সাধন হইতে থাক্।" ("সবুজপত্র," বৈশাখ, ১৩২১, ২০—৩১ পৃ)

যে-যৌবন রুদ্রের প্রসাদ সেই যৌবন বাঙালী চিত্তকে অধিকার করুক, ইহাই হইল কবির প্রার্থনা। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের নববর্ষের প্রার্থনাও তাহাই,—

> পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
> ওই কেটে গেল ওরে যাত্রী।
> তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
> রুদ্রের ভৈরব গান।
>
> * * *
>
> ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
> চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—
> সে ত নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
> নহে শান্তি, নহে সে আরাম।

মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ। (৪৬নং)

'সবুজের অভিযান' কবিতায় অথবা 'যৌবন' কবিতায় যে-সুর আমরা শুনিয়াছি, সেই সুর 'আহ্বান' এবং 'শঙ্খ' কবিতায়ও সহজেই ধরা পড়ে।

আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে?
রৈল যারা পিছন টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।

*　　*　　*

রুদ্রমোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য।
মাথার পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য।
মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে,
আলোর নেশায় গেছি ক্ষেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের বাঁধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে। (৩নং)

অথবা,

তোমার শঙ্খ ধূলায় প'ড়ে
কেমন করে সইব?
বাতাস আলো গেল ম'রে
এ কিরে দুর্দৈব।

*　　*　　*

যৌবনেরি পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ।
দীপকতানে উঠুক ধ্বনি
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ। (৪নং)

কিন্তু রুদ্রের প্রসাদ যৌবনের জয়গানই "বলাকা"র শেষ কথা নয়, মূল কথাও নয়; শুধু এইটুকু হইলে "বলাকা" তাহার যথার্থ কাব্যমূল্য কিছুতেই

দাবী করিতে পারিত না। কারণ, যৌবন-সত্য যে-বাণীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার মধ্যে ভাব-কল্পনার সৌন্দর্য অপেক্ষা প্রচারের শক্তিই স্বপ্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে বেশী, বোধ ও বুদ্ধির ঐশ্বর্যকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বাক্যের প্রাথর্য।

"বলাকা" গতিরাগের কাব্য। সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এক অফুরন্ত গতিবেগ, এই গতিবেগই অচল পাষাণের মধ্যে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা স্থাণু, জড়, নিশ্চল তাহার মধ্যে প্রাণরসের সঞ্চার করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তোলে, যাহার বলে তরুশ্রেণী পাখা মেলিয়া শূন্যে উড়িয়া যাইতে চায়, পর্বত বৈশাখের মেঘের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে চায়, পটে লিখা ছবি জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসে; এই তৃণ এই ধূলি এরা অস্থির, সচল বলিয়াই এরা সত্য হইয়া উঠে। গতি, eternal flux, ইহাই সত্য; স্থিতি মিথ্যা, মায়া মাত্র! যাহাকে আমরা স্থাণু, জড় অথবা স্থিত বলিয়া মনে করি, তাহা আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম; জড় জগতের মধ্যেই বিধৃত, জগৎ হইতে জড় পৃথক নয়, এবং আমরা যাহাকে পরিবর্তন বলিয়া ব্যাখ্যা করি, তাহা জড় হইতে জড়ে পরিণতি নয়, নিরন্তর গতি-চক্রাবর্তের এক একটি মুহূর্ত মাত্র। তত্ত্ব হিসাবে এই তত্ত্ব কিছু নূতন নয়; হিন্দু ও বৌদ্ধ চিন্তা-জগতে, আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তারাজ্যে এ তত্ত্ব অজ্ঞাত ছিল না। ফরাসী মনীষী আঁরি বের্গস তাঁহার চারিটি সুবিখ্যাত গ্রন্থে * এই তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আমাদের হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকেরাও করিয়াছেন।

কিন্তু তত্ত্ব কাব্য নয়, এবং তত্ত্ব হিসাবে "বলাকা" বিচার্যও নয়। এই theory of perpetual change বুঝিবার জন্য কেহ "বলাকা", অথবা John Masefield'র "The Passing Strange", Thomas Hardy'র "The Dynasts", অথবা Robert Bridges'র কাব্য পড়িবে না। সে কথা অবান্তর। চিন্তাশীল দার্শনিক যিনি তিনি যুক্তিপরম্পরার ভিতর দিয়া যখন কোনও তত্ত্ব অথবা সত্যকে লাভ করেন, সেই মুহূর্তেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায়; পরে হয়ত তিনি তাঁহার চিন্তা ও যুক্তিগুলিকে সাজাইয়া অপরের

* Henri Bergson—(1) Essai sur les donnees immediates de la conscience, 1888; (2) Matiere et memoire, 1896, (3) L'evolution creative, 1907; (4) La perception du changement, Oxford lectures, 1911.

বোধ ও বুদ্ধির গোচর করিতে চেষ্টা করেন। তিনি চিন্তাসূত্রগুলি উপভোগ করেন না, সেগুলি তাঁহার কাছে উপায় মাত্র, এবং সেই উপায় অবলম্বন করিয়া যখন সত্যে আসিয়া উপনীত হন, তখন নিজকে সার্থকজ্ঞান করেন। কিন্তু যে কবি বহুদিন আগেই ইন্দ্রিয়ানুভূতির আনন্দস্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহার বোধ ও বুদ্ধি ক্ষুরের ধারের মত শানিত এবং চিন্তার আনন্দস্তরে যাঁহার চিত্ত জাগ্রত তিনি শুধু চিন্তার তত্ত্বজাল উপভোগ করেন তাহাই নয়, চিন্তা উদ্ভূত সত্যটিকেও রূপাশ্রিত করিয়া রসবস্তুতে পরিণত করিয়া তাহাকে নিবিড় ভাবে উপভোগ করেন। এই রূপরসাশ্রিত সত্যই কাব্য হইয়া দেখা দেয়।

কোন্ চিন্তাস্তরপর্যায়ের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বকে লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা কঠিন, এবং কাব্যপ্রবাহের পরিচয়ের জন্ম তাহা অবান্তরও ; হিন্দু-বৌদ্ধ দর্শন অথবা বের্গস-তত্ত্বের সঙ্গে তাঁহার তত্ত্বের কতটুকু মিল আছে বা নাই, তাহার আলোচনাও নিরর্থক। তবে, কি করিয়া এবং কেন এই তত্ত্ব রবীন্দ্র-কবিচিত্তকে অধিকার করিল, তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। রবীন্দ্র-জীবন ও কাব্য-প্রবাহের সঙ্গে যাহারা পরিচিত তাহারা জানেন, এই উভয়ই perpetual change'র উৎকৃষ্ট উদাহরণ, হেরাক্লিটাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও বলিতে পারেন, I cannot bathe in the same river twice. বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রবাহের ইতিহাস নিরন্তর এক ভাব ও অনুভূতির পর্যায় হইতে আর এক ভাব ও অনুভূতির পর্যায়ে যাত্রার ইতিহাস। অতৃপ্তির চিরগতিই তাঁহার চিরকাম্য, নব নব চৈতন্যে উদ্বোধিত চিত্তই তিনি প্রার্থনা করেন। চিরযৌবনই তাঁহার পূজা লাভ করিয়াছে জীবনের সকল অবস্থায়, এবং যৌবনের ধর্মই গতি, চঞ্চল প্রাণ-বেগ। এই কারণেই কি গতিতত্ত্ব কবির সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল ?

যাহাই হউক, এই গতিতত্ত্ব কবিচিত্তকে অধিকার করিল এবং ক্রমশঃ কবিকে মুগ্ধ করিয়া অন্তরে এক নূতন অনাস্বাদিত পূর্ব রহস্যানুভূতি জাগাইয়া তুলিল। কবিচিত্তে যখন কোনও তত্ত্ব অথবা সত্য অনুভূতির স্তরে আসিয়া পৌঁছায় তখন তাহা কোনও নির্দিষ্ট রূপের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং তত্ত্ব কবির মায়া কাঠির স্পর্শে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপবস্তু হইয়া উঠে। "বলাকা"য় এই গতিতত্ত্বই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, কখনও আপাতদৃষ্ট

জড় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া করিয়া (যেমন, 'ছবি' অথবা 'তাজমহল' কবিতায়) কখনও চঞ্চল গতিময় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া (যেমন, 'চঞ্চলা' অথবা 'বলাকা' কবিতায়)।

'ছবি' (৬নং) কবিতা হইতেই "বলাকা"র মূল সুরটির সূত্রপাত। একটি ছবির রূপবস্তুকে আশ্রয় করিয়া কবি গতিতত্ত্বের চিন্তাতন্তুটিকে উপভোগ করিয়াছেন। এই গতিতত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনও সন্দেহ নাই, সত্যে তিনি আগেই পৌছিয়াছেন, কিন্তু এই সত্যকে তিনি যে চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়া লাভ করিয়াছেন, সেই চিন্তাধারাটিকে রূপাভিব্যক্তি দান করিয়াছেন এই কবিতায়।

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা?
—ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়;
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহতারা রবি
তুমি কি তাদের মত সত্য নও?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?

* * *

এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে;
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি'
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে,
অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন উষায়—
এই ধূলি এও সত্য হায়;—
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি,—
তুমি স্থির, তুমি ছবি
তুমি শুধু ছবি।

কিন্তু এই যে পটে লিখা ছবিকে জড় বলিয়া স্থিতিশীল বলিয়া মনে করা, ইহা ত মিথ্যা, মায়া মাত্র ; সৃষ্টির প্রত্যেক অনুপরমাণু পর্যন্ত গতিচ্ছন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, এই গতি আছে বলিয়াই ত জগৎ। কবি নিজেই তাই উত্তর দিতেছেন,

কী প্রলাপ কহে কবি ?
তুমি ছবি ?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে ?
মরি মরি সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গ বেগ,
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।

*　　*　　*

তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ?
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।
অন্য মনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল
ভুলিনে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাস বায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি' দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সেত ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্মে বসি' রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;

*　　*　　*

নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

যে শব্দ-চয়ন নৈপুণ্য, ভাব-গাম্ভীর্য, ছন্দ-সজ্জা এবং কল্পনার প্রসার এই কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যায়, "বলাকার" প্রায় সব কবিতাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় কবিতাগুলির সচেতন শক্তিসম্পদ ; এই শক্তি কতকটা আসিয়াছে ইহাদের নূতন ছন্দ-গরিমা হইতে, কতকটা চিন্তার গভীরতা ও ভাবের গাম্ভীর্য আশ্রয় করিয়া, এবং কিছুটা সংস্কৃত শব্দ-সম্পদের সুনির্বাচিত প্রয়োগের ফলে।

'ছবি'র পরেই অতি সুপরিচিত 'শা-জাহান' কবিতায়ও কবি নিজের বিপরীতমুখীন চিন্তাধারা উপভোগ করিয়াছেন, অনবদ্য ভাষায় ও ছন্দে এবং সবল কল্পনায় সেই চিন্তাধারাকে রূপদান করিয়া। কিন্তু যে যুক্তি শৃঙ্খলা, ভাব-পারম্পর্য, চিন্তার যে স্বচ্ছ অবারিত গতি, যে অনুভূতির দীপ্তি "বলাকা"র কবিতাগুলির সম্পদ, তাহা এই 'শা-জাহান' কবিতাটিতে দেখা যায় না—চিন্তাসূত্রের মধ্যে কোথায় যেন একটা জট পাকাইয়া গিয়াছে, এই কথাই কেবল মনে হয়। কবি বলিতেছেন,

দিল্লীশ্বর শা-জাহান স্ত্রীবিয়োগের অন্তর-বেদনা চিরন্তন করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তাজমহল রচনা করিয়াছিলেন, সর্বশোকাপহারী যে কাল মানুষের সকল শোক ভুলাইয়া দেয়, তাজমহলের সৌন্দর্যে ভুলাইয়া সেই কালের হৃদয় তিনি হরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাজমহল সম্রাটের হৃদয়ের ছবি, নব-মেঘদূত। এই সৌন্দর্য-দূত

> যুগ যুগ ধরি
> এড়াইয়া কালের প্রহরী
> চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া
> "ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

কিন্তু দিল্লীশ্বর আজ নাই, তাঁহার অতুল বৈভব, তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যও আজ নাই।

> তবুও তোমার দূত অমলিন
> শ্রান্তি ক্লান্তিহীন,
> তুচ্ছ করি রাজ্যভাঙাগড়া
> তুচ্ছ করি জীবন মৃত্যুর ওঠা-পড়া,

যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

কিন্তু তাহার পরই কবি বলিতেছেন, এই যে "ভুলি নাই" একথা মিথ্যা। স্মৃতির পিঞ্জর-দুয়ার খুলিয়া অতীতের চির-অস্ত-অন্ধকার বাহির হইয়া যায়। সমাধি-মন্দির স্মরণের আবরণে মরণকে যত্নে ঢাকিয়া রাখে মাত্র।

জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তা'র নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন বিহীন

এ-জীবন কাহার জীবন ? সম্রাট-মহিষীর জীবনের কথা কবি বলিতেছেন না, বলিতেছেন সম্রাটের জীবনের কথা। সম্রাট মহিষীর মৃত্যু-স্মৃতিকে সম্রাট স্মরণের আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজের জীবন জীবন-উৎসবের শেষে এই ধরাকে মৃৎপাত্রের মতন দুই পায়ে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার জীবনের রথ তাঁহার কীর্তিকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তা'র রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।

জীবন সম্বন্ধে এই তত্ত্ব সম্রাট-মহিষী সম্বন্ধেও সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও 'ভুলি নাই, ভুলি নাই' একথা হয়ত মিথ্যা হইয়া যায় না। মানুষ মাত্রেই স্মরণের আবরণে মরণকে যত্নে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর স্মৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, সম্রাটও তাহাই চাহিয়াছিলেন। তিনি জীবনকে

বাঁধিয়া রাখিতে চাহেন নাই, পারেনও নাই; তাঁহার নিজের জীবনকেও কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রিয়জনের জীবন ও মৃত্যুর স্মৃতিকে মানুষ বাঁচাইয়া রাখিয়া বলিতে চায় "ভুলি নাই, ভুলি নাই", একথা যেমন সত্য, জীবনকে মানুষ ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারেনা, একথাও তেমনই সত্য—এই দুইয়েতে ত সত্যকার কোনও বিরোধ নাই।

তাজমহলকে উপলক্ষ্য করিয়া আর একটি কবিতা "বলাকা"য় আছে (৯ নং)। কবিতাটি সুন্দর, মধুর, এবং "বলাকার" মূল সুর যে গতিতত্ত্ব সেই সুরে এই কবিতাটি বাঁধা নয়। সম্রাট্ তাঁহার প্রিয়তমার প্রেমের স্মৃতি এই সমাধি-মন্দিরের মধ্যে অমর করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাজমহলের সৌন্দর্যে সেই প্রেমের স্মৃতি মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাজমহলের বস্তুপুঞ্জের মধ্যে অথবা সম্রাটের হৃদয়ের মধ্যেই সেই স্মৃতি আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই, সম্রাট ও সম্রাট-মহিষীকে অতিক্রম করিয়া তাহা আজ ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে সর্বমানবের অনন্ত বেদনার মধ্যে,—রবীন্দ্র-কবিচিত্তের অতি পুরাতন অনুভূতি।

সম্রাট মহিষী,
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্যে হ'য়েছে মহীয়সী।
সে-স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেছে বেড়ে
সর্বলোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে।
অঙ্গ ধরি' সে অনঙ্গ স্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি।
রাজ-অন্তঃপুর হ'তে আনিলে বাহিরে
গৌরবমুকুট তব,—পরাইলে সকলের শিরে
যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী
রাজার প্রাসাদ হ'তে দীনের কুটীরে,—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।

কিন্তু গতিতত্ত্ব সর্বোচ্চ সুসম্বদ্ধ কাব্যাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে 'চঞ্চলা' ও 'বলাকা' কবিতা দুইটিতে।

বিরাট নদীর অদৃশ্য নিঃশব্দ জল অবিচ্ছিন্ন অবিরল ছুটিয়া চলিয়াছে, কবির কল্পনাদৃষ্টির সম্মুখে তাহার যতটুকু দেখা যাইতেছে তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই, ভৌগোলিক তথ্যের কোন মূল্য নাই এই দৃষ্টির সম্মুখে। এই অবিরত চলার কায়াহীন বেগে সমস্ত বিরাট শূন্য স্পন্দিত শিহরিত হইয়া উঠে; ভৈরবী বৈরাগিনী সেই রুদ্ররূপ, তাহার প্রেম সর্বনাশা, সে তাই ঘরছাড়া। উন্মত্ত তাহার অভিসার, কিছুই সে সঞ্চয় করে না, শোক ভয় কিছুই তাহার নাই, পথের আনন্দবেগে অবাধে সে পাথেয় ক্ষয় করিয়া চলে; প্রতি মুহূর্তে সে নূতন, পবিত্র, তাহার চরণস্পর্শে মৃত্যুও প্রাণ হইয়া উঠে। তাহার রূপ নটীর, চঞ্চল অপ্সরীর। তাহার নৃত্য-মন্দাকিনী প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবনকে নূতন ও পবিত্র করিয়া তুলিতেছে। নদী সম্বন্ধে চিন্তা ও কল্পনা যখন অনুভূতির এই স্তরে আসিয়া পৌঁছিল তখন কবির ব্যক্তিগত জীবনও এক মুহূর্তে গভীর ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল, অনুভূতি তখন উপায় ও উপলক্ষ্যকে ছাড়াইয়া কবির চিত্তমূল ধরিয়া টান দিল। নদীর অবিচ্ছিন্ন অবিরাম রুদ্রগতি নিজের চিত্তে সংক্রামিত হইল, কবি বলিয়া উঠিলেন,—

> ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
> ঝঙ্কার মুখর এই ভুবন মেখলা,
> অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
> নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
> বক্ষ তোর উঠে রনরনি'।
> নাহি জানে কেউ
> রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ
> কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা। (৮নং)

নদী স্রোতকে উপলক্ষ্য করিয়া কবির মনে পড়িতেছে নিজের জীবন-স্রোতের কথা। তিনিও ত প্রতিদিন চলিয়া আসিয়াছেন রূপ হইতে রূপে, প্রাণ হইতে প্রাণে, যাহা কিছু পাইয়াছেন তাহাই ক্ষয় করিয়া আসিয়াছেন দান হইতে দানে, গান হইতে গানে। তারপর একদিন তিনি অরূপের নিস্তব্ধ গহনে, একের নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে নিজকে নিমগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আবার পুরাতন

* * * সেই স্রোত হ'য়েছে মুখর
তরী কাঁপিছে থরথর।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে
তাকাসনে ফিরে!
সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি'
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে, অকূল আলোতে। (৮ নং)

'চঞ্চলা'য় দেখিলাম নদীর চলমান রুদ্ররূপ দেখিয়া কবির চিত্তস্রোতও চঞ্চল এবং মুখর হইয়া উঠিল। 'বলাকা' কবিতায় (৩৬ নং) দেখিতেছি, হংস-বলাকার উন্মুক্ত ডানার নিরুদ্দেশ যাত্রাধ্বনি শুনিয়া একমুহূর্তে কবির চিত্তে মনে বিশ্বজীবনের অনন্ত অলক্ষিত ব্যাকুল অবারিত অনির্দেশ যাত্রার কল্পনা জাগিয়া উঠিল। এই অনুভূতির এমন অপূর্ব অপরূপ কাব্যাভিব্যক্তি অতুলনীয়; এবং সর্বাপেক্ষা এই একটি কবিতাই "বলাকা"-গ্রন্থকে তাহার মহার্ঘ কাব্যমূল্য দান করিয়াছে। এমন সুন্দর পরিবেশ, সবল কল্পনা, মননের এমন স্বচ্ছ অবারিত গতি, এমন ভাবব্যঞ্জনা, এমন নিখুঁত অপরূপ শব্দ-সজ্জা ও গাম্ভীর্য, সর্বোপরি এমন কাব্যময় প্রকাশ "বলাকা"র আর কোনও কবিতাতেই দেখা যায় না।

শ্রীনগরে ঝিলম নদীর উপর নৌকায় কবি তখন বাস করিতেছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, অন্ধকার কাল জলের উপর তারায় খচিত আকাশের ছায়া পড়িয়া মনে হইতেছে যেন তারাফুল ভাসিতেছে। নিস্তব্ধ দুই তীরে পর্বতশ্রেণী, তাহারই পাদমূলে সারি সারি দেওদার বন। মনে হইল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে কথা কহিতে চাহিতেছে, স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছেনা, শুধু অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। এমন সময়, এমনই পরিবেশের মধ্যে এক ঝাঁক হংসবলাকা স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করিয়া, অন্ধকারের বক্ষবিদীর্ণ করিয়া মাথার উপর দিয়া মুহূর্তের মধ্যে দূর হইতে দূরান্তরে শূন্যতা হইতে শূন্যতায় উড়িয়া চলিয়া গেল। দেওদার বন, তিমিরমগ্ন গিরিশ্রেণী শিহরিয়া উঠিল। শিহরিয়া উঠিল কবির অন্তর, শিহরিয়া উঠিল কবির চিত্ত, শিহরিয়া উঠিল কবির চিন্তা ও কল্পনা, হংসবলাকার শব্দায়মান

উন্মুক্তপক্ষ স্পর্শ করিল কবিচিত্তের গভীরতম স্তর, এক মুহূর্তে কবির অনুভূতি সচকিতে জাগিয়া উঠিল,

মনে হ'ল, পাখার বাণী
দিল আনি'
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি,
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে' বেদনার ঢেউ উঠে জাগি'
সুদূরের লাগি
হে পাখা বিবাগী !
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনওখানে"।

কবি তখন শূন্যে জলে স্থলে সর্বত্র উদ্দাম চঞ্চল পাখার শব্দই কেবল শুনিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে, মাটির তৃণ মাটির আকাশে ডানা ঝাপটাইতেছে, পাহাড়, বন সমস্তই উন্মুক্ত ডানায় উড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে অন্ধকার চমকিয়া উঠিতেছে। আরও

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনে রাতে
এই বাসা-ছাড়া পাখী ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনও খানে।"

এ পর্যন্ত আমরা দেখিলাম, কবি সৃষ্টির গতি-সত্যকে রূপাশ্রিত করিয়া রসমণ্ডিত করিয়া অত্যন্ত নিবিড় ভাবে গভীর ভাবে উপভোগ করিলেন, অনুভূতির মধ্যে উপলব্ধি করিলেন, এবং তাহাকে অপূর্ব কাব্যাভিব্যক্তি দান করিলেন। কিন্তু একদিন এই গতি-সত্য নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে স্পর্শ করিল; 'ঝঙ্কার-মুখরিত এই ভুবন মেখলা, অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা' কবিকে উতলা করিয়া তুলিল, শুধু তাহাই নয়, তাঁহার কল্পনা-দৃষ্টির সম্মুখে এক গভীরতর সমস্যারও সৃষ্টি করিল। জীবনরথচক্রের গতিই যদি একমাত্র সত্য হয়, তাহা হইলে ত একদিন জীবন মৃত্যুতে আসিয়া তাহার চরম বিরতি লাভ করিবে, জীবনের গতি-আবর্ত সেইখানে আসিয়া সমাপ্ত হইবে। এই প্রত্যক্ষ মৃত্যু-ভাবনা তখন কবি-চিত্তকে অধিকার করিল; সৃষ্টির অনন্ত গতিশীলতার মধ্যে ত নিজের চলিয়া যাওয়ার ইঙ্গিতটুকুও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। কিন্তু, এই চিন্তার প্রথম স্তরে কোনও বেদনাবোধ নাই, বরং পথ যাত্রার আনন্দই যেন কবি উপভোগ করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে,—

যতক্ষণ স্থির হইয়া থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যতকিছু বস্তুভার।

* * *

যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হ'তে থাকে ক্ষয়
পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃত পানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া উঠে প্রতিক্ষণ।
ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখ পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস্ পিছে?

আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
রবোনা ঘরের কোণে থেমে।
আমি চির-যৌবনেরে পরাইব মালা
হাতে মোর তারি ত বরণ ডালা।

* * *

ওরে মন
যাত্রার আনন্দ গানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি। (১৮ নং)

কিন্তু ক্রমশঃ যেন মৃত্যুর এই চিন্তা চিত্তের কোণে একটু বেদনার সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিল; যে কবি এই জগৎ ও জীবনকে এমন নিবিড় করিয়া ভালবাসিয়াছেন, মৃত্যু-ভাবনা তাঁহাকে ব্যথিত করিবে বই কি? কবি যেন এই মৃত্যু-বিরহের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজিবার চেষ্টা করিতেছেন। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে কোথাও কোনও মিল আছে, তাহাই কবি অনুভব করিতে চাহিতেছেন,—

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে;

* * *

এক হ'য়ে গেছে আজ আমার জীবন, আর
আমার ভুবন
ভালবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভাল।

* * *

তবুও মরিতে হ'বে, এও সত্য জানি
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবেনা
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবেনা,
মোর হিয়া ছুটিবেনা

অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে ;
মোর কাণে কাণে
রজনী কবেনা তার রহস্য বারতা,
শেষ করে যেতে হ'বে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

এই ভাবনার সঙ্গে বেদনা জড়িত আছেই, কিন্তু সান্ত্বনা ও কি নাই ? কবি বলিতেছেন, নিশ্চয়ই আছে।

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনখানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিতনা
সব তার আলো
কীটে কাটা পুষ্পসম এতদিনে হ'য়ে যেত কালো। (১৯ নং)

য়ুরোপে তখন প্রবল সমরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মরণের তাণ্ডব নৃত্য তখন দিকে দিকে। দূর হইতে সেই মৃত্যুর গর্জন কানে আসিয়া পৌছিতেছে। এই যে মরণে মরণে আলিঙ্গন ইহার মধ্যেও জীবন-সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। জীবনের হাটে পুরাণ সঞ্চয় নিয়ে বেচা কেনা আর কত কাল চলিবে, দিনে দিনে সত্যের পুঁজি ফুরাইতেছে, বঞ্চনা বাড়িয়া উঠিতেছে, মরণ সমুদ্র পার হইয়া, মৃত্যুস্নানে শুচি হইয়া জীবনকে নূতন করিয়া পাইতে হইবে,—

কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি,—
"তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।"

ঘরে ঘরে বিচ্ছেদের হাহাকার, মাতৃকণ্ঠের ক্রন্দন, প্রেয়সীর আর্তনাদ ; কিন্তু সমস্ত তুচ্ছ করিয়া মানুষ নূতন উষার স্বর্ণদ্বার অতিক্রম করিবার আশায় নবজীবনের অভিসারে মরণ-মহোৎসবে ছুটিয়া চলিয়াছে দলে দলে, 'কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার, শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন, চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন।' দেশে দেশে দিকে দিকে মানুষের যত পাপ যত অন্যায়, 'লোভ

নিষ্ঠুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ, জাতি-অভিমান, মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান' আজ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, মৃত্যুযজ্ঞে আজ তাহা বিসর্জন দিতে হইবে। এই যে অভ্রভেদী বিরাট মৃত্যুর রূপ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া,—

বল অকম্পিত বুকে,
"তোরে নাহি করি ভয়
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে আমি করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।" (৩৭ নং)

ইহাই কবির সান্ত্বনা, মৃত্যুযজ্ঞের ইহাই সার্থকতা। সৃষ্টির গতিকে একদিন মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেই হয়, কিন্তু সেইখানেই সব শেষ হইয়া যায় না, সৃষ্টি ও জীবন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া নূতন গতির, নূতন মুক্তির সন্ধান লাভ করে।

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ লজ্জায়,
অহঙ্কার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘর-ছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস রবে
মরিতে ছুটিবে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত ?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হ'বে হারা ?
স্বর্গ কি হ'বে না কেনা ?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবেনা
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবেনা দিন ?
নিদারুণ দুঃখ রাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্য সীমা
তখন দিবেনা দেখা দেবতার অমর মহিমা ? (৩৭নং)

এই আশ্বাস ও বিশ্বাসেই কবি মৃত্যুকে স্বীকার করিলেন ; সৃষ্টির গতি-সত্যই একমাত্র সত্য নয়, এই গতিবেগ হইতে মুক্তিও গতির অন্যতম সত্য। সৃষ্টি শুধু গতি-সর্বস্ব হইতে পারে না, তাহা হইলে তাহার সার্থকতা কোথায়? সেই সার্থকতা গতি হইতে মুক্তিতে। সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এই দুইটি সত্য।

এতক্ষণ যে কবিতাগুলির আলোচনা করা গেল, তাহা ছাড়াও "বলাকা"য় অনেকগুলি কবিতা আছে যেখানে কোনও তত্ত্ব অথবা সত্য কবির কল্পনা অথবা মননের বিষয়বস্তু নয়, যেখানে কোনও সুগভীর সৃষ্টি-রহস্য কবিকে গভীরভাবে আলোড়িত করিতেছে না। এই কবিতাগুলি রবীন্দ্র-সুলভ নিসর্গ সৌন্দর্যে মণ্ডিত, সহজ অনুভূতি ও উপলব্ধিতে সার্থক এবং অন্তর-রহস্যে সুনিবিড়। ৯ নং (হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে, নিজ হাতে), ১১ নং (হে মোর সুন্দর), ১২ নং (তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে), ১৪ নং (কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে), ১৫ নং (মোর গান এরা সব শৈবালের দল), ১৭ নং (হে ভুবন, আমি যতক্ষণ তোমারে না বেসেছিনু ভাল), ২০ নং (আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি), ২২ নং (যখন আমায় হাতে ধরে আদর করে), ২৪ নং (স্বর্গ কোথায় জানিস্ কি তা, ভাই), ২৫ নং (যে-বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল), ২৭ নং (আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা), ২৮ নং (পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান), ২৯ নং (যে দিন তুমি আপনি ছিলে একা), ৩০ নং (এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো), ৩২ নং (আজ এই দিনের শেষে), ৩৫ নং (জানি আমার পায়ের শব্দ), ৩৮ নং (সর্ব দেহের ব্যাকুলতা), ৪০ নং (এই ক্ষণে মোর হৃদয়ের প্রান্তে), ৪২ নং (যে কথা বলিতে চাই), ৪৩ নং (তোমারে কি বারবার) প্রভৃতি কবিতা সমস্তই এই পর্যায়ের। "গীতিমাল্য" ও "গীতালি"র অধ্যাত্ম-উপলব্ধির শান্তি ও তৃপ্তির সুরের সঙ্গে এই পর্যায়ের অনেকগুলি কবিতার একটা নিবিড় আত্মীয়তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভাগবতোপলব্ধি এই সব কবিতায় আর ও উচ্চ গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে,—দেবতা প্রিয়তম এবং বন্ধুর আসন অধিকার করিয়াছেন বহুদিনই, দেবতাকে লাভ করিয়া কবি কৃতার্থ এবং পরিপূর্ণ হইয়াছেন, শুধু এ কথাই সত্য নয়, কবিকে লাভ করিয়াও দেবতা কৃতার্থ এবং পরিপূর্ণ হইয়াছেন, এমন কি

এই যে ভুবন যতক্ষণ কবি ইহাকে ভাল না বসিয়াছেন, ততক্ষণ তাহার আলো খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার সকল ধনের সন্ধান পায় নাই, ততক্ষণ নিখিল গগন হাতে দীপ লইয়া শূন্য পানে শুধু পথ চাহিয়াছিল ; আজ তাহাকে কবি ভাল বাসিয়াছেন বলিয়াই সে সার্থক হইয়াছে (১৭ নং), যতক্ষণ দেবতা একা ছিলেন, ততক্ষণ দেবতার নিজকেই নিজে দেখা সম্পূর্ণ হয় নাই,—

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে ত হয়নি' তোমার দেখা

* * *

আমি এলেম ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দকুসুম।
আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার ফাগুন ভরা আনন্দ,
জীবনমরণ তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাইত তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

* * *

আমায় দেখ্‌বে বলে, তোমার অসীম কৌতূহল
নইলে ত এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল। (২১নং)

অথবা,

জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রি দিনে শুনতে তুমি পাও,
খুসি হ'য়ে পথের পানে চাও।

* * *

আমি যতই চলি তোমার কাছে
পথটি চিনে' চিনে'
তোমার সাগর অধিক করে নাচে
দিনের পরে দিনে। (৩৩ নং)

কতগুলি কবিতা কেবল মিলনের পূর্ণ তৃপ্তি ও শান্তিতে আনন্দ-বিভোর, নিসর্গ-সৌন্দর্যে স্বচ্ছ ও নির্মল (১০,২৬, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪২

ইত্যাদি) এবং ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিতে রহস্যময়। নিজের অধ্যাত্ম-উপলব্ধি-জনিত আত্মবিশ্বাস এবং মুক্তির আনন্দও কতকগুলি কবিতায় সুপরিস্ফুট। যতদিন দেবতা তাঁহার একান্ত সাথে সাথে ছিলেন, তখন মনে মনে ভয় ছিল, ভাবনা ছিল, কখন তাঁহাকে হারাই, কখন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিরাগ ভাজন হই; আজ আর সে ভয় নাই।

যখন আমায় হাতে ধরে
আদর করে
ডাকলে তুমি আপন পাশে,
রাত্রি দিবস ছিলাম ত্রাসে
পাছে তোমার আদর হ'তে অসাবধানে কিছু হারাই,
চলতে গিয়ে নিজের পথে
যদি আপন ইচ্ছা মতে
কোনওদিকে এক পা' বাড়াই,
পাছে বিরাগ-কুশাঙ্কুরের একটি কাঁটা একটু মাড়াই!
মুক্তি এবার মুক্তি আজি
উঠ্‌লো বাজি
অনাদরের কঠোর ঘায়ে,
অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর সকল গাঁয়ে।
ওরে ছুটি, এবার ছুটি, এই যে আমার হ'লো ছুটি,
ভাঙ্‌লো আমার মনের খুঁটি,
খসলো বেড়ি হাতে পায়ে;
এই যে এবার
দেবার নেবার
পথ খোলসা ডাইনে বাঁয়ে।

* * *

আঘাত হানি'
তোমারি আচ্ছাদন হ'তে যেদিন দূরে কোথাও টানি'
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি'
দেখি বদন খানি। (২২ নং)

দেবতার নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াই যেন কবি দেবতাকে বেশী করিয়া পাইলেন, আত্ম-প্রত্যয়ও দৃঢ় হইল। এতদিন কবি শুধু নিবেদন করিয়াছেন, আজ ভগবানের পালা কবির কাছে চাহিবার।

তুমি ত গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।
আর সকলেরে তুমি দাও।
শুধু মোর কাছে তুমি চাও!

* * *

মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তা'র বেশী ফিরে তুমি পাও! (১৮নং)

মুক্তির আনন্দ কবির আজ সর্ব অঙ্গে মনে, আত্ম-প্রত্যয়ের উপর সেই আনন্দ প্রতিষ্ঠিত; আজ তাই কবি আবার অজানার পথে যাত্রী হইয়াছেন,—'আমি যে অজানার যাত্রী, সেই আমার আনন্দ * * * অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই ত মুক্তি'—

ভাবিস্ বসে' যেদিন গেছে সেদিন কি আর ফিরবে?
সেই কূলে কি এই তরী আর ভিড়বে?
ফিরবেনা রে, ফিরবেনা আর, ফিরবেনা,
সেই কূলে আর ভিড়বেনা।

* * *

কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ! (৩০নং)

কবির কল্পনায় ও অনুভূতিতে

বঁধুর হিয়া মধুর হ'য়ে আছে
সেই অজানার দেশে!

প্রাণের ঢেউ সে এমনি করেই নাচে
এমনি ভালবেসে।

* * *

সে-গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে,
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে।

* * *

জোয়ার ভাঁটার নিত্য চলাচলে
তার এই আনাগোনা।
আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
মোদের চেনাশুনা।
তারে নিয়ে হ'ল না ঘর বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা,
এমনি করেই আসা যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরি জাল বোনা। (৪৪ নং)

"বলাকা"য় একটি কবিতা আছে, 'স্বর্গ কোথায় জানিস্ কি তা, ভাই?' আমরা আগে দেখিয়াছি, কবি আর একটি কবিতায় বলিয়াছেন, ভগবান গড়িয়াছেন মাটির ধরণী, আর কবিকে দিয়াছেন স্বর্গ গড়িবার ভার। এই কবিতাটিতে (২৪ নং) দেখিতেছি কবির কল্পনা ও অনুভূতিতে সেই স্বর্গের কোনও ঠিক্‌ঠিকানা নাই, তাহার আরম্ভ নাই শেষও নাই, দেশ নাই দিশাও নাই, দিবসও নাই, রাত্রিও নাই। কবি সেই শূন্য স্বর্গে, ফাঁকির ফাঁকা ফানুসে বহুদিন বিহার করিয়াছেন, আর নয়। আজ তিনি বলিতেছেন,—

কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির 'পরে ধূলামাটির মানুষ।
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে সুখে।

আমার জন্ম-মৃত্যুরি তরঙ্গে
নিত্য নবীন রঙের ছায়া খেলায় সে-যে রঙ্গে।

* * *

স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে।

"পলাতকা"য় আমরা সেই মাটি-মায়ের স্বর্গের ঠিকানা পাইলাম।

"পলাতকা"র কবিতাগুলি ১৩২৪-২৫র চৈত্র-বৈশাখের মধ্যে লেখা। "বলাকা"য় কবি অসমছন্দে কবিতায় এক নূতন আঙ্গিক সৃষ্টি করিয়াছিলেন—শক্তিও বীর্যে, শব্দ-সজ্জা নৈপুণ্যে, ধ্বনি-গাম্ভীর্যে সেই ছন্দ বাঙ্‌লা কাব্যে এক নূতন ঐশ্বর্যের সৃজন করিয়াছে। সেই ভঙ্গ, অসম ছন্দই "পলাতকা"য় আর এক নূতন রূপে দেখা দিল—সর্বপ্রকার অলঙ্কার বর্জিত, একান্ত সহজ ঘরোয়া শব্দ ও বাক্যভঙ্গিতে সরল ও অনাড়ম্বর, অথচ কোথাও অভদ্র নয়, পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মত স্বচ্ছ, মুক্ত সহজ ও স্বাধীন। কবিতাগুলি অনেকটা গল্পের ধরণে বলা, স্বচ্ছ সহজ ভাষায়; তাহাদের কবিত্ব ধরা পড়ে চকিতে বিদ্যুৎ ঝলকের মত এখানে ওখানে কোন উপমায়, হঠাৎ কোনও চিত্রাভাসে অথবা রহস্য-গর্ভ কোনও বাক্যে। তাহা ছাড়া কাব্যাভাস বোধ হয় ছড়াইয়া আছে গল্পগুলির টানা-পোড়েনের মধ্যে, গল্পগুলিই যেন কাব্যময়। কবির অতীন্দ্রিয় জীবনের সুগভীর অনুভূতি এই গল্পগুলির মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে; তাহার সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে কবির সুনিবিড় নিসর্গপ্রীতি। প্রথম কবিতাটিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কবির বাগানে খেলা করে একটি পোষা হরিণ ও একটি কুকুরছানা; একদিন,—

ফাগুন মাসে জাগ্‌ল পাগল দখিন হাওয়া
শিউরে উঠে আকাশ যেন কোন্-প্রেমিকের রঙীন-চিঠি-পাওয়া
শালের বনে ফুলের মাতন হ'ল সুরু,
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে জাগ্‌ল কাঁপন দুরুদুরু।
হরিণ যে কার উদাস-করা বাঁশি
হঠাৎ কখন শুনতে পেলে আমরা কি তা' জানি!

তাই যে কাল চোখের কোণে
চাউনি তাহার উতল হ'ল অকারণে ;
তাই যে থেকে থেকে
হঠাৎ আপন ছায়া দেখে'
চম্‌কে দাঁড়ায় বেঁকে।

তারপর একদিন বিকাল বেলায় ঝিকিমিকি আলোর খেলায় আমলকী বন যখন অধীর, আমের বোলের গন্ধে তপ্ত হাওয়া যখন ব্যথিত, তখন হরিণ মাঠের পরে মাঠ পার হইয়া নিরুদ্দেশের আশায় ছুটিয়া গেল—'সম্মুখে তার জীবণমরণ একাকার, অজানিতের ভয় কিছু নেই আর'।

কেন যে তা সে ই কি জানে ? গেছে সে যার ডাকে
কোনোকালে দেখে নাই যে তাকে।
আকাশ হ'তে' আলোক হ'তে, নতুন পাতার কাঁচা সবুজ হ'তে
দিশাহারা দখিন-হাওয়ার স্রোতে
রক্তে তাহার কেমন এলোমেলো
কিসের খবর এলো !

* * *

জন্ম হ'তে আছে যেন মর্মে তারি লেগে,
আছে যেন ছুটে চলার বেগে,
আছে যেন চল চপল চোখের কোনে জেগে।
কোনও কালে চেনে নাই সে যারে
সেই ত তাহার চেনা শোনার খেলাধূলা ঘোচায় একেবারে।
আঁধার তারে ডাক দিয়েছে কেঁদে,
আলোক তারে রাখ্‌লনা আর বেঁধে। ('পলাতকা')

সেই পুরাতন দু'চার ছত্রে অপূর্ব নিসর্গ-পরিবেশ সৃষ্টির নৈপুণ্য, এবং ইন্দ্রিয়াতীত জীবনের রহস্যময় অনুভূতি, দুইই সহজেই এই কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যায়। "পলাতকা"র অন্যান্য কবিতায়ও তাহার আভাস আছে ; কিন্তু রহস্যানুভূতির খানিক স্পষ্ট পরিচয় আছে 'মালা' 'কালো মেয়ে', এবং আরও স্পষ্ট 'হারিয়ে যাওয়া' কবিতাটিতে।

আরও আছে এই কবিতাগুলিতে—দুঃখের প্রতি, বেদনার প্রতি কবি

হৃদয়ের অপূর্ব দরদ, সুকোমল সহানুভূতি। কবি নিজের জীবনে দুঃখ ও বেদনার উপর জয়ী হইয়াছেন, তাহার উর্দ্ধে উঠিয়াছেন,—তবু, আমাদের প্রতিদিনের সমাজ ও সংসারে যত দুঃখ ও বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহার প্রতি তিনি তাকাইতেছেন অত্যন্ত দরদ ও সহানুভূতির দৃষ্টি লইয়া, যত দুঃখী ব্যথিত হৃদয় সকলকে তিনি গ্রহণ করিতেছেন নিজের হৃদয়ের ভিতর। শৈলর দুঃখ, বিনুর বঞ্চনার বেদনা, অপূর্বর মাসির লাঞ্ছনা ও মহত্ত্ব, মঞ্জুলির মায়ের স্মৃতির অপমান, বঞ্চিত পিতৃহৃদয়ে ভোলার স্নেহ-আব্‌দারের স্পর্শ, মনুর ছেঁড়া চিঠির টুক্‌রায় জ্বলে-ওঠা পুরাতন স্মৃতি, পাগল মহেশের আত্মভোলা বৃহৎ প্রাণ, সব কিছু কবি-হৃদয়ের সুকোমল সহৃদয়তার স্পর্শে রসে ও রহস্যে সুনিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। স্বল্প কথায় অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি, দুই চার লাইনে মানব-মনের অন্তর্লোকের রহস্য উদ্‌ঘাটন, হঠাৎ এখানে ওখানে ছড়ানো স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, দুঃখ ও বেদনার সুকোমল করস্পর্শ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যানুভূতির অস্পষ্ট আলোক এই কবিতাগুলিকে অপরূপ মাধুর্য ও সুনিবিড় আত্মীয়তা-বোধের ঐশ্বর্য দান করিয়াছে। একটি কবিতাও বর্ণনা-বাহুল্য দ্বারা পীড়িত ও ভারাক্রান্ত নয়, গল্প-বলার আনন্দের জন্যই শুধু গল্প বলা নয়—এত স্বল্প কথায়, এমন অনাড়ম্বরে, এমন স্বচ্ছ সহজ ভাবে যে মানব মনের সঙ্গে মানব মনের আত্মীয়তা স্থাপন করা যায়, "পলাতকা"র কবিতাগুলি না পড়িলে সহজে তাহা জানা যায় না। "পলাতকা"র অধিকাংশ কবিতাই শুধু মানব মনের পরিচয়জ্ঞাপক; আমাদের এই ধরার ধূলা মাটির স্বর্গে মানব চিত্ত কত আপাতঃ তুচ্ছ সুখ ও দুঃখে, ব্যথা ও বেদনায়, প্রেম ও গঞ্জনায়, স্নেহ ও লাঞ্ছনায়, প্রীতি ও অবহেলায় নীরবে দৃষ্টির বাহিরে কি ভাবে আন্দোলিত আলোড়িত হয় তাহাই নিপুণ তুলির স্পর্শে ফুটাইয়া তোলা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু দু'একটি কবিতা আছে যেখানে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অন্যায় অবিচারের প্রতি কঠোর ইঙ্গিত সহজেই ধরা পড়ে, যেমন 'মুক্তি' ও 'নিষ্কৃতি' কবিতায়। 'দশের ইচ্ছা বোঝাই করা' আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারে নারীত্বের অবহেলা সহজে আমাদের মন ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা। নারীত্বের পূর্ণ সম্ভাবনার খবর আমাদের বাঁধা ধরা এই ঘরকন্নার ঠাঁসবুনান জীবনযাত্রার পথে প্রবেশ করিবার কোনও পথই নাই।

সুখের দুখের কথা
একটুখানি ভাব্‌ব এমন সময় ছিল কোথা!
এই জীবনটা ভাল, কিম্বা মন্দ, কিম্বা যা' হোক-একটা-কিছু
সে কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগু-পিছু।
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চল্‌ছে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা!
শুনি নাই ত মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা!

কিন্তু আজ বাইশ বৎসর বিবাহিত-জীবন যাপনের পর দীর্ঘ অসুখের ছল করিয়া মৃত্যু যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, তখন এই মেয়েটির হেলা-ফেলার জীবনে প্রথম বসন্ত দেখা দিল, নারীত্বের পূর্ণ সম্ভাবনার আভাস যেন জাগিল।

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জান্‌লা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠ্‌চে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল ফোটা।

* * *

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব আকাশ মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক্‌।
মরণবাসর ঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক্‌

যারে আমার প্রাণী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু,
হেলা আমায় করবেনা সে কভু !
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী।
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হ'তে পার করে দাও কালের পারাবার।

আমাদের সমাজে বালবিধবা কন্যা ঘরে রাখিয়া প্রৌঢ় অথবা বার্দ্ধক্যে পিতার দ্বিতীয়বার বিবাহ খুব অসাধারণ নয়। ইহার মধ্যে সমাজ জীবনের যে দুঃখ ও গ্লানি, নারীত্বের যে-অবমাননা, যে নিদারুণ ট্রাজেডি আত্মগোপন করিয়া আছে, সচরাচর আমাদের তাহা চোখে পড়েনা। 'নিষ্কৃতি' কবিতায় কবি সেই গ্লানি ও অবমাননা, দুঃখ ও বেদনা সবিস্তারে সুনিপুণ ভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছেন, এবং উদ্ঘাটন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বর্তমান সমাজের যুবক যুবতীর হাতে সেই আঘাতের প্রত্যাঘাত কোথায় তাহারও যেন ইঙ্গিত করিয়াছেন। পিতা যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া

বৌকে নিয়ে শেষে
যখন ফিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি পড়ে'
পুলিন তা'কে বিয়ে করে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চ'লে
সেইখানেতেই ঘর পাত্‌বে বলে।
আগুন হ'য়ে বাপ
বারে বারে দিলেন অভিশাপ।

তখন এই ভাবিয়া মন খুশী হয় যে, মঞ্জুলিকা দিনের পর দিন যে আঘাত পাইয়াছে, অবশেষে সে-আঘাত সে ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছে। হয়ত ইহাই একমাত্র পথ, হয়ত ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু তাহাতে কবিতাটির কাব্য-মূল্য কতটুকু বাড়িয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন।

যাহাই হউক, "পলাতকা"র নানা গল্প কথায়, নানা ভাবে কবি এই কথাই স্বীকার করিলেন, এই ধূলামাটির ধরা-স্বর্গবাসী যত জীব ইহারাই কবির পরমাত্মীয়, ইহারাই ত তাহাদের 'আপন হিয়ার পরশ দিয়ে' সকাল সন্ধ্যায় কবির গানের দীপে আলো জ্বালাইয়াছে, কবি-জীবনের যাহা কিছু শাদা কাল তাহা ত ইহাদেরই আলোছায়ার লীলা,—

> নানান প্রাণের প্রীতির মিলন নিবিড় হ'য়ে স্বজনবন্ধু জনে
> পরমায়ুর পাত্রখানি জীবনসুধায় ভরছে ক্ষণে ক্ষণে।

আজ জীবন-সায়াহ্নে প্রেম-পূর্ণ অন্তরে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে কবি স্বীকার করিলেন,—

> তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের সূর্য ডোবার বেলায়
> তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—
> এই ভাল আজ এ সঙ্গমে কান্না হাসির গঙ্গা যমুনায়
> ঢেউ খেয়েছি, ডুব্ দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
> এইত ভাল ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়
> তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নূতন প্রাণের আশায়।
>
> (শেষ গান, "পলাতকা")

১৩২৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের ভিতর "পলাতকা"র প্রায় সব কবিতা রচনা শেষ হইয়া গেল। তারপর বহুদিন কবির সঙ্গে কাব্য-লক্ষ্মীর কোনও দেখাশুনা নাই। ১৩২৮: পূজার ছুটীর ভিতর দেখিতেছি কবি ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া "শিশু ভোলানাথে"র কবিতাগুলি লিখিতেছেন; এবং সেগুলি শেষ হইতে হইতেই ১৩২৯এ "লিপিকা"র কাব্য-কণিকাগুলি রচনার সূত্রপাত হইতেছে, এবং "প্রবাসী", "ভারতী", "শান্তিনিকেতন পত্রিকা", "সবুজপত্র", "বঙ্গবাণী", "শঙ্খ" প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

"শিশু ভোলানাথ"-গ্রন্থে কবি যেন আবার নূতন করিয়া শিশুজীবন উপভোগ করিলেন, কখনও কেবল খেলাচ্ছলে, কখনও শৈশব-লীলাকে রহস্যজালে মণ্ডিত করিয়া। আগে "শিশু"-গ্রন্থ সম্বন্ধে যে-কথা বলা হইয়াছে, "শিশু ভোলানাথ" সম্বন্ধেও সে-কথা প্রযোজ্য; তবে "শিশু ভোলানাথে"র কল্পনা-রহস্য আরও

গভীর। কবি যেন দূরে দাঁড়াইয়া সুগভীর দরদ দিয়া অনিমেষ আঁখি লইয়া, শিশু-জীবনের অন্তরলোকের রহস্যের মধ্যে দৃষ্টি নিমজ্জিত করিতেছেন, তাহাকে উপভোগ করিতেছেন।

"লিপিকা" গদ্যে লিখিত হইলেও তাহাকে অপূর্ব কাব্য বলা যাইতে পারে। সাহিত্য-সৃষ্টিতে ফর্মের নেশা কবিকে চিরকাল নূতন উৎসাহ জোগাইয়াছে; "লিপিকা"তেও দেখিতেছি কবিতার এক নূতন গদ্যরূপ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কিছুদিন এই নূতন রূপেই সাহিত্য-সৃষ্টি চলিল। ২।৩টি কথিকা ত পরিষ্কার মুক্তছন্দের কবিতা, গদ্যের আকারে লেখা মাত্র। বেশীর ভাগ অবশ্য রূপক-মূলক গদ্যকবিতা, কোনও বিশেষ ভাব-গ্রন্থিকে মুক্ত করিবার চেষ্টা। সূক্ষ্ম ভাবধারা ও বীক্ষণ-নৈপুণ্যে রচনাগুলি সমৃদ্ধ, যদিও সর্বত্র ইহা সুনিবিড় নয়। বাক্য ও পদ-নির্বাচন অনির্বচনীয়, এবং লয় ও তাল নির্দোষ সুরসমৃদ্ধ গীতি-কবিতার। গীতি-কবিতার নূতন রূপ হিসাবে "লিপিকা" বাঙ্‌লা সাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি সন্দেহ নাই, এবং বোধ হয় অননুকরণীয়।

কিন্তু রবীন্দ্র-কবি-জীবনের ভাবপ্রবাহের দিক হইতে "শিশু ভোলানাথ" ও "লিপিকা"র মূল্য অন্যত্র খুঁজিতে হয়। এই দুইটি গ্রন্থেই কবিজীবনকে দেখি একটু নূতন রূপে। যে রবীন্দ্রনাথ একদিন রূপারূপ সৌন্দর্যের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যাইতেই অভ্যস্ত ছিলেন, যিনি ছিলেন চির-অতৃপ্ত, নব নব অনুভূতি যাঁহার প্রাণে নিত্য নব নব রসের সঞ্চার করিত, তিনি যেন আজ দরদী সহৃদয় দর্শক মাত্র, সমস্ত সৌন্দর্য উৎস হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে রাখিয়া তিনি যেন শান্তি ও তৃপ্তিতে জগৎ ও জীবনের দিকে তাকাইয়া আছেন, অনুভূতির আনন্দ অপেক্ষা বুদ্ধি ও চিন্তার দীপ্তি যেন তাঁহাকে প্রসন্নতায় ভরিয়া তুলিয়াছে। যাহা ছিল এক সময় সুগভীর দুঃখ ও বেদনার হেতু, তাহা যেন চিত্তে আনিয়াছে অপার শান্তি। দুঃখ ও বেদনার আভাস আমরা পরবর্তী কাব্য "পূরবী"তেও দেখিব, কিন্তু সে দুঃখে কোনও গ্লানি নাই। পুরাতন সুখ ও দুঃখের স্মৃতি মনের মধ্যে বেদনার সৃষ্টি করিতেছে—"লিপিকা" ও "পূরবী"-গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—কিন্তু সে-বেদনা অপার শান্তি দ্বারা, মাধুর্য দ্বারা মণ্ডিত। এই শান্তি, এই মাধুর্য "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র দান।

১৩৩১ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের গোড়াতে পেরু গবর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করিবার জন্ত রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করেন (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪)। চারমাস পরে মাঘ মাসের গোড়ায় দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করিয়া কবি ইতালি হইয়া ৫ই ফাল্গুন দেশে ফিরিয়া আসেন। "পূরবী"র অধিকাংশ কবিতা এই ক'টি মাসের মধ্যে রচিত ("পূরবী", ৬৩-২২৪ পৃ; ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ হইতে ২৪ জানুয়ারী ১৯২৫)। "পূরবী"-গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'পূরবী'র সাক্ষাৎ "পলাতকা"-গ্রন্থেই আমরা পাইয়াছি। দ্বিতীয় কবিতা 'বিজয়ী' ১৩২৪, চৈত্রমাসে, তৃতীয় কবিতা 'মাটির ডাক' ১৩২৮, ফাল্গুনে, চতুর্থ কবিতা 'পঁচিশে বৈশাখ,' ১৩২৯'র জন্মদিনে, এবং পঞ্চম কবিতা 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' ১৩২৯, আষাঢ়ে কবি-কনিষ্ঠের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। 'শিলংয়ের চিঠি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বকুল বনের পাখী' পর্যন্ত সবগুলি কবিতাই ১৩৩০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুনের ভিতর লেখা। কবি এই কাব্য-পর্বের (অর্থাৎ প্রথম হইতে 'বকুল বনের পাখী' পর্যন্ত) নামকরণ করিয়াছেন 'পূরবী'। দ্বিতীয় পর্বের অর্থাৎ য়ুরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণকালে রচিত কবিতাগুলির (১৩৩১) নাম দিয়াছেন 'পথিক'; এবং কতগুলি পুরাতন কবিতা যাহা এতদিন কোনও গ্রন্থে গ্রথিত হয় নাই, সেগুলিকে গাঁথিয়াছেন 'সঞ্চিতা' নামে। 'সঞ্চিতা' পর্বের কবিতাগুলি আমাদের আলোচনার বহির্ভূত, কারণ "পূরবী"-গ্রন্থের ভাব-প্রবাহের সঙ্গে তাহাদের কোনও যোগ নাই। মূল সুর অথবা ভাবপ্রবাহের দিক্ হইতে "পূরবী" পর্যায়ের কবিতাগুলির সঙ্গে 'পথিক' পর্যায়ের কবিতাগুলির বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই; কাজেই এই দুই পর্যায়ের কবিতাগুলি এক সঙ্গেই আলোচনা করা যাইতে পারে।

"পূরবী"-গ্রন্থ 'বিজয়ার করকমলে' উৎসর্গীকৃত। দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ কালে কবির স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; আর্জেণ্টাইনের ডাক্তাররা পেরু যাইতে বারণ করিলেন। শেষ পর্যন্ত পেরু আর যাওয়া হইয়া উঠিল না। আর্জেণ্টাইনের নগরবাসীরা সহর হইতে ২০ মাইল দূরে San Isidore নামে একটি সুন্দর বাগান-বাড়ীতে কবির বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। এখানে Signore Victoria de Estrada নামক একটি অতি বিদূষী বিদগ্ধা মহিলার সঙ্গে কবির পরিচয় হয়, এবং তিনি ক্রমশঃ কবির প্রতি শ্রদ্ধায় ও প্রীতিতে আকৃষ্ট

হন। San Isidoreর বাগান বাড়ীতে এই মহীয়সী মহিলার সঙ্গ ও সেবাই ছিল কবির আনন্দ। এই মহিলাই কবির 'বিজয়া'। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই কবি "পূরবী"র 'অতিথি' কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন,—

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মাধুর্য সুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি
দূরদেশী পথিকেরে।*

"পূরবী"র রবীন্দ্রনাথ ষষ্টিতম বৎসরোত্তীর্ণ কবি। জীবন-সায়াহ্নের গোধূলি আলোকে এই দিনগুলি আলোকিত। কবির ভাব ও কল্পনায় 'সূর্য আলোর অন্তরালের দেশের' স্পর্শ আসিয়া লাগিয়াছে, বিদায়ের 'বিষন্ন মূর্চ্ছনা' শোনা যাইতেছে। "পূরবী"তে একদিকে দেখিতেছি, কবি এই 'বিষন্ন মূর্চ্ছনা'কে ছিন্নশৃঙ্খল 'বন্দীযৌবনের ব্যগ্র কলোচ্ছ্বাসে' ডুবাইয়া দিয়াছেন, স্থবিরের শাসন চূর্ণ করিয়া 'বিদ্রোহী নবীন বীরের' সিংহাসন রচনা করিয়াছেন, তাহাকেই সম্ভাষণ জানাইয়াছেন। আর একদিকে দেখিতেছি, এই সুন্দরী ধরণীর বক্ষলগ্ন জীবনের দিনগুলি ফুরাইয়া আসিতেছে, কবি তাহা অত্যন্ত বেদনার সহিত অনুভব করিতেছেন,—বেলা চলিয়া যাইতেছে, দিন সারা হইয়া আসিতেছে, পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীণা বাজিতেছে, এই ধরণীর প্রাণের খেলায়, তাহার আনন্দোৎসবে কবি আর বেশী দিন যোগ দিতে পারিবেন না, এই ভাবনা কবি-হৃদয়কে অব্যক্ত বেদনায় ভরিয়া তুলিতেছে। "পূরবী"র অধিকাংশ কবিতা ব্যথার রঙে রঙীন্। অথচ দুঃখের আবেগ নাই, বেদনার চঞ্চলতা নাই—শুদ্ধ শান্ত করুণায় মণ্ডিত পূরবীর সুরটি! বার্দ্ধক্যের শান্ত-সমাহিত সাধনা ও তপস্যার শুদ্ধ মাধুর্য কবিচিত্তের এই ফিরিয়া-পাওয়া-যৌবনের তীব্র শক্তি এবং "পূরবী"র ব্যথাভরা করুণ সুরটির উপর এক অপরূপ রসের তুলি বুলাইয়া দিয়াছে। বহুদিন যে যৌবন তাহার সমস্ত আনন্দ ও সৌন্দর্য লইয়া অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই অতীত এক দুস্তর কালসমুদ্র পার হইয়া আসিয়া এই জীবনের অপরাহ্নবেলায় কবিচিত্তে অভিনব মায়াতন্ত্র রচনা করিয়াছে। "পূরবী"তে দেখিতে পাই, শৃঙ্খলহীন যৌবনের দিনগুলিকে

* Signore Victoria de Estrada সম্বন্ধে জর্মান মনীষী Count Hermann Keyserlingএর স্মৃতিলিপি কয়েক বৎসর আগে Viswa-Bharati Quarterly নামক ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। কৌতূহলী পাঠক তাহা দেখিয়া লইতে পারেন।

জীবনের মধ্যে ফিরিয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনে অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যখন কবিচিত্তে এই কথা জাগিল,—জীবনের সন্ধ্যা আসিয়াছে, ধরণীর প্রাণের খেলা ত এইবার ফুরাইবে, অথচ জানালার ফাঁকে ফাঁকে কাজের কক্ষকোণে অতীত জীবনের নানা বিচিত্র রসমাধুর্যময় দিনগুলি আসিয়া উকিঝুঁকি মারিতেছে, তখন যেন মুহূর্তে অন্তর বেদনায় ভরিয়া গেল, সমস্ত চিত্ত ক্রন্দনমুখী হইয়া উঠিল।

কিন্তু, যে-রসমাধুর্যময় অতীত জীবনের জন্য এই সায়াহ্নবেলায় সমস্ত অন্তর কাঁদিয়া উঠিল, সে-দিনগুলি জন্মলাভ করিয়াছিল কোথায়? যে-সখী সকাল বেলায়, বটের তলায়, শিশির ভেজা ঘাসের উপর বসিয়া কবিহৃদয় সুরের মাধুর্যে ভরিয়া দিয়াছিল সে-সখী জীবনের কোন্ শুভমুহূর্তে আসিয়া ধরা দিয়াছিল?

পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের এক অপূর্ব সম্পদ। এই অপূর্ব সম্পদটি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে নানা ভাবে নানা রূপে ও রসে, সুরে ও ছন্দে লীলায়িত করিয়াছে, তাঁহাকে হাসি কান্না সুখ দুঃখ, তৃপ্তি অতৃপ্তি বিরহ মিলনের বিচিত্র দোলায় দোলাইয়াছে। এই প্রেম ও সৌন্দর্য-বোধের প্রথম পরিচয় আমরা লাভ করি "ছবি ও গানে"। তারপর "কড়ি ও কোমল" হইতে আরম্ভ করিয়া "মানসী"তে, "চিত্রাঙ্গদা"য় ইহার ব্যগ্র বিকাশ এবং তাহার পর "সোনার তরী" "চিত্রা "ও" চৈতালী"তে সেই ব্যগ্রতা ও চঞ্চলতার সম্পূর্ণ সার্থকতা পাঠককে প্রেম ও সৌন্দর্যের এক মাধুর্যময় জগতে আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। রবীন্দ্র-কবি-জীবনের এই অধ্যায়টি বাস্তবিকই মাধুর্যরসে কানায় কানায় ভরপুর, এবং আমার মনে হয়, নিছক কাব্য ও শিল্প হিসাবে এমন অপরূপ সৃষ্টি আগেকার জীবনে ত কোথাও নাইই, পরবর্তী কালেও অনেক দিন পর্যন্ত সেই সৃষ্টির বিকাশ কোথাও দেখিতে পাই না। আমার বিশ্বাস, সেই প্রেম ও সৌন্দর্যময় জীবনকে এক সুমহান্ সাধনা ও তপশ্চর্যার আড়ালে বন্দী রাখিয়া বহুকাল পরে তপস্যার মহিমা ও চিন্তার দীপ্তিদ্বারা শক্তিযুক্ত ও জয়যুক্ত করিয়া "পূরবী"-গ্রন্থে তাহার শৃঙ্খল উন্মোচন করিলেন।

কিন্তু, "নৈবেদ্য-খেয়া" হইতে যে কবি-জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল তাহার মূলে এই প্রেম-সৌন্দর্যমাধুর্যময় জীবনের কাছে কবিকে বিদায় লইতে হইল।

"সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি"র প্রেম ও বিচিত্র রসানুভূতির কবি রবীন্দ্রনাথ "খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"-র অধ্যাত্ম-লোকের একতম ও গূঢ়তম রসানুভূতির মধ্যেই নিজকে একান্তভাবে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অধ্যাত্ম-জীবনের শান্ত স্থির বিরামপূর্ণ আনন্দরস তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। কবি নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাত্মময়, শান্ত, পরিতৃপ্ত জীবন হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অথচ সেই জীবন দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া যৌবন ও সৌন্দর্যের জীবনে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন, এবং "বলাকা"য় আমরা তাহার প্রথম আভাস লাভ করিলাম। "পূরবী"তে যাহা শক্তিতে, সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে দেখা দিবে, "বলাকা"য় তাহার সূচনা দেখা গেল।

১৩২৩ সালের বৈশাখের প্রথম খরদাহে নববর্ষের রুদ্ররূপকে আহ্বান করিয়া কবি "বলাকা" হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার পর হইতেই কবি-জীবনে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তনের সূত্রপাত হইল। না জানি কেন মনে হইতে লাগিল—জীবন হইতে একটা জিনিস হারাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহাকে ফিরিয়া না পাইলে কিছুই আর ভাল লাগিতেছে না। চারিদিকে যাহারা নিবিড় বন্ধনে জড়াইয়া আছে, এই পৃথিবীর যে সকল বস্তু এই জীবনকে ঘিরিয়া আছে, তাহাদের লইয়া প্রেম ও সৌন্দর্যের অনুভূতি একসময়ে কবির পক্ষে যত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, তাহা যেন দুর্লভ দুরধিগম্য হইয়া উঠিয়াছে; অথচ, এদিকে জীবনের দিনগুলি ফুরাইয়া আসিল। শেষে কি এই দুঃখ থাকিয়া যাইবে, যাহারা আপন হিয়ার পরশ দিয়া কবির হৃদয়ে

> * * সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
> * * * * এই জীবনের সকল শাদা-কালো
> যাদের আলো-ছায়ার লীলা * *

সেই যে কবির 'আপন মানুষগুলি' তাহাদের সঙ্গলাভ, তাহাদের প্রাণের সাড়া হইতে এই জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায় বঞ্চিত থাকিতে হইবে? না, চাই না গূঢ় তত্ত্বের পাকে পাকে আপনাকে জড়াইতে, চাই না জীবনের রহস্য বুঝিতে, অধ্যাত্ম-জীবনের নিগূঢ় ও দুর্লভ আনন্দের মধ্যে নিজকে ডুবাইয়া রাখিতে। ইহার চেয়ে জীবনের শেষ কয়টা "দিনের আলো থাকিতে

থাকিতে' এই হৃদয়ের সুহৃত্তম যাহারা তাহাদের হাতে হাত দিয়া গাহিয়া লই, বলিয়া লই,

"এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো,
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্না-হাসির গঙ্গা যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধূলো-মাটি ফল হাওয়া জল তৃণতরুর সনে।

ইহাই "পলাতকা"র শেষ এবং "পূরবী"র প্রথম কবিতা। বাস্তবিকই ত যে ধরার ধূলা মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর মধ্যে এই জীবন গানে গন্ধে রসে রূপে প্রেমে আনন্দে সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠিল তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন কতদিন বাঁচে? নীড়-ছাড়া বিহঙ্গ ত আপন মনের আনন্দে মুক্ত বাতাসে উদার আকাশে শুধু ঊর্দ্ধে আরও ঊর্দ্ধে অসীম আলোর বিচ্ছুরিত জ্যোতির মধ্যে কোথায় যে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু সন্ধ্যার রঙীন্ আলোয়-আলোয় যখন সকল জগৎ রঙীন্ হইয়া উঠে তখন সেই সুদূর আকাশের প্রান্ত হইতে নীড়ের পাখী নীড়ের পানেই উন্মুখ হইয়া ফিরিয়া আসে; অনন্ত অসীমের নেশা তাহাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। এই ভাবিয়াই কি কবি "কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে' আবার ফিরিয়া আসিলেন? যেমন করিয়াই হউক, যৌবনের সেই লুপ্ত দিনগুলিকে ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই তাঁহার প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। সেই আকাঙ্ক্ষার প্রথম স্ফুরণ ত "বলাকা"তেই দেখা গিয়াছে, এবং "বলাকা"র সুর "পূরবী"তে তাহার শেষ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে 'বিজয়ী' কবিতাটিতে। এই কবিতাটির ভাব ও ছন্দ যেন "বলাকার" সুরেই গাঁথা। তাহার কারণও আছে, "পূরবী"র প্রথম কবিতা দু'টি ১৩২৪ সালে লেখা এবং তখনও কবি "বলাকা"র জীবন-সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অন্য কোন গ্রন্থে এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই তাহা "পূরবী"তে স্থান লাভ করিয়াছে, নহিলে "পূরবী"র ভাব-ধারার সঙ্গে 'বিজয়ী' কবিতাটির কোন ঐক্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

"শিশু ভোলানাথে"র পর হইতে অর্থাৎ ১৩২৬ এবং ১৩২৭, এই পরিপূর্ণ দু'টি বৎসর এবং ১৩২৮ সালেরও দীর্ঘ কতকগুলি মাস বঙ্গবাণীর মুখর কবিটি স্তব্ধ নীরব হইয়া রহিলেন।

মাহুষের জীবনের চিন্তাধারা যখন এক রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্য রাজ্যে গমনোদ্যোগ করে, তখন একদিকে বিচ্ছেদের দুর্ভাবনা, অন্যদিকে সম্মুখে ভবিষ্যতের অস্পষ্ট প্রেরণা এই দুইএ মিলিয়া যে সংশয় ও সংঘাতের সৃষ্টি হয় তাহাতে কবিচিত্তের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত নীরব হইয়া পড়া কিছুই আশ্চর্য নয়। "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে"র নিবিড় অধ্যাত্ম-জগৎ হইতে জীবন ক্রমেই দূরে সরিয়া আসিতেছিল এবং অতীতের সর্বব্যাপী প্রেম ও সৌন্দর্যের এক নূতন রূপ ক্রমেই দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত হইতেছিল। এই পরিবর্ত্তনের মুখে "বলাকা"য় যাহা লাভ করিয়াছিলেন তাহা যতটা যৌবনের শক্তি এবং জীবন ও সৌন্দর্যের নিগূঢ় জ্ঞান ততটা সহজ উপলব্ধি নয়। কিন্তু জীবনের গতি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া মোড় ফিরিয়াছিল "বলাকা"য় তাহার সন্ধান মিলিল না; অতৃপ্তি রহিয়াই গেল। এই অতৃপ্তি ও সংশয় আরও বাড়িয়া উঠিল মহাযুদ্ধের অবসানে রণক্লান্ত পশ্চিমের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং কবিহৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া। এই ক্ষমতামত্ত ঐশ্বর্য গর্বিত পশ্চিম, যন্ত্রসভ্যতার কেন্দ্রভূমি পশ্চিম, জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিতকলার লীলাভূমি পশ্চিম—এরা ত মানুষের প্রাণকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়া পৃথিবীর বুকে ধন ও রক্ত ছড়াইয়া যৌবনের তাণ্ডব-লীলায় মাতিয়াছিল, শক্তির অদ্ভুত বিকাশ দেখাইয়াছিল, কিন্তু এরা মঙ্গলকে, কল্যাণকে লাভ করিতে পারিল কি? জীবনের নিগূঢ় রহস্যও ত এদের কম জানা ছিল না, বিশ্বের কল্যাণকামী মহাত্মাদের শান্তি ও প্রীতির বাণীও ত এরা কম শোনে নাই, কিন্তু কিছুই ত এদের রক্ষা করিতে পারিল না। কবি অবশ্য দেশে ফিরিয়া আসিয়া সর্বাগ্রে একথা স্বীকার করিলেন যে প্রাণের লীলার অদ্ভুত বিকাশে, কর্ম ও চিন্তার জগতে শক্তির স্ফুরণে 'পশ্চিমজয়ী হইয়াছে' কিন্তু ব্যক্তি-জীবনে কবিচিত্তের মধ্যে তাঁহাকে এ কথাও স্বীকার করিতে হইল, প্রাণের গতি-চাঞ্চল্যে কিংবা শুধু শক্তির স্ফুরণে কল্যাণ নাই, আনন্দ নাই, জীবনের নিগূঢ় তত্ত্বোপলব্ধির মধ্যেও নাই, প্রেম ও শান্তির রহস্য-প্রচারের মধ্যেও নাই। আছে, এই যে জীবনের আশেপাশে চারিদিকে ধূলা মাটি ফল ফুল তৃণ নিজেদের বিলাইয়া দিয়াছে, হাসি-কান্নায় ভরা এই যে মানব-সংসার চিরকাল ধরিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে, ইহাদেরই মধ্যে। ব্যক্তিজীবনের শান্তি ও কল্যাণকে লাভ করিতে হইলে এই সংসারের বিচিত্র লীলার মধ্যে, তাহার ঋতু উৎসবের মধ্যে, তাহার সুখ ও দুঃখের মধ্যে, যাহাদের

জন্য 'স্বর্গ হইতে বিদায়' লইয়া কবিচিত্ত এই ধরার স্নেহে পুষ্ট সকল প্রাণীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহাদেরই মধ্যে খুঁজিতে হইবে। মনের মধ্যে এই কথাটি যেখানে জাগিল সেইখানেই "পূরবী"র সৃষ্টি।

"সোনার তরী"র 'দরিদ্র', কিংবা 'স্বর্গ হইতে বিদায়', "চিত্রা", "চৈতালি" "ক্ষণিকা"র অনেক কবিতাতে দেখা যায় এই ধরিত্রীর প্রতি কবির প্রাণের কি একটা অচ্ছেদ্য ভালবাসার টান, তাহার সঙ্গে প্রেম কি নিবিড়! এই জীবনের এবং পৃথিবীর সকল বস্তুই যেন কবির প্রাণে অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছে ; যাহা কিছু দেখিতেছেন,

> কিছু তুচ্ছ নয়
> সকলি দুর্লভ বলে' আজি মনে হয়।

গ্রীষ্মের খরতাপ, বর্ষার মেঘ, শরতের রৌদ্র, সবুজ মাঠ, হরিৎ ক্ষেত্র, সকলের সঙ্গে কি সুগভীর আত্মীয়তা, প্রকৃতির সঙ্গে কি নিবিড় যোগ! কিন্তু, বলিয়াছি, এই জীবন হইতে তিনি বিদায় লইয়াছিলেন। তারপর কত সুদীর্ঘ কাল কাটিয়া গিয়াছে। ঐ মাধুর্য-সৌন্দর্যময় জীবন-বৈচিত্র্য হইতে বিদায়ের পর জীবনের উপর দিয়া কত ভাব-প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদিন পর আবার সেই অতীত জীবনের কথা মনে পড়িল কেন? কেন মনে পড়িল

> শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে
> যেদিন হাওয়া উঠ্‌ত ক্ষেপে
> ফাগুন বেলায় বিপুল ব্যাকুলতায়,
> যেদিন দিকে দিগন্তরে
> লাগ্‌তো পুলক কি মন্তরে
> কচিপাতার প্রথম কলকথায়,
> সেদিন মনে হ'ত যেন
> ঐ ভাষারি বাণী যেন
> লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জ ছায়ে। ('মাটির ডাক')

কেন মনে হয়, আশ্বিনের ফসল ক্ষেতে, কিংবা 'নীল আকাশের কূলে কূলে সাগর ঢেউয়ের তালে তালে', সবুজের নিমন্ত্রণে কবির প্রাণের দাবী আছে। দাবী

যে এক সময় ছিল, একথাও সত্য, কিন্তু কবি নিজকেই নিজে দোষী করিতেছেন,—

কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিলি চাবী ?

যে মাটী-জননীর কোলে তাঁহার জন্ম, সেই কোল হইতে কে তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়াছিল ? আজ কে যেন কবিকে বলিতেছে,—

বাঁধন-ছাড়া তোর সে নাড়ী
সইবেনা এই ছাড়াছাড়ি
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।
('মাটির ডাক')

কবিও এতদিন 'নানা মতে নানান্ হাটে' নানান্ পথে হারাণ কোল খুঁজিয়া খুঁজিয়া কেবলি ঘুরিয়া মরিয়াছেন। এতদিন পরে আবার তাহার সন্ধান মিলিল।

আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে
আজিকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ। ('মাটির ঘর')

উপরে "পূরবী"র যে-কবিতাটি উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই অনুরূপ ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে 'লীলা-সঙ্গিনী'তেও। জীবনের যে প্রিয়তমা লীলা-সঙ্গিনী কবিকে একা ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ আবার তাহার পুরাতন বন্ধুকে মনে পড়িয়াছে। সেই কবেকার পুরাতন পরিচিত সুরে আবার আসিয়া সে কিঙ্কিনী বাজাইল,সে-শব্দে কবি দুয়ার-বাহিরে আসিয়া যেমনই চাহিলেন অমনি তাহাকে চিনিয়া লইতে পারিলেন। এই লীলা-সঙ্গিনী অতীতের সেই মধুর দিনগুলিতে কতদিন কত লীলার ছলে আসিয়া কবিকে বারবার দেখা দিয়া গিয়াছে, তাহার কঙ্কন-ঝঙ্কারে কবির বন্ধ দুয়ার কতদিন খুলিয়া গিয়াছে, বাতাসে বাতাসে তাহার ইসারা ভাসিয়া আসিয়াছে 'কখনও আমের নবমুকুলের বেশে', কখনও 'নবমেঘভারে', কত বিচিত্র রূপে চঞ্চল চাহনিতে কবিকে সে

বার বার দুলাইয়াছে। এতদিন পরে আজ সকল কথাই কবির মনে পড়িয়া গেল। শুধু কি তাই, কত প্রশ্ন যে বুকের মধ্যে উতলা হইয়া উঠিল,—

এলোচুলে বহে এনেছ কি মোহে
সেদিনের পরিমল?
বকুল-গন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল?

'শেষ অর্ঘ্য' সুন্দর একটি সনেট; সেখানেও ঐ একই কথা। যে কবিকে প্রত্যূষে 'মহেন্দ্রক্ষণে প্রথম নিশান্তের বাণী' শুনাইয়াছিল, যে তাঁহাকে এই 'নিখিলের আনন্দ মেলায়' ডাকিয়া আনিয়াছিল, যে

"দিল আনি
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে; যে সুন্দরী যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি' কম্পিত পরশে
চম্পক অঙ্গুলি পাতে তন্দ্রা-যবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা"—

সে কবির জীবন হইতে কোথায় খসিয়া পড়িল, কোথায় আত্মগোপন করিল? অথচ আজ তাহাকে না পাইলে ত আর কিছুতেই চলিতেছে না; জীবন-সন্ধ্যায় একবার তাহার দর্শন, একবার তাহার আলিঙ্গন চাই। তাই সব কিছু তুচ্ছ করিয়া প্রিয়তমের সন্ধান

এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

যাহাদের সঙ্গে কবির অতীত জীবন জড়াইয়া ছিল, তাহাদের কতজন আজ সন্ধ্যা বেলায় 'কাজের কক্ষকোণে' আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, হাতছানি দিয়া ইঙ্গিত করিতেছে। চোখের সমুখ দিয়া 'বকুল বনের পাখী' উড়িয়া যাইতেছে; কবি তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন, তুমি ত এক সময়ে আমার মনোজগতের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতে, আজ যে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দূরে চলিয়া আসিয়াছি, তা'র বেদনা কি তোমার বুকে বাজে নাই? আমি যে

তোমায় ভালবাসিতাম। আষাঢ়ের জলভরা মেঘের খবর কি তুমি বলিতে পার, সে কি আমার আশায় উন্মুখ হইয়া থাকে না? নদীর কলতানে আমার অভাবের বেদনা কি বেসুরে বাজে না? আমি হারাইয়া গিয়াছি বলিয়া আঁখিজলে কাহারও বুক কি ভাসিয়া যায় নাই?

শোনো শোনো ওগো বকুলবনের পাখী,
সেদিন চিনেছ, আজিও চিনিবে না কি?
পার ঘাটে যদি যেতে হয় এইবার
খেয়াল-খেয়ায় পাড়ি দিয়ে হবো পার,
শেষের পেয়ালা ভরে' দাও হে আমার
সুরের সুরার সাকী।
('বকুল বনের পাখী')

একদিকে এই বেদনাময় আকুলতা আর একদিকে বিশ্বাসের দীপ্তি—'আমি ত এই বিশ্বের উচ্ছ্বসিত আনন্দের পরিপূর্ণ অনুভূতির জীবনকেই আবার ফিরিয়া পাইলাম,' নহিলে এই জীবন-সন্ধ্যায় 'পঁচিশে বৈশাখ'

পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণ দেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার
নীলকান্ত আকাশের থালা
তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা।

সাজাইয়া আনিবে কেন?

এর পরে আমি যে কবিতাটির উল্লেখ করিতে চাই, কবি তাহার নামকরণ করিয়াছেন 'তপোভঙ্গ'। এই অপূর্ব কবিতাটিকে ছন্দে এবং ধ্বনিতে, শব্দসজ্জায় এবং বর্ণনাভঙ্গীতে, ভাবের স্বচ্ছ প্রকাশ এবং অনুভূতিতে উর্বশীর সহিত একাসনে স্থান দিতে আমার একটুও দ্বিধা নাই। উর্বশীতে কি শক্তিতে অথচ কি সংযত কৌশলে শব্দ দ্বারা ধ্বনিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, অপূর্ব কল্পনায় ভাবকে রূপদান করিয়া কবি সৌন্দর্যের তীব্র অথচ শান্ত ও নির্মল অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়াছেন! 'তপোভঙ্গে'ও প্রকাশ-ভঙ্গী একই কিন্তু অনুভূতি হইতেছে তারুণ্যের সদানন্দ প্রাণশক্তির। কি করিয়া কবি এই অপূর্ব বর্ণনাচাতুর্য ও প্রকাশ-ভঙ্গিমা এতদিন পরে পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন, তাহা

বাস্তবিকই বিস্ময়কর। "তপোভঙ্গে" কবি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন আমার মনে হয় তাহা এই,—

কালের অধীশ্বর মহেশ্বরের হিসাবের খাতায় ত মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিনের কথাই লিখা থাকে। তিনি কি কবির 'যৌবন-বেদনা-রসে উজ্জ্বল দিনগুলির' কথা ভুলিয়া গিয়াছেন? সেদিনগুলি কি অযত্নে ভাসিয়া গিয়াছে, না 'স্বেচ্ছাচারী হওয়ার খেলায় নির্মম হেলায়' বিস্মৃতির ঘাটে ডুবিয়া গেল? একদিন সেই যৌবনের দিনগুলি প্রাণশক্তিতে কি পরিপূর্ণ ছিল—তাহারা ভোলানাথের রুদ্ররূপকে সৌন্দর্যে সাজাইয়া দিয়াছিল, ডম্বরু-শিঙ্গা কাড়িয়া লইয়া হাতে মঞ্জিরা বাঁশরী তুলিয়া দিয়াছিল; তাঁহার তপস্যাকে 'গীতরিক্ত হিম মরুদেশে' নির্বাসিত করিয়া সন্ন্যাসের অবসান করিয়া দিয়া বিশ্বের ক্ষুধার জ্যোতির্ময় সুধাপাত্রটি তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিল। মহেশ্বরের এই নব সৌন্দর্যরূপই কবি-হৃদয়কে প্রেমে ও গানে, রসে ও সৌন্দর্যে ভরিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কবির যৌবনের দিনগুলির সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথের এই নবরূপকে কে সংহরণ করিয়া লইয়াছিল? নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যে 'অগীত সঙ্গীতে' 'অশ্রুর সঞ্চয়ে' পরিপূর্ণ জ্যোতির্ময় সুধাপাত্রটি কি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল? কবির যৌবনের লুপ্ত দিনগুলি কি নিঃস্ব কাল-বৈশাখীর নিঃশ্বাসে আকুলিয়া উঠিল? না, সে দিনগুলি লুপ্ত হইয়া যায় নাই; মহেশ্বরের প্রেম ও সৌন্দর্যের চিরন্তন রূপও নিঃশেষিত হয় নাই—

> নহে নহে, আছে তারা; নিয়েছো তাদের সংহরিয়া
> নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
> রাখো সঙ্গোপনে।

যৌবনের সেই অকারণ আনন্দ-উল্লাস, সৌন্দর্যের সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দ-বেগ 'তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে' শান্ত হইয়া আছে মাত্র। কিন্তু এ তপস্যা কি চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকিবে? যৌবন কি চিরকাল বন্দী হইয়া থাকিবে;—এর কি অবসান হইবে না? হইবেই—

> "চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আবার উন্মত্ত অবসান
> দুরন্ত উল্লাসে।
> বন্দী যৌবনের দিন
> আবার শৃঙ্খলহীন
> বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে

কবি এই তপস্যাকে স্থায়ী হইতে দিবেন না; তিনি যে তপোভঙ্গদূত, স্বর্গের চক্রান্ত। ভোলানাথের ছলনা তিনি জানেন, সেই শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী তপস্যার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া সুন্দরের সাধক কবির হাতেই ত পরাজয় কামনা করিতেছে। সেইজন্যই

বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি' দিব বলে'
আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে'
মৃত্তিকার কোলে।

মহেশ্বরের তপস্যা তখন ভাঙ্গিয়া যায়; তার চিতাভস্ম, বিভূতি সমস্তই খসিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যায়, পরিবর্তে দেখা দেয় পুষ্পমালা। বহুদিন বিচ্ছেদের পরে কবির প্রসাদে আবার উমার সঙ্গে তাঁর মিলন—সেই মিলনের বিচিত্র ছবি কবির বীণায় আবার সুর জাগায়; আর

"কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশী সুন্দরের জয়ধ্বনি-গানে
কবির পরাণে।"

শুধু অপরূপ কাব্যসৃষ্টির দিক হইতে না দেখিয়া এই কবিতাটিকে যদি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের উপর প্রতিফলিত করিয়া এই কথা বলি যে 'তপোভঙ্গ' কবিতায় কবি নিজের তপস্যাও ভঙ্গ করিয়াছেন তবে খুব ভুল করিব কি? আমার মনে হয় কবিগুরু মহেশ্বরের তপোভঙ্গের আড়ালে নিজের এই "নিত্য নূতনের লীলা চিত্ত ভরিয়া" দেখিবার আকুলতার অস্পষ্ট আবরণটি ছিন্ন করিয়া একেবারে আপন মর্মবাণীটি ব্যক্ত করিলেন।

কবিচিত্তের এই পরিবর্তনকে শুধু তাঁহার কাব্যকথার মধ্যেই খুঁজিলে চলিবে না। ভাব ও কথা যে-রূপ ধরিয়া, যে ছন্দে ও ধ্বনিতে আত্মপ্রকাশ করিল, তাহার মধ্যেও সেটা লক্ষ্য করা যায়। 'তপোভঙ্গ' কবিতা সম্পর্কে আমি তাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। শুধু সেই কবিতাটিতেই নয়; "পূরবী"র অনেক কবিতাতেই সে আভাস অতি সুপরিস্ফুট। "সাবিত্রী," "আহ্বান," "সমুদ্র," "যাত্রী" প্রভৃতি কবিতা কিছুতেই "বর্ষশেষ" "সমুদ্রের প্রতি," "রাত্রি," "এবার ফিরাও মোরে" প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া না দিয়া পারে না বাস্তবিক "পূরবী" পড়িলে মনে হয় নিজের পুরাতন ছন্দের জগতেও কবি আবার ফিরিয়া আসিলেন। "বলাকা"তে অবশ্য একটা নূতন ছন্দ প্রথম

সৃষ্টিলাভ করিল ; তাহার মধ্যে একটা বিপুল শক্তি, উদ্দাম গতিবেগ, যাহা আছে যাহা পাইয়াছি সেই জানা সীমার মধ্যে বন্ধনের একটা চঞ্চল অতৃপ্তি, সেই বন্ধন ও অতৃপ্তির হাত হইতে মুক্তিকামনার আবেগ ও উচ্ছ্বাস সমস্তই প্রকাশ পাইয়াছে, শুধু ছন্দে নয়—ভাবেও। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিসের যেন একটা অভাবও তাহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। 'বলাকা'র ছন্দ গতিতে ও শক্তিতে মন ও কল্পনাকে বর্ষার পার্বত্য নদীর মত উদ্দাম বেগে ঠেলিয়া লইয়া যায়, কিন্তু শরতের ভরা নদীর যেমন শান্ত, সংযত, গম্ভীর অথচ দ্রুতগতির তরঙ্গায়িত লীলা আছে এবং তাহার চলার মধ্যে যে-মাধুর্য আছে সেই লীলা ও মাধুর্য তাহাতে নাই। ছন্দের এই লীলা ও মাধুর্যের জগৎ "বলাকা"র দানে সমৃদ্ধ হইয়া "পূরবী"র কবিতাগুলিতে পুনরাবিষ্কার লাভ করিল, ইহাই আমার বিশ্বাস।

আমি এতক্ষণ যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি সেই কথাটি নানাস্থানে কবি-হৃদয় হইতে বিচিত্ররূপে আপনি ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আনন্দে সৌন্দর্যে এক সময় যে জীবন পরিপ্লুত হইয়াছিল, জীবনের সেই আনন্দ ও সৌন্দর্য কোথায় হারাইয়া গিয়াছিল—আজ তাহা জীবন-সন্ধ্যায় অতি ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আবার আসিয়া গোপনে কবির ভাবের ও রূপের রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বড় দ্রুত ক্ষণিকার মত সেদিনের সেই ত্রস্ত আঁখি-যুগল সুনিবিড় তিমিরের তলে ডুবিয়া গিয়াছিল—দুজনের জীবনের চরম অভিপ্রায় সেদিন পূর্ণ হয় নাই ; আজ তাই

> খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা
> খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
> কবে সে যে এসেছিলো আমার হৃদয়ে যুগান্তরে
> গোধূলি-বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে
> ল'য়ে তা'র ভীরু দীপশিখা
> দিগন্তের কোন্ পারে চ'লে গেলো আমার ক্ষণিকা।
>
> * * * * * * *
>
> * * * * *
>
> আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তা'র
> আমার গানের ছন্দ গোপনে করিছে অধিকার,
> দেখি তা'র অদৃশ্য অঙ্গুলি
> স্বপ্ন-অশ্রু-সরোবরে ক্ষণে-ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি। ('ক্ষণিকা')

"খেলা", "কৃতজ্ঞ" প্রভৃতি কবিতায়ও এই একই কথা। "কৃতজ্ঞ" কবিতাটি ভারি চমৎকার একটি সরল মাধুর্য এবং করুণ সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে; অতীত জীবনের ছোট-খাট স্মৃতিগুলি কবিকে কি রকম বেদনা দিতেছে এই একটি কবিতা পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কোন্ অতীত দিনে কবেকার সেই প্রিয়া কবিকে তা'র শেষ চুম্বন দিয়া গিয়াছে। কবি এতদিনের বিচ্ছেদে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আজ যখন আবার তাহাকে মনে পড়িয়াছে তখন বড় আকুল হৃদয়ে এই বিস্মৃতির জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন। সেই শেষ চুম্বনের পরে কত মাধবী-মঞ্জরী থরে থরে শুকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, কত 'কপোতকূজন-মুখরিত মধ্যাহ্ন', কত 'সন্ধ্যা সোনার বিস্মৃতি আঁকিয়া দিয়া', কত 'রাত্রি অস্পষ্ট রেখার জালে আপন লিখন আচ্ছন্ন করিয়া' প্রতি মুহূর্ত 'বিস্মৃতির জাল বুনিয়া' দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে কবি যদি তাঁহার প্রিয়াকে ভুলিয়া গিয়াই থাকেন—আজ তাহার জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন। তবু একদিন এই প্রিয়া কবিকে আলিঙ্গন করিয়াছিল বলিয়াই গানের ফসলে কবি-জীবন ভরিয়া উঠিয়াছিল—'আজও তার শেষ নাই'; তাহার স্পর্শ আজ আর নাই কিন্তু কি যে 'পরশমণি' কবির অন্তরে সে রাখিয়া গিয়াছে যাহার কল্যাণে

> * * * বিশ্বের অমৃত ছবি লেখা দেয় মোরে
> ক্ষণে ক্ষণে—অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
> আমারে করায় পান। * * *
>
> "আজ তুমি আর নাই, দূর হ'তে গেছো তুমি দূরে
> বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিঁদুরে।
> সঙ্গীহীন এ জীবন, শূন্য ঘর হয়েছে শ্রীহীন,
> সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।

এই কবিতাটির করুণ মাধুর্যের তুলনা "পূরবী"র আর একটিতেও আছে বলিয়া মনে হয় না।

আগেই বলিয়াছি, "পূরবী"র 'পথিক' অংশে যে-কবিতাগুলি গ্রথিত হইয়াছে তাহা ১৩৩১ সালে য়ুরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের সময় লেখা; কিন্তু এই কথাটি জানা না থাকিলে কিংবা কবিতার নীচে "আণ্ডেস্ জাহাজ" অথবা "বুয়েনোস এয়ারিস্" লেখাটি না দেখিলে কিছুতেই বুঝিবার উপায়

নাই, এই সহজ সুন্দর মাধুর্যময় কবিতাগুলি জাহাজের নির্জন কক্ষে কিংবা পশ্চিমের জনসংঘাতের উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে বসিয়া লেখা না বাঙ্‌লাদেশের খাল, বিল, নদী, বট, শাল, পলাশ, যুঁই, বেলা, করবীর চিরপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে প্রসূত। 'কিশোর প্রেম', 'অন্তর্হিতা', 'শেষ বসন্ত' প্রভৃতি যে-কোনও কবিতা পড়িলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। স্থান ও কালের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত কি করিয়া সর্বদাই চিরপরিচিত গৃহের সুমধুর আবেষ্টনের মধ্যে বিহার করিয়া ও একই সঙ্গে সমস্ত বিশ্বানুভূতির সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া চলে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময় উৎপাদন না করিয়া পারে না।

'চাপাড্‌ মালাল' কিংবা 'বুয়েনোস এয়ারিসে'ও অতি তুচ্ছ আকন্দ এবং যুঁই যে কবিচিত্তের স্মরণ ও ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছে ইহা বিস্ময়কর নয় কি?

অতীতের সৌন্দর্য ও রসভরা দিনগুলিকে যখনই ফিরিয়া পাইবার ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগিয়াছে তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে শেষের সুরটিও অতি করুণ ঝঙ্কারে হৃদয়তন্ত্রীকে পীড়ন করিয়াছে। এই পীড়া, এই বেদনা সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ও তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতাটিতে।

প্রিয়তমা লীলাসঙ্গিনী এই জীবন-সন্ধ্যায় আবার আসিয়া চিত্তদুয়ারে হানা দিয়াছে; কিন্তু এতদিন পরে বেলা-শেষে সে যে আসিল তাহাকে আমি বরণ করিয়া ঘরে লইতে পারিব কি? পারিলেও আর কতদিন?

> দেখো না কি হায়, বেলা চলে যায়
> সারা হ'য়ে এলো দিন।
> বাজে পুরবীর ছন্দে রবির
> শেষ-রাগিণীর বীণ্।
> এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
> হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশী
> আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি
> গানহারা উদাসীন।
> এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
> নিশীথ অন্ধকারে?
> মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
> অমাবস্যার পারে?

আবার, 'বৈতরণী' কবিতায়, কতবার মরণ-সমুদ্রের খেয়ার তরণী

> এসেছিলো এই ঘাটে আমার এ বিশ্বের আলোতে।
> নিয়ে গেলো কালহীন তোমার কালোতে
> কত মোর উৎসবের বাতি,
> আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাথী,
> দিবসেরে রিক্ত করি' তিক্ত করি' আমার রাত্রিরে।
> সেই হ'তে চিত্ত মোর আশ্রয় নিয়েছে তব তীরে।

কবির হৃদয়ের একদিকে এই সুতীব্র বেদনাবোধ এবং অন্য দিকে ব্যথাজীর্ণ হৃদয় লইয়া শেষ দিনটীর জন্য নীরব প্রতীক্ষা, ইহা পাঠকের চিত্তকেও পীড়িত না করিয়া পারে কি? বাঙ্‌লার যে কবি অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্‌লার, ভারতের ও সমগ্র পৃথিবীর পিপাসু চিত্তকে গানে গন্ধে সৌন্দর্যে মাধুর্যে রসে সৌরভে নন্দিত করিয়াছেন, যিনি অজাত মানব এবং অনাগত কালের জন্যও সুধাপাত্র পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি আজ 'পূরবীর ছন্দে শেষ রাগিণীর বীণা' বাজাইতেছেন, ইহার ভাবনা মাত্রই কবির অনুরক্ত পাঠকের মন ব্যথায় ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। তবু, মনে হয়, জরার পীত উত্তরীয়ের অন্তরালে, বয়সের হিসাবে জীবন-সন্ধ্যার পশ্চাতে যে চির-নূতন চির-অতৃপ্ত প্রাণের পরিচয় আমরা এতকাল তাঁহার জীবনে ও কাব্যে দেখিয়াছি, বারবার যে নব অরুণোদয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই চির-নূতন প্রাণ, নব অরুণোদয় আবার আমরা কবির জীবনে প্রত্যক্ষ করিব, কবির জীবন-দেবতার নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর আহ্বান-বাণী আবার কবির প্রাণে নূতন জীবনের সঞ্চার করিবে।

"পূরবী"র পরবর্ত্তী কাব্য-প্রবাহ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।*

---

* প্রথম রচনাকাল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২। ইহার কোনও কোনও অংশ "কল্লোল", ১৩৩৩, "প্রবাসী", ১৩৩২, "ভারতবর্ষ", ১৩৩৬, প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত।

ছোট গল্প

(১)

সত্য করিয়া বলিতে গেলে বাঙ্‌লা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ছোট গল্পের সৃষ্টিই করিলেন রবীন্দ্রনাথ; তাহার আগে আমাদের সাহিত্যে ছোট গল্প বলিয়া কিছু ছিল না, পরেও যে অসংখ্য ছোট গল্প রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলির সঙ্গে সমান পর্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে, এমন গল্পের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অথচ বাঙ্‌লা সাহিত্যে ছোট গল্পের সংখ্যাদৈন্য কিছু আছে, এখন আর এমন কথা বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের আগে বাঙ্‌লা সাহিত্যে ছোট গল্পের সৃষ্টি যে কেন হয় নাই, একথা ভাবিলে একটু বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বতোমুখী প্রতিভা কখনও ছোট গল্প রচনার দিকে আকৃষ্ট হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। পরিসরে অথবা আয়তনে ছোট, এমন দু'একটি গল্প তাঁহার আছে, কিন্তু ছোট গল্প বলিতে কথা-সাহিত্যের যে বিশেষ প্রকাশটিকে বুঝি, বঙ্কিমচন্দ্রের এই গল্পগুলিকে সে পর্যায়ে ফেলিতে পারি না। স্বল্প-পরিসরের মধ্যে জীবনের একটি ক্ষুদ্র তুচ্ছ খণ্ডাংশকে, কোনও একটি বিশেষ অভিব্যক্তিকে বা বাস্তবানুভূতিকে, দু'একটি ঘটনার আবর্তে, ভাব ও কল্পনার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত করিয়া তাহাকে স্বাভাবিক পরিণতি দান করা, বস্তুর কোনও একটি বিশেষ পরিচয়কে রূপান্বিত করিয়া তোলা, ছোট গল্পের এই যে সুকঠিন কলাকৃতি, রবীন্দ্র-পূর্ব বাঙ্‌লা সাহিত্যে ইহার প্রকাশ নাই বলিলেই চলে। অথচ আমাদের বাঙ্‌লা দেশে কিছুদিন আগে পর্যন্তও শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের পারিবারিক জীবনযাত্রার যে ধারা ছিল, তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া ছোট গল্পের উপাদানই ছিল বেশি। উপন্যাসের সুবৃহৎ জগতে তাহার প্রবেশাধিকার বড় ছিল না; জীবনের যে বৈচিত্র্য, ঘটনার যে তরঙ্গপর্যায়, যে চঞ্চল রসসমৃদ্ধ জীবনলীলা উপন্যাসের প্রাণ, সমস্যার যে বিচিত্র জটিলতা উপন্যাসের ঘটনাস্রোতকে আবর্তে চঞ্চল ও ঘনীভূত করিয়া তোলে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাহার প্রসার খুব বেশি ছিল না। যাহা ছিল, তাহার দিকেও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি ও হৃদয় বেশি আকৃষ্ট হয় নাই, তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিতে সে পরিচয়ও খুব বেশি নাই। সেই জন্যই

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসের উপাদান খুঁজিয়াছেন আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বাহিরে; আমাদের জীবনের মন্দগতি ও ধীরপ্রবাহ তাঁহার চিত্তে উপন্যাসের রোমান্স সঞ্চার করিতে পারে নাই। কি পল্লীতে কি নগরে আমাদের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল ও সহজ, যদিও আজ তাহা নানান্ কারণে জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। পারিবারিক আক্রোশ, সামাজিক দলাদলি যথেষ্টই ছিল; উইল চুরি লইয়া, অন্যান্য দুই চারি রকমের জটিলতর সামাজিক অথবা পারিবারিক ব্যাপার লইয়া হয় ত দ্বন্দ্ব আন্দোলন ইত্যাদিও হইত; এসব উপাদান লইয়া রবীন্দ্র-পূর্ব বাঙ্‌লা সাহিত্যে গল্প-উপন্যাস কম রচিত হয় নাই। কিন্তু তাহার রকম ও বৈচিত্র্য খুব বেশি নাই, কিম্বা খুব উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টিও তাহা লইয়া হয় নাই; দুই চারিটি মাত্র উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত আছে, যেমন, "বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইল" "স্বর্ণলতা"। কিন্তু আমাদের জীবনের বাহিরের এই সহজ ও স্থূলভগোচর দিক্‌টা ছাড়া আর একটি গোপন নিভৃত দুর্লভগোচর দিক্ আছে। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া, একটু সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয় লইয়া এই নিভৃত দিকটির দিকে তাকাইলে সহজেই দেখা যায় পরিবারে ও সমাজে আমাদের দৈনন্দিন জীবন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষোভে আন্দোলিত, বিচিত্র দুঃখ-বেদনায় পীড়িত, সুখ ও আনন্দে উদ্বেলিত। প্রতিদিনের কর্ম-কোলাহলে সহজে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের মুখরতার মধ্যে তাহার ক্ষীণ আহ্বান সহজেই বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু বৃহত্তর জগৎ বলিতে আমাদের কিছু ছিল না, তাহার মুখরতাও বাঙ্‌লা-দেশে বহুদিন পর্যন্ত কিছু শোনা যায় নাই। বলিয়াছি, আমাদের জীবন এক সময় অত্যন্ত সংকীর্ণ ও স্বল্পপরিসর ছিল, এখনও যে তাহা নয় এমন বলা চলে না; কিন্তু সংকীর্ণ ও স্বল্পপরিসর ছিল বলিয়াই জীবনে আমাদের কোন আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কোনও দুঃখ এবং বেদনা-বোধ, সুখ এবং আনন্দানুভূতি ছিল না এমন নয়। মানুষের মন ও হৃদয়ের যত কিছু বিচিত্র ভাব ও অনুভূতি তাহা আমাদের অন্তরের মধ্যে নানান্‌রূপে ও রসে চিত্রিত, বর্ণে ও গন্ধে নন্দিত হইত; কিন্তু তাহা প্রকাশের কোন পথ ছিল না। তাই তাহার স্বরূপ কাহারও জানা ছিল না, জীবনের এই দুর্লভগোচর দিক্‌টাকে জানিবার আগ্রহও ছিল না। জীবনের এই সব ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনা ও খণ্ডাংশ এবং তাহার তুচ্ছতর সুখ দুঃখ লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস রবীন্দ্র-পূর্ব বাঙ্‌লা সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায়

না। অথচ ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ বলিয়াই, পরিসর ইহাদের কম বলিয়াই ইহাদের মধ্যে ছোট গল্পের উপাদানও বেশি করিয়াই ছিল।

(রবীন্দ্রনাথই বাঙ্‌লা-সাহিত্যে সর্বপ্রথম আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর বহির্বিকাশের দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া জীবনের তলদেশে যে নিভৃত ফল্গুধারাটি তাহা আমাদের দেখাইয়া দিলেন। দেখিলাম, সেখানে ঘরের কোণে, নদীর ঘাটে, সহস্র তুচ্ছ পরিচিত স্থানে ও আবেষ্টনে কত সহস্র তুচ্ছ ঘটনা খুঁটিনাটি উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের জীবনে বিচিত্র আশা আকাঙ্ক্ষা অবিরত স্পন্দিত হইতেছে, অসংখ্য ক্ষুদ্র বিক্ষোভে আন্দোলিত হইতেছে। আমাদের দৈনন্দিন কার্যের মধ্যে সেখানে অপরূপ মাধুর্য সুগভীর ভাবরসে বিধৃত হইয়া আছে। আমাদের বৈচিত্র্যবিহীন বাহিরের জীবন সেখানে বৈচিত্র্যে ভরপুর, আবেগে চঞ্চল, সেখানে তাহার কোনও দৈন্য নাই, কোনও অভাব নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিচিত্তের অপূর্ব সুগভীর সহানুভূতি ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়া আমাদের জীবনের এই নিভৃত গোপন প্রবাহটি আবিষ্কার করিয়া তাহাকে আপন ভাব ও কল্পনায়, রূপে ও রসে আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। আমরা একটি নূতন জগৎ ও জীবনের সন্ধান পাইয়া বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম)

কিন্তু জীবনের এই গোপন প্রবাহটি খুঁজিয়া পাওয়ার মধ্যে কবিগুরুর কোন সজাগ চেষ্টা ছিল একথা যেন আমরা কখনও মনে না করি। (রবীন্দ্রনাথ কবি, এবং তাঁহার কবিপ্রতিভা একান্তভাবে লিরিক্ বা গীতিকবিতার প্রতিভা। সরস সাবলীল গীতবহুল ছন্দের মধ্যে একটি অপূর্ব সুর ফুটাইয়া তোলা, একটি অনাহত ধ্বনি বাজাইয়া তোলাই গীতিকবিতার ধর্ম; স্বল্পের মধ্যেই তাহা উচ্ছ্বসিত, যদিও তাহার অধিকাংশই অব্যক্ত, খণ্ডের মধ্যেই তাহার পূর্ণতা, যদিও তাহার রেশটুকু অশেষ। এক হিসাবে ইহাই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পেরও ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের লিরিক্ প্রতিভার সমৃদ্ধির তুলনা নাই, সেই অতুলনীয় সমৃদ্ধি লইয়া তিনি যখন আমাদের জীবনের দিকে তাকাইলেন, বাঙ্‌লাদেশের সহজ অনাড়ম্বর জীবন-প্রবাহ যখন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তখন সংকীর্ণ বৈচিত্র্যবিহীন জীবনের বহির্বিকাশ তাঁহার কবিচিত্তে রসানুভূতির সঞ্চার করিতে পারিল না; তাঁহার গীতমুগ্ধ হৃদয় সহজেই দোলা দিল জীবনের নিভৃত গোপন প্রবাহটি যেখানে জীবনের খণ্ডাংশের মধ্যেই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার

মধ্যেই দুঃখ ও বেদনার, সুখ ও আনন্দের এক একটি সুর পূর্ণ ও উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে, অথচ সেখানেই তাহা শেষ হইয়া যায় নাই, অন্তরের মধ্যে তাহা গুঞ্জন করিয়া বাজিতে থাকে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ ছোট গল্পই একান্তভাবে গীতিকবিতার ধর্ম লাভ করিয়াছে; চিত্তের একটা বিশেষ মুড্ বা ভাব হইতেই তাঁহার বেশীর ভাগ গল্পগুলি অন্তপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। আমার মনে হয়, এক কথায় ইহাই বলা যায় যে, যে-মনোধর্ম, মনের যে বিশেষ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সৃজনী-প্রতিভাকে গীতধর্মী করিয়াছে সেই মনোধর্ম, সেই দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁহাকে তাঁহার ছোটগল্পের উৎসেরও সন্ধান দিয়াছে। গল্পগুলির আলোচনার সময় ক্রমেই একথা আরও পরিষ্কার হইবে, কিন্তু পূর্বাহ্নেই বলিয়া রাখা ভাল যে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প তাঁহার গীতিকবিতারই আর একটি দিক; একটু আলগা করিয়া বলিতে গেলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীতিকবিতারই গল্পরূপ।

(২)

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলির রচনা যে সময়টাতে আরম্ভ হয়, এবং জীবনের যে পর্বটিতে অধিকাংশ গল্পগুলি রচিত হয়, সেই উদ্ভব ও বিকাশের সময়টির প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিলে, তাঁহার ছোট গল্পের উৎসটিকে, ধর্মটিকে, আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। তাঁহার বেশীর ভাগ গল্প রচিত হইয়াছিল মোটামুটি ভাবে ১২৯৮ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩১০ সালের মধ্যে; অবশ্য তাহার পরেও আরও কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ গল্প ১৩১৪ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩২৫ সালের মধ্যে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার গল্পগুলির মূলধর্মটি ঐ ১২৯৮—১৩১০ সালের রচনাগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়। এই বার বৎসরের একটি যুগ রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের স্বর্ণযুগ; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, সৃষ্টি যেন বান ডাকিয়া আসিল। "সোনার তরী" হইতে আরম্ভ করিয়া "চিত্রা", "চৈতালি", "কাহিনী", "কল্পনা", "কথা", "কণিকা"র কবিজীবন একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া "সোনার তরী", "চিত্রা" ও "চৈতালি"র কবিতাগুলিতে সমস্ত বিশ্বজীবনের সঙ্গে কি সহজ ও আনন্দপূর্ণ তাঁহার যোগ; সকল কাজ, সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে

তাঁহার অপূর্ব বিস্ময়কর সৌন্দর্যবোধ। অতি তুচ্ছতম জিনিষটিও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতেছে না; জলে যে হাঁসগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে, নদীর চরে যে লোকটি বসিয়া বসিয়া বাঁখারি চাঁছিতেছে, গ্রামের যে মেয়েটি নদীর ঘাটে বসিয়া অঙ্গের বসন ফেলিয়া দিয়া গা ঘসিতেছে, সবই তাঁহার চোখে পড়িতেছে, সব কিছুর মধ্যেই তিনি অপরিসীম প্রেম ও সৌন্দর্যের বিকাশ দেখিতে পাইতেছেন, সকল জিনিষ মিলিয়া তাঁহার প্রাণে এক অপূর্ব মায়ালোক সৃজন করিতেছে। সৃষ্টির প্রতি তাঁহার একটি অপূর্ব ভালবাসা, একান্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এই সময়ের কবিজীবনের মধ্যে বারবার প্রকাশ পাইয়াছে। মনের যখন এই অবস্থা, জীবনের অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটি জিনিষগুলিও যখন তাঁহার নিকট অপূর্ব বলিয়া মনে হইতেছে, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ হইয়া যখন তিনি প্রকৃতির অতি তুচ্ছ সামান্য ব্যাপারটিকেও অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া মনে করিয়া আকুল আগ্রহে তাহা উপভোগ করিতেছেন, তখন, মনের ঠিক এই পরম মাহেন্দ্র-ক্ষণটিতে তাঁহার ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত হইল এবং দেখিতে দেখিতে সেই অবস্থার মধ্যেই তাঁহার অধিকাংশ গল্পগুলি রচিত ও প্রকাশিত হইয়া গেল।

সেই প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মবোধ, জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যাপার গুলিকেও পরম রমণীয় ও অপূর্ব রহস্যময় বলিয়া অনুভব করা, তাহাদের প্রতি অপূর্ব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, আপনাকে একান্তভাবে নির্লিপ্ত করিয়া দিয়া একমনে জীবনটিকে প্রকৃতির সকল অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া উপভোগ করা—এসমস্তই তাঁহার ছোট গল্পগুলির মধ্যেও অপূর্ব রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

(শুধু তাঁহার কাব্যসৃষ্টি হইতেই নয়, কবির এই সময়কার জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য করিলেও তাঁহার ছোটগল্প রচনার উদ্ভবের সময়টি আমরা বুঝিতে পারিব এবং তাহাতে এই গল্পগুলির বিশেষ ধর্মটি আরও সহজে আমাদের কাছে ধরা দিবে। 'পোস্টমাস্টারে'র মতন একটি সুপ্রসিদ্ধ গল্প ১২৯৮ সালে লেখা। এই সময়, বরং ইহার কিছুদিন আগে হইতেই কবি জমিদারী দেখাশুনার ভার লইয়াছেন, এবং তাঁহার দিনগুলি কাটিতেছে পূর্ব-বাঙ্লার এক নদীর উপরে নৌকায় ভাসিয়া ভাসিয়া—সাজাদপুরে, শিলাইদহে। অপূর্ব আনন্দময়, বৈচিত্র্যে ভরপুর এই সময়কার জীবনযাত্রা। বাঙ্লাদেশের একটি নির্জন প্রান্ত, তাহার নদীতীর, উন্মুক্ত আকাশ, বালুর চর, অবারিত মাঠ,

ছায়া-সুনিবিড় গ্রাম, সহজ অনাড়ম্বর পল্লীজীবন, দুঃখে পীড়িত অভাবে ক্লিষ্ট অথচ শান্ত সহিষ্ণু গ্রামবাসী, সব কিছুকে কবির চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছে, আর কবি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে পুলকে শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে তাহার অপরিসীম সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করিতেছেন। এমনি করিয়াই ধীরে ধীরে বাঙ্‌লাদেশের পল্লীজীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইতে আরম্ভ করিল; গ্রামের পথঘাট, ছেলেমেয়ে, যুবাবৃদ্ধ সকলকে তিনি একান্ত আপনজন বলিয়া জানিলেন। "ছিন্নপত্রে" এই সময়কার প্রত্যেকটি চিঠিতে কবি নিজেই বারবার এসব কথা বলিয়াছেন। পল্লীজীবনের এই সব নানান্ বেদনা ও আনন্দ যখন তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল তখন তাঁহার ভাব ও কল্পনার মধ্যে আপনা-আপনি বিভিন্ন গল্প রূপ পাইতে আরম্ভ করিল, তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনা ও ব্যাপারকে লইয়া এই সব বিচিত্র সুখদুঃখ অন্তরের মধ্যে মুকুলিত হইতে লাগিল। মানব-জীবনের বিচিত্র ঘটনা প্রকৃতির ভাবাময় আবেষ্টনের সঙ্গে এক হইয়া গেল। ইহারই প্রেরণা পাইয়া গল্প লিখিবার ইচ্ছা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল; এক একদিন এক একটি ছোটখাট ঘটনার সূত্র ধরিয়া এক একটি গল্প মনের মধ্যে জমিয়া উঠিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন (বাংলা বোধ হয়, ১৩০০ সাল হইবে) শিলাইদহ হইতে একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন :—

"আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোট ছোট গল্প লিখতে বসি তাহ'লে কতকটা মনের সুখে থাকি, এবং কৃতকার্য্য হ'তে পারলে পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লিখ্‌বার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখ্‌ব তারা আমার দিনরাত্রির অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে।"

এই ভাবে এই দিনটিতে "মেঘ ও রৌদ্রে"র মতন একটি সুবিখ্যাত ছোটগল্পের সৃষ্টি হইল। এই ভাবেই, দুই বৎসর আগে (২৯ জুন, ১৮৯২) সাজাদপুরের কুঠিতে একদিন গ্রামের পোস্টমাস্টারের আগমন উপলক্ষ্য করিয়া "পোস্টমাস্টার" গল্পটির সৃষ্টি হইল। "সমাপ্তি" গল্পের মৃন্ময়ী, "ছুটি" গল্পের ফটিক এরাও এই সময়কার সৃষ্টি।

'পোস্ট্‌মাস্টার' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের প্রথমতম গল্পগুলির অন্যতম। আমি যে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের একশ্রেণীর গল্পগুলি একান্তভাবে গীতধর্মী এই গল্পটি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। একটি স্বজনহারা নিঃসহায় গ্রাম-বালিকার স্নেহলোলুপ হৃদয় আসন্ন স্নেহবিচ্যুতির আশঙ্কায় কি সকরুণ অশ্রুসজল ছায়াপাত করিয়াছে এই গল্পটির উপর! রবীন্দ্রনাথের এই গীতধর্মী গল্পগুলির একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে কবির কল্পলোকের মানুষগুলি, তাহার ঘটনার আবেষ্টনটি, বাহিরের চতুর্দিকের জগতের সঙ্গে, প্রকৃতির ছায়া-আলো-গন্ধ-বর্ণ-ধ্বনি ও ছন্দের সঙ্গে একান্তভাবে মিশিয়া যায়, এবং বিশ্বজগতের পারিপার্শ্বিক ভাবাময় আবেষ্টনের সঙ্গে এক হইয়া গিয়া একটি সুরের জগৎ সৃষ্টি করে, 'সকল ঘটনার একটি আকাশ সৃজন করে'। এই 'পোস্টমাষ্টার' গল্পটি এবং এই রকম বহু গল্পের মধ্যে এই বিশেষত্বটি চোখে না পড়িয়াই পারে না। স্বজন হইতে দূরে, এক নিভৃত পল্লীতে দরিদ্র পোস্টমাষ্টারের জীবন প্রথম প্রথম প্রায় নির্বাসন তুল্য বলিয়াই মনে হইত। মাঝে মাঝে একা-একা ঘরে বসিয়া বসিয়া তিনি একটি 'স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি'র সঙ্গ কামনা করিতেন, নিজের ঘরের ছেলেমেয়ে-স্ত্রীর কথা তাহার মনে হইত। এই কামনাটুকু গল্পটিতে কি সুন্দর একটি করুণ সুরের রূপ লইয়াছে!

এই গল্পটিতেই, বিদায় যখন ঘনাইয়া আসিল, রতন পোস্ট্‌মাস্টারের সম্মুখ হইতে এক দৌড়ে পলাইয়া গেল। আর, ভূতপূর্ব পোস্ট্‌মাস্টার ধীরে ধীরে নৌকার দিকে চলিলেন।

> "যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল—বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মত চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, একটি সামান্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি, কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরবেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি? পৃথিবীতে কে কাহার?"

কলাকৌশলের দিক্ হইতে এই তত্ত্বের উদয় না হইলেই ভাল হইত, তবু, যাহাই হউক, এমনই করিয়া পোস্ট্‌মাস্টার ও রতনের দুঃখ একটা উদাস সকরুণ

পরিসমাপ্তি লাভ করিল, এবং সেই অব্যক্ত মর্মব্যথা যেন সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া একটি অপূর্ব স্থরের জগৎ স্থষ্টি করিল। এইরকম স্থরের জগৎ স্থষ্টি হইয়াছে তাঁহার অনেকগুলি গল্পেই।

'একরাত্রি' গল্পটিতে সেই যে ঝড়ের রাত্রে বানের মধ্যে একটি বিচ্ছেদ-ব্যথিত প্রাণী "মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদন" লাভ করিয়াছিল, যাহার সমস্ত ইহজীবনে "কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্ত রাত্রির উদয় হইয়াছিল, সেই রাত্রিটি শুধু সেই ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টারের কাছেই তুচ্ছজীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা" হইয়া রহিল না, তাহার জীবনের সমগ্র ট্র্যাজেডিটুকুও সেই একটি রাত্রির একটি স্থরের মধ্যে অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিল। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিতেও ইহার পরিচয় আছে। এই গল্পগুলিতে ঘটনা অথবা চরিত্রবাহুল্য বলিতে কিছুই নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু কেবল একটি সকরুণ অনুভূতির স্থরের মধ্যেই গল্পের পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

(রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির মধ্যে মানুষ ও ঘটনার সঙ্গে প্রকৃতির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের, নিবিড় ঐক্যের পরিচয় আছে সে-পরিচয় অনেক গল্পেই পাওয়া যায়) কিন্তু তাহা একটি পরিপূর্ণ গীতিকবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে 'স্থভা' গল্পে মূক বালিকার সহিত মূক প্রকৃতির নিবিড় ঐক্য-সম্বন্ধের মধ্যে। নানান্ কাজে ও ব্যবহারের ভিতর দিয়া, অদ্ভুত সরস ও সহজ বর্ণনার সাহায্যে মানবচরিত্র বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা অনেক লেখকের মধ্যেই দেখা যায়, কিন্তু অপূর্ব শিল্পকুশলী রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া মনের বিভিন্ন বিচিত্র ভাব ও চিন্তাধারার সঙ্গে বিশ্ব-জগতের বিচিত্র ভাব প্রকাশের নিবিড় ভাবগত ঐক্যের স্থষ্টি করেন, এবং তাহার ফলে তাঁহার এক একটি গল্প যেমন করিয়া কল্পলোকের স্বপ্ন ও সঙ্গীত-মাধুর্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তেমন স্থষ্টি, তেমন প্রকাশ, আর কাহারও মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না।

'মহামায়া' গল্পটিতে আমার এই কথার খুব স্থন্দর দৃষ্টান্ত আছে। 'মহামায়া' তাহার দীপ্ত চরিত্র লইয়া এক দুর্ভেদ্য অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রাজীবের নিকটে আপনাকে রহস্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে; রাজীব তাহার নাগাল পায় না, "কেবল একটা মায়াগণ্ডির বাহিরে বসিয়া অতৃপ্ত

তৃষিত হৃদয়ে এই সূক্ষ্ম অচল অটল রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে।" এমন সময়

"একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্নারাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়াছিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল, অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জ্জিত রূপার পাতের ন্যায় ঝকঝক্ করিতেছে। মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কিনা বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, বনের মতো একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মতো একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজীব কি ভাবিল জানিনা, কিন্তু তাহার মনে হইল আজ যেন সমস্ত পূর্ব্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে; এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।"

তারপর কি করিয়া রাজীবের রহস্য টুটিয়া গেল, মহামায়া একটি উত্তর না দিয়া এক মুহূর্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, আর তাহার সেই "ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল" তাহা ত সকলেই জানেন। সমস্ত গল্পটির মধ্যে একটি অপূর্ব রহস্য কি সুন্দর ভয়ঙ্কররূপে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়া কিরূপে নিবিড়তর বিদায়-রহস্যের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিল, ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। ইহার মধ্যে যে শুধু একটা সবল কল্পনা-শক্তির পরিচয় আছে তাহা নহে, একটা খুব বড় ভাব-লোকের স্পর্শও সমস্ত রহস্যটিকে একটি অপূর্ব অভিব্যক্তি দান করিয়াছে। কিন্তু এই যে গল্পের ঘটনা বর্ণনা ও চরিত্র-চিত্রণের ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির সঙ্গে একটা নিবিড় ঐক্যের সৃষ্টি করা, ইহা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির একটা বিশেষ কলাকৌশল, এবং ইহার প্রভাব টুকুও অতি চমৎকার। সর্বত্রই আমি লক্ষ্য করিয়াছি, এবং উপরে যে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতে পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে এই বিশেষ কৌশলটি অবলম্বনের ফলে প্রত্যেকটি গল্পেরই ঘটনা ও চরিত্র একটি ভাবগাম্ভীর্য, একটি অপূর্ব প্রশান্তি লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এই কৌশলটি রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে আয়ত্ত করিয়াছেন একথা যেন কেহ

মনে না করেন। ইহা তাঁহার কবিচিত্তের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিরই ফল; মানুষকে, মানবজীবনের বিচিত্র ঘটনা ও প্রকাশকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখা তাঁহার কবিহৃদয়ের ধর্ম, ইহাই তাঁহার অদ্ভুত ভাবলোকধ্যান, যাহার স্পর্শে পৃথিবীর ধূলামাটি, আমাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যাহা কিছু তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, দুঃখবেদনায় ব্যথিত, সমস্তই সোনা হইয়া গিয়াছে, অপূর্ব রূপে ও রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই ধ্যানের স্পর্শে, যে-বস্তু লইয়া তাঁহার কারবার, সেই বস্তুরই রূপ অনেক সময় একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া আর চেনা যায় না। বরং মনে হয়, কবি বস্তুর যে-রূপ আমাদের দেখাইলেন সেইরূপই তাহার সত্য রূপ। ব্যক্তি-বিশেষের দুঃখকে, কোনও সবিশেষ ঘটনাসংশ্লিষ্ট বেদনাকে তিনি সকলের দুঃখ, সকলের বেদনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাকে একটা অচঞ্চল অবসানের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছেন, কোনও ক্ষুব্ধতায় কোনও বিক্ষোভের মধ্যে তাহার সমাপ্তিটুকু আন্দোলিত হইতে দেন নাই। তিনি তাঁহার চরিত্র ও ঘটনাবস্তুগুলিকে পৃথিবীর ধূলামাটির সঙ্গে সৃষ্টির এক পর্যায়ভুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন, এবং মানুষের দুঃখকে বেদনাকে, সুখকে শান্তিকে সৃষ্টির সকল বস্তুর দুঃখ ও বেদনা, সুখ ও শান্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন। আগে যে 'কাবুলিওয়ালা', 'পোস্ট্‌মাষ্টার' ও 'মহামায়া' গল্পের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতেই এই কথার ভাল প্রমাণ আছে, কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর প্রমাণ আছে 'অতিথি' গল্পটিতে। কিশোর তারাপদ কোথাও স্থির হইয়া থাকে না, কাহারও নিবিড়বন্ধনে বাঁধা পড়ে না; মতিবাবু, অন্নপূর্ণা অথবা চারু কাহারও স্নেহপ্রেম বন্ধুত্বের মধ্যেও সে শেষ পর্যন্ত বাঁধা পড়িল না। তাহার চলিষ্ণু চিত্ত একদিন 'বর্ষার মেঘ-অন্ধকার রাত্রে আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্ব-পৃথিবীর নিকট চলিয়া গেল।' এই সমস্ত স্নেহবন্ধন উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবার ব্যাপারটির সঙ্গে যে দুঃখবেদনা জড়িত হইয়া আছে, যে ট্র্যাজেডির আভাস আছে, তাহাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কল্পিত ঘটনাবস্তু ও ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন না, তাঁহার স্বাভাবিক ভাবলোক-বিহারী মন এই চলিয়া যাইবার ব্যাপারটিকে সমস্ত বিশ্বসংসারের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিল।

"দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া

আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল, পূবে বাতাস বেগে বহিতে লাগিল; মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া উঠিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল; নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল,—সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িতেছে বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে।"

এই দ্রুত চলমান চরাচরের মধ্যে কিশোর তারাপদই বা স্থির হইয়া থাকিবে কেন? ইহাই রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, তাঁহার ধ্যানলোকের পরশমণি, যাহার ছোঁয়ায় সকল বস্তু এক অখণ্ড রসপরিণামের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। বস্তুকে লইয়াই তাঁহার প্রত্যেক সৃষ্টির সূত্রপাত, কিন্তু তাঁহার কল্পনা বস্তুকে ছাড়াইয়া রসের ঊর্দ্ধলোকে উঠিয়া গিয়া ভাবলোকের কল্পমায়ার মধ্যে আত্ম-বিসর্জন করিয়াছে। ইহাই তাঁহার প্রতিভার মূলকথা।

যে কল্পাদর্শের কথা এইমাত্র বলিলাম তাহার স্পর্শ 'দুরাশা' গল্পটিতে একটি সুরাবেগের সঞ্চার করিয়াছে। এই গল্পটির স্বল্প পরিসরের মধ্যে ঘটনা-বাহুল্য প্রচুর, তাহার বৈচিত্র্যও কম নয়; কিন্তু বস্তুতঃ গল্পটি দুর্বার অজেয় প্রেমের একটি প্রশস্তি মাত্র। একটি সুর যেন প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত স্পন্দিত, শুধু মাঝে মাঝে বাধা পাইয়া যেন আরও দ্বিগুণবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারী একটি ব্রাহ্মণের গৌরবর্ণ ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মত সু-উন্নত দেহ ও তাঁহার দৃপ্ত ব্রাহ্মণ্যের গর্ব এক নবাবপুত্রী মুসলমান দুহিতার মুগ্ধ হৃদয়কে শ্রদ্ধায় ও প্রেমে বিনম্র করিয়া তুলিল। সেই দুর্বার প্রেমে ষোড়শী নবাবপুত্রী অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহির হইল; এবং বাহির হইয়া প্রথমেই তাহার সংসার-দেবতার নিকট হইতে অত্যন্ত নিষ্ঠুর নিষ্করুণ সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু প্রেম কিছুতেই পরাভব মানিল না।

"মুহূর্তের মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্বিকার পবিত্র ব্রাহ্মণের পদতলে দূর হইতে প্রণাম করিলাম—মনে মনে কহিলাম, হে ব্রাহ্মণ! তুমি হীনের সেবা, পরের অন্ন, ধনীর দান, যুবতীর যৌবন, রমণীর প্রেম, কিছুই গ্রহণ কর না; তুমি একাকী, তুমি স্বতন্ত্র তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সুদূর, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই।"

কিন্তু নবাবপুত্রীর প্রেম ব্রাহ্মণের মনে কোনও ভাবান্তর আনিল না; নীরবে সেই ব্রাহ্মণ মুসলমান দুহিতার সেই পবিত্র প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গেল। তারপর সেই নবাবদুহিতার সুকঠিন কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ হইল।

একদিকে সেই ব্রাহ্মণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার আকুল প্রয়াস, আর একদিকে নিজের আজন্ম মুসলমান সংস্কার দূর করিয়া আপনাকে একান্ত করিয়া ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিবার অপূর্ব চেষ্টা। দুর্জয় দুর্বার প্রেমের কাছে কিছুই আর অসম্ভব রহিল না; সে সমস্ত পূর্বসংস্কার ধীরে ধীরে বিসর্জন দিল, সংস্কৃত শিখিল, ভক্তিভরে ব্রাহ্মণের সমস্ত শাস্ত্রপাঠ করিল। ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় সে অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইল।

"আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারম্ভের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার যৌবনশেষের শেষ ব্রাহ্মণ, আমার ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরূপ দীপ্তি লাভ করিলাম।"

এই ভাবে সে যখন দেহে এবং মনে প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্তে তাহার আরাধ্য দেবতার নিকটবর্তী হইতেছে, সে যখন ভাবিতেছে তাহার তরী তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার জীবনের পরমতীর্থ অনতিদূরে, তখন তাহার তরী হঠাৎ ডুবিয়া গেল, পরমতীর্থ ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সে দেখিল

"বৃদ্ধ কেশরলাল, তাহার আযৌবনপূজিত ব্রাহ্মণ, ভুটিয়া পল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্রপৌত্রী লইয়া ম্লানবস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।"

বুঝিল, যে-ব্রাহ্মণ্য তাহার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল তাহা অভ্যাস, তাহা সংস্কার মাত্র! যে-ব্রাহ্মণ্যের পদতলে সে তাহার সমস্ত জীবন ও যৌবন বিসর্জন দিয়াছে, চরম নিষ্করুণ ব্যর্থতা লইয়া সেই জীর্ণভিত্তি ধূলিশায়ী ভগ্ন ব্রাহ্মণ্যের নিকট সে তাঁহার শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। একটি অপূর্ব ঊর্ধ্বশিখ প্রেমের জ্যোতি যেন হঠাৎ এক ফুৎকারে নিবিয়া গেল। সমস্ত গল্পটি যেন একটি মেঘাচ্ছন্ন কাহিনী, একটি দৃপ্ত সুগম্ভীর রাগিণী যেন একটি পরম ব্যথার মধ্যে আত্মবিসর্জিত, একটি গভীর অচঞ্চল আবেগ যেন হঠাৎ মরুমরীচিকার মধ্যে ক্রন্দনরত।

এই ধর্ম শুধু তাঁহার সাধনার যুগে লিখিত, সেই পদ্মাচরের মাধুর্যপূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যে লিখিত গল্পগুলির মধ্যেই আবদ্ধ নয়। বহুদিন পরে লিখিত কয়েকটি গল্পের মধ্যেও এই পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। ১৩২১ সালে আশ্বিন ও কার্তিক মাসে লিখিত দুইটি গল্প হইতে এই সুরধর্মের পরিচয় লওয়া যাক্। 'শেষের রাত্রি' গল্পটিতে ঘটনা বা চরিত্র-চিত্রণ বলিতে বিশেষ কিছু নাই, শুধু মাসির স্নেহ-দুর্বল শঙ্কিত চরিত্রটি একটি অপরূপ মাধুর্যে ফুটিয়াছে। যতীন নিজের

মনে নারী-দেবতার একটি পীঠস্থানে তাহার স্ত্রী মণিকে বসাইয়া রাত্রিদিন তাহার প্রেমের পূজা নিবেদন করিতেছে, মণি ফিরিয়াও তাকায় না, বেদনায় যতীনের মন ভরিয়া ওঠে। কিন্তু তাহার আশা পরাভব মানে না, প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেক ব্যাপারে সে আত্ম-প্রতারিত; আর মণি যে তাহাকে দূরে রাখিয়াই চলে, একথা জানিলে যতীন দুঃখ পায়, মাসি তাহা জানেন বলিয়া তিনিও মণির মিথ্যা পরিচয়ে যতীনকে প্রতারণা করেন। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী যতীনের এই আত্মপ্রতারণার মিথ্যা আবরণ প্রায় খসিয়া পড়িতে চলিয়াছে। সেই চরম ক্ষণে সেই রোগবিকারের মধ্যেও যতীন তাহার স্খলিতপ্রায় প্রেমের ছদ্মাবরণটি প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে। কি করুণ দীর্ঘনিঃশ্বাস-ক্ষুব্ধ এই মিথ্যা প্রয়াস। সমস্ত গল্পটির মধ্যে, বিশেষ করিয়া তার পরিসমাপ্তির মধ্যে, আশায় উর্দ্ধশিখ প্রেমের নিষ্ঠুর ব্যর্থতার একটি করুণ চাপা কান্নার সুর, দুঃখে দুর্বল, ব্যথার অস্ফুট একটি রাগিণী কি নিবিড় স্পন্দনের মধ্যে অবিরত আহত!

ইহার কয়েকদিন পরে লেখা 'অপরিচিতা' গল্পটিও যেন একটি গানের উচ্ছ্বসিত সুরে বাঁধা। গল্পটির প্রথম পর্বের মধ্যে বিশেষ কিছু নাই—বিবাহের দেনা-পাওনা লইয়া আমাদের সমাজে অহর্নিশ যা ঘটিয়া থাকে তারই একটি চিত্র। অবশ্য উহাতে হইতে-পারিত-শ্বশুর শম্ভুনাথের শান্ত অথচ তেজোদৃপ্ত চরিত্রের পরিচয়ের মধ্যে এবং পরে ট্রেণে কল্যাণীর সহজ অথচ দৃপ্ত উজ্জ্বল ব্যবহারের মধ্যে বেশ একটু নৈপুণ্য আছে, সমাজে ইহা নূতন ও বটে। কিন্তু গল্পটি তাহার গানের রূপ লাভ করিয়াছে শেষের পর্বে; এবং সেই গানের একটি মাত্র ধুয়া, তাহা সেই অপরিচিতার অন্তরতম অনির্বচনীয় কণ্ঠের একটি মাত্র শব্দ, "জায়গা আছে"। কি করিয়া ঘটনাচক্রে চারিবৎসর পরে এক রেলোয়ে ষ্টেশনে সাতাশ বৎসরের যুবকের সঙ্গে সেই অপরিচিতার দেখা হইয়া গেল, কি করিয়া তাহার মনের মধ্যে সেই অপরিচিতা একটি অখণ্ড আনন্দের মূর্ত্তি ধরিয়া, একটী সুরের রূপ ধরিয়া জাগিয়া উঠিল, কি করিয়া উভয়ের পরিচয় লাভ ঘটিল, কিন্তু তারপরেও দুইজনে কেমন করিয়া আবার মিলনের মধ্যেই বিচ্ছেদকে বরণ করিয়া লইল, গল্পের মধ্যেই তাহার সবিশেষ পরিচয় আছে। কল্যাণী বিবাহে রাজী হইল না, মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিল।

"কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজো বাজিতেছে……। আর সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল,

"জায়গা আছে", সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ।......তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনোকালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর স্বরের আশা—"জায়গা আছে"। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াইব কোথায়? তাই বৎসরের পর বৎসর যায়,—আমি এইখানেই আছি।......ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো এইতো আমি জায়গা পাইয়াছি।"

বাস্তব জীবনে কি হয় জানিনা, হয়ত সেখানে সমস্ত জীবন অন্যরকম সমাপ্তিলাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু যে ভাবলোকধ্যান এই গল্পটিতে প্রকাশ পাইয়াছে, সাহিত্যে তাহার মূল্য যে আছে, এই গল্পটিই তাহার প্রমাণ। গল্পের এমন গীতিমাধুর্য, এমন অপূর্ব রসপরিণতি এমন অপরূপ সুরসমাপ্তি আমি অন্য কোনও ছোটগল্পের মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

একান্তভাবে গীতধর্মী গল্পগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের একশ্রেণীর কয়েকটী বিশেষ গল্প আছে, যাহার মধ্যেও এই সুরধর্মই বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই গল্পগুলিতেও প্লট্ বা আখ্যানভাগ বলিতে কিছুই নাই; থাকিলেও তাহার মূল্য খুব বেশী কিছু নয়; সমস্ত কাহিনীটিকে, আখ্যান-ভাগটিকে ছাড়াইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে মনের একটা বিশেষ 'মুড্', মানসিক বিকৃতির একটা অপূর্ব গীতিময় প্রকাশ; অন্ততঃ "নিশীথে" ও "ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পে এই গীতিধর্মই সব কিছুকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই গল্পগুলির একটা বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। এবং সেইদিক হইতে আলোচনা করিয়া সুপণ্ডিত সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই গল্পগুলিকে একটি বিশেষ পর্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। আমাদের প্রতিদিনের বাস্তবজীবনের মধ্যে অতীন্দ্রিয় অতি-প্রাকৃত ভৌতিক রহস্যের আবির্ভাব ও অভিব্যক্তিই সেই উপাদান। শ্রীকুমার বাবু এই উপাদান লইয়া রচিত গল্পগুলির খুব চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন, বলিয়াছেন,—

"সাধারণ বাঙ্গালীজীবনের সহিত অতি-প্রাকৃতের সংযোগসাধন একদিক দিয়া বিশেষ সহজ, অপর দিক দিয়া বিশেষ আয়াসসাধ্য। সহজ এই জন্য যে, আমাদের মধ্যে এখনও কতকগুলি বিশ্বাস ও সংস্কার সজীব ভাবে বর্ত্তমান আছে, যাহাদের অতি-প্রাকৃতের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। আবার অন্য দিকে, আমাদের সাধারণ জীবন এতই বিশেষত্বহীন ও ঘটনা-

বিরল, যে ইহার মধ্যে মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ের দ্বারা অতি-প্রাকৃতের অবতারণা নিতান্ত দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের গল্পমধ্যে উভয়বিধ গল্পেরই উদাহরণ মিলে।"

কিন্তু উপাদান লইয়া সাহিত্য নয়, উপাদান বিশ্লেষণ দ্বারা সাহিত্য-সৃষ্টিকে ভোগও করিতে পারি না। আমি বুঝিতে চাই লেখকের মনের সেই বিশেষ ধর্মটীকে, তাহার বিশেষ ভঙ্গিটিকে যাহার সহায়তায় সেই উপাদান একটা রসময় ভাবারূপ লাভ করে। সেইদিক হইতে দেখিলে এই ধরণের গল্পগুলিকে একটি বিশেষ পর্যায়ভুক্ত করিবার কারণ কিছু নাই; কারণ যে সুরধর্ম যে কল্পনার ঐশ্বর্য রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গল্পে এ পর্যন্ত আমরা দেখিলাম, অতি-প্রাকৃত ভৌতিক রহস্যাবৃত এই গল্পগুলিতেও সেই সুরধর্ম, সেই কল্পনার ঐশ্বর্যই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু তাহাই নয়; ইহার উপরে কলাকৌশলের দিক্ হইতেও রবীন্দ্রনাথের একটা বৈশিষ্ট্য এই গল্পগুলিতে সহজে লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকুমারবাবু সত্যই বলিয়াছেন, বাস্তবজীবনের সহিত অতি-প্রাকৃতের সমন্বয়-সাধন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার; তিনি দেখাইয়াছেন, এ বিষয়ে ইংরেজী সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী কোলরিজকেও

> "অতি-প্রাকৃতের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করিতে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছে,—নৈসর্গিকের সীমা লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, শরীরী প্রেতের আবির্ভাব ঘটাইতে হইয়াছে। * * * যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে তাঁহাকে এই অনৈসর্গিকের অবতারণা করিতে হইয়াছে তাহাতেও অজ্ঞাত অপরিচিতের সুদূর রহস্য মাখানো * * * পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া তাহাকে মায়া-তরী ডুবাইতে হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য কুহকবলে আমাদের অতিপরিচিত গৃহাঙ্গনের মধ্যেই অতি-প্রাকৃতকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন এবং নৈসর্গিকের সীমা ছাড়াইয়া এক পদও অগ্রসর হন নাই।"

এই ধরণের গল্প রবীন্দ্রনাথের খুব বেশী নাই। গল্পরচনার আদিপর্বে লেখা 'সম্পত্তিসমর্পণ' ও কয়েক বৎসর পরে লেখা 'গুপ্তধন' গল্পদুটী নিতান্তই আমাদের সহজ ভৌতিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে বিশেষ কোন কলাকৌশল, কল্পনার কোন সমৃদ্ধি প্রকাশ পায় নাই; শুধু গল্প বলিবার জন্যই যেন এই গল্পগুলির রচনা, রসসৃষ্টির কোন প্রয়াস এই গল্পগুলির মধ্যে নাই, ইহাদের মধ্যে অতীন্দ্রিয় অনৈসর্গিকের রহস্য কিছু নিবিড় হইয়া উঠিয়া মনের মধ্যে মায়াজালের সৃষ্টি করে না। 'কঙ্কাল' গল্পটিতে এই মায়াজাল-সৃষ্টির প্রয়াস তবু কতকটা দেখা যায়, কিন্তু তাহাও একটি রূপযৌবনগর্বিতা প্রেমমুগ্ধা মৃতানারীর বিগতজীবনের কাহিনীমাত্র।

যে মৃতানারী এক সুস্থ যুবকের মস্তিষ্ক-বিকৃতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়া এই কাহিনী যুবককে শুনাইতেছে, তাহার কথাবার্ত্তায়, হাসিতে, ইঙ্গিতে মৃত্যু-লোকের সেই সুগভীর uncanny ও অতীন্দ্রিয় রহস্য নিবিড় হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই। 'জীবিত ও মৃত' গল্পটিও কতকটা এইরূপ, যদিও সেখানে কাদম্বিনীর মনোবিকারের কাহিনীটুকু একটু জটিল ও অদ্ভুত। লেখকের কল্পনা কাদম্বিনীর মানসিক বিকৃতির স্বরূপটিকে আবিষ্কার করিয়াছে সত্য, কিন্তু খানিকটা অসাধারণ বলিয়াই হোক্ বা অন্য যে কোন কারণেই হোক্ এই মনোবিকৃতির রহস্যটুকু খুব বুদ্ধি ও ভাবগ্রাহ্য হইয়া পাঠকের মনকে অধিকার করিয়া বসে না, তাহার মনকে কল্পনার রসে অভিষিক্ত করিয়া দেয় না। বাড়ীর লোকেরা জানে কাদম্বিনী মরিয়াছে, শ্মশানে তাহার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে; এবং শ্মশান-প্রত্যাগতা কাদম্বিনী নিজেও নিজকে মৃত বলিয়াই মনে করিতেছে, ভাবিতেছে 'আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়ীতে লইবে কেন?...জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়াছি, আমি যে আমার প্রেতাত্মা।' আর যেখানেই সে যাইতেছে, সেখানেই তো সকলেই তাহাকে প্রেতাত্মা বলিয়াই মনে করিতেছে। কিন্তু এমন করিয়া প্রতিদিন প্রতি কার্যে প্রতি ঘটনায় জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংঘর্ষ কাদম্বিনী কেমন করিয়া সহিবে, সহিয়া কেমন করিয়া মৃতের মতন হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? কাজেই অবশেষে তাহাকে মরিয়া প্রমাণ করিতে হইল যে সে মরে নাই। সুকৌশল ঘটনার সন্নিবেশে গল্পটির সমগ্র আখ্যানভাগ ভালই জমিয়া উঠিয়াছে, বিশেষ করিয়া জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংঘর্ষের ট্রাজেডির শেষ অধ্যায়টুকু, যেখানে কাদম্বিনী অনেক দিন পরে অনুভব করিল যে, সে মরে নাই—সেই পুরাতন ঘরদ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্তভাবেই আছে, মধ্যে কোনও বিচ্ছেদ কোনও ব্যবধান জন্মায় নাই। তৎসত্ত্বেও গল্পটির অনুভূতি পাঠকের মনকে মৃত্যুকালের অশরীরী কোনও ভয়াবহ রহস্যে কম্পিত করে না, চিত্তকে নিবিড় কল্পনারসে ভরিয়া দেয় না।

এই ধরণের গল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে রসঘন ও রহস্য-নিবিড় গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ'। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে, এই বিশেষ ধরণের গল্পের এমন অপূর্ব কলাকৌশল, রহস্য-নিবিড় বর্ণনা-ভঙ্গি অপরূপ কল্পনার ঐশ্বর্য, সর্বোপরি এমন উচ্ছ্বসিত সুরপ্রবাহ দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে

পারি না। শ্রীকুমারবাবু সত্যই বলিয়াছেন 'ভাষার ধ্বনি, ব্যঞ্জনা ও সাঙ্কেতিকতায় এক De Quincey-র "Dream Visions" ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অনুরূপ কিছু ইংরেজী সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।' গল্পটীর পরিবেশ রচিত হইয়াছে শুস্তা নদীর তীরে বরীচ নগরে আড়াই-শ বছর আগেকার তৈরী দ্বিতীয় শা' মামুদের ভোগবিলাসের নির্জন প্রাসাদে। তাহার কক্ষে একদিন

> 'অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইয়াছে। সেই সকল চিত্তদাহে সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া আছে; সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতন খাইয়া ফেলিতে চায়।'

এমনই রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে লেখকের কল্পনা ছাড়া পাইয়াছে। সেই অবাধ কল্পনা ও সঙ্গীত-প্রবাহের মধ্যে যেন অবাস্তব কোথাও কিছু নাই, অস্পষ্ট কুহেলিকার আবরণ যাহা কিছু বা ছিল সব ঘুচিয়া গিয়াছে। তুলার মাশুল-আদায়কারী যে নির্জন প্রাসাদবাসী সেই ভদ্রলোকটী এই গল্পের নায়ক, সূর্য্যাস্তের পর হইতে সে যেন আর নিজের মধ্যে থাকে না, মোগলাই-খানা খাইয়া, ঢিলা পায়জামা, মখমলের ফেজ, দীর্ঘচোগা, ও ফুলকাটা কাবা পরিয়া, রুমালে আতর মাখিয়া,

> 'শত শত বৎসরের পূর্ব্বেকার কোনো এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর একটা অপূর্ব্ব ব্যক্তি হইয়া উঠে, একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়ে।'

তখন সম্মুখে শুস্তার জলে বিজন প্রাসাদের সিঁড়িতে, তাহার কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে এক রহস্যময় ইন্দ্রজাল বিস্তৃত হয়। এক একটি রাত্রি যেন এক একটি স্বপ্নময় নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীত; বুঝি এই স্বপ্ন এই সঙ্গীতের শেষ কোথাও হইত না যদি প্রতিদিন প্রত্যূষে জনশূন্য পথে পাগলা মেহের আলীর 'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও', চীৎকার এই নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্ন ও সঙ্গীতপ্রবাহের মধ্যে অকস্মাৎ একটা বাধার মতন আসিয়া নিক্ষিপ্ত না হইত। প্রতিরাত্রির স্বপ্ন-সঙ্গীতের আবর্তের মধ্যে সেই বহুদিনবিস্মৃত বাদসাহী ঐশ্বর্যের দীপ্তি ও লালস, অতৃপ্ত কামনা ও সম্ভোগের ক্ষুব্ধ হতাশ যেন সব সজীব মূর্তি ধরিয়া সেই বিজন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে জাগিয়া বসিয়া আছে, তাহার মধ্যে মায়া বা বিভ্রম কোথাও কিছু নাই। এই অপূর্ব কল্পনার পাখার উপর ভর করিয়া একটির পর একটি রাত্রি যেন স্বপ্ন-সঙ্গীতের মালা গাঁথিয়া চলিয়াছে।

গল্পের মধ্যে কোন্ কবির কল্পনা এমন করিয়া শতদল মেলিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সঙ্গীতপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়াছে? এই কল্পনার ঐশ্বর্য, এই সুরধর্ম্মই 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে এমন রসময় ভাষারূপ দান করিয়াছে; তাহার উপাদান এক্ষেত্রে তুচ্ছ।) একটি মাত্র দৃষ্টান্ত না দিয়া পারিলাম না।

"আবার সেইদিন অর্দ্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম, কে যেন গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে, যেন আমার খাটের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণ ভিত্তির তলবর্ত্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার কাছে চাপিয়া ধরিয়া বনের ভিতর দিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্য্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও! আমাকে উদ্ধার কর।

"আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণামান পরিবর্ত্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমান্ কামনা-সুন্দরীকে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জ্জুর কুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? তোমাকে কোন্ বেদুইন্ দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মত মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপর চড়াইয়া জলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল! সেখানে কোন্ বাদসাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জ কাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল! সেখানে সে কি ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্কণ, এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক্, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত! কি অসীম, কি ঐশ্বর্য্য, কি অনন্ত কারাগার! দুইদিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে; শাহেন্‌শা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে;—বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মত হাব্‌শী, দেবদূতের মত সাজ করিয়া খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসঙ্কুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে?"

কি অপূর্ব এই প্রশস্তি সঙ্গীত! এমনই সঙ্গীত-প্রবাহ চলিয়াছে এক রাত্রি হইতে অন্য রাত্রিতে। তাহার বর্ণনার ভঙ্গীতে, ভাষার ধ্বনিতে, শব্দের চয়নে কি সুন্দর সুর, কি অপরূপ মাধুর্য! প্রত্যেকটী বাক্যে, তাহার ইঙ্গিতে ও ব্যঞ্জনায় কত কথা কত ইতিহাস যেন প্রাণ পাইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

কলাকৌশলের দিক্ হইতে গল্পের 'সেটিং'টিও খুব লক্ষ্য করিবার। ইহার আরম্ভিক ভূমিকা যেমন স্বল্পপরিসর, ইহার সমাপ্তিও তেম্‌নি আকস্মিক; অন্য গাড়ী আসিবার অবসরে ষ্টেশনের বিশ্রামকক্ষে এই গল্প বর্ণনার সূত্রপাত, সেইখানেই ইহার আকস্মিক সমাপ্তি। খাঁটি গল্পভাগের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ খুব অল্পই; গল্পের আরম্ভ ও সমাপ্তির জন্য পাঠককে কিছু প্রস্তুত হইতে হয় না। রঙ ও রেখায় দীপ্ত সবল সুন্দর একটা ছবি যেন কাঠের কঠিন ও সুনির্দিষ্ট একটি ফ্রেমের মধ্যে বাঁধা পড়িয়াছে।

'নিশীথে' গল্পটী আরও সহজ ও স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে; উহার জন্য কোনও বিজন প্রাসাদ বা কোনও অতীত যুগের মধ্যে কল্পনাকে পক্ষমুক্ত করিতে হয় নাই। আমাদের প্রতিদিনের অতি সহজ কথা এবং কাজ কর্মের মধ্যেই কেমন করিয়া অতীন্দ্রিয় অতি-প্রাকৃত জগতের মায়াজাল বিস্তৃত হয়, দৈনন্দিন তুচ্ছ একান্ত স্বাভাবিক কথা ও কর্মকে আশ্রয় করিয়া অতি-প্রাকৃতের স্পর্শ আকস্মিক একটা সাময়িক মনোবিকার ঘটাইয়া দেয়, এবং তাহাকেই অবলম্বন করিয়া কবির কল্পনা সমস্ত আখ্যানটিকে রসে রহস্যে সুনিবিড় করিয়া তোলে, এই গল্পটি তাহার একটা সরস ও প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রুগ্না স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কোনো এক উদ্বেলিত মুহূর্তে স্বামীর পক্ষে বলা সহজ "তোমার ভালোবাসা আমি কোনও কালে ভুলিব না"। কিন্তু কথাটা শুনিয়া রুগ্না স্ত্রীও হা হা করিয়া সুতীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া উঠিয়াছিল। সে হাসির মধ্যে স্ত্রীর লজ্জা ও সুখের অনুভূতি একটু হয়ত ছিল, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী ছিল অবিশ্বাস ও পরিহাসের তীব্রতা! সেই এক বিহ্বল মুহূর্তের কথাটা যে কত মিথ্যা তাহা ধরা পড়িয়া গেল রুগ্না স্ত্রীর মৃত্যুশয্যার আড়ালে নূতন প্রেমের সঞ্চারে, গোপনে গোপনে নূতন করিয়া নূতন মানুষের সঙ্গে প্রেমের লীলায়। মৃত্যুশয্যাশায়িনীর চোখেও বুঝিবা তাহা ধরা পড়িয়াছিল, তাহার হৃদয়ের ডাঁটায় বুঝিবা টান পড়িয়াছিল। তাই, মনোরমা যখন তাহাকে দেখিতে আসিল, রুগ্না অবহেলিতা স্ত্রী চম্‌কিয়া উঠিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওকে? ওকে, ও কেগো?" স্ত্রী তো মরিল; স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহও করিল। কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অবহেলা, অপরাধ ও মিথ্যাচরণের গুরুভার তাহার বুকের উপর অনুক্ষণ চাপিয়া রহিল, মনোরমাও সহজভাবে স্বামীকে গ্রহণ করিতে পারিল না।

"আমি যখন আদরের কথা বলিতাম প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিতে চেষ্টা করিতাম, মনোরমা হাসিত না গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কি খট্‌কা লাগিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব ?"

কিন্তু তবু আর এক বিহ্বল মুহূর্তে বলিতে হইল, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমাকে কোনওকালে আমি ভুলিতে পারি না।' এই কথা শুনিয়াই একদিন রুগ্না প্রথমা স্ত্রী অবিশ্বাস ও পরিহাসের সুতীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়াছিল। আবার যখন সেই কথাটাই নূতন করিয়া দ্বিতীয় স্ত্রীকে প্রেম জানাইবার জন্য নিবেদন করিতে হইল, তখন এক মুহূর্তেই তাহার নিজের মিথ্যা নিজের ফাঁকি নিজের কাছেই অত্যন্ত ক্রূর নিষ্ঠুর রহস্য লইয়া উন্মুক্ত হইয়া পড়িল; এবং পরক্ষণেই একটা অতীন্দ্রিয় ভৌতিক শিহরণে নিজেই কাঁপিয়া উঠিল, একটা মানসিক বিকার তাহার সমস্ত সত্তাকে অধিকার করিয়া বসিল। সেই মুহূর্তেই 'বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউ গাছের মাথার উপর দিয়া কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচ দিয়া গঙ্গার পূর্বপার হইতে পশ্চিম পার পর্যন্ত সেই অবিশ্বাস ও পরিহাসের হাহা-হাহা-হাহা হাসি দ্রুতবেগে বহিয়া গেল।' আর সেই যে মৃত্যুপথযাত্রিনীর 'ও কে, ও কে, ও কে গো' প্রশ্ন তাহাও অনুতপ্ত অপরাধগ্রস্ত স্বামীকে অব্যাহতি দিল না; এই যে প্রেমবিহ্বল স্বামীর পাশে পাশে নবপরিণীতা নূতন স্ত্রী, আকাশ বাতাস পথ ঘাট বিশ্বজগতের যাহা কিছু সবই যেন উহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কেবলি প্রশ্ন করিতেছে, ও কে, ও কে, ও কে গো। নির্জন পদ্মার চর পর্যন্ত সেই এক হৃদয়বিদারক প্রশ্ন তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল; জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমিতে শুনা যায় ও কে, ও কে, ও কেগো ? রাত্রির অন্ধকারে সুষুপ্তির মধ্যে কে যেন অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে থাকে ও কে, ও কে, ও কেগো ? কি অপূর্ব সহজ ও স্বাভাবিক এই ভৌতিক শিহরণ! অতি-প্রাকৃতের এই স্পর্শ দৈনন্দিন জীবনে আমরা কতই অনুভব করিয়া থাকি। এক একটা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া তুচ্ছ এক একটা কথা, একটা ছবি, এমন অনপনেয় রেখায় আমাদের মনের পটে আঁকা হইয়া যায়, মনকে এমন গুরুভারে পীড়িত করিয়া মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়—তখন সেই কথা সেই ছবিটাই যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহার প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছবি যেন সকলদিক হইতে

সমস্ত জীবনকে চাপিয়া ধরিয়া মৌন আর্তনাদে উৎপীড়িত করে, কিছুতেই তার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না। 'নিশীথে'র গল্পভাগ এই প্রকার মনোবিকৃতি হইতেই উদ্ভূত, কিন্তু লেখকের সুদূরবিসর্পী কল্পনার ঐশ্বর্য, তাঁহার স্বাভাবিক কবিচিত্তের সুরধর্ম ইহাকে একটি অতুলনীয় রসময় রহস্যঘন রূপ দান করিয়াছে। এই অতি-প্রাকৃতের শিহরণ যখন এক একটা climaxএ আসিয়া উঠিয়াছে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উঁচু পর্দায় আসিয়া চড়িয়াছে, সেইখানেই এই কল্পনার মুক্তগতি ও সহজ সুরধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়—ম্লানজ্যোৎস্নালোকিত শুভ্র বকুলবেদীতে, জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ পদ্মাচরের উপর অথবা অন্ধকার রাত্রিতে বোটের মধ্যে মসারীর নীচে।) শেষ দৃষ্টান্তটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"তখন অন্ধকারে কে একজন মসারীর কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ওকে ? ওকে ? ওকে গো ?—

"তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেসলাই জ্বালাইয়া বাতি ধরিলাম। সেই মুহূর্তেই মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারী কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা-হাহা একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম, নগর, পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে,—ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল—ক্রমে যেন তাহা সূচীর অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল—এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই, কল্পনা করি নাই, আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে, কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না ; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল, তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমনি আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারীর পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল :—ও কে, ও কে, ও কে গো। আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল,—ও কে, ও কে, ও কে গো! সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!

(অতি-প্রাকৃতের এই uncanny feeling সঞ্চারের সার্থক প্রয়াস 'মণিহারা' গল্পেও দেখিতে পাই। পত্নীপ্রেমবঞ্চিত স্বামীর পত্নীবিয়োগে শোকভারগ্রস্ত

চিত্তের বিকার হইতেই এই গল্পের সৃষ্টি; কিন্তু ইহার মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় ভৌতিক রহস্য তাহা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে গল্পের শেষ দিকে। এবং সেখানেও যে এই অতীন্দ্রিয় অতি-প্রাকৃতের রহস্য খুব নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, আমার এমন মনে হয় না; কল্পনার ঐশ্বর্যও খুব দীপ্তি লাভ করিতে পারে নাই, বর্ণনার সাঙ্কেতিকতায় অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতিও খুব উঁচু পর্দায় পৌঁছিতে পারে নাই। তবে গল্পের প্রথমভাগে ফণীভূষণ ও মণিমালিকার পরস্পরের হৃদয়লীলার পরিচয়ের মধ্যে লেখকের সুতীক্ষ্ণ মনোবিশ্লেষণ-ক্ষমতা ও সহজ বোধশক্তির আশ্চর্য প্রমাণ আছে। ইহা ছাড়া, শ্রীকুমারবাবু খুব নিপুণতার সহিত গল্পটীর আর একটি বিশেষত্বের দিক ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহা একটু মনোযোগী পাঠকমাত্রের চোখে ধরা না পড়িয়াই পারে না। তাহা এই যে

> "এই তুষার-শীতল, মৃত্যুরহস্যগূঢ় স্বপ্নকাহিনীর চারিদিকে একটা ইস্পাতের মত শক্ত বাস্তবতার বন্ধন দেওয়া হইয়াছে। এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত যিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার চক্ষে স্বপ্নজড়িমার লেশমাত্র নাই, বরঞ্চ একটা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তি শাণিত ছুরিকাগ্রভাগের ন্যায় চক্ চক্ করিতেছে। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে আদিম রহস্য ও বর্তমান যুগের সমাজে সেই সনাতন নীতির বৈপরীত্য—এই অতি গভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ আলোচনার মধ্যে, বুদ্ধি তর্কের অতীত অতীন্দ্রিয় জগতের ভয়াবহ ইঙ্গিতটি আশ্চর্য সুসঙ্গতির সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পের উপসংহারটিও আবার বাস্তব সত্যকে প্রাধান্য দিয়া একটা সংশয়াকুল সন্দেহবিজড়িত অনিশ্চয়ের মধ্যে গল্পটিকে হঠাৎ শেষ করিয়া দিয়াছে।"

(৩)

কিন্তু গীতিমাধুর্য অথবা সুরধর্ম্ম এবং কল্পনার ঐশ্বর্য রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলির একমাত্র বিশেষত্ব নয়। কতগুলি গল্পের মধ্যে আছে—এবং তাহাদের সংখ্যা কম নয়—লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, সহজ অনুভূতি, এবং অপরূপ মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয়। মানব-হৃদয়ের প্রেমের প্রবাহ যেখানে ফল্গুসম গোপন, জীবনযাত্রার বাঁকে বাঁকে জটিল, সামাজিক ও পারিবারিক বিধিনিষেধ রীতিবন্ধনের মধ্যে যেখানে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক হৃদয়-বৃত্তির বিচিত্র লীলাগুলি আহত ও সংকুচিত, শঙ্কিত ও বাধাপ্রাপ্ত, সেখানেও কবি তাঁহার সহজ সহানুভূতি দিয়া, অন্তর্দৃষ্টি দিয়া, একান্ত আত্মীয়তা-বোধের সাহায্যে

গল্পের উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন, এবং অপরূপ মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার সহায়তায় স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র লীলার যথার্থ স্বরূপ ও তাহার বিকাশ আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। আমাদের সমাজে ও পরিবারে হৃদয়বৃত্তির যত লীলা প্রায় সবই প্রকাশ পায় কতকগুলি অতি পরিচিত সমাজসম্মত সম্বন্ধের মধ্যে, তাহার স্রোত বহিয়া চলে কতকগুলি বাধাধরা খাতের মধ্য দিয়া। কিন্তু এই পরিচিত বাঁধাধরার মধ্যেও মাঝে মাঝে এমন একটা সহজ স্বাভাবিক, অথচ অপ্রত্যাশিত সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ জীবনধারা এমনভাবে আন্দোলিত হয় যে, তাহার মধ্যে ছোট গল্পের উৎসের সন্ধান পাওয়া কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। পল্লীজীবনের যে আবেষ্টন ও পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গল্প রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই পল্লীজীবনই আমাদের পরিবার ও সামাজিক জীবনে হৃদয়বৃত্তির এই বিচিত্র লীলার বিচিত্রতর প্রকাশের দিকে তাঁহার কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিল।) 'দেনা-পাওনা' গল্পটি ১২৯৮ সালে 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটিরও আগেকার লেখা। গল্পটির বিশেষ কিছু সাহিত্য-মূল্য যে আছে, এমন নয়। তবু এই গল্পটির উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে গল্পরচনার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই কি করিয়া আমাদের পরিবার ও সমাজের নানান্ বিধানের ফলে ব্যক্তিজীবনে কি নিদারুণ দুঃখ ও বেদনা জমা হইয়া আছে, এবং তাহা কবিচিত্তে কি ভাবে রসসঞ্চার করিয়াছে, তাহার একটি প্রথমতম দৃষ্টান্ত হিসাবে। ('দেনাপাওনা'র মতন আরও দুই চারিটি গল্পে ঠিক এই জিনিসের পরিচয় আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের রসবৈশিষ্ট্য ইহাদের মধ্যে তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই। অথচ অতি সহজ একটি হৃদয়বৃত্তি নিষ্করুণ হেলা ও বিদ্রূপে যে কি অসহায়ভাবে পীড়িত ও লজ্জিত হয়, তাহার অতি সুন্দর পরিচয় আছে 'গিন্নি' নামক ছোট গল্পটিতে। স্বভাবতঃই লাজুক মুখচোরা বালক আশু একদিন তাহার একান্ত স্নেহের ছোট বোন্‌টির সঙ্গে বসিয়া একমনে পুতুল খেলিতেছিল; এমনিই তাহার দুর্ভাগ্য, তাহার ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া ফেলিলেন। বোনের সঙ্গে বসিয়া পুতুলখেলার মধ্যে যে স্নেহলীলার অপূর্ব একটি অভিব্যক্তি আছে, পণ্ডিতমশাইর নিষ্করুণ হৃদয়কে তাহা স্পর্শও করিল না; তিনি এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া ইস্কুলে সকল ছাত্রদের সমক্ষে তাহার নামকরণ করিলেন 'গিন্নি' বলিয়া,

এবং ছোট ঘটনাটিকে সবিস্তারে লঘু রসিকতায় হাল্কা করিয়া তাহাকে কৌতুকে ও বিদ্রূপে লাঞ্ছিত করিলেন। যে স্নেহের লীলা আশুর কাছে ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক, এই বিদ্রূপের লাঞ্ছনায় সেই বোনের সহিত স্নেহের খেলাই জীবনের একটি সর্বপ্রধান লজ্জাজনক ভ্রম বলিয়া তাহার কাছে বোধ হইতে লাগিল। এমনই করিয়া একটি সহজ হৃদয় বৃত্তি পীড়িত ও সংকুচিত হইল। এই ক্ষুদ্র কথাটি বলিতে গিয়া গল্পটির মধ্যে এমন একটি সকরুণ সহৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহার তুলনা প্রতি দিনের বাস্তবজীবনে কমই দেখা যায়। পারিবারিক বিরোধ ও কলহ ব্যক্তিগত স্নেহ ও ভালবাসার সম্বন্ধকে কি ভাবে সংকুচিত করে, 'ব্যবধান' গল্পটিতে তাহার পরিচয় আছে। অতি সাধারণ ঘটনা, আমাদের পারিবারিক জীবনে নিয়তই এমনই ঘটিতেছে, অথচ তাহা বনমালী ও হিমাংশুমালীর পবিত্র স্নেহ ও ভালবাসার মধ্যে কি করিয়া যে একটি ব্যবধানের সৃষ্টি করিল, এবং সেই সম্বন্ধকে কুণ্ঠিত ও পীড়িত করিয়া তুলিল তাহার অত্যন্ত সহৃদয় বর্ণনা এই গল্পটিতে আছে। গল্পটির গঠন পারিপাট্যও খুব নিপুণ।

কিন্তু যে কয়টী গল্পের উল্লেখ করিলাম, তাহার মধ্যে কোন জটিলতা নাই। যে স্নেহ বা প্রীতির সম্বন্ধকে আমরা তুচ্ছ বলিয়াই বিচার করিয়া থাকি, কবি তাঁহার সকরুণ সহৃদয়তায় আমাদের হৃদয়বৃত্তির সেই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র প্রকাশগুলির সৌন্দর্য, তাহাদের পীড়া ও সংকোচ আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন মাত্র। এই কয়েকটি গল্প তাঁহার গল্পরচনার প্রথম অধ্যায়ে রচিত। বাঙালীর পরিবার ও সমাজ সম্পর্ক, অথবা তাহার বিচিত্র বিধান ও আবেষ্টন এই গল্পগুলির মধ্যে কোনও আবর্তের সৃষ্টি করে নাই, হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র লীলা তখনও কোনও অতর্কিত অসামাজিক কোনও জটিলতা ঘনাইয়া তোলে নাই। কিন্তু কবির কাছে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যতই নিকটতর হইতে লাগিল, মানুষ তাহার অন্তরের গোপন প্রবাহটির বিচিত্রলীলা লইয়া যতই তাঁহার প্রিয় হইতে প্রিয়তর হইতে লাগিল, ততই তিনি দেখিতে পাইলেন, আমাদের নিয়মবদ্ধ সংকীর্ণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যেও মনোবৃত্তির যে লীলা তাহার বৈচিত্র্য অপরিসীম, এবং তাহার ক্ষুব্ধ জটিলতায় আমাদের অতি পরিচিত মনগুলিও ক্ষুব্ধ এবং উচ্ছ্বসিত। ইহার প্রথম সরস

পরিচয় পাই আমরা ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে লেখা 'মধ্যবর্তিনী' গল্পটিতে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির যেটি প্রবলতম, সেই প্রেম একটি সহজ পারিবারিক জীবনযাত্রাকে কি ভাবে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, এবং তিনটি মানুষের জীবনকে কি ভাবে ক্ষুব্ধ ও উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার অপূর্ব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, তাহার মধ্যে অপূর্ব রস ও আবেগ সঞ্চারে রবীন্দ্রনাথ যে অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, ইহার পূর্ববর্তী কোনও গল্পেই তাহা পাওয়া যায় না এবং পরেও খুব বেশী গল্পে পাই না। বহুদিন ভুগিয়া রোগমুক্তির পর হরসুন্দরীর মনে একটা প্রবল আনন্দ, বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হইল, তাহার মনে হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। এবং এই ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া সে এক সুবৃহৎ ত্যাগ করিয়া বসিল—পুত্রহীনা হরসুন্দরী এক রকম জোর করিয়াই স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করাইল, এবং শুধু তাহাই নয়, নববধূ শৈলবালাকে স্বামীর কাছে সোহাগিনী করিয়া তুলিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিল। কিন্তু যেদিন সে দেখিল নিবারণ তাহাকে ছাড়িয়া একান্ত করিয়া শৈলবালাকেই লইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া গেল, এবং সর্বনাশা প্রেমের সুগভীর গহ্বরে আত্মবিসর্জন করিল, তখন তাহার বুকের মধ্যে বেদনা যেন টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। কোথায় গেল সেই বল, যে-বলে হরসুন্দরী মনে করিয়াছিল স্বামীর জন্য চিরজীবনকাল সে আপনার প্রেমের দাবীর অর্দ্ধেকাংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে! আর নিবারণের জীবনের নিম্নস্তরে যে একটি যৌবন-উৎস বরাবর চাপা পড়িয়াছিল, আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড় অসময়ে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। দুর্দমনীয় প্রেমবাসনার অত্যাচারে তাহার বুদ্ধিবিবেচনা এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উলট্ পালট্ হইয়া গেল, এবং অবশেষে নিদারুণ সর্বনাশের মধ্যে হঠাৎ যখন একদিন জাগিয়া উঠিল, তখন ততদিনে শৈলবালা ক্রমাগত আদর সোহাগ পাইয়া নিজের মধ্যে নিজে অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সৌভাগ্য নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া একান্ত আত্মসর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় অহঙ্কার আছে কিন্তু তৃপ্তি নাই, নারী-জীবনের যথার্থ সুখের আস্বাদ নাই। এদিকে শৈলবালার ভোগের সন্তুষ্টি বিধান করিতে গিয়া নিবারণ যখন সর্বস্বান্ত হইল, তখন তাহার অসন্তোষ ও অসুখের আর শেষ নাই; দেহের ও মনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য হইতে সে বঞ্চিত হইল। অবশেষে

'শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসুখ ও অসন্তোষে ক্ষুদ্র বালিকার অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন নষ্ট হইয়া গেল।' তাহার পর আবার নিবারণ নূতন করিয়া পুরাতন হরসুন্দরীকে ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু 'ঠিক্ মাঝখানে একটি মৃতা বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।' গল্পটির কাঠামো যেমন করিয়া বিবৃত করিলাম তাহাতে গল্পের বিশেষ ধর্মটি হয়ত ধরা পড়িবে, কিন্তু একটি মানুষের জীবনে সজাগ প্রেমের জাগরণ তিনটি প্রাণীর সমগ্র জীবন-ধারার মধ্যে কেমন একটা ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে, তিনটি মন, বিশেষভাবে হরসুন্দরীর মন, কি ভাবে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব-লীলায় আন্দোলিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ যে রস-সঞ্চারের ক্ষমতা, যে অপূর্ব মনোবিশ্লেষণের প্রতিভা দেখাইয়াছেন, যেমন করিয়াই গল্পটির সারাংশ উদ্ধৃত করিনা কেন, কিছুতেই তাহার মধ্যে তাহার পরিচয় মিলিবে না।

এই আশ্চর্য মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় 'সমাপ্তি' গল্পটিতেও আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আছে অপূর্ব কাব্যসৃষ্টির সার্থক চেষ্টা। বন্য মৃগের মত দুরন্ত চঞ্চলা বালস্বভাবা মৃন্ময়ীকে যখন ধরিয়া বাঁধিয়া জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া হইল, তখন প্রথম প্রথম অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার বন্য স্বভাব কিছুতেই পোষ মানিল না, সমস্ত দেহমন তাহার বহুদিন পর্যন্ত বিদ্রোহী হইয়া রহিল, এবং নিজের ঘরে প্রকৃতির মুক্ত আবেষ্টনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল, বালসুলভ চপলতা কিছুতেই তাহার ঘুচিল না। কিন্তু তাহার এই অদ্ভুত ব্যবহারে স্বামী অপূর্ব যখন তাহাকে বাপের বাড়ী রাখিয়া দীর্ঘ দিনের জন্য কলিকাতা চলিয়া গেল, তখন হঠাৎ কি এক অদৃশ্য প্রভাবে যেন সমস্ত আমূল পরিবর্তিত হইয়া গেল। হঠাৎ যেন তাহার মনে হইল, সমস্ত গৃহে এবং গ্রামে কেহ লোক নাই, হঠাৎ এক মুহূর্তে যেন তাহার বাল্যজীবন অপসারিত হইয়া যৌবনস্বপ্নে সমস্ত আকাশ ছাইয়া গেল, হঠাৎ যেন কেমন করিয়া বাল্য অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল। বিস্মিত ব্যথিত মৃন্ময়ীর সমস্ত স্মৃতি 'সেই আর একটি বাড়ী, আর একটি ঘর, আর একটি শয্যার কাছে গুন্ গুন্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।' এই অতর্কিত আমূল পরিবর্তন, এ যেন এক সোনার কাঠির স্পর্শ, এবং এই স্পর্শটুকু এমন সুন্দর ও মনোরম করিয়া কবি ফুটাইয়াছেন যে, তাহার মধ্যে একটি অতি সুকোমল

দরদ-বোধ যেন স্বতঃ উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটিতে শশী-ভূষণ ও গিরিবালার মধ্যে স্নেহে সুকোমল যে একটি শুদ্ধ পবিত্র সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে-সম্বন্ধের স্বরূপটি হয়ত শশিভূষণ বা গিরিবালা কাহারও যথেষ্ট স্পষ্ট করিয়া জানা ছিল না, আমাদেরও তাহা স্পষ্ট করিয়া জানিবার উপায় নাই; কিন্তু সেই সুকোমল সম্বন্ধটি এমন একটি সকরুণ বিচ্ছেদ-ব্যথার মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে, যে তাহাতে সমস্ত মন ব্যথিত হইয়া উঠে। এই গল্পটিতেও কবির অন্তর্দৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণের ক্ষমতা সুপরিস্ফুট; কিন্তু গল্পটিতে অবান্তর ঘটনা বাহুল্য এত বেশী, এবং সেই ঘটনাগুলিও এত খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন যে সমগ্র গল্পটি জমাট বাঁধে নাই, এক কথায়, রস ঘন হইয়া উঠিতে পারে নাই। শ্রীকুমার বাবু সত্যই বলিয়াছেন, "গল্পটি শশিভূষণের জীবন-কাহিনীর কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশের সমষ্টি বলিয়া আর্টের পরিণত ঐক্য লাভ করিতে পারে নাই।"

কিন্তু 'দিদি' গল্পটি নিখুঁত, অপূর্ব—কি ইহার চরিত্র-বিশ্লেষণের ক্ষমতায়, কি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে, কি ঘটনাসংস্থানে, কি ইহার করুণ সমাপ্তিতে। জয়গোপালের স্ত্রী শশীমুখীর মনে স্বামী-বিরহে যখন প্রবল প্রেমাবেগ জাগিয়া উঠিতেছে, যখন 'নির্জ্জনঘরে বিরহশয্যায় উন্মেষিত-যৌবনা নববধূর সুখস্বপ্ন' দেখিতেছে, ঠিক তখনই পিতৃমাতৃহারা ছোটভাইটিকে লইয়া স্বামীর সহিত তাহার এক বিরোধের সূত্রপাত হইল; এবং ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল। ছোট একটি ছিদ্র অবলম্বন করিয়া এই বিরোধ ক্রমে অত্যন্ত 'বিকট বীভৎস আকার' ধারণ করিল। শশীর মন ছোটভাইটিকে সকল অসুখ অবিচার হইতে রক্ষা করিতে প্রাণপণে আকুল, অথচ স্নেহলেশহীন অবিচারী স্বার্থপরায়ণ স্বামীর প্রতি তাহার প্রেমের টানও কম নয়। মনের মধ্যে এই নীরব দ্বন্দ্বের আন্দোলনটি গল্পের মধ্যে অতি চমৎকার রূপ পাইয়াছে, এবং শশীর শান্ত নীরব সহিষ্ণুতা এই রূপটিকে আরও করুণ মাধুর্যে ভরিয়া তুলিয়াছে। 'দৃষ্টিদান' গল্পটি মিলনাত্মক, কিন্তু আরও সুন্দর, আরও মধুর, এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এমন একটা স্নিগ্ধ সুকোমল সংযত প্রেমাবেগ দ্বারা উচ্ছ্বসিত, এমন মৃদুসৌরভ, সঙ্গীত, সৌন্দর্য এবং সুকুমার চিরতারুণ্য দ্বারা আপ্লুত যে, কোনও ভাষায়, কোনও কথায় তাহা ব্যক্ত করা একেবারেই অসম্ভব। প্রত্যেকটি কথায়, প্রত্যেকটি চিত্রে ও বর্ণনায় একটি শীতল সুকোমল

মাধুর্য সমস্ত গল্পটিকে যেন একটি ফুলের মতন ফুটাইয়া তুলিয়াছে। অথচ তাহার মধ্যে কি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়; কবি যেন চোখ দিয়া কিছু দেখেন নাই, মন দিয়া সমস্তই অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার অন্ধ মানসকন্যাটির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও যেন অন্ধ হইয়া গিয়াছেন, চোখ দিয়া সমস্ত জীবন ও প্রকৃতিকে দেখিবার ও ভোগ করিবার যে সুবিধা, তাঁহার দৃষ্টিহীনা কন্যাটির জন্য যেন তিনি তাহা বিসর্জন দিয়াছেন। মনের স্বচ্ছ গভীর অনুভূতি-দৃষ্টির যে জগতে তাঁহার কন্যাটির বাস, তিনি-ও যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই জগতের অধিবাসী হইয়াছেন, নহিলে বুঝি দৃষ্টিহীনার সহজ অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম সুগভীর অনুভূতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধে এমন করিয়া কিছুতেই ফুটাইয়া তোলা সম্ভবপর হইতনা। অবস্থার স্বচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর যখন পরিবর্তন আরম্ভ হইল, ন্যায় অন্যায় ধর্ম অধর্ম সম্বন্ধে তাহার মনের বেদনাবোধ যখন অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল, তখন সেই দৃষ্টিহীনা সহজেই সব বুঝিতে পারিল। "একদিন একজন ধনিলোকের আমলা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপনে দুইদিন ধরিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল, কি বলিল আমি কিছুই জানিনা,—কিন্তু তাহার পরে যখন তিনি আমার কাছে আসিলেন, অত্যন্ত প্রফুল্লতার সঙ্গে অন্য নানাবিষয়ে নানা কথা বলিলেন, তখন আমার অন্তঃকরণের স্পর্শশক্তিদ্বারা বুঝিলাম, তিনি আজ কলঙ্ক মাখিয়া আসিয়াছেন।" তারপর হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে যখন স্বামীর নূতন প্রেমাবেগের সঞ্চার হইতেছে, তখন তাহার এই নূতন অনুভূতি দৃষ্টিহীনা স্ত্রীর নিকট হইতে তিনি প্রাণপণে গোপন করিতেছেন; কিন্তু দৃষ্টিহীনা নারী অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দিয়া সকলই বুঝিতেছে, দেখিতেছে। "অথচ পত্রদ্বারা তিনি যে সর্বদাই তাহার (হেমাঙ্গিনীর) খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যখন একটু প্রবেশ করে সেইদিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে—তেমনই তাঁহার ভিতরে একটুও যেদিন স্ফীতির সঞ্চার হয়, সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি।" দৃষ্টিহীনার এমন অনবদ্য সহজ অথচ সূক্ষ্ম অনুভূতির এমন অপূর্ব পরিচয় সাহিত্যে খুব কমই দেখা যায়। এই গল্পটির সুকোমল মৃদু মাধুর্য 'মাল্য-দান' গল্পটিতেও আছে। কুড়ানি কুড়াইয়া পাওয়া মেয়ে, বনের হরিণশিশুর মত সরল, তাহার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণও হয় নাই। একটি অপরিচিত যুবকের সম্মুখে তাহাকে লইয়া প্রেমের ও বিবাহের কত কৌতুক,

অথচ কিছুই সে বুঝিতে, কিছুরই মর্ম সে গ্রহণ করিতে পারেনা। কিন্তু, একদিন সেই স্বল্পপরিচিত যুবকটি যখন চলিয়া গেল, তখন বাহিরের রৌদ্ররচিত জগৎখণ্ডের প্রাণের আনন্দের মধ্যে, "ঐ বুদ্ধিহীনা বালিকা তাহার জীবনের, তাহার চারিদিকের, সঙ্গত কোনো অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিলনা। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা! কি হইল, কেন এমন হইল তা'র পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা কিছু সমস্তই এমন একেবারে শূন্য হইয়া গেল কেন? যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প, তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল? জগতের এই সহজ উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে, এই গাছপালা মৃগপক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরবের মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে?" তারপর দেখিতে না দেখিতে মৃগ-শিশু কুড়ানি কখন হৃদয়ভারাতুরা যুবতী নারী হইয়া উঠিল! "কোন্ রৌদ্রের আলোকে—কোন্ রৌদ্রের উত্তাপে তাহার বুদ্ধির উপরকার সমস্ত কুয়াসা কাটিয়া গিয়া তাহার লজ্জা, তাহার শঙ্কা, তাহার বেদনা এমন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িল!" এবং সর্বশেষে আরও দুঃখ বেদনার ভিতর দিয়া একটা ব্যর্থ সার্থকতার মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিল। কুড়ানির ও যতীনের মনোবৃত্তি স্ফুরণের যে-চিত্র এই গল্পটিতে আছে তাহার মধ্যে কবির সহজ ও স্বাভাবিক সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় অতি চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে।

'মাষ্টার মশায়' গল্পটি অত্যন্ত সরল; গৃহশিক্ষকের সঙ্গে তাহার ছাত্রের স্নেহসম্পর্কের একটি কাহিনী। অথচ এই অতিপরিচিত মনোবৃত্তিটি তাহার সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশের পথ না পাইয়া নিজের মধ্যেই পীড়িত ও সংকুচিত হইয়া মরিয়াছে। মাতৃহারা বেণুগোপাল তাহার পিতার ক্রমবর্দ্ধমান অবহেলা ও ঔদাসীন্যের হাত হইতে মুক্তি পাইতে গিয়া সর্বনাশ করিয়া বসিল তাহার, যে তাহাকে সকলের চাইতে বেশী স্নেহ করে। অথচ এই সর্বনাশ যে মাষ্টারমশাই হরলালের সর্বনাশ তাহা সে বুঝিল না। তাহার একান্ত স্নেহের পাত্রই যে তাহাকে অন্ধকার গহ্বরে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে, একথা ত সে কাহাকেও বলিতে পারেনা, মা-কেও না; আর মুখ ফুটিয়া বলিতে কি, ভাবিতে গেলেও যে তাহার দেহমন সমস্ত অসাড় অবসন্ন হইয়া আসে। অথচ অন্তদিকে লজ্জা, অপমান, দুঃখ কাল ঘন মেঘের মত যেন তাহার সমস্ত জীবনকে ঘেরিয়া আসিয়াছে, মুক্তির কোনও পথ নাই, সহায়

নাই, নিষ্কৃতি নাই। ভাবিতে ভাবিতে স্বাভাবিক বুদ্ধি যখন লয় পাইল, মস্তিষ্কে যখন বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল, সমস্ত জীবন যখন দুর্বহ হইয়া একটা চঞ্চল বিক্ষোভের মধ্যে তাহার অবসান খুঁজিতে লাগিল, তখন জীবনের এই দুশ্ছেদ্য জটিল ট্র্যাজেডিটুকু একটা অদ্ভুত ভঙি অবলম্বন করিয়া একটি শান্ত অচঞ্চল সুগভীর অনুভূতির মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিল। এই বিশেষ ভঙিটুকুর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কল্পমায়ার, তাহার বিশেষ কবি-মানসের অপূর্ব পরিচয় আছে। ব্যাপারটি কিছুই নয়; এই সহায়সম্বলহীন নৈরাশ্যান্ধকারময় বর্তমান ও ভীষণতর ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার দেহমনের চৈতন্য বিলুপ্ত হইল, এবং এই প্রকাণ্ড মানসিক আঘাত সহ্য করিয়া সে আর বাঁচিয়া উঠিতে পারিল না। কবির হাতে যখন এই প্রবল মানসিক বিক্ষোভ ক্রমে অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, ট্র্যাজেডি যখন প্রায় চরমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন এক অপূর্ব কৌশলের ফলে সমস্ত ট্র্যাজেডিটুকু যেন একটি সোণার কাঠির ছোঁয়ায় এক অপরূপ রূপে মণ্ডিত হইয়া একটি পরিপূর্ণ ভাবলোকের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিল। "সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া গেল মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।…সে যে মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন একমুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল।…মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল, তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল।…বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র মিলাইয়া গেল,—হরলালের শরীর মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল,—ঐ গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্বুদ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।" ইহাতে যে শুধু সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে একটি অপূর্ব কল্পমায়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই নয়; সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে প্রকৃতির ভাষায় রূপান্তরিত করিবার, প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে তাঁহাকে একান্ত-ভাবে যুক্ত করিয়া অভিব্যক্তি দান করিবার যে বিশেষ শিল্পকৌশল একান্তই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, এই গল্পটির পরিসমাপ্তির মধ্যে তাহারও পরিচয় আছে।

অথচ, আমি আগেই বলিয়াছি, এই শিল্পকৌশল কিছু সজ্ঞান চেষ্টা নয়, ইহা তাঁহার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির, বিশেষ অনুভূতিরই একটি প্রকাশ; সৃষ্টির মর্মস্থলে একটি বিরাট ঐক্যানুভূতির, "creative unity"-র অভিব্যক্তি।

'রাসমণির ছেলে' গল্পটি প্রকৃতপক্ষে দুইটি গল্প। কালীপদের যে বাল্যজীবন সুদৃঢ় সুকঠোর মাতৃশাসন ও উদার শিথিল পিতৃস্নেহের মধ্যে কাটিয়াছে, সেই বাল্যজীবনের পরিচয়টুকু সম্পূর্ণ করিতে গিয়া ছোট একটি গল্পের অবতারণা করিতে হইয়াছে। তাহার মধ্যে রাসমণির পতিপ্রেম ও মাতৃস্নেহ তাহার সমস্ত স্নিগ্ধকোমল মাধুর্য ও সুকঠোর দৃঢ়তা লইয়া কি করিয়া অপূর্ব রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, একটি বালকের সুকোমল হৃদয় পিতৃহৃদয়ের শিথিল উদার স্নেহের মধ্যে দায়ীত্বলেশহীন সুখপরায়ণ যথেচ্ছাচারী হইয়া গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনার মুখে মাতার সুদৃঢ় শাসনে কি করিয়া সংযত হইয়া গেল, এবং কি করিয়া মাতার একান্ত অন্তরঙ্গ হইয়া ক্রমে সে বুঝিল যে পৃথিবীতে মূল্য না দিয়া কিছুই পাওয়া যায় না, এবং সে মূল্য দুঃখের মূল্য, এই ছোট খণ্ড-গল্পটির মধ্যেই তাহার সমস্ত পরিচয় আছে। একটু বিকৃত ভাষায় বলিতে গেলে, ইহা একটি গল্পের ভিতর আর একটি গল্প, story within a story। সত্য বলিতে কি, ইহার পরে রাসমণি চরিত্রের নূতন পরিচয় আর কিছু পাই না; শুধু পরিচয় বলিয়াই নয়, তাঁহার দেখাও আর পাই না, যতটুকু পাই তাহা কালীপদের মধ্যেই; এবং কালীপদের যে পরিচয় ইহার পরে আছে, তাহারও সূচনা এইখানেই আমরা পাইলাম। এই গল্পাংশটির সঙ্গে পরবর্তী অংশটির খুব একটা নিবিড় ঐক্য কিছু নাই, শুধু ঐ ভবানীচরণের বিগত বংশাভিমান ও উইলচুরীর ব্যাপারটি ছাড়া। যাহা হউক, লেখাপড়া শিখাইয়া ছেলেকে মানুষ করিবার জন্য রাসমণি ছেলেকে কলিকাতা পাঠাইলেন, মাতার আশীর্বাদ কালীপদকে রক্ষাকবচের মত ঘিরিয়া রহিল। রাসমণি এইখানেই বিদায় লইলেন। ইহার পরবর্তী গল্পাংশে রাসমণির স্থান কোথাও নাই। কিন্তু ভবানীচরণ যে নিজের কোল ছাড়িয়া কালীপদকে কলিকাতা পাঠাইতে রাজী হইলেন, তাহা কালীপদকে মানুষ করিবার জন্য নয়; তিনি ভাবিলেন কালীপদ লেখাপড়া শিখিয়া উইল চুরির প্রতিশোধ লইবে, সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনিবে, এবং বিলুপ্ত বংশগৌরবকে ফিরাইয়া আনিবে। কালীপদ মাতার আশীর্বাদের বর্মে নিজকে

আবৃত করিয়া কলিকাতার জীবন কাটাইতে লাগিল; তারপর একদিন যখন সেই বর্মে আঘাত লাগিল তাহার মাতৃআশীর্বাদের উপর যখন লাঞ্ছনা বর্ষিত হইতে আরম্ভ করিল, তখন সে ভাঙিয়া পড়িল, কিন্তু আত্মার পরাভব কিছুতেই স্বীকার করিল না, নিজের দুঃখের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুতেই অপমানিত হইতে দিল না। মায়ের আশীর্বাদ অক্ষয় হইয়া রহিল, কিন্তু কালীপদ বাঁচিল না। কিন্তু বীর সৈনিকের মত মাতার আশীর্বাদের পতাকা বহন করিবার উজ্জ্বল সাধনার মধ্যে এই গল্পাংশটির সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে নাই; সে সৌন্দর্য ফুটিয়াছে শৈলেন্দ্রের চরিত্রের বিশ্লেষণে, এবং ভবানীচরণের জীবনের ট্র্যাজেডির মধ্যে। প্রথমটায় শৈলেন অর্থ ও আভিজাত্যের গর্বে কালীপদকে অবজ্ঞা করিয়াই চলিত, লজ্জিত ও অপদস্থ করিতেও সংকুচিত হইত না; তারপর একদিন সে বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা যখন চরমে উঠিল, এবং কালীপদ যখন বেদনায় ভাঙিয়া পড়িল, তখন শৈলেনের ব্যবহারের এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল; এবং তখন পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কোনও কিছুই বাকী রাখিল না। এই পরিবর্তনের মধ্যে, এবং শৈলেনের পূর্বকার চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে অপূর্ব মনোবিশ্লেষণের পরিচয় আছে, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া কালীপদের চরিত্রে যে দৃঢ়তা ও সংযম এবং একান্ত নিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে তাহারও মূল্য কম নয়। কালীপদ মরিল; স্বামীর কথা ভাবিয়া 'রাসমণি নিজের শোককে ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না, তাঁহার পুত্র আবার তাঁহার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল।' কিন্তু ট্র্যাজেডি ঘনীভূত হইয়া উঠিল ভবানীচরণের জীবনে। কালীপদ কলিকাতায় গিয়াছিল 'সীতা উদ্ধার' করিতে, ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইতে; ভবানীচরণ এই ভরসা নিয়াই বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু কালীপদ যখন মরিল, তখন আর কিছুই আশা করিবার, আকাঙ্ক্ষা করিবার রহিল না, রহিল কেবল পিতৃহৃদয়ের দুঃখ ও ব্যথা। এমন সময় এক নিশীথ রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে বন্দিনী সীতার উদ্ধার হইল, উইল ফিরিয়া পাওয়া গেল, ঘরের লক্ষ্মী ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তখন কালীপদ নাই— উইলের কি প্রয়োজন, ঘরে লক্ষ্মী থাকিল কি না-ই থাকিল, তাতেই কি ক্ষতি !!

কিন্তু এম্‌নি করিয়া কয়টি গল্পের উল্লেখ করা সম্ভব? আমি কয়েকটি প্রধান প্রধান গল্পের উল্লেখ করিলাম মাত্র। (আমাদের হৃদয়-বৃত্তির বিচিত্র লীলার

মধ্যে পরিবার ও সমাজের সরল ও জটিল আবেষ্টনে, তাহার বিচিত্র পরিচয়ের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও সহজ অনুভূতি অবাধ বিহারের আনন্দলাভ করিয়াছে, নিজের সুকোমল দরদবোধ দিয়া আমাদের হৃদয়বৃত্তির এই সূক্ষ্ম জটিল লীলাগুলিকে তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এবং তাহার এই সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণ অপূর্ব রসে ও সৌন্দর্যে এই গল্পগুলির মধ্যে সর্বত্র অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।) 'ঠাকুর্দা' গল্পে ঠাকুর্দার চরিত্রে, 'পণরক্ষা' গল্পে বংশীবদন ও রসিকের জটিল স্নেহ সম্পর্কের মধ্যে, 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পে পরিবারের দাবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেমের দাবীর বিরোধ ও অসঙ্গতিতে বাণোয়ারীলাল ও কিরণলেখার যে পরিচয় আছে তাহার মধ্যে, 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর চরিত্রে যে শান্ত সুগম্ভীর সহিষ্ণুতা একটা দুঃখের মূর্তি ধারণ করিয়াছে তাহার মধ্যে, এবং এমনই ধরণের আরও অনেক গল্পেই কবি হৃদয়ের এই সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টি, সহজ দরদবোধ ও অপূর্ব মনোবিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৪)

হৃদয়-বৃত্তির যে-লীলাবৈচিত্র্যের কথা বলিলাম, এই বৈচিত্র্যের কোনও সীমা নাই, শেষ নাই। এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে ছোটগল্পগুলির উল্লেখ করিয়াছি তাহার সবগুলির মধ্যেই হৃদয়বৃত্তির যে লীলাবৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা আমাদের কাছে অল্পবিস্তর পরিচিত, তাহাদের উদ্ভব আমাদের জীবনের মর্মস্থল হইতে, এবং পাঠকের কাছে তাহাদের আবেদন তাহাদের হৃদয়ের সুগভীর রসানুভূতির মধ্যে, তাহাদের চিত্তের সহজ দরদবোধের মধ্যে। 'পোষ্টমাষ্টার', কিংবা 'সমাপ্তি' কিংবা এই ধরণের যত গল্প, এই গল্পগুলি পড়িতে পড়িতে আমাদের সুগভীর অন্তর-দেশটি যেন রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, হৃদয়ের ভাঁটায় যেন টান পড়ে, সমগ্র মর্মস্থলটি যেন কাঁপিয়া নড়িয়া উঠে। ইহাদের আবেদন অত্যন্ত স্বচ্ছ, সহজ, সরল। সমস্ত ঘটনা ও সমস্যাকে অতিক্রম করিয়া ইহারা সরাসরি অন্তরের গহন দেশে গিয়া ঢুকিয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের পরিবারের ও সমাজের এই চিরপরিচিত জীবনধারার মধ্যেও হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম বিচিত্রলীলা এক এক সময় এমন এক একটি অপরূপ উপায়ে বিকশিত হইয়া উঠে, এমন এক একটি অপ্রত্যাশিত

পরিণতি লাভ করে যেগুলিকে সামাজিক ও পারিবারিক বিধিবিধান অনুসারে অন্যায় হয়ত বলিতে পারি, কেহ কেহ হয়ত অধর্মও বলিবেন, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুতেই বলিতে পারিনা। আমাদের অন্তরের রসানুভূতির মধ্যে তাহাদের আবেদন সহজ ও সরল নয়, স্বচ্ছ নয়, হয়ত তাহারা আমাদের চিত্তকে রসে ভরিয়া দেয় না, মর্মস্থলটিকে নাড়া দেয় না, কিন্তু আমাদের বুদ্ধির মধ্যে চিন্তার মধ্যে তাহারা জোর করিয়া আসন পাতিয়া বসে, সেখানে কিছুতেই তাহাদের দাবী অস্বীকার করিতে পারিনা। চারিদিক বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অন্তরের সূক্ষ্ম অলিগলিগুলির সন্ধান লইলে সেগুলিকে একান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়; এবং আমাদের বুদ্ধি ও চিন্তাবৃত্তি তাহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করে। হৃদয়বৃত্তির এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লীলাগুলির সম্বন্ধে বহুদিন আমরা কিছু সচেতন ছিলাম না, রবীন্দ্রনাথও হয়ত ছিলেন না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমাদের কিংবা লেখকের চেতনাবোধ থাকিলেও অন্যায় বোধে অসামাজিক বোধে সেখানে আত্মপীড়ন ও সংকুচনের সীমা ছিল না। আজ হৃদয়বৃত্তির এই অজ্ঞাত ও অনাদৃত লীলাগুলি সম্বন্ধে আমরা কমবেশী সচেতন হইয়াছি, আমাদের বুদ্ধি দিয়া, চিন্তা দিয়া সেগুলিকে আমরা নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছি, এবং অন্যায় বলিয়া মনে করিলেও কিছুতেই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারিতেছিনা। বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের ছোটগল্পে ও উপন্যাসে হৃদয়বৃত্তির এই নূতন আবিষ্কৃত লীলা-জগত খুব বড় একটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে; কিন্তু তাহাতে বুদ্ধির লীলা ও সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ প্রতিভাই একান্তভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, অন্তরের সুগভীর রসে সর্বত্র তাহা অভিষিক্ত হয় নাই, বস্তুর যথার্থ রূপে ও পরিচয়ে তাহা আশ্রিত নয়, হৃদয়ের সহজ দরদবোধ তাহাকে সর্বদা আবেগে ও সৌন্দর্যে পরিপ্লুত করিতে পারে নাই। সেই জন্যই এই ধরণের গল্পে যুক্তির প্রাখর্য, বর্ণনার চাতুর্য যতটা প্রকাশ পাইতেছে, রসের গভীরতা, সহজ সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় ততটা পাওয়া যাইতেছেনা। বর্তমান বাংলা কথা-সাহিত্যের এই নূতন অধ্যায়ের সূচনা রবীন্দ্রনাথের একশ্রেণীর ছোটগল্প ও উপন্যাসেরমধ্যেই সর্বপ্রথম দেখা যায়, এবং এই গল্পগুলি সাধারণতঃ পরবর্তী কালের রচনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাঙলা কথা-সাহিত্যের এই নব-ধর্মের অগ্রদূত হইলেও শুধু মাত্র বুদ্ধির দীপ্তিতেই তাঁহার এই ধরণের গল্পগুলি

আলোকিত হয় নাই, যুক্তির প্রাখর্য ও বর্ণনার চাতুর্যই তাহার মধ্যে কখনও একান্ত হইয়া উঠে নাই, বুদ্ধির দীপ্তির সঙ্গে মিশিয়াছে হৃদয়ের সহজ দরদবোধ, যুক্তির প্রাখর্যের সঙ্গে মিশিয়াছে অন্তরের সুগভীর রসানুভূতি, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে মিশিয়াছে সহজ সৌন্দর্যবোধ, বর্ণনা-চাতুর্যের সঙ্গে মিশিয়াছে অপূর্ব কলা কৌশল, বাস্তব সত্যের সঙ্গে মিশিয়াছে ভাবলোকের সত্য ও সৌন্দর্য।

যাহা হউক, এই ধরণের গল্পগুলির প্রথম পরিচয় 'নষ্টনীড়', ১৩০৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে লেখা। 'নষ্টনীড়'কে ছোটগল্প বলিতে কাহারও কাহারও আপত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু ঘটনার যে স্তর পর্যায়, যে আবর্ত, যে সংক্ষুব্ধ সুগভীর ঘাত প্রতিঘাত উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, তাহারা পরিচয় 'নষ্টনীড়' গল্পে নাই। কাজেই আয়তনে প্রায় উপন্যাসিক সম্ভাবনা সত্ত্বেও 'নষ্টনীড়'কে ছোট গল্প পর্যায়ে উল্লেখ করাই সঙ্গত। যাহাই হউক, এই গল্পটিতে মনস্তত্ত্বমূলক একটি সমস্যা অতি সুনিপুণ অভিব্যক্তিলাভ করিয়াছে।

চারুবালা ভূপতির স্ত্রী, অমল চারুর সমবয়সী দেবর। ভূপতি সংবাদ-পত্র সম্পাদনায় ব্যস্ত, নিরবসর কাজের লোক। স্ত্রী-র দিকে চাহিবার অবসর তাহার ছিলনা, স্ত্রী-র ভালবাসা যে মূল্য দিয়া কিনিতে হয়, একথা তাহার মনে কখনও জাগে নাই। তাহার 'একটা সাধারণ সংস্কার ছিল স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্ত্রী ধ্রুবতারার মত নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে,—হাওয়ায় নেবেনা, তেলের অপেক্ষা রাখেনা।' এই সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া ভূপতি কর্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সংসারে চারুকে সঙ্গদান করিবার জন্য রহিল অমল এবং চারুর এক ভাজ, মন্দাকিনী। মন্দাকিনীর রুচি এবং প্রবৃত্তি একটু স্থুল, বুদ্ধি একান্তই সাংসারিক। অমল সৌখীন তরুণ, কল্পনা-প্রবণ এবং সাহিত্যে যশলিপ্সু। চারু তাহার নিরবচ্ছিন্ন অবসর অমলের আব্দার দিয়া, অমলের সাহিত্য-লিপ্সার গাছে জল ঢালিয়া এবং বাতাস দিয়া, এবং নানাপ্রকারে অমলের সঙ্গ আহরণ করিয়া ভরিয়া তোলে। এইভাবে চারু এবং অমলের মধ্যে একটা মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে; তাহারও বেশী, অমলের সঙ্গ উপলক্ষ করিয়া চারুর যৌবন বিকশিত হইয়া উঠে। 'চারু ও অমলের এই সখিত্বে ভূপতি আনন্দ বোধ করিত। এই দুইজনের আড়ি ও ভাব, খেলা ও মন্ত্রণা তাহার কাছে সুমিষ্ট কৌতুকাবহ ছিল।' 'কিন্তু ক্রমশঃ অমলের সাহিত্য-যশলিপ্সার গাছে ফুল ফুটিল, এবং তাহার সৌরভ চারু এবং অমল এই

দুইজনের জগৎ অতিক্রম করিল। অমল চারুকে অতিক্রম করিল; আগে তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল শুধু চারুর কাছে, এখন সে দশজনের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দাঁড়াইয়া শতজনের প্রতিষ্ঠা দাবী করিল। চারু তাহাতে ব্যথিত হইল, অমল যে ক্রমশঃ তাহার নীড় হইতে বাহির হইয়া ডানা মেলিতেছে, ইহাতে তাহার নবজাগ্রত নারীত্বে সে আঘাত পাইল। মন্দাকিনী এতদিন অমলকে বিশেষ একটা কেহ বলিয়া মনে করে নাই। আজ তাহার স্থূল রুচি ও প্রবৃত্তি লইয়া 'মন্দা যখন দেখিল অমল চারিদিক হইতেই শ্রদ্ধা পাইতেছে তখন সেও অমলের উচ্চ মস্তকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। অমলের তরুণ মুখে নব গৌরবের গর্বোজ্জ্বল দীপ্তি মন্দার চক্ষে মোহ আনিল।' সেই মোহে অমল এখন নিজকে ধরা দিতে বাধ্য হইল। এদিকে তখন চারুর মনে ঈর্ষ্যার ছায়া ঘনাইতে আরম্ভ করে। সে স্থির করিল, সেও সাহিত্য সৃষ্টি করিবে, এবং অমলকে দেখাইয়া দিবে, মন্দাকিনীর চেয়ে সে অনেক বড়, অনেক বেশী কাম্য। কিন্তু হইল বিপরীত। চারুর রচনা ও অমলের রচনা পাশাপাশি রাখিয়া কাগজে যে-সমালোচনা বাহির হইল তাহাতে চারুরই হইল জয়, সমালোচক অমলকে নিন্দাবানে লাঞ্ছনা করিলেন। চারু ও অমলের ব্যবধান বাড়িয়াই গেল, এবং অমল ক্রমশঃ মন্দার দিকেই আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। চারুর মনে একদিকে এই ব্যবধানের বেদনা, আর একদিকে ঈর্ষ্যার জ্বালা; এই দুইয়ে যখন তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত ও ভারাক্রান্ত, তখন ভূপতির কর্মসমুদ্রে সংবাদপত্র তরণী টলমল করিয়া উঠিল মন্দার স্বামী উমাপদর চক্রান্তে। ম্লান মুখে চিন্তাভারাতুর হৃদয়ে বহুদিন পরে ভূপতি শান্তি খুঁজিতে আসিল স্ত্রী চারুর কাছে। কিন্তু 'চারু তখন নিজের দুঃখে সন্ধ্যাদীপ নিবাইয়া জানালার কাছে অন্ধকারে বসিয়াছিল।' ভূপতি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। ইতিমধ্যে মন্দা স্বামীকে লইয়া বিদায় হইয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যেই ভূপতির সংবাদ-পত্র তরণীও ভরাডুবি হইল। চারু তখনও নিজের দুঃখভারে অবনত, ভূপতির বিপদের দিকে দৃষ্টি দিবার মত হৃদয়ের অবস্থা তাহার নয়। কিন্তু সে-বিপদ যে কত বড় এবং সেই বিপদ ও দায়ীত্ব মাথায় লইয়া দাদা যে একা অসহায়ের মতন নিশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন তাহা শুধু বুঝিল অমল। এক মুহূর্তে সে তাহার নিজের দায়ীত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইল, নিজের কর্তব্যবোধ মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিল, এবং হয়ত বা নিজের অতীতের দায়ীত্বলেশহীন

জীবনযাত্রার জন্য ব্যথিত ও হইল। এমন সময় সুযোগ আসিল অমলের এক বিবাহের, এবং বিবাহের পরই শ্বশুরের খরচে বিলাত যাইবার। বিনা দ্বিধায় এবং বিনা বাক্যব্যয়ে অমল রাজী হইল, এবং বিবাহের পরই বিলাত চলিয়া গেল। তাঁহার প্রতিজ্ঞা, তাঁহাকে মানুষ হইয়া উঠিয়া দাদার বিপদের অংশ মাথায় লইতেই হইবে। সে জানিলনা, বুঝিতেও পারিলনা, দাদার সুখ ও শান্তির নীড়টি ইতিমধ্যেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এদিকে চারু আশ্চর্য হইল, ব্যথিত হইল এই ভাবিয়া যে অমল এত সহজে বিবাহ করিতে রাজী হইল কি করিয়া, এত সহজে তাহাদের দুজনের মধুর সম্বন্ধ ভুলিতে পারিল কি করিয়া, এবং তাহাকে একটি কথাও না বলিয়া একান্তভাবে চলিয়াই বা যাইতে পারিল কি করিয়া। 'নিজের হৃদয় প্রাচুর্যের সহিত তুলনা করিয়া চারু অমলের শূন্য হৃদয়কে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিলনা। ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা বেদনার উদ্বেগ তপ্তশূলের মত তাহার অভিমানকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল।' চারু নিজে ভাবিয়াছিল, অমল চলিয়া যাওয়ার আগে তাহাদের এই ব্যবধান সে নিজেই ঘুচাইয়া ফেলিবে, কিন্তু 'বিদায় দিবার সময় চারুর মুখে কোনও কথাই বাহির হইল না। সে কেবল বলিল, চিঠি লিখ্‌বে ত অমল? অমল ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল—চারু ছুটিয়া গিয়া শয়ন ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।' তারপর আরম্ভ হইল দিনের পর দিন নীরব ক্রন্দন। 'অবশেষে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সংসারিক শূন্যতার পরিমাপ ক্রমাগতই যেন বাড়িতে লাগিল। এই ভীষণ আবিষ্কারে চারু হতবুদ্ধি হইয়া গেছে। * * * এ মরুভূমির কথা সে কিছুই জানিত না।' * * * 'অবশেষে চারু একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল—নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করায় ক্লান্ত হইল—হার মানিয়া নিজের অবস্থাকে অবিরোধে গ্রহণ করিল। অমলের স্মৃতিকে যত্নপূর্বক হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল। ক্রমে এম্‌নি হইয়া উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্বের বিষয় হইল—সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব।'

"গৃহকার্যের অবকাশে একটা সময় সে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। সেই সময় নির্জনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিসের উপর মুখ রাখিয়া বারবার করিয়া বলিত—অমল,

অমল, অমল! সমুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত—বৌঠান, কি বৌঠান! চারু নিস্তব্ধ স্ফুরিত করিয়া বলিত—অমল, তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন? আমি তো কোনো দোষ করি নাই। তুমি যদি ভাল মুখে বিদায় লইয়া যাইতে, তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইতামনা। অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত, চারু ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত। অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই। একদিনও না, এক দণ্ডও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠপদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব।

"এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃপুরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা সজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামীর বা পৃথিবীর আর কাহারও কোনও অধিকার রহিলনা। * * * তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে, এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোসখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

"এইরূপে মনের সহিত দ্বন্দ্ববিবাদ ত্যাগ করিয়া চারু তাহার সুবৃহৎ বিষাদের মধ্যে একপ্রকার শান্তিলাভ করিল এবং একনিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে ভক্তি ও যত্ন করিতে লাগিল। * * *"

কিন্তু বৃথাই চারুর এই চেষ্টা, বৃথাই এই সাধন-যোগ। এবং বৃথাই ভূপতির নানা উপায়ে নানা চেষ্টায় চারুকে অন্তরের মধ্যে একান্ত আপন করিয়া ধরিবার। মনের সঙ্গে লুকোচুরী করিয়া দিন কাটিয়া যায়, কিন্তু একদিন ভূপতি জানিল, সমস্ত বুদ্ধি ও চৈতন্য দিয়া বুঝিল, তাহার নীড় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর তাহা জোড়া লাগিবে না। 'সংসার একেবারে তাহার কাছে শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল।' কিন্তু, সে কিছু বলিল না, কোলাহল করিল না, শুধু বুঝিতে চেষ্টা করিল। চারু আর একবার শেষ চেষ্টা হয়ত করিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝিল, নষ্টনীড় আবার গড়িয়া তোলার চেষ্টা বৃথা।

গল্পটির কাঠামো অত্যন্ত শুষ্ক ও নীরস করিয়া উপরে বিবৃত করা হইয়াছে। যে সুচারু ও সুনিপুণ ঘটনা সংস্থান এই অত্যন্ত সুকুমার অসামাজিক ও অপ্রত্যাশিত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে, যে সুকোমল হৃদয়বৃত্তির বিকাশ এই গল্পটির উপজীব্য তাহার পরিচয় এই বিবৃতির মধ্যে পাওয়া যাইবে না। তবু, এই পরিবেশ ও এই বিকাশের মূলে যে যুক্তি আছে, তাহাকে এই নীরস সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মধ্যে হয়ত ধরা যাইতে পারে। লেখক নিজের সুগভীর সহানুভূতির দ্বারা অন্তরের মধ্যে এই গল্পের যাহা অন্তর্নিহিত সত্য তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও জানেন, অমল ও

চারুর মধ্যে যে সুকুমার সম্বন্ধ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া শেষ পর্যন্ত চারু ও ভূপতির নীড় নষ্ট করিয়া দিল তাহা অসামাজিক, তাহা আমাদের চিরাচরিত সামাজিক সংস্কারকে আহত করে, প্রেমবিকাশের এই পরিবেশ আমাদের সামাজিক বুদ্ধি স্বীকার করে না। ভূপতি যেদিন আবিষ্কার করিল, তাহার নীড় চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেদিন তাহার দুঃখ যে কত গভীর তাহাও লেখক জানেন, কিন্তু এই সত্যকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না যে, যে-ঘটনা পৌর্বাপর্যের ভিতর দিয়া অমল ও চারুর বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে, তাহাতে এই প্রেম বিকাশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, শুধু স্বাভাবিক নয়, বাস্তব জীবনে তাহা নিয়তই ঘটিয়া থাকে। এবং লেখক ঘটনার পর ঘটনা, পরিবেশের পর পরিবেশ যেমন করিয়া সাজাইয়াছেন তাহাতে পাঠকের চিত্তে ও লেখকের উপলব্ধ সত্য শুধু যে নিকটতর হয় এমন নয়, সে সত্যকে সে স্বীকার না করিয়া পারে না। কারণ, ঘটনা ও পরিবেশ লেখক যেমন করিয়া বিন্যাস করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা শুধু ঘটনা ও পরিবেশ মাত্র থাকে নাই, তাহারা হইয়া উঠিয়াছে একটি সুসম্বদ্ধ যুক্তিমালা। এই দিক্ দিয়া গল্পটির কলাকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না; এবং এই ধরণের সমস্যামূলক গল্পে ও উপন্যাসে এই কলাকৌশলই প্রধান বস্তু যাহার বলে সমস্যাগত সত্য সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়। সমস্যাগত সত্যকে তর্ক করিয়া কবি অথবা লেখক যখন পাঠক-চিত্তের নিকটতর করিতে চাহেন তখন তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য; আমাদের সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু ঘটনা ও পরিবেশ এমন সুচারু, সুনিপুণভাবে বিন্যাস করা যাইতে পারে যাহার ফলে সমস্যার অন্তর্নিহিত সত্য যুক্তি-শৃঙ্খলার মীমাংসিত সত্যের রূপ ধরিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, যেমন হইয়াছে 'নষ্টনীড়ে'। তখন আমাদের সমাজবুদ্ধি ও সংস্কার আহত হইলেও সত্যকে আর অস্বীকার করিতে পারিনা, চারু অথবা অমল কাহাকেও সমর্থন করিতে না পারিলেও তাহাদের সম্বন্ধকে অস্বাভাবিক বলিতে পারি না, সমাজ স্বীকার না করিলেও মন সমস্তই স্বীকার করিয়া লয়। তখন আমরা চারু অথবা ভূপতি কাহারও দুঃখেই ব্যথিত না হইয়া পারি না, কে কতটুকু দায়ী সে বিচার তখন একান্তই অবান্তর। এবং সমাজনীতি কতটা পীড়িত হইয়াছে বা হয় নাই, তাহাও অবান্তর।

'নষ্টনীড়' গল্পটি উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের মনের ক্রম-পরিবর্তন ও

লক্ষ্য করিবার। কি কাব্য রচনায়, কি গল্প উপন্যাস রচনায়, এপর্যন্ত সর্বত্রই আমরা দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনা আমাদের চিরাচরিত সংস্কার, শতাব্দী-সঞ্চারিত ধ্যান ধারণা, ধর্ম ও সমাজবোধ, এমন কি প্রচলিত সৌন্দর্যবোধকেও খুব অতিক্রম করিয়া যায় নাই। এসব সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন এপর্যন্ত কবির মনে জাগে নাই। এক কথায়, তিনি আমাদের সংস্কার ও পরিবেশ, ঐতিহ্য ও আবেষ্টন, সমাজ ও রাষ্ট্র সব কিছু স্বীকার করিয়া লইয়াই এযাবৎ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এই স্বীকৃতি সজ্ঞান স্বীকৃতি নয়, কার্যকারণ বিচারলব্ধ নয়, একান্তই সহজ সংস্কারগত। এই সহজ সংস্কারই বহুদিন তাঁহার সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলে প্রেরণা জোগাইয়াছে, বিশেষ করিয়া কাব্যে ও ছোটগল্পে। কিন্তু সহজ প্রেম ও সৌন্দর্যতন্ময়, গীতি মাধুর্যময় জীবনে একদিন প্রশ্ন ও সংশয়ের দ্বিধা জাগ্রিল, "কল্পনা"-গ্রন্থ হইতেই তাহার সূচনা লক্ষ্য করা যায়; গভীর মহাজীবনের ইঙ্গিত "নৈবেদ্য-খেয়া" পর্যায়ে সুপরিস্ফুট। একদিকে এই নবজাগ্রত দ্বিধা সংশয় যেমন তাঁহাকে জীবনের গভীরতার দিকে আহ্বান করিতেছে, অন্যদিকে এই দ্বিধা সংশয়ই তাঁহাকে আমাদের সামাজিক সংস্কার ও ঐতিহ্যের কার্যকারণ সম্বন্ধের মূল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত করিতেছে। তাহার প্রথম পরিচয় আমরা পাইলাম 'নষ্টনীড়' গল্পে। এই গল্পেই আমরা প্রথম সুস্পষ্ট আভাস পাইলাম একান্ত ভাবধর্মী রবীন্দ্র-কবিচিত্তে যুক্তিধর্মের স্পর্শ লাগিয়াছে। কাব্যে এবং ছোট গল্পেও ইহার বিকাশ আমরা দেখিব আরও অনেক পরে,—"বলাকা"য়, "পলাতকা"য়, 'স্ত্রীর পত্র', 'পাত্র ও পাত্রী', 'পয়লা নম্বর', 'নামঞ্জুর' প্রভৃতি গল্পে, "চতুরঙ্গ" "ঘরে বাইরে" প্রভৃতি উপন্যাসে। এই সব কাব্য, গল্প ও উপন্যাসে লেখকের যে সমাজবোধ ও বুদ্ধি আমরা প্রত্যক্ষ করি, সমাজ-সত্তা সম্বন্ধে যে চেতনা লেখকের এই সাহিত্য-সৃষ্টিকে নূতন ভাব ও দৃষ্টি দান করিল, বাংলা সাহিত্যে এই সামাজিকচৈতন্য, কার্যকারণ জ্ঞানলব্ধ সমাজবোধ ও বুদ্ধি আমরা এতকাল লক্ষ্য করি নাই। এই নূতন ভঙ্গি ও দৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক জগতের সীমার মধ্যে আনিয়া পৌঁছাইয়াছে, এবং ইহার বলেই তিনি আধুনিক সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সামাজিক চৈতন্য, কার্যকারণ-জ্ঞানলব্ধ সমাজবোধ রবীন্দ্রনাথের মনে হঠাৎ জাগে নাই।

বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকের শেষাশেষি হইতেই বাঙ্‌লা দেশে একটা নবজীবনের সাড়া জাগিতেছিল; বাঙালী জীবনে শতাব্দী ধরিয়া যে গ্লানি ও অপমান, যে দুঃসহ বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল তাহা একদিন বঙ্গচ্ছেদের নির্মম আদেশকে উপলক্ষ্য করিয়া দেশের উপর ভাঙিয়া পড়িল—এক মুহূর্তে দেশের মূর্তি বদ্‌লাইয়া গেল। শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র সর্ববিষয়ে যেন দেশ সচেতন হইয়া উঠিল, একটা প্রবল ভাবোন্মাদনায় দেশ মাতিয়া উঠিল, এবং সে-উন্মাদনা ভাষা পাইল রবীন্দ্রনাথের গানে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়। বাঙ্‌লা দেশের সেই কয় বৎসরের ইতিহাস যাহারা জানেন, তাঁহারাই একথা বলিবেন, রবীন্দ্রনাথই ছিলেন এই স্বদেশী-যজ্ঞের উদ্গাতা। এই সময়কার রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদির বিষয় হইতেছে আমাদের শিক্ষা, আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম, আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের জীবনাদর্শ। অর্থাৎ আমাদের স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধ জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি একেবারে তাহাদের মর্মমূলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন, এবং তাহা হইতেই জাগিল প্রশ্ন, সংশয়, লাভ হইল কার্যকারণ বিচারসাপেক্ষ জ্ঞান। অথচ, আশ্চর্য এই, সঙ্গে সঙ্গে তখন লিখিতেছেন "খেয়া"-গ্রন্থের কবিতা।

"খেয়া"র কবি তাঁহার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিলেন "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"তে। ইতিমধ্যে য়ুরোপে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়া গেল, কবি নোবেল পুরস্কার পাইলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইল, মহাযুদ্ধ-পরবর্তী য়ুরোপের নূতন সামাজিক চৈতন্ত তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন এবং তাহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। বাহিরের জগতে ও জীবনে একটা মহাপরিবর্তন এই কয় বৎসরের মধ্যে সাধিত হইয়া গেল; কবিচিত্তে কি তাহার স্পর্শ লাগিল না? বোধ হয় ভাল করিয়াই লাগিল, গভীর ভাবেই লাগিল। তাহার ফলেই ত আমরা পাইলাম "বলাকা", "পলাতকা", পাইলাম "চতুরঙ্গ", "ঘরে বাইরে"; পাইলাম 'স্ত্রীর পত্র', 'পাত্র ও পাত্রী', 'পয়লা নম্বর' প্রভৃতি গল্প।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি পত্রাকারেই লিখিত, স্বামীর নিকট স্ত্রীর পত্র। আমাদের সমাজে নারীর কোনও মূল্য ছিল না একথা বলা চলে না, কিন্তু সে মূল্য ছিল কন্যা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে, মা হিসাবে; নারীর প্রতি একটি রোমান্টিক দৃষ্টি ও তজ্জনিত প্রীতি এবং শ্রদ্ধাও ছিল, কিন্তু পারিবারিক সম্পর্ক নিরপেক্ষ নারী

হিসাবে নারীর মূল্য কিছুই ছিল না, শুধু আমাদের দেশে নয়, কোনও দেশেই ছিল না। এই নারীর মূল্য অপেক্ষাকৃত বর্তমান যুগের আবিষ্কার, আর্থিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফল। য়ুরোপে এবং অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশে এই ফল, এই আবিষ্কারের স্থচনা দেখা দিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই, কিন্তু তাহার প্রকাশ দেখা গেল সে-শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে এবং পূর্ণতর বিকাশ আমরা দেখিলাম মহাযুদ্ধের পর। সে ঢেউ যে আমাদের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রতটে আসিয়া লাগিল তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল 'স্ত্রীর পত্রে'।)

'স্ত্রীর পত্র' প্রকাশিত হইয়াছিল "সবুজপত্র" মাসিক-পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩২১)। আমাদের পুরাতন জীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে "বলাকা"র কবিতায় যে-বিদ্রোহ ধ্বনিত হইতেছিল, তাহারই স্থর ধরা পড়িল এই গল্পেও। নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের আভাস 'হৈমন্তী' গল্পেও আছে কিন্তু 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে স্বামীচরণতলাশ্রয়ছিন্ন মৃণাল স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিল,

"আমি তোমাদের মেজ-বৌ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। * * * [বিন্দুর] ভালবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটী স্বরূপ দেখ্‌লুম, যা আমি জীবনে আর কোনও দিন দেখিনি'! সেই আমার মুক্তস্বরূপ। * * * আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরবো না। আমি বিন্দুকে দেখেছি! সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কি তা' আমি পেয়েছি। আমার আর দরকার নেই। * * * [বিন্দুর] উপরে তোমাদের যত জোরই থাক্‌না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগা মানব জন্মের চেয়ে বড়। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্—সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভা'য়ের বোন্ নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত। তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র। আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ। তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখ্‌বার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাবৃত রূপ যাঁর চোখে

ভাল লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখচেন্। এইবার মরেচে মেজ-বৌ। * * * আমিও বাঁচবো। আমি বাঁচলুম।"

কোথায় গেল সেই সুকুমার গীতিমাধুর্য, ভাব-কল্পনার লীলা যাহা ছিল রবীন্দ্র-ছোটগল্পের প্রাণ? এ যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ জর্জ্জরিত জীবন-সমস্যা, এ যে তীব্র কণ্টকিত আঘাত; এ যে চিন্তাবৃন্তের মূল ধরিয়া টান, সমাজ-ব্যবস্থার মূল সম্বন্ধে শুধু প্রশ্নমাত্র নয়, তাহাকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা। 'নষ্টনীড়' গল্পের কলাকৌশলের নিপুণতা 'স্ত্রীর পত্রে' নাই; মৃণালের বক্তব্য একপক্ষীয়, যুক্তি-শৃঙ্খলাও তেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিন্তু যুক্তি-শৃঙ্খলার অভাব পূরণ করিয়াছে বক্তব্য বিষয়ের ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা, ভাব-গভীরতার অভাব পূরণ করিয়াছে জীবন-সমস্যার সত্য, এবং মৃণালের নারী-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের বিকাশ যে-ভাবে হইয়াছে তাহাতে ঢাকা পড়িয়াছে গল্পটির আদর্শ প্রচার-ভঙ্গিমা।

'স্ত্রীর পত্রে'র বিদ্রূপবাণ ব্যর্থ যায় নাই। প্রমাণ, "নারায়ণ" মাসিক পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের 'মৃণালের পত্র' এবং ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'স্বামীর পত্র' নামক দুই প্রতিবাদ। প্রমাণ, পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর বিদ্রোহবাণী।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণাল নারীত্বের যে মহিমা ঘোষণা করিল তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনি "পলাতকা"র 'মুক্তি' নামক কবিতায়, যেখানে বাইশ বৎসর বিবাহিত জীবন যাপনের পর দীর্ঘ অসুখের ছল করিয়া মৃত্যু যখন একটি অবহেলিত মেয়ের জীবনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, তখন সেই মেয়েটির হেলাফেলার জীবনে প্রথম বসন্ত দেখা দিল, নারীত্বের পরিপূর্ণ মহিমার আভাস যেন সে পাইল:

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠ্‌ছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।

* * * *

তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণে ধুলায় পড়ে থাক্
মরণ বাসর ঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক্
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু
হেলা আমায় করবেনা সে কভু।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে-সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী!
দাও খুলে দাও দ্বার
ব্যর্থ বাইশ বছর হ'তে পার করে দাও কালের পারাবার।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পেও এই একই কথা। মৃণাল নারীত্বের পূর্ণ মহিমা উপলব্ধি করিল বিন্দুর লাঞ্ছিত অবজ্ঞাত বঞ্চিত জীবন ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া, আর 'মুক্তি' কবিতার মেয়েটি সেই মহিমাকেই জানিল নিজেরই বঞ্চিত জীবনের শেষ অধ্যায়ে মৃত্যু দূতের আহ্বান পাইয়া। নারীত্বের প্রতি আমাদের রোমান্টিক প্রেম ও শ্রদ্ধার অন্তরালে যে কত বড় বঞ্চনা লাঞ্ছনা আত্মগোপন করিয়া আছে, 'স্ত্রীর পত্র' গল্প ও 'মুক্তি' কবিতা আমাদের এই সামাজিক প্রবঞ্চনাকে গোপনতা হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে।

'পয়লা নম্বর' (১৩২৪) গল্পটি আপাতঃ দৃষ্টিতে দাম্পত্য-সম্বন্ধের বিশ্লেষণ চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু ইহার আর একটি গভীরতার দিক্ আছে, সেটি ইহার সামাজিক চেতনার দিক্। অদ্বৈতচরণ একাগ্র জ্ঞানান্বেষী চিন্তাবিলাসী যুবক, সংসারানভিজ্ঞ ও অন্যমনস্ক-চিত্ত। সে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর নিজের বন্ধু-মণ্ডলীর পরিবেশের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনে ব্যাপৃত। সে-জগতের মধ্যে তাহার স্ত্রী অনিলার কোনও স্থান ছিল না, এবং অদ্বৈতচরণও নিশ্চিন্ত ছিল এই ভাবিয়া যে পুরোহিতের কাছ হইতে যখন একজনকে স্ত্রী বলিয়া পাওয়া গিয়াছে তখন সে নিশ্চয়ই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। এর চেয়ে স্ত্রী সম্বন্ধে বেশী কিছু ভাবিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অনিলার হৃদয় ছিল, এবং সে হৃদয় সজীব পদার্থ। এই সজীব পদার্থটার জগত ক্ষুদ্র হইলেও সেখানে

ঘাত-প্রতিঘাতের অভাব ছিল না, এবং সেই ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া একটি ক্ষুব্ধ নারীহৃদয় বিদ্রোহে ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল। অদ্বৈতচরণ তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই; বুঝিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। এমন সময় সিতাংশুমৌলির আবির্ভাব, যে-সিতাংশুর হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য তাহার সাংসারিক ঐশ্বর্যের চেয়ে কম নয়। অদ্বৈতচরণ যাহা কখনও দেখে নাই বুঝে নাই, সিতাংশু তাহা দেখিল এবং বুঝিল, সে দেখিল অন্তরের দিক হইতে অনিলার বেদনা কত বড়, কত গভীর। সিতাংশুর সমস্ত হৃদয় নিংড়াইয়া এই কথা উচ্চারিত হইল—

> "আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি দেখ্‌বার মত দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম ঘট্‌লো। চোখের উপর ঘুমের পর্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুঁয়ে দিয়েছ। আজ আমি নব জাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখ্‌লুম, যে-তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার আমি তা' পেয়েছি, আর কিছু চাইনে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই।"

এই স্তব শুনাইয়া অনিলার চিত্ত সে জয় করিল; অনিলার নিকট হইতে কোনও সাড়া সে পাইল না; কিন্তু তাহার বিদ্রোহ-ধূমায়িত হৃদয়ে আগুন ধরাইয়া তাহাকে সে গৃহছাড়া করিল। অনিলা অদ্বৈতর গৃহ ছাড়িল, সিতাংশুর গৃহেও গেল না। জ্ঞান-গর্বিত অদ্বৈতচরণ প্রথম ধাকাটা সামলাইয়া লইবার পর ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে দেখিতে চেষ্টা করিল। 'যুগ যুগান্তরের জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে টি'কে রয়েছে এমন সব জিনিসকে আমি কি চিন্‌তে শিখিনি ?'

> "কিন্তু হঠাৎ দেখ্‌লুম এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্যকালের জ্ঞানীটা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লো, আর কোন্ আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগ্‌লো।"

এ যেন "চতুরঙ্গ"-গ্রন্থের সেই 'আদিম জন্তুটা'! তারপর রেশমের লাল ফিতায় বাধা সিতাংশুর লেখা চিঠির তাড়া যখন পড়া শেষ হইল তখন সে নিজকে এই বলিয়া প্রবোধ দিল—

> "সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেছে আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখ্‌লুম। আমার চোখের ঘুমের পর্দা কত মোটা পর্দা না জানি! পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি চেয়েছিলুম, কিন্তু তার

বিধাতার হাত থেকে হাত গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিইনি। আমি আমার দৈতদলকে এবং নবাল্লায়কে তার চেয়ে অনেক বড় করে দেখেছি। সুতরাং যাকে আমি কোনদিনই দেখিনি, এক নিমেষের জন্যও পাইনি, তাকে আর কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কি ব'লে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করবো ?"

কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, সেই আদিকালের প্রাণীটা এই প্রবোধে সান্ত্বনা মানিল কি ? লেখকের রচনায় কার্যকারণ বিচারলব্ধ জ্ঞান জয়ী হইয়াছে, যুক্তি-শৃঙ্খলা অনুসরণ করিয়া পাঠক অদ্বৈতচরণের আত্ম-প্রবোধকে স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। কিন্তু আদিকালের প্রাণীটার ক্ষুধা নিবৃত্তি লাভ করিবে কি ?

গল্প হিসাবে 'পাত্র ও পাত্রী' (১৩২৪) খুব সার্থক রচনা নয়। আমাদের সমাজে বিবাহ ব্যাপারে পুরুষ নারীর প্রতি কিরূপ নির্মম ও অপৌরুষেয় ব্যবহার করিয়া থাকে, মানবতার দাবী ও যুক্তিকে কি নির্দয়ভাবে পীড়িত করিয়া থাকে তারই কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তে গল্পটি গাঁথা। তাহাদের মধ্যে রস ও রূপ-বন্ধনের কোনও নিবিড় ঐক্য নাই। কিন্তু কলাকৌশলের কথা ছাড়িয়া দিলে গল্পটির মধ্যে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত যে-সমস্ত সুগভীর মন্তব্য আছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যে-দীপ্তি আছে, যে-সামাজিক চেতনার পরিচয় আছে তাহা কোনও পাঠকেরই দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দুঃখ ও ত্যাগের, বিপদ ও লাঞ্ছনার, কলহ ও কোলাহলের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের কত যে ফাঁকি, কত যে আত্মবঞ্চনা, কত যে ক্ষুদ্র মন প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহার খানিক পরিচয় আছে 'নামঞ্জুর গল্পে' (১৩৩২)। অমিয়ার দেশসেবার মধ্যে প্রচ্ছন্ন খ্যাতির লোভ এবং দশজনের সকাম প্রশংস-দৃষ্টির মোহ তাহাকে গৃহে সত্যকার ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক পীড়িত ভাইয়ের সেবার কথা ভুলাইয়া তাহাকে টানিয়া লইয়াছে জনসংঘের মাদকতার মধ্যে, অসহায় নারীত্বের কর্তৃত্বের আত্মতৃপ্তির মধ্যে। গৃহে রুগ্ন ভ্রাতা, বাহিরে সে অসংখ্য দেশভ্রাতার মধ্যে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে মত্ত; গৃহে যে নিঃসহায় ভীরু নারী ভীত কম্পিত হৃদয় লইয়া পীড়িত ভ্রাতার সেবায় উন্মুখ তাহার প্রতি সে ঈর্ধান্বিত, বাহিরে সে অসহায় নারীর জন্য আশ্রম পরিকল্পনায় ব্যস্ত। যে স্বদেশ-সমাজ-কর্মবিলাসী অনিল অমিয়ার সহকর্মী সে অমিয়ার প্রেমানুরাগী এবং তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু যখনই সে শুনিল অমিয়ার জন্মবৃত্তান্ত তখন কোথায় গেল তার প্রেম, কোথায় তাহার স্বদেশ ও সমাজ-

ধর্ম ! এ সবের মধ্যে যে ফাঁকি, যে বিরাট আত্মপ্রবঞ্চনা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহা কল-কোলাহলের মধ্যে সহজে আমাদের চোখে পড়ে না, হৃদয়কে স্পর্শ ও বুদ্ধিকে জাগ্রত করে না। কিন্তু লেখক আমাদের হৃদয়কে আবেগে পীড়িত না করিয়াও তাঁহার বুদ্ধির ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতায় ঘটনা পর্যায় এমন সুনিপুণ ভাবে বিন্যাস করিয়াছেন, চরিত্রগুলি এমন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে ঘটনা ও চরিত্র মিলিয়া হইয়া উঠিয়াছে একটি যুক্তি-শৃঙ্খলা। এবং তাহার ফলে হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়াও 'নামঞ্জুর গল্প' আমাদের বুদ্ধিকে চেতনা দান করে।

রবীন্দ্রনাথ ইহার পর আর কোনও উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প রচনা করেন নাই। এবং করেন নাই বলিয়া দুঃখ করিবার কিছু নাই। যে-প্রসার ও বৈচিত্র্য আমরা তাঁহার ছোট গল্পের মধ্যে দেখিয়াছি তাহার তুলনা নাই। আমাদের পুরাতন সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা, তাহাদের আবেষ্টন ও পরিবেশের মধ্যে যাহা কিছু রূপ, রস ও গন্ধ তাহা তিনি সর্ব অঙ্গে মনে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার সমস্ত রসমাধুর্য নিঃশেষে তাঁহার বিচিত্র গল্পরাজির মধ্যে পরিবেশন করিয়াছেন। বাঙ্‌লা দেশের পুরাতন প্রচলিত জীবনধারার যত কিছু দুঃখ ও বেদনা, যত কিছু সৌন্দর্য-মাধুর্য সমস্তই তাঁহার স্বচ্ছ সহজ দৃষ্টি ও অনুভূতির মধ্যে ধরা দিয়াছে, এবং অপূর্ব্ব সহৃদয়তায় তিনি তাহা রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সেইখানেই তাঁহার সৃষ্টিপ্রচেষ্টা নিঃশেষ হইয়া যায় নাই।

যে নূতন জীবনধারা, যে নূতন ভাব ও চিন্তা-জগৎ আমাদের প্রাচীন জীবন-ধারা, প্রাচীন ভাব ও চিন্তা-জগতের তটে আসিয়া আঘাত করিতেছে এবং যে অভিনব ভাব ও চিন্তা-সম্পদের সৃষ্টি করিতেছে রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সের ক্ষীয়মান শক্তির মধ্যেও তাহা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অনুভূতিকে তাহা স্পর্শ করিয়াছে, এবং সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে। একান্তভাবধর্মী বাঙ্‌লা সাহিত্য যে আজ যুক্তি ও চিন্তাধর্মের সঙ্গে সমন্বয় অন্বেষণ করিতেছে, তাহার ইঙ্গিত ত রবীন্দ্রনাথই আমাদের দিয়া গিয়াছেন, এবং সে-ইঙ্গিত তাঁহার ছোট গল্পের মধ্যেও সুস্পষ্ট। তিনি কবির দিব্যদৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন, এই নূতন ভাবসম্পদকে আশ্রয় করিয়া, এই নূতন সমাজ-চেতনা ও জীবন-সমস্যাকে ঘিরিয়াই নবযুগের নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে, আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যক্তিত্ব আত্ম-

প্রকাশ করিবে; বুদ্ধির স্তরের ভিতর দিয়া দুর্গমযাত্রা অতিক্রম করিয়া ইহারাই একদিন অন্তরের মাধুর্যরসের সন্ধান লাভ করিবে। এই সব নূতন ভাবসম্পদ, নূতন সমাজ-চেতনা নূতন জীবন-সমস্যা ইহারাই একদিন বাঙ্‌লা ছোট গল্প ও উপন্যাসের উপজীব্য হইবে, রবীন্দ্রনাথই সে আভাস আমাদের দিয়াছেন।

আজিকার বাঙ্‌লা সাহিত্যে ছোট গল্প ও উপন্যাসে সে আভাস স্পষ্টতর হইতেছে, সুখের কথা সন্দেহ নাই। না হওয়াই অস্বাভাবিক। সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ সুনিবিড়। বাঙ্‌লা দেশে সেই জীবনের তটে আজ বিশ্বজীবনের উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া নিরন্তর আঘাত করিতেছে। বাঙালী জীবনে, ভারতীয় জীবনে কর্মধারা চিন্তাধারার মধ্যে বিপুল আবর্তন পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবেই। রবীন্দ্রনাথ যে নূতন সাহিত্যের নূতন জীবনের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অঙ্কুরোদ্গম আমরা দেখিতেছি, কিন্তু সেই অঙ্কুর কবে বৃক্ষে পরিণত হইবে, এবং সেই বৃক্ষে কবে আমরা পরিণত ফল প্রত্যক্ষ করিব তাহা নির্ভর করিতেছে আধুনিক সাহিত্য-স্রষ্টাদের বুদ্ধির উপর, সমাজ-চৈতন্যের উপর, অন্তর্দৃষ্টি ও সৃজন-প্রতিভার উপর।*

---

* প্রথম রচনার তারিখ, আষাঢ়, ১৩৩৮। কিছু কিছু অংশ "বিচিত্রা" মাসিক পত্র (ভাদ্র, ১৩৩৮) এবং "চতুরঙ্গ" মাসিক পত্রে (১৩৪৬) প্রকাশিত।

নাটক ও নাটিকা

(১)

বাঙ্‌লাসাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠকেরা সকলেই একথা জানেন যে আমাদের সাহিত্যে সার্থক নাটক-রচনা এ-যাবৎ হয় নাই। দীনবন্ধু-মাইকেল-গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল, ইহারা সকলেই নাটক রচনা করিয়াছেন, নাট্যমঞ্চে সেই সব নাটক বহুবার অভিনীত হইয়া বহুজনের চিত্ত নন্দিতও করিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে বস্তুধর্ম, বস্তুজীবনের যে অমোঘ প্রবাহ ঘটনাকে এবং ঘটনাগত চরিত্রগুলিকে রূপ হইতে রূপান্তরে ঠেলিয়া লইয়া যায় দুর্নিবার পরিণতির দিকে, বাঙ্‌লা নাটকে তাহার পরিচয় খুব বেশী নাই। দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী" জাতীয় রচনায় তাহার কিছু পরিচয় আছে, এবং যতটুকু আছে ততটুকুই তাঁহাদের রচনা নাটক হিসাবে সার্থক। কিন্তু নাটকত্ব ছাড়াও, অর্থাৎ দৃশ্য-কাব্যের যে লক্ষণ আমরা নাটকের উপর সাধারণতঃ আরোপ করিয়া থাকি তাহা ছাড়াও নাট্য-রচনার অন্য সাহিত্য-মূল্য আছে, একথা আজিকার দিনে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরাজী সাহিত্যে সেক্সপীরিয় নাটকের ধারা বিবর্তনের ভিতর দিয়া আজিকার নাটকে আসিয়া পৌছান সত্ত্বেও সেখানে আধুনিক নাটকের রূপ ও ভঙিমা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, য়ুরোপের অন্যান্য সাহিত্যেও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা তাহাকে নাটকই বলি। গ্রীক্ ট্র্যাজেডি অথবা এলিজাবেথীয় নাটকের লক্ষণ আধুনিক ইংরাজী নাটকে নাই, অতি আধুনিক এলিয়টীয় নাটক ছাড়া, কিন্তু তাহাতে তাহার যে বিশিষ্ট সাহিত্যমূল্য তাহার কিছু আসিয়া যায় না, নাটক বলিতেও আপত্তি হইবার কিছু নাই।

আমাদের দেশে দৃশ্যকাব্যের যে লক্ষণ আমরা নাটকের উপর আরোপ করি তাহা আমরা বর্তমানকালে শিখিয়াছি সংস্কৃত নাটকের রূপ, কিন্তু তাহার অপেক্ষাও বেশী ইংরাজী এলিজাবেথীয় এবং পরবর্তী নাট্য-সাহিত্যের রূপ এবং ভঙিমা হইতে। কিন্তু সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের ধারার সঙ্গে বহুকাল আগেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। গ্রাম্য টপ্পা অথবা যাত্রাগানে একধরণের

নাটকাভাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে বর্তমান বাঙ্‌লা নাটকের যোগ কিছু নাই বলিলেই চলে। দীনবন্ধু-গিরিশচন্দ্রের নাটকে যে দৃশ্যকাব্য-লক্ষণকে আমরা নাট্যলক্ষণ বলি তাহা প্রধানতঃ ইংরাজী নাটক হইতেই আহৃত, ঠিক যেমন বাঙ্‌লাদেশের নাট্যমঞ্চ য়ুরোপীয় আদর্শের অনুকরণেই রচিত। একথা স্বীকার করার মধ্যে কোনও লজ্জা নাই।

কিন্তু, কি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক, কি এলিজাবেথীয় ইংরাজী নাটক, বস্তুধর্মই ইহাদের প্রাণ, ঘটনার অমোঘ অনিবার্য প্রবাহই ইহাদিগকে ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথের যে-জাতীয় রচনাগুলিকে আমরা গীতিনাট্য, কাব্য-নাট্য অথবা নাটক ইত্যাদি বলি তাহাদের মধ্যে এই বস্তুধর্ম নাই, ঘটনার অমোঘ অনিবার্য প্রবাহ তাহাদের রূপ ও ভঙিমা নিয়ন্ত্রিত করে না। দৃশ্যকাব্যের লক্ষণ দ্বারা রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনাগুলি বিচার্য নহে, যেমন এলিজাবেথীয় নাট্য-লক্ষণ দ্বারা আধুনিক য়ুরোপীয় নাটকও বিচার্য নয়। আসল কথা হইতেছে, সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনেই নাটকের প্রাচীন লক্ষণ, প্রাচীন সংজ্ঞা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, প্রাচীন রূপ এবং ভঙিমাও বিবর্তিত হইয়া অন্য রূপ ও ভঙিমা ধারণ করিয়াছে। নাট্যমঞ্চও সেই নূতন আদর্শের রূপ দিতেছে। এই দিক হইতেই রবীন্দ্র-নাটক বিচার্য। তাহা ছাড়া সাহিত্য-মূল্যের দিক্ হইতেও ইহাদের একটা বিশেষ স্থান আছে। কিন্তু যেহেতু, আমার উদ্দেশ্য রবীন্দ্র-মানসের পরিচয়, যে-মানস তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে সেই মানসের বিবর্তন আবর্তনের ইতিহাস, সেই হেতু, নাট্যলক্ষণের বিচার আমার কাছে মুখ্য নয়, সাহিত্য-বিচার এবং সেই সাহিত্যের মধ্যে রবীন্দ্র-মানস কতখানি কি উপায়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার আলোচনাই প্রধান।

রবীন্দ্র-নাট্যের বিভিন্ন পর্ব; একটির পর একটি কালানুক্রমিক সাজাইয়া লওয়া চলে। প্রথম পর্বের গোড়া হইতে শেষ পর্বের শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার একটা বিবর্তনের ধারাও লক্ষ্য করা যায়। এই বিবর্তন ধারার সঙ্গে রবীন্দ্র-মানসের অন্যান্য প্রকাশের সম্বন্ধ খুব নিবিড়; সেই জন্য রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্য পাঠের অথবা আলোচনার সময় সমসাময়িক রবীন্দ্র-সাহিত্যের কাব্য, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রভৃতি রচনার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে রবীন্দ্র-মানস বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

রবীন্দ্র-মানস একান্তভাবে গীতধর্মী। এই গীতধর্মী মানস যে কাব্যেই শুধু আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা নয়, ছোট গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, সর্বত্রই ইহার

প্রকাশ দেখা যায় ; নাটকেও তাহাই। একথা আমি অন্যান্য আলোচনা উপলক্ষে বহু স্থানে ব্যক্ত করিয়াছি ; এবং আমার বিশ্বাস, একথা স্বীকার করিয়া না লইলে রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের পরিপূর্ণ সাহিত্যরস উপলব্ধি ও উপভোগ করা যায় না।

(২)

"বাল্মীকি-প্রতিভা" (১২৮৭)*

"কাল-মৃগয়া" (১২৮৯ ?)*

"প্রকৃতির প্রতিশোধ" (১২৯১)

"মায়ার খেলা" (১২৯৫)

"বাল্মীকি-প্রতিভা" রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতি-নাট্য। ১৩০৩ সালে কবির কাব্য-গ্রন্থের যে-সংস্করণ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, 'গ্রন্থাবলীর অসম্পূর্ণতা দোষ নিবারণের জন্য' এই গীতি-নাট্যখানিকে উহার মধ্যে 'স্থান দেওয়া' হইয়াছিল। এসম্বন্ধে কবির মনে একটা সঙ্কোচ ছিল, কারণ তিনি তখনই মনে করিতেন, "এই গীতি-নাট্যখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে অপাঠ্য হইয়াছে। ইহা সুরে লয়ে নাট্যমঞ্চে শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য।" বহু বৎসর পরে লেখা "জীবন-স্মৃতি"তেও এই সঙ্কোচের উল্লেখ আছে। গানের সংগ্রহ পুস্তকের বিভিন্ন সংস্করণে "বাল্মীকি-প্রতিভা" বারবার প্রকাশিত হইয়াছে ; বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ও সরস্বতীর ভূমিকায় প্রতিভা দেবীর§ প্রথম অভিনয়ের

---

* "বাল্মীকি-প্রতিভাকে আমরা যেরূপে বর্তমানে পাই, প্রথমে তাহা সেরূপ ছিল না। বাল্মীকি-প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া [কবি] এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য পরে লিখিয়াছিলেন। তাহার নাম কাল-মৃগয়া—দশরথ কর্তৃক অন্ধ মুনির পুত্র বধ তাহার নাট্যবিষয়। পরে এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কাল-মৃগয়া গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।

"নাট্যাভিনয় উপলক্ষে ইহা (বাল্মীকি-প্রতিভা) ছাপা হইয়াছিল……। তখন ইহাতে কাল-মৃগয়ার গান ছিল না। পরে কাল-মৃগয়া আর ছাপানো হয় নাই।……কাল-মৃগয়া অভিনীত হইয়াছিল বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয়ের পর প্রায় দুই বৎসর পরে, ১২৮৯, ৯ই পৌষ।"—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী", ১ম খণ্ড, ১০৫ পৃ।

§ "প্রতিভা দেবী হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। বাল্মীকি-প্রতিভা এই নামের মধ্যে এই ইতিহাসটুকু আছে। পরে প্রতিভা দেবীর সহিত আশুতোষ চৌধুরীর বিবাহ হয় (১৮৮৬, অগষ্ট) —প্রভাতকুমার, "রবীন্দ্র-জীবনী", ১ম খণ্ড, ১০৫ পৃ।

বহু পরেও আজ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে এবং বাঙলাদেশের অনেক পরিবারে ও প্রতিষ্ঠানে বহুবার এই গীতিনাট্যখানি অভিনীত হইয়াছে। ইহার বন্ধন-বিহীন ছন্দের মধ্যে, ইহার গানগুলির টোড়ী, সিন্ধু, রামপ্রসাদী রাগিনী ও সুর বুনানীর মধ্যে এমন একটা সহজ সরল উচ্ছ্বাস আছে যাহা মানুষের মনকে আনন্দে উল্লসিত না করিয়া পারে না। আর, সত্য বলিতে কি, কবির প্রথম যৌবনের গীতি-নাট্যগুলির মধ্যে এই গানের আনন্দই বিশেষভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। হইবার কারণও আছে। কবির তখন 'অল্প বয়স' (১৮-২০),

> "গান গাহিতে···কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না; তখন বাড়ীতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সঙ্গীতের অবিরল বিগলিত ঝরণা ঝরিয়া তাহার শতকর-বর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ্ ছড়াইয়া দিতেছে।"

সঙ্গীতের এই প্রাচুর্যের মধ্যে, "বাল্মীকি-প্রতিভা", "কাল-মৃগয়া", "প্রকৃতির প্রতিশোধ", এবং "মায়ার খেলা"র সৃষ্টি। প্রথম য়ুরোপ প্রবাসকালে কবি আইরিশ মেলডীজের (melodies) সুরের প্রতি খুব অনুরক্ত হইয়াছিলেন। বিলাতে তাহার অনেকগুলি গান তিনি শুনিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিখিবার ইচ্ছা আর থাকে নাই। ইহার ফলে তাহার সুর সাধনার একটু পরিবর্তন না হইয়া পারে নাই। প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই

> "এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দেশী, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্তক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে, উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো হইয়াছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতি-নাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। * * * বস্তুতঃ 'বাল্মীকি-প্রতিভা' পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে। উহা সঙ্গীতের একটি নূতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোন স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। * * * ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করে নাই * * *। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমান সঙ্গত রীতিমত সঙ্গীত নহে।" ("জীবন-স্মৃতি", ১৫১-৫৩ পৃ)

"বাল্মীকি-প্রতিভা" যে কি বস্তু তাহা কবির ভাষাতেই ব্যক্ত করিলাম। এই গীতি-নাট্যটির বিষয়বস্তু অথবা ভাব-প্রকাশের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই; ইহার যাহা কিছু রস-মাধুর্য তাহা ইহার গানগুলির মধ্যে। বিষয়বস্তুর ভিতর কোনও

সত্য অথবা তত্ত্ব আবিষ্কারের উদগ্র চেষ্টা কোথাও নাই ; না থাকিয়া ভালই হইয়াছে, কারণ তাহাতে নাট্যকে গানের সুরের আশ্রয় করাইয়া যে-শিল্পরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অভিব্যক্তি সহজ হইতে পারিয়াছে। নাট্যই ইহার মুখ্যবস্তু, তাহা সুরকে আশ্রয় করিয়াছে মাত্র। যেমন, 'যাও লক্ষী অমরায়, যাও লক্ষী অলকায়, এ বনে এসনা এসনা, এসনা এ দীনজন কুটীরে—' বাল্মীকির ভূমিকায় একটি গানের এই কথাগুলির রসাভিব্যক্তি পাঠের সময় ত ধরা পড়েই না, টোড়ী রাগিনীতে বসিয়া বসিয়া গান করিলেও ততটা পড়ে না, যতটা পড়ে তাহার অভিনয় চোখের সম্মুখে দেখিলে।

এই যে নাট্যকে সুরের আশ্রয় করাইয়া ভাবকল্পনার অভিব্যক্তি, সঙ্গীতের এই নূতন পরীক্ষা কবিকে কিছুদিন খুব একটা আনন্দ দিয়াছিল ; "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সার্থকতায় হয়ত তিনি খুব উৎসাহিতও হইয়াছিলেন। "প্রভাত-সঙ্গীতে"র কবিতাগুলি যখন লেখা হইতেছে, এবং একটি একটি করিয়া "ভারতী"তে বাহির হইতেছে, তখন কবি ঠিক "বাল্মীকি-প্রতিভা"রই ঢঙে আর একটি গীতি-নাট্য রচনা করেন, তাহার নাম "কাল-মৃগয়া"। দশরথ কর্তৃক অন্ধ-মুনির পুত্রবধ এই গীতি-নাট্যের বিষয়বস্তু। পরে এই গীতি-নাট্যের অনেকটা অংশ "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া "কাল-মৃগয়া" গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী", ১ম খণ্ড, ১০৫, ১৩৭ পৃ)।

"বাল্মীকি-প্রতিভা" ও "কাল-মৃগয়া"র কিছুকাল পরে, কবি "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নামক একটি নাটিকা রচনা করেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যপ্রয়াস যাহা গানের ছাঁচে ঢালা নয়, গীতি-মাধুর্যই যাহার মুখ্যবস্তু নয়। ইহার বিষয়বস্তুর মধ্যেও একটু স্বকীয়ত্ব, একটু নূতনত্ব আছে। "বাল্মীকি-প্রতিভা" এবং "কাল-মৃগয়া"র বিষয়বস্তু তিনি পাইয়াছিলেন যথাক্রমে দস্যু রত্নাকরের এবং দশরথ কর্তৃক অন্ধ-মুনির পুত্রবধের রামায়ণী কথার মধ্যে ; কিন্তু "প্রকৃতির প্রতিশোধে"র গল্পভাগ কবির নিজস্ব সৃষ্টি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায়, এবং কোথাও কোথাও গদ্যে সমস্ত গল্পটি বিবৃত হইয়াছে ; মাঝে মাঝে কয়েকটি গান আছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা খুব বেশী নয় বলিয়া এবং নাট্যবস্তুর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ খুব কম বলিয়া অভিনয়ের ভাষা কোথাও সুরকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই নাটিকাটির নায়ক একজন সন্ন্যাসী। তিনি সংসারের

সমস্ত স্নেহবন্ধন, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের মায়া ছিন্ন করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর জয়ী হইতে চাহিয়া অন্ধকার নির্জন গুহায় সাধন-রত হইয়াছিলেন। একদিন সন্ন্যাসী নগরের রাজপথে চলিতে চলিতে 'ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর দুহিতা' বলিয়া পরিচিত, পিতৃমাতৃহীন স্বজন পরিত্যক্ত সর্বজনঘৃণিত অসহায় একটি বালিকাকে পথের পাশে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া বালিকাকে তাহার ভাঙা কুটীরে পৌঁছাইয়া দেন। সেইদিন হইতে বালিকা তাহাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে, এবং সেই স্নেহ বন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসীর হৃদয়েও স্নেহের অঙ্কুর জাগাইয়া তোলে। সন্ন্যাসী তাহা বুঝিতে পারেন এবং সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার চিত্তে সন্ন্যাস ও সংসারের আদর্শের তুমুল সংগ্রাম বাঁধে। বালিকাকে তাহার গুহাদ্বারে লইয়া গিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে নানান্ তত্ত্বকথা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বালিকা ওসব কিছুই বুঝিত না, শুনিতেও চাহিত না, শুধু একান্ত নির্ভরে ও ভালবাসায় তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিত। এই ভাবে শুধু তাহার ভালবাসা দিয়া ক্ষুদ্র বালিকা সন্ন্যাসীকে সংসারের স্নেহবন্ধনের মধ্যে ফিরাইয়া আনিল, তিনি আর কিছুতেই সংসার হইতে, প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কঠোর তপশ্চরণে নিযুক্ত থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিন তাঁহাকে বলিতে হইল,

> "আজ হতে আমি আর নহিরে সন্ন্যাসী!
> পাষাণ সঙ্কল্প ভার দিয়ে বিসর্জন
> আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার!
> হে বিশ্ব, হে মহাতরী চলেছ কোথায়,
> আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
> একা আমি স'াতারিয়া পারিবনা যেতে!
> কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া,
> আমিও চলিতে চাই উহাদের সাথে!
> যে পথে তপন শশী আলো ধরে আছে,
> সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যাজিয়া
> আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত আলোকে
> কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে।"

তাঁহার চোখে পৃথিবীর রঙ্ তখন বদ্‌লাইয়া গেল, 'জগতের মুখে হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, চন্দ্রসূর্য ঘিরিয়া আনন্দ-তরঙ্গ নাচিতে লাগিল, লতায়

পাতায় আনন্দ হিল্লোল কাঁপিতে লাগিল, পাখীর গলায় আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠিল, কুসুমে কুসুমে আনন্দ ফুটিয়া পড়িতে লাগিল।

দুইটি আপাতবিরোধী আদর্শের এই যে সংগ্রাম, এবং বহু সংগ্রামের পর এই সুমধুর পরাজয়, এই সংগ্রাম ও পরাজয়ই "বাল্মীকি-প্রতিভা" অথবা পরবর্তী "মায়ার খেলা" অপেক্ষা "প্রকৃতির প্রতিশোধ"কে একটা পূর্ণতর নাট্যরূপ দান করিয়াছে; এই দ্বন্দ্বই সমস্ত নাটিকাটির মধ্যে একটি সচল গতি সঞ্চার করিয়া সমস্ত কথা ও ভঙিমাগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্যই "প্রকৃতির প্রতিশোধে"র মধ্যেই সর্বপ্রথম আমরা একটা বিশিষ্ট নাটকীয় রসের আস্বাদন লাভ করি। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী চরিতকার টম্‌সন্ সাহেব যে এই নাটিকাটিকে কবির 'first important drama' বলিয়াছেন, একথা খুবই সত্য।

একটু অভিনিবেশ সহকারে এই বিষয় বস্তুটির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, এই নাটিকাটির মধ্যে শিল্পাভিব্যক্তির যে আনন্দ শুধু তাহাই ফুটিয়া উঠে নাই, জীবনের একটি পূর্ণতর সত্যের দিকেও ইঙ্গিত ইহার মধ্যে আছে। এই সত্য কবির তৎকালীন জীবনে যে-ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া এই নাট্য-কাব্যটি জন্মলাভ করিয়াছে। সেইজন্যই "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সঙ্গে ইহার প্রভেদ অনেকখানি। এই প্রভেদের কারণও আছে। "প্রকৃতির প্রতিশোধ" লিখিবার কিছুদিন আগেই কবির প্রথম যৌবনের ভাব-ধারার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসিয়াছিল; সে-পরিবর্তনের পরিচয় ইতিপূর্বেই "প্রভাত-সঙ্গীতে" পাওয়া গিয়াছিল। "সন্ধ্যা-সঙ্গীতে" একটা দুঃখ, একটা নৈরাশ্যের, একটা অনির্দিষ্ট অন্ধকারের যে ভাব ছিল, তাহা কাটিয়া গিয়া কবির হৃদয় "প্রভাত সঙ্গীতে" বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের আনন্দকে বরণ করিয়া লইল। 'আজি এ প্রভাতে রবির কর', 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি' প্রভৃতি কবিতায় তাহার প্রকাশ অতি সুপরিস্ফুট। "জীবন স্মৃতি"তে কবির নিজের লেখা হইতেই আরও ভাল করিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে, সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালবেলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল।

দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। *** আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। *** আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মত বহিয়া চলিয়াছে। * * * রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আরেক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না—বিশ্বজগতে অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান্ রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরণা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম। * * * বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা পালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে একটা অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল।"

প্রকৃতির লীলার মধ্যে, সংসারের স্নেহ প্রীতি ভালবাসার মধ্যে কবি এমনই করিয়াই একটা আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাহার মধ্যে জীবনের সার্থকতার সন্ধানও লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই সংসারের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে বিদ্রোহ করিয়া সন্ন্যাসীকে তিনি থাকিতে দিলেন না, প্রকৃতি সেই বিদ্রোহের প্রতিশোধ লইল, সন্ন্যাসীকে সংসারের মধ্যে, আপনার স্নেহ ভালবাসার মধ্যে ফিরাইয়া আনিল এবং তাহার মধ্যে যে 'অন্তহীন অপরিমেয়তা', সেই দিকে ইঙ্গিত করিয়া গেল। শিল্প-বিকাশের দিক হইতে ততটা নয়, কিন্তু কবি জীবনের ভাবরহস্যের বিকাশের দিক হইতে এই জন্যই "প্রকৃতির প্রতিশোধ"কে আমি "বাল্মীকি-প্রতিভা" হইতে বড় বলিয়া মনে করি; তাহার মধ্যে ভাবের যে গভীরতা আছে, জীবনবিকাশের সত্যকে যেমন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা আছে, বহুদিন পর্যন্ত তাহার প্রকাশ নাটকে আর দেখা যায় নাই।

"জীবন-স্মৃতি"তে কবি নিজেই "প্রকৃতির প্রতিশোধে"র ভিতরকার রহস্যটিকে তাঁহার অনবদ্য ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সন্ন্যাসী যখন সংসারের সংকীর্ণতার গণ্ডির মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন,

"ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই। * * * বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য ও

প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষ বোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কি করিয়া? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাস দরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ—এর মধ্যে একদিকে যত সব পথের লোক যতসব প্রেমের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মধ্যে তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।" ("জীবন-স্মৃতি"; পৃঃ ১৮৬—৮৭)

"প্রকৃতির প্রতিশোধে"র পরে "কড়ি ও কোমল", তাহার পরেই "মায়ার খেলা"র সৃষ্টি। "বাল্মীকি-প্রতিভা" ও "মায়ার খেলা" দুইটিই গীতিনাট্য, কিন্তু শেষেরটি অনেকটা "ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতিই মুখ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা······যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের উপরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুতঃ, মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম, তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।" (জীবন-স্মৃতি; পৃঃ ১৫৩-৫৪)। অল্প কথায় এই গীতিনাট্য দু'টির রূপ-বিশ্লেষণ ইহার চেয়ে সুস্পষ্ট আর কি হইতে পারে? "মায়ার খেলা"য় বিষয়বস্তু কিছু নাই বলিলেও চলে; কয়েকটি তরুণ প্রাণ শুধু আপনার সুখের মোহে প্রেমের মায়ায় ভালবাসার ছলনার মধ্যে পড়িয়া নিজেরা কি করিয়া ভুল করিয়া মরিয়াছে, তাহাই অফুরন্ত গানের সুরের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার সমস্ত সত্যটি মায়াকুমারীদের সর্বশেষ গানটির করুণ বিভাস রাগিণীর মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে:

"এরা, সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলেনা,
শুধু সুখ চলে যায়!
এমনি মায়ার ছলনা।
এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায়!
তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ!
তাই মান অভিমান
তাই এত হায় হায়।"

এই মায়াকুমারীরাই শুনাইয়াছে,

> দুঃখের মিলন টুটিবার নয়
> নাহি আর ভয় নাহি সংশয়।
> নয়ন সলিলে যে হাসি ফুটে গো,
> রয় তাহা রয় চিরদিন রয়।"

এত যে গানের লীলা, সিন্ধু দেশ সাহানা খাম্বাজ বেহাগ কানাড়া পূরবী সোহিনী ভূপালী ভৈরবীতে এত যে সুরের এত যে সৌন্দর্যের উৎসব, তাহার মধ্যেও কবি প্রেমের, সৌন্দর্যের, ভোগানুভূতির অন্তরের রহস্যটিকে ভুলিয়া যান নাই; এত যে 'ভুবনমোহিনী মায়া' সমস্ত 'কায়াকে বেষ্টন করিয়া ধরিতে চায়', তাহার মধ্যেও কবি বিস্মৃত হন নাই যে দুঃখের তপস্যার ভিতর দিয়া জীবনের প্রেমতৃষ্ণাকে, সৌন্দর্যানুভূতিকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে না পারিলে, নয়ন সলিলে ডুবিয়া হাসির কমলকে ফুটাইতে না পারিলে মায়ার বন্ধনই চিরস্থায়ী হইয়া থাকে, চিরজীবন ক্রন্দনই সার হয়, প্রাণই দগ্ধ হয়; প্রেমকে পাওয়া যায় না, জীবনের সার্থকতার স্বপ্ন সুদূরে মিলাইয়া যায়। ইহার পরই লেখা "মানসী" কাব্যটির ভিতরে এই 'মায়ার খেলা' হইতে মুক্ত হইবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে, 'নিষ্ফল কামনা', 'আঁখির অপরাধ' প্রভৃতি কবিতায় তাহার প্রমাণ আছে। আমরা এইখানেই তাহার প্রথম আভাস লাভ করিলাম। ভাবরহস্যের দিক হইতে দেখিতে গেলে বুঝা যাইবে কবি "প্রকৃতির প্রতিশোধে"র রহস্য হইতে "মায়ার খেলা"য় এক ধাপ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। পূর্বোক্তটিতে দেখিয়াছি সংসার মুক্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে "সন্ধ্যাসঙ্গীতে"র রবীন্দ্রনাথ সংসারের স্নেহ প্রীতি প্রেম ভালবাসার সীমার বন্ধনের মধ্যে ধরা দিলেন, এই ক্ষুদ্রতর সীমার মধ্যে, সৌন্দর্যভোগের মধ্যে জীবনকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। কিন্তু "মায়ার খেলা"র মধ্যে এই রহস্যই ব্যক্ত হইল যে,এই প্রেমকে শুধু আপনার সুখের জন্য চাহিলে প্রেমের স্পর্শ ত পাওয়া যাইবেই না, সুখও দূরে পলাইবে, শুধু ভোগের নিমিত্ত ভালবাসার দুয়ারে অতিথি হইলে সে তোমাকে ছলনা করিবেই, সংসারের মধ্যে 'অন্তহীন অপরিমেয়তার' সন্ধান তুমি কিছুতেই পাইবে না, আর তাহাই যদি তুমি না পাইলে, তাহা হইলে তোমার জীবনের সার্থকতা রহিল কোথায়? মায়ার খেলাই যদি তোমার সার হইল, তাহার মধ্যেই যদি বাঁধা পড়িয়া রহিলে

তবে তোমার প্রেমের 'মলিন মালা কে লইবে', 'নীরব নিরাশা কে সহিবে'?

রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, সত্য হউক মিথ্যা হউক, তাঁহার সমসাময়িক কাব্যেও সুপ্রকাশ, এবং তাহার বিস্তৃত উল্লেখ আগেই করিয়াছি; এখানে তাহার পুনরুল্লেখের আর প্রয়োজন নাই।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী রবীন্দ্রনাথের বাল্যাবস্থায় নবজাগ্রত বাঙালী উচ্চমধ্যবিত্ত-মানসের লীলাক্ষেত্র ছিল। কাব্যালোচনায়, গানে, নাটকাভিনয়ে ঠাকুরবাড়ীর সান্ধ্যমজলিস মুখরিত; সেই মজলিসে রবীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠতম। তাঁহার স্ফুটনোন্মুখ কবি-প্রতিভা এবং সঙ্গীত-নৈপুণ্য সেই মজলিসে স্বীকৃত। গীত ও গীতিকাব্যের রসে তখন কিশোর মন আচ্ছন্ন; তাহার ফাঁকে ফাঁকে নিজের বাড়ীর বিচিত্র নাটকাভিনয় ধীরে ধীরে তাঁহার মনে নাট্টীয় রস সঞ্চার করিতে আরম্ভ করে। এই উভয়ের মিলন-মোহানায় "বাল্মীকি প্রতিভা"র সূচনা। তখন দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্রনাথের সামন্ত-পরিবারের প্রাচীর ধীরে ধীরে ভাঙিতেছে; ঠাকুর বাড়ীতে যাহারা জমায়েৎ হইতেছেন, তাহারা নূতন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। তাহাদের মানস ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নানান্ বিচিত্র সম্বন্ধের লীলা ও আলোড়নই তাহাদের ঔৎসুক্যের বিষয়, এবং সেই সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়াই তাহাদের মানস ও ভাবকল্পনা মুক্তি পায়। সমাজ ও রাষ্ট্র-শাসনমুক্ত যে মানবত্ব সেই মানবত্বের পাঠ তাহারা লইয়াছেন তদানীন্তন বাঙ্‌লা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির ধারা হইতে, এবং এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবত্বই তাহাদের কামনার বস্তু। স্বভাব ও সংস্কারের, অভ্যাস ও অহংকারের, সর্বপ্রকার শাসন ও বন্ধনের দাসত্ব হইতে মুক্ত যে মানুষ সেই মানুষের জয়গানই বাঙ্‌লাদেশের উনবিংশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের একমাত্র ধর্ম, যাহার সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল প্রথম পাদে রামমোহন এবং পরবর্তী যুগে তত্ত্ববোধিনী সভাকে কেন্দ্র করিয়া, এবং যাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ বাঙ্‌লাদেশে দেখা গেল বিংশ শতকের প্রথম পাদে। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষের জয়গানই রবীন্দ্রসাহিত্যেরও ধর্ম এবং এই ধর্ম রবীন্দ্রসাহিত্যে যে ভাবে ও রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, এমন আর কোনও ভারতীয় সাহিত্যেই এই যুগে আর দেখা যায় নাই। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থেই অন্যত্র আমি করিয়াছি, তবু অতি সংক্ষেপে

এইখানে তাহার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, ইহা না জানিলে রবীন্দ্রনাথের আদি নাট্য-প্রয়াসগুলির এবং পরবর্তী নাট্য-প্রয়াসগুলিরও অন্তরের ধর্মটি বুঝা যাইবে না বলিয়া আমি মনে করি।

আগেই বলিয়াছি, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের লীলাবৈচিত্র্যই ছিল কিশোর রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঔৎসুক্যের বিষয়, পরম বিস্ময়ের বস্তু; কবি-মানসের মধ্যে তখন কেবল প্রথম এই অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হইতেছে। "বাল্মীকি-প্রতিভা" ও পর পর কয়েকটি নাট্য-প্রয়াস ঠিক এই সময়কার সৃষ্টি। দয়া, করুণা, প্রেম, স্নেহ, মৈত্রী, এই সব গুণই মানবতার স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত। এই স্বভাবজ মানবধর্ম নানা অভ্যাসের কঠোরতায়, নানা সংস্কারের শাসনে, নানা বিধি বিধানের, নানা ঐতিহ্যের বাঁধনে মানুষ ভুলিয়া যায়, তাহাকে অস্বীকার করে। এই ভাবেই স্বাভাবিক মানবত্ব লাঞ্ছিত হয়। দস্যু রত্নাকরের কাছেও একদিন তাহাই হইয়াছিল, সংসার-বন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসীর কাছেও হইয়াছিল, প্রমদার কাছেও তাহাই হইয়াছিল। ইহাদের একজনও নিজেদের স্বাভাবিক মানবধর্ম সম্বন্ধে সজাগ ছিল না; দস্যু রত্নাকর তাহাকে ভুলিয়াছিল অভ্যাসের কঠোরতায়, সন্ন্যাসী তাহাকে ভুলিয়াছিল সন্ন্যাস-সংস্কারের শাসনে, প্রমদা ভুলিয়াছিল তাহার নিজের অহংকারে। বিভিন্ন ঘটনা ও পরিবেশকে আশ্রয় করিয়া একদিন প্রত্যেকেরই জীবনে এক একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিল; এই দ্বন্দ্বটুকুই নাটক, এবং যেটিতে এই দ্বন্দ্ব যতটা সুস্পষ্টরূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই নাট্যটি ততটুকুই সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি হইতে পারিয়াছে। এই হিসাবে এই চারিটির ভিতর "প্রকৃতির প্রতিশোধ"ই সার্থকতম। যাহা হউক, এই দ্বন্দ্বের ভিতর হইতেই আবিষ্কৃত হইল স্বাভাবিক মানবত্ব, এবং শেষপর্যন্ত চিরকালের ভিতরকার সর্বআবরণমুক্ত মানুষটিই হইল জয়ী।

(৩)

"রাজা ও রাণী" (১২৯৬)
"বিসর্জন" (১২৯৭)
"মালিনী" (১৩০৩)

"রাজা ও রাণী" রচনা হইতেই রবীন্দ্রনাট্যের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হইল। এই পর্বে বিশেষ করিয়া তিনটি নাট্য-প্রচেষ্টাকে স্থান দিতে হয়, "রাজা

ও রাণী", "বিসর্জন" ও "মালিনী"। প্রথম দুইটি একেবারে পর পর লেখা, তৃতীয়টি প্রায় ছয় বৎসর পর। ভাবকল্পনার ধারা ও বিষয়বস্তু, উভয় দিক হইতেই এই তিনটি কাব্যনাট্যকে এক পর্যায়ভুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যখন একদিকে "মানসী"র হৃদয়াবেগ ও প্রচ্ছন্ন অনিশ্চিত বেদনাবোধে কবিচিত্ত ভারাক্রান্ত তখনই "রাজা ও রাণী" এবং "বিসর্জন" এই নাটক দু'টির সৃষ্টি। "মালিনী" প্রায় "চৈতালি"র সমসাময়িক, এবং ইতিমধ্যে রবীন্দ্র-কবিমানস "চিত্রাঙ্গদা-সোনার তরী-বিদায় অভিশাপ-চিত্রা"র সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। "মায়ার খেলা"র কয়েকমাস পরই রচিত হয় "রাজা ও রাণী"। "মায়ার খেলা"র কল্পনা ক্ষীণ, হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস প্রবল, এবং প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধে ভাবকল্পনা ভারাক্রান্ত। "রাজা ও রাণী" নাটকেও হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রবল এবং বিষয়বস্তু এবং সাহিত্যরূপ ভিন্ন প্রকারের হওয়া সত্ত্বেও ইহার মধ্যে গীতিকাব্যের আবেগই নাটকীয় দ্বন্দ্ব অথবা পরিণতি অপেক্ষা স্পষ্টতর। তাহার ফলে নাটক হিসাবে "রাজা ও রাণী" দুর্বল হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে, অথচ বিষয়বস্তুর মধ্যে নাট্য-সম্ভাবনা নাই একথা কিছুতেই বলা চলে না। তবু, নাটক হিসাবে "রাজা ও রাণী" যত দুর্বলই হউক, ইহার গল্পের মধ্যে বস্তু আছে যাহা কবির পূর্ববর্তী নাট্য-প্রয়াসগুলির মধ্যে দেখা যায় না; ইহার গল্প-বিন্যাসের মধ্যে সুদৃঢ় গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় আছে এবং মানবসম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতর আভাস আছে। ভাব-কল্পনার প্রসারের পরিচয়ও পাওয়া যায় গল্প ও চরিত্রের পরিকল্পনার ভিতর, কিন্তু এই ভাব-কল্পনা এখনও মোহস্বপ্নে আচ্ছন্ন, বাস্তবের অমোঘ ও অনাবিল স্পর্শ এখনও তাহাকে আলোকোদ্ভাসিত করে নাই। সে-স্পর্শ লাগিয়াছে "বিসর্জন" নাটকে, যদিও এই নাটক "রাজা ও রাণী"র কিছুদিন পরই লেখা। ভাব-কল্পনার প্রসার ও গভীরতায়, নাটকীয় আঙ্গিকের দৃঢ় স্থাপত্য-মহিমায়, জটিল মানব-সম্বন্ধের সুনিপুণ বিশ্লেষণে, হৃদয়াবেগের সংযমে ও স্বচ্ছন্দতায়, এবং অনুভূত সত্যের প্রতি নিষ্ঠায় "বিসর্জন" এত সমৃদ্ধতর যে, মনে হয় এই দুই নাটকের মধ্যে একটা যেন সুদীর্ঘ অথচ অজ্ঞাত অভিজ্ঞতার ইতিহাস কোথাও আত্মগোপন করিয়া আছে!

এই পর্ব হইতে আমি ইচ্ছা করিয়াই "চিত্রাঙ্গদা", ও "বিদায়-অভিশাপ"কে বাদ দিতে চাহিতেছি; তাহার কারণ, ইহাদের ভাববস্তুটি একটা নাট্যরূপের

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিলেও, মূলতঃ ইহারা নাট্য নহে ; নাট্যের যে বিশেষ ভঙ্গি, যে দ্বন্দ্ব ও পরিণতি যথার্থ নাট্যীয় তাহা ইহাদের মধ্যে নাই। বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকার ভিতর দিয়া সমগ্র বস্তুটি তীক্ষ্ণতর ও পূর্ণতর হইয়া ইহাদের মধ্যে অভিব্যক্তি পাইবার অবসর পাইয়াছে বটে, কিন্তু বিষয়বস্তুটির মধ্যে এমন কোন দ্বন্দ্ব, অথবা সমস্যা নাই যাহার জন্য একটা নাট্যরূপেরই প্রয়োজন হইতে পারে। এবং বলিতে কি, এই দু'টি সাহিত্য-বস্তুর যে রস, তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে নাটকের অর্থাৎ বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা-সংস্থানের অথবা তাহাদের পরিণতির মধ্যে ততটা নয়, যতটা তাহাদের কথার প্রকাশের মধ্যে। ইহাকেই মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ইহাদের মধ্যে নাট্যাভাস ততটা নাই, যতটা আছে শুধু কথনের ভিতর দিয়া মনের ভাবগুলিকে ফুটাইয়া তোলা, ইহাদের ঘটনার সজ্জা ও বিন্যাসের জন্য কবিকে প্রথম হইতেই কিছু অবহিত হইতে হয় নাই, যাহা নাট্যে ও উপন্যাসে একান্তই প্রয়োজন। আমার এই বিশ্লেষণ সত্য নাও হইতে পারে, কিন্তু "চিত্রাঙ্গদা" ও "বিদায় অভিশাপে"র রসাভিব্যক্তি যে কাব্যের, নাট্যের নহে, এ সম্বন্ধে কাহারও বোধ হয় দ্বিমত নাই।

আগেকার পর্বে যে চারিটি নাট্য-প্রচেষ্টার আলোচনা করিয়াছি, দেখিয়াছি তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি 'আইডিয়া', একটি অনুভূত সত্যকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে ; সমস্ত কথা ও ঘটনাপরম্পরার ভিতর দিয়া সেই সত্যটাই একটা শিল্পরূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। টম্‌সন্ সাহেব সত্যই বলিয়াছেন এবং সকলেই একথা স্বীকার করিবেন যে "his dramatic work is the vehicle of ideas, rather than the expression of action.' এই যে নাটককে একটা 'আইডিয়া', একটা ভাবের বাহন করিয়া তোলা, রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার সূচনা হইতেই এই বিশেষত্বটুকু আমরা লক্ষ্য করি, এবং ক্রমে যতই অগ্রসর হই, "রাজা ও রাণী", "বিসর্জন", "মালিনী"র ভিতর দিয়া যতই রূপক-নাট্যের রাজ্যের সীমার মধ্যে আসিয়া পৌঁছাই, ততই এই বিশেষত্বটুকু স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া যদি মনে করি কোন একটা নির্দিষ্ট সত্য বা 'আইডিয়া'কে প্রকাশ করিবার জন্যই কোন একটি বিশেষ নাটকের সৃষ্টি তিনি করিয়াছেন তাহা হইলে হয়ত ভুল করিব। বরং, সর্বত্রই আমরা দেখি নাটকের পারিপার্শ্বিক শিল্প-বেষ্টনের ভিতর হইতে কবির বিশিষ্ট ভাবটি, সত্যটি আপনি আপনার

অজ্ঞাতসারে ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে; দেখি, কোথাও কোনও 'আইডিয়া' তত্ত্বের রূপ ধারণ করিয়া নাটকীয় সংস্থান, রীতি ও ভঙ্গিমাকে অথবা তাহার রসাভিব্যক্তিকে সহজে ব্যাহত করিতে পারে নাই; কোথাও সেই সত্য বা 'আইডিয়া' কোন apostlic message হইয়া উঠে নাই; রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব শিল্পপ্রতিভা ও সৌন্দর্যবুদ্ধিই তাঁহাকে এই অত্যন্ত সম্ভাবনীয় পরিণাম হইতে দূরে রাখিয়াছে। 'আইডিয়া' বা অনুভূত সত্যকে কোথাও সজ্ঞানে লক্ষ্যের মধ্যে রাখা হয় নাই; সর্বত্রই ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-স্ফূরণের ভিতর হইতে বিশিষ্ট 'আইডিয়া'টি নিজকে প্রকাশ করিবার জন্য নিজ হইতেই যেন উন্মত, এই কথাটাই মনে হয়।

যাহা হউক, "রাজা ও রাণী", "বিসর্জন", অথবা "মালিনী" কি করিয়া কোন্ ভাবের বাহন যে হইয়া উঠিল তাহা সত্যই দেখিবার বস্তু। সঙ্গে সঙ্গে উহাদের নাটকীয় সংস্থান ও কলাকৌশল সম্বন্ধে ও নানান্ কথা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িবে।

"রাজা ও রাণী"র নাট্যবস্তুটি গড়িয়া উঠিয়াছে একটি অতি তুচ্ছ ঐতিহাসিক ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া। সে ঐতিহাসিক ঘটনাও আবার এতখানি কল্পনার খাদে মেশান যে একেবারে উল্টাইয়া এ কথাও বলা চলে যে একটা কল্পিত আখ্যান বস্তুকে একটা ঐতিহাসিক আবেষ্টনের মধ্যে ফেলিয়া তাহাকে ইতিহাসের রূপ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। বিক্রমদেব জলন্ধরের রাজা; কাশ্মীরের রাজা চন্দ্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং যুবরাজ কুমারসেনের ভগিনী সুমিত্রা তাঁহার মহিষী। মহিষীর 'কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরি' বিক্রমদেবের রাজ্য জুড়িয়া বসিয়া 'রাজার প্রতাপ খণ্ড খণ্ড করিয়া' ভাগ করিয়া লইয়াছে; বিদেশীর অত্যাচারে রাজ্যের যত প্রজা সব 'জর্জর কাতর'। প্রতিকার করিবার কেহ নাই; রাজা বিক্রমদেব দুর্বলচিত্ত, কর্তব্যবিমুখ, নিজের রাজ্য ছাড়িয়া রাণীর রাজত্বে তিনি আশ্রয় লইয়াছেন, কর্তব্য ও দায়িত্ব-বিরহিত প্রেম মেঘের মত তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত চিত্তকে বিকল করিয়াছে, রাজ্যের প্রতি সকল কর্তব্য ভুলিয়া তিনি ভালবাসার নামে একটা মোহ-মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু মহিষীর কর্তব্যে জাগ্রত-চিত্ত সুমিত্রা রাজার এই আত্ম-বিস্মৃতিতে লজ্জায় ম্রিয়মান,

"শোন প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজ,
তুমি স্বামী—আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশী নই; আমারে দিয়োনা লাজ,
আমারে বেসোনা ভাল রাজশ্রীর চেয়ে!"

সুমিত্রা চাহেন না রাজার একান্ত বিস্মৃত আত্ম-সমর্পিত প্রেম; লতার মত দুর্বল ললিত হৃদয়ের দৃষ্টি-বিহীন প্রেম নারীর ভালবাসাকে শুধু অবমানিত করে, সে প্রেম নারী কামনা করে না। সুমিত্রা তাই রাজাকে বলেন,

"তোমরা পুরুষ, দৃঢ় তরুর মতন
আপনি অটল রবে আপনার পরে
স্বতন্ত্র উন্নত; * * *
তোমরা রহিবে কিছু স্নেহময়, কিছু
উদাসীন; কিছু মুক্ত, কিছু বা জড়িত,
সহস্র পাখীর গৃহ, পান্থের বিশ্রাম,
তপ্ত ধরণীর ছায়া, মেঘের বান্ধব,
ঝটিকার প্রতিদ্বন্দ্বী লতার আশ্রয়।

কিন্তু রাজার কর্তব্যবুদ্ধিকে তিনি বৃথাই উদ্রিক্ত করিতে চেষ্টা করেন। বিদীর্ণ-হৃদয় মন্ত্রী নতশিরে শূন্য সিংহাসনের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদেন, আর রাণী সুমিত্রা অভাগা প্রজার করুণ ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া বারবার রাজাকে উৎপীড়ক অমাত্যবর্গের নির্বাসনের জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজ-কর্তব্য পালনে তৎপর করিয়া তুলিতে পারেন না। অগত্যা মহিষী সুমিত্রা নিজেই পতি-সত্য পালনের জন্য পুরুষের ছদ্মবেশ ধরিয়া দেবপূজার ছলে রাজধানী ছাড়িয়া অনুচর মাত্র সঙ্গে লইয়া কাশ্মীরে আসিয়া উপস্থিত হন। এদিকে রাজা বিক্রমদেব যখন দেখিলেন রাজ্যের যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার, যত শৃঙ্খল সব কিছু দিয়া, তাহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম উজাড় করিয়া দিয়াও ক্ষুদ্র একটি নারীর হৃদয়কে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, আপন কর্তব্যের আহ্বানে মোহাচ্ছন্ন প্রেমকে সবলে ঠেলিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল; তখনই তাহার সমস্ত স্বপ্ন টুটিয়া গেল, নিজেকে তিনি ফিরিয়া পাইলেন; তখনই তিনি বলিতে পারিলেন,

"অন্তর্যামী দেব,
তুমি জান, জীবনের সব অপরাধ
তারে ভালবাসা ; পুণ্য গেলো, স্বর্গ গেলো ,
রাজ্য যায় অবশেষে সেও চলে গেলো !
তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মোর ;
রাজধর্ম ফিরে দাও ; পুরুষ হৃদয়
মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরঙ্গ মাঝে !
কোথা কর্মক্ষেত্র ! কোথা জনস্রোত ! কোথা
জীবন মরণ ! কোথা সেই মানবের
অবিশ্রান্ত সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ,
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস ! * * * "

এইখানে নাটকটির প্রথম পর্যায়ের শেষ। এ-পর্যায়ে সুমিত্রা ও বিক্রমদেবকে কেন্দ্র করিয়াই প্রত্যেকের কথা ও গতির সঞ্চার। রাজপথে বিভিন্ন লোকের কথাবার্তা, দেবদত্তর সঙ্গে রাজার, মন্ত্রীর সঙ্গে মহিষীর কথাবার্তা প্রভৃতির ভিতর দিয়া রাজ্যের অবস্থা, বিশেষ করিয়া রাজার চরিত্রের দিক্‌টার একটি সুন্দর পরিবেশ রচিত হইয়াছে। নহিলে বিক্রমদেবের চরিত্র-বিশ্লেষণ আমাদের কাছে এতটা সহজ হইত না। এই যে প্রথম পর্যায় ইহারই মধ্যে একটা জিনিস অতি সুস্পষ্ট হইয়া পাঠকের মনে ধরা না পড়িয়া পারে না; দুইটি অঙ্কের কয়েকটি দৃশ্যের মধ্যে নাটকীয় সংস্থান খুব সচল নয়, খুব ঘনীভূতও নয় ; বরং প্রথম অঙ্কে রাজপথের দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে জয়সেনের প্রাসাদের দৃশ্য নাটকীয় সংস্থানকে একটু শিথিলই করিয়া দিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে একটা সত্য অত্যন্ত সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সে'টি বিক্রমদেব ও মহিষীর চরিত্র। দুর্বল, দায়িত্ববিহীন, কর্তব্য-বিরহিত ভালবাসার মোহে যতদিন তিনি আচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন, ততদিন তাহার ভালবাসা কিছুতেই মহিষীর পূজা ও শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই, বরং রাজাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া ভালবাসার বস্তুটি একদিন অন্তঃপুর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া গেল ; শুধু তখনই তাহার স্বপ্ন টুটিল, আপনাকে জানা তাহার সম্ভব হইল এবং নিজের কর্তব্যবুদ্ধিতে তিনি জাগ্রত হইলেন। এই যে আপনার পরিচয় লাভ, এর জন্য মূল্য দিতে হইল রাণীকে ; যিনি তাহার অন্তরের দেবতা, তাহাকে তাহার ছাড়িতে হইল, রাণী হইয়া তাহাকে অনেকখানি বিপদ ও লোকনিন্দাকে

বরণ করিতে হইল, কিন্তু, কেন? তাহার উত্তর, "তোমারে যে ছেড়ে যাই, সে তোমারি প্রেমে", যাহাকে তিনি ছাড়িয়া গেলেন তাহাকেই তিনি আরও বেশী করিয়া পাইবেন বলিয়া, মোহের আচ্ছন্নতার ভিতর হইতে সত্যের ও জীবনের কর্তব্যের জ্যোতির মধ্যে তাহার প্রিয়তমকে ফিরাইয়া আনিবেন বলিয়া। "রাজা ও রাণী"তে এই সত্যটাই নানান্ ভাবে নানান্ ঘটনায় সর্বত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; প্রথম পর্যায়ে যাহার সুরু, শেষ পর্যন্ত সেই সত্যটাই, সেই idea-টাই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে। এই সত্যটির সন্ধান পাইলেই সমস্ত নাটকটির অন্তরের রহস্য সহজ হইয়া উঠে।

তৃতীয় অঙ্কে একটি শান্ত মধুর অথচ তেজস্বী চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় লাভ ঘটে। শঙ্কর কাশ্মীর-কুমার কুমারসেনের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য। প্রথম দৃশ্যে যেখানে পুরুষবেশী সুমিত্রার সঙ্গে শঙ্করের প্রথম দেখা, সেখানে শঙ্করের বুকে কুমারসেন ও সুমিত্রার প্রতি স্নেহের উৎসের পরিচয়ে মন সিক্ত হয়। এই বৃদ্ধ ভৃত্যটির স্নেহপ্রাণ তেজোদীপ্ত চরিত্রটি বহুবার আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় না, কিন্তু তাহার এই একটুখানি পরিচয়ই আমাদের চিত্তের সমস্ত সম্ভ্রমকে আকর্ষণ করে এবং সমস্ত নাটকটির উপর একটি অপূর্ব সবল রেখাপাত করিয়া যায়। দ্বিতীয় দৃশ্যে ত্রিচূড়-কাননে কুমার সেনের সহিত বিবাহপণবদ্ধা ত্রিচূড়-রাজকন্যা ইলার ও কুমারের আলাপনের ভিতর দিয়া কুমারের চরিত্রের পরিচয় কতকটা আমরা পাই। তৃতীয় দৃশ্যে ছদ্মবেশী সুমিত্রা যুবরাজ কুমারসেনের কাছে কাশ্মীরের দুর্বিনীত দস্যুদের অত্যাচারে নিজের মর্মপীড়ার কথা জ্ঞাপন করেন, কিন্তু কুমারের অনুরোধেও রাজা চন্দ্রসেনের কাছে নিজের অনুরোধ জানাইতে অসম্মত হন।

> "আমি কি এসেছি
> জালন্ধর রাজা হ'তে ভিখারিণী রাণী
> ভিক্ষা মাগিবার তরে কাশ্মীরের কাছে?"

কিন্তু কুমারসেন নিজেই কাশ্মীরের এই কলঙ্কমোচন করিবার জন্য সংকল্প করেন এবং পিতৃব্যের আদেশ লইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। পঞ্চম দৃশ্যে ইলার নিকট হইতে কুমারসেনের বিদায়।

এদিকে জাগ্রতকর্তব্য রাজা বিক্রমদেব দুর্বৃত্ত কাশ্মীর দস্যুগণের অনেককেই পরাজিত করিয়া উদগ্র সংগ্রামে মাতিয়া উঠিয়াছেন,

"সন্ধি নহে—যুদ্ধ চাই আমি! রক্তে রক্তে
মিলনের স্রোত—অস্ত্রে অস্ত্রে সঙ্গীতের
ধ্বনি"

শুনিবার জন্ম উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন, তখন খবর পাইলেন, "বিপক্ষদল নিকটে আসিছে *** মার্জনা প্রার্থনা তরে", এবং মহারাণী স্থমিত্রা ভাই কুমার-সেন ও কাশ্মীরের সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া পলাতক দস্যুদের বন্দী করিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন! কিন্তু বিক্রমদেবের সমস্ত চিত্ত তখন উৎকট রণমদে মাতিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার অপমানক্ষুব্ধ চিত্ত কিছুতেই এত সহজে শান্ত হইতে চাহিল না; মহারাণীকে সাক্ষাতে অসম্মতি জানাইয়া, দূত শঙ্করকে অপমানিত করিয়া তিনি কাশ্মীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইলেন। এই খানেই "রাজা ও রাণী" নাটকের যথার্থ নাটকীয় পরিণতি। বিক্রমের বিপুল প্রেমাবেগ প্রতিহত হইয়াছে স্থমিত্রার স্থির অবিচল সত্যবুদ্ধি ও প্রেমের কাছে, এবং প্রতিহত হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে দুর্দম হিংসায় ও হিংস্রতায়, যে-প্রেম আঘাত করিতেছিল নিজকে, সে-প্রেম প্রতিহত হইয়া এইবার আঘাত করিল সকলকে; তাহার মধ্যে নাই ক্ষমা, নাই বিচারবুদ্ধি। নাটকীয় সম্ভাবনা এই রূপান্তরের মধ্যে নিহিত; কিন্তু তাহার পরেই ইলা ও কুমারের যে গীতি-কাব্যিক উপাখ্যান নাটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাহা যে শুধু জলীয় তাহাই নয়, নাটকীয় সম্ভাবনার দিক্ হইতে অবাস্তরও বটে।

যাহাই হউক, এদিকে কুমারসেন স্থমিত্রার স্নেহানুরোধে, এবং আপন হৃদয়ের ঔদার্যে বিক্রমকৃত অপমানের কোনও প্রতিশোধ না লইয়াই কাশ্মীরে ফিরিয়া আসিলেন। শঙ্করের তীব্র ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ তাঁহাকে টলাইতে পারিল না, স্থমিত্রার সঙ্গে তাঁহার যে চিরজীবনের প্রাণের সম্পর্ক, তাঁহাদের স্নেহভালবাসার মধ্যে যে "পিতামাতা-বিধাতার আশীর্বাদ ঘেরা পুণ্য স্নেহতীর্থখানি" গড়িয়া উঠিয়াছে, বিক্রমকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইতে গিয়া "বাহির হইতে হিংসানলশিখা আনিয়া" সেই স্নেহতীর্থের কল্যাণভূমিকে "অঙ্গার মলিন" করিতে চাহিলেন না।

এইখানে চতুর্থ অঙ্কের ছেদ পড়িয়াছে। এই পর্যন্ত নাট্যবিষয়ের ঘটনাস্রোতের বেগ কোথাও খুব দ্রুত নয়, অতি ধীরে ধীরে সমস্ত কাহিনীটি একটু একটু করিয়া দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু

চতুর্থ অঙ্কের পরেও সমস্ত ঘটনাটির পরিণতি কোথায় গিয়া হইবে তাহা সহজে অনুমান করিয়া উঠিতে পারি না। এই পরিণতির ইঙ্গিতও এ পর্যন্ত কোনও চরিত্র বা ঘটনার মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। সেই জন্যই পঞ্চম অর্থাৎ সর্বশেষ অঙ্কটিতে ঘটনাস্রোতের বেগ খুব দ্রুত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে; একটি দৃশ্যের পর আর একটী দৃশ্য অত্যন্ত চঞ্চল ও শৃঙ্খলাবিহীন ঘটনাবর্তের ভিতর দিয়া সমগ্র দর্শকের দৃষ্টি ও অনুভূতিকে অতি দ্রুত পদক্ষেপে শেষ পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছে, কোথাও বিরামের অবসর দেয় নাই। এই হিসাবে "রাজা ও রাণী" ঠিক পরিচিত নাট্যভঙ্গিমাকে আশ্রয় করে নাই। এই দ্রুত ঘটনা-সঞ্চালনের ভিতর দিয়া যে চরিত্রগুলির পরিচয় আমরা পাই, তাহারা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের চোখের ও মনের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়; তাহাদের কথা ও গতির মর্ম, এককথায় তাহাদের পরিচয়, আমাদের মনের মধ্যে খুব স্থায়ী ও নিবিড় হইয়া আসন দাবী করিতে পারে না; যবনিকাপাতের পর মন যখন বিশ্রামের ও ভাবিবার অবসর পায়, তখনই শুধু সেই স্থায়ী ও নিবিড় পরিচয়টুকু সম্ভব হয় এবং সমস্ত নাটকের মর্মরহস্যটি তখনই আমাদের কাছে ধরা পড়িবার সুযোগ ঘটে। পঞ্চম অঙ্কের ঘটনার সংস্থান যদি এতটা দ্রুত না হইত এবং তাহার কিছুটা গতিবেগ যদি তৃতীয় বা চতুর্থ অঙ্কে ধরিয়া রাখা যাইত, বোধ হয় নাট্যাভিব্যক্তির এই বৈশিষ্ট্যটুকু ধরা পড়িত না; ঘটনা-সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যরহস্যটি হয়ত আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারিত, যদিও সেই অনুপাতে নাটকের রসমাধুর্যটুকু অনেকটা কমিয়া যাইতে বাধ্য হইত। পঞ্চম অঙ্কের নাট্যবস্তুর পরিচয় লাভ করিলেই আমার কথাটা পরীক্ষা করা সহজ হইবে। ইহার ফলে লাভ হইয়াছে এই যে চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত নাট্য-বিষয়ের সংস্থানের মধ্যে যে শিথিল মন্থরতা স্থির হইয়া আছে, তাহা হঠাৎ কোথায় উড়িয়া যায়, এবং সমস্ত সংহত শক্তি যেন হঠাৎ মুক্তি পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়া আপন পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলে। এ যেন দৌড়ের প্রতিযোগিতায় বেশীর ভাগ পথটুকু ধীরে ধীরে দৌড়াইয়া আসিয়া, তারপর শেষ লক্ষ্যটি যখন নিকটতর হইল তখনই হঠাৎ সমস্ত সংহত শক্তিকে মুক্তি দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পদচালন করিয়া লক্ষ্যটির দিকে অগ্রসর হওয়া।

কুমারসেন কাশ্মীরে ফিরিয়া আসিয়া পিতৃব্য চন্দ্রসেনকে বিক্রমদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জার জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু চন্দ্রসেনের মহিষী

রেবতী জালন্ধররাজের শত্রুতাচরণ করিতে অনিচ্ছুক ; কারণ কাশ্মীর-রাজ্যের উত্তরাধিকারী কুমারসেন, চন্দ্রসেন রাজ্যের রক্ষক মাত্র। মহিষীর ইচ্ছা কোনও উপায়ে কুমারসেনকে সিংহাসন-বঞ্চিত করিয়া নিজের স্বামীর জন্য কাশ্মীর-রাজ্য ও সিংহাসন লাভ। সেইজন্য তিনি চাহেন জালন্ধররাজের মিত্রতা।

"যুদ্ধ সজ্জা ? কেন যুদ্ধসজ্জা ? শত্রু কোথা ?
মিত্র আসিতেছে। সমাদরে ডেকে আনো
তারে ! করুক সে অধিকার কাশ্মীরের
সিংহাসন ! রাজ্যরক্ষা তরে তুমি এত
ব্যস্ত কেন ! একি তব আপনার ধন ?
আগে তারে নিতে দাও, তারপর ফিরে
নিয়ো বন্ধুভাবে ! তখন এ পররাজ্য
হবে আপনার।"

দুর্বলচিত্ত চন্দ্রসেনকে বাধ্য হইয়াই মহিষীর ইচ্ছার দাস হইতে হয় ; এবং কুমারসেন যুদ্ধসজ্জার অনুমতি লইতে আসিয়া প্রত্যাখ্যাত ও অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। চন্দ্রসেন ও রেবতী চাহিয়াছিলেন কুমারকে বন্দী করিয়া জালন্ধররাজের হাতে অর্পণ করিতে। কিন্তু কুমারসেন সুমিত্রাকে সঙ্গে করিয়া ত্রিচূড় রাজ্যে চলিয়া আসেন এবং অমরুরাজের নিকট ইলার দর্শন ভিক্ষা করেন। কিন্তু জালন্ধররাজভীত অমরু কুমারসেনকে আশ্রয় দিতে এবং ইলার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হন। ভগ্নমনোরথ কুমারসেন সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে বিক্রমদেব কাশ্মীর আক্রমণ করিতে আসিয়া চন্দ্রসেন কর্তৃক পরমাতিথ্যে গৃহীত হন এবং বিশেষ করিয়া রেবতী বিক্রমদেবের নিকট "রাজবিদ্রোহী" কুমারের শাস্তি প্রার্থনা করেন ও চরের মুখে ত্রিচূড়-রাজ্যে তাহার গোপন আশ্রয়ের সংবাদ দান করেন। বিক্রমদেব মৃগয়ার ছলে ত্রিচূড়-রাজ্যে আগমন করিলে অমরুরাজ তাঁহার হাতে তাঁহার সর্বস্ব তুলিয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে "তব যোগ্য কন্যা মোর—তারে লহ তুমি" বলিয়া ইলাকেও তাঁহার হাতে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হন। পঞ্চম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে ইলা ও বিক্রমের কথোপকথনের মধ্যে নাটকের একটি অপূর্ব ইঙ্গিত অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুমিত্রার বিস্মৃত-প্রেম বিক্রম ইলার পাণি প্রার্থনা করেন, কিন্তু ইলার চিত্ত মন ভরিয়া আছে কুমারের প্রেম-স্পর্শে, তাহার ধ্যানে চিত্ত তাহার সদাজাগ্রত।

"পিতা মোরে দিয়াছেন স'পি তব হাতে,
আপনারে ভিক্ষা চাহি আমি। ফিরাইয়া
দাও মোরে। কত ধন, রত্ন, রাজ্য, দেশ
আছে তব, ফেলে রেখে যাও মোরে এই
ভূমিতলে; তোমার অভাব কিছু নাই।"

আর যদি লুণ্ঠিত রত্নের মত আমাকে লইয়া যাইবেই তাহা হইলে

"তোমরা যেমন ক'রে বনের হরিণী
নিয়ে যাও, বুকে তার তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে
তেমনি হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া
জীবন কাড়িয়া আগে, তারপর মোরে
নিয়ে যাও। * * * কিন্তু, মহারাজ!
কোথা নিয়ে যাবে? রেখে যাও তার তরে
যে আমারে ফেলে রেখে গেছে।"

কে সে? এমন একনিষ্ঠ প্রেমের অধিকারী কোন্ ভাগ্যবান্। বিক্রমদেব উত্তর পাইলেন, সে সৌভাগ্য-বঞ্চিত আশ্রয়-বিহীন কুমারসেন। কত করিয়া তিনি চেষ্টা করিলেন ইলাকে তাহার প্রেম হইতে বিচ্যুত করিতে। কিন্তু এমন একান্ত একনিষ্ঠ সর্ব্বহারা প্রেমের কি বিচ্যুতি আছে? যে-প্রেম আত্মবিস্মৃতি ঘটায় না তাহার কি কোনও পরাজয় আছে? প্রেমস্বর্গচ্যুত বিক্রম আপনাকে বুঝি বহুদিন পরে ফিরিয়া পাইলেন, বহুদিন পরে বুঝি সত্য প্রেমজ্যোতির একটু আভাস পাইলেন ইলার চোখে মুখে, বুঝি তাঁহার উদগ্র হিংস্র যুদ্ধোন্মত্ততা শীতল হইয়া আসিল, বুঝি 'শিশির-শীতল প্রস্ফুটিত শুভ্রপ্রেমের' একটি বিন্দু লাভ করিবার জন্য, আবার সেই পুরাতন দিনগুলিকে তাহার সব সুখদুঃখভার লইয়া ফিরিয়া পাইবার জন্য সমস্ত অন্তর তৃষিত হইয়া উঠিল!

"কী প্রবল প্রেম! ভালোবাস', ভালোবাস'
এমনি সবেগে চিরদিন। যে তোমার
হৃদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালোবাস।
প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
ধন্য হই! দেবি, চাহিনে তোমার প্রেম;
* * * * *
আমারে বিশ্বাস করো, আমি বন্ধু তব;
চলো মোর সাথে, আমি তারে এনে দেবো

সিংহাসনে বসায়ে কুমারে—তাঁর হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারি। * * *
* * * * *
যুদ্ধ নাহি
ভালো লাগে। শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ
গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে! এ সংসারে যেথা যাও, সেথা থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদৃষ্টি সম, পবিত্র কিরণে তারি
দীপ্তি পায় বিপদের মেঘ, স্বর্ণময়
সম্পদের মতো। আমি কোন্ সুখে ফিরি
দেশ-দেশান্তরে, স্কন্ধে বহি জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অতিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ!
কোথা আছে কোন্ স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্রপ্রেম শিশির শীতল।
ধুয়ে দাও প্রেমময়ি, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর, রক্ত কলুষিত।

এদিকে অরণ্যে সুমিত্রা ও কুমারসেন খবর পাইলেন, ছদ্মবেশে রাজ্যের সংবাদ নিতে গিয়া শঙ্কর ধরা পড়িয়াছে এবং শত্রুচরেরা তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়িত করিতেছে; জয়সেন গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া প্রজাদের উপর নৃশংস অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। কুমারসেনের কাছে জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিল;

"আর ত সহেনা।
ঘৃণা হয়, এ জীবন করিতে বহন
সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয়।"

সুমিত্রার ইচ্ছা দুইজনে রাজসভায় গিয়া ইহার কিছু প্রতিকার প্রার্থনা করেন কিন্তু বন্দীভাবে ধরা দিবার চিন্তাও কুমারসেনের অসহ্য!

"পিতৃ-সিংহাসনে
বসি' বিদেশের রাজা দণ্ড দিবে মোরে
বিচারের ছল করি, একি সহ্য হবে?"

তাহার চেয়ে যে মৃত্যুও ভাল! সত্যই ত মৃত্যুও ভাল। সুমিত্রারও ইহাতে কোনও দ্বিধা নাই।

"বেঁচে থাকা ভীরুতা কেবল!

* * * * *

ভক্ত যারা অনুরক্ত মোর—প্রতিদিন
সঁপিছে আপন প্রাণ নির্যাতন সহি।
তবু আমি তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে
জীবন করিব ভোগ—একি বেঁচে থাকা!"

সুমিত্রা। "এর চেয়ে মৃত্যু ভালো!"

কুমার। "বাঁচিলাম শুনে!
কোনোমতে রেখেছিনু তোমারি লাগিয়া
এ হীন জীবন, প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর
নির্দোষের প্রাণবায়ু করিয়া শোষণ!
আমার চরণ ছুঁয়ে করহ শপথ
যে কথা বলিব তাহা করিবে পালন
যতই কঠিন হোক।"

কিন্তু তাহার আগে একবার ইলার কথা মনে পড়িল না কি? তাহার নিকট হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার কথা মনে হইয়া সমস্ত অন্তর দুর্বলতায় কাঁপিয়া উঠিল না কি? কিন্তু এ কি বিক্রমের মোহাচ্ছন্ন প্রেম, এ কি বিচ্ছেদে দুর্বল, না মৃত্যুতে ব্যথিত!

"তারে কি জানিনে আমি?
হেন অপমান লয়ে সে কি মোরে কভু
বাঁচিতে বলিত? সে আমার ধ্রুবতারা
মহৎ মৃত্যুর দিকে দেখাইছে পথ।"

কাশ্মীরের রাজপ্রাসাদে বিচারসভা আসীন। সংবাদ আসিয়াছে কুমারসেন স্বেচ্ছায় বন্দীভাবে ধরা দিতে আসিতেছেন! সিংহাসনে বিক্রমদেব নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন, কুমার আসিলে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া পিতৃ-সিংহাসন তাহাকে দান করিবেন। বৃদ্ধ শঙ্করও সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, কুমারসেন বন্দীভাবে ধরা দিতে আসিতেছেন শুনিয়া লজ্জায় ও অপমানে বৃদ্ধের অন্তর ক্ষুব্ধ, মস্তক অবনত; ভাবিতেছেন, "চিরভৃত্য তব, আজি দুর্দিনের আগে মরিল না কেন?" রুদ্ধদ্বার শিবিকা দরজায় আসিয়া থামিল, বিক্রমদেব

সিংহাসন হইতে নামিয়া অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এমন সময় সুমিত্রা স্বর্ণথালে ছিন্নমুণ্ড লইয়া শিবিকা হইতে নামিলেন, এবং বিস্মিত স্তব্ধ বিক্রমের হাতে সেই থালা অর্পণ করিলেন—

"ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধ'রে
কাননে কান্তারে শৈলে, রাজ্য, ধর্ম, দয়া,
রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জিয়া ; যার লাগি
দিগ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার ;
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে ;
লহ, মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
শ্রেষ্ঠ সেই শির ; আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ !"

এই বলিয়াই মহিষী সুমিত্রা ভূমিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই মুহূর্তেই ইলা ছুটিয়া আসিয়া 'কুমার' 'কুমার আমার' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ শঙ্কর কুমারকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার মৃত্যুপথের সঙ্গী হইল। চন্দ্রসেন সিংহাসনে পদাঘাত করিয়া 'রাক্ষসী পাপীয়সী' রেবতীকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিলেন। আর বিক্রমদেব সুমিত্রার মৃতদেহের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িলেন ; তাঁহার সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া একটিমাত্র আক্ষেপোক্তি বাহির হইয়া আসিল

"দেবি, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই ব'লে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির-অপরাধী ক'রে? ইহজন্ম
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব ; তাহারো দিলে না অবকাশ
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।"

পঞ্চম অঙ্কে আমি যে দ্রুত ঘটনা-সংস্থানের কথা বলিয়াছি, এখন বোধ হয় তাহা কতকটা স্পষ্ট হইয়া থাকিবে ; "বিসর্জনে"র ঘটনা-সংস্থান ও নাট্যরহস্যের আলোচনার সময় এই কথাটা আরও স্পষ্ট হইবে। এই ঘটনা-সংস্থানকে বুঝাইবার জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াই "রাজা ও রাণী"র কাহিনীটিকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি ; "রাজা ও রাণী", "বিসর্জন" ও "মালিনী"র নাট্য-

৩৯

রূপটি বুঝিবার জন্যও ইহার প্রয়োজন ছিল। পাঁচটী অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যকে আশ্রয় করিয়া কি ভাবে সমস্ত নাট্য-বিষয়টি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার আরম্ভ, বিবৃতি ও পরিণতি কেমন করিয়া মনের বিভিন্ন অনুভূতির সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া গিয়াছে, তাহা একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। এই তিনটি নাটকই মোটামুটিভাবে প্রাচীন পঞ্চাঙ্ক নাটকের নাট্যরূপেরই অনুসরণ করিয়াছে; অবশ্য, "মালিনী" "রাজা ও রাণী" এবং "বিসর্জন" অপেক্ষা অনেকটা সহজ ও সাবলীল।

কিন্তু "রাজা ও রাণী"র অন্তরের রহস্যটি এইবার জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। আমি পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি, বিক্রমদেবের চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া একটি সত্য, একটি 'আইডিয়া' এই নাটকটির মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যতদিন বিক্রম সুমিত্রার প্রতি প্রেমে আত্মকর্তব্য বিস্মৃত হইয়া মোহাচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন ততদিন তিনি সত্য প্রেমের আভাস লাভ করিতে পারেন নাই; তারপর, একদিন সুমিত্রাকে নিজেই যখন পথে বাহির হইয়া যাইতে হইল, তখনই তাহার স্বপ্ন টুটিল, আপনাকে জানা সম্ভব হইল, এবং নিজের কর্তব্যবুদ্ধিতে তিনি জাগ্রত হইলেন। কিন্তু এ জাগরণও সত্য জাগরণ নয়, কারণ, যে রাজ্যের মধ্যে তিনি জাগিলেন সে রাজ্য একটা ক্রুদ্ধ আহত অভিমানের রাজ্য, একটা সাময়িক উন্মত্ততার রাজ্য, নিজের উদগ্র অভিমানের মধ্যে নিজকে উদ্দীপ্ত করিয়া রাখার রাজ্য; যেন এক মোহের আচ্ছন্নতার ভিতর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আর এক আচ্ছন্নতার ভিতর নিজকে ডুবাইয়া দেওয়া! চতুর্থ অঙ্কে রাণী সুমিত্রা নিজে আসিয়াও এই নূতন আচ্ছন্নতার ভিতর হইতে আপন স্বামীকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না বরং অপমানিত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল। এত সহজে বিক্রমের ভুল ভাঙিল না; জীবনের রহস্য, প্রেমের রহস্য এত সহজে তাঁহার কাছে ধরা দিল না, তাহার জন্য অনেকখানি মূল্য দিতে যে এখনও বাকী। যুদ্ধের পর যুদ্ধ তিনি জয় করিতেছেন, কিন্তু যাহাকে জয় করিবার জন্য এ যুদ্ধ, তাহাকে তিনি পাইতেছেন কোথায়? জীবনের যে-সন্ধান লাভের এই উন্মত্ত অভিযান, সে সন্ধান কোথায়? এই রহস্যটিকে উদ্ঘাটিত করিবার জন্য কবিকে অনেকখানি কৌশল অবলম্বন করিতে হইল, অনেকগুলি জীবনের

বিকাশকে বিক্রমের কাছে বলি দিতে হইল, বিকৃত করিতে হইল। রেবতীকে এমন করিয়া দেখাইতে হইল, এমন 'হিংস্র', এমন 'নরকাগ্নিশিখার' মতন করিয়া ফুটাইতে হইল, যাহাতে 'এতদিন পরে' বিক্রম নিজের 'শাণিত ক্রুর বক্র' হিংসার প্রতিমূর্তিখানা দেখিতে পাইলেন 'এই রমণীর মুখে'; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিলেন,

> "এ হিংসা আমার
> চোর নহে, ক্রূর নহে, নহে ছদ্মবেশী।
> প্রচণ্ড প্রেমের মত প্রবল এ জ্বালা
> অভ্রভেদী সর্বগ্রাসী উদ্দাম উন্মাদ দুর্নিবার!"

এত জ্বালা বুকে লইয়া কি মানুষ কখনও আপনার সন্ধান জানিতে পারে, প্রেমের মধুর রহস্যের আভাস লাভ করিতে পারে? সেই জন্য ইলাকে সুদীর্ঘ বিরহ দুঃখ সহিতে হয়, পরহস্তে সমর্পণের যে সুদুঃসহ লজ্জা তাহা বহন করিতে হয়; এবং সর্বশেষে তাহার সর্বত্যাগী মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের পরিচয়ের মধ্যে বিক্রমের আচ্ছন্নতা যেন সূর্যোদয়ে কুয়াসার মত কোথায় উবিয়া গেল, তাহার সমস্ত চৈতন্য এক মুহূর্তে যেন ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহাতেও প্রেমের রহস্য, জীবনের রহস্য যে এখনও অনেক দূরে, এখনও যে তার জন্য অনেকখানি মূল্য দেওয়া বাকী; যে দুঃখের ও অনুতাপের কষ্টিপাথরে প্রেমের পরীক্ষা দিতে হয়, জীবনের পরিচয় লাভ করিতে হয়, সে দুঃখ লাভ হইল কি, আক্ষেপ অনুতাপের আগুনে নিজকে পোড়ান হইল কোথায়? কুমারসেন সেই পরিচয়, সেই পরীক্ষা প্রতিদিন দিতেছেন বলিয়াই না তিনি আজ নির্বাসিত হইয়াও পূজিত এবং সমাদৃত, সকল পরাজয়ের ভিতরও সর্বজয়ী; আর তিনি জয়ী হইয়াও একান্ত পরাজিত, সকল সাফল্যের অধিকারী হইয়াও ব্যর্থতার বেদনায় ভারাক্রান্ত; ইহা অপেক্ষা নিষ্করুণ আর কি হইতে পারে? সেইটুকু বুঝাইবার জন্য আত্মদান করিতে হইল কুমারসেনকে, এবং সর্বোপরি সুমিত্রাকে। ইলার প্রেম কুমারসেনকে মহৎ মৃত্যুর দিকেই পথ দেখাইয়া দিল, তাহাকে নিজের কাছে কোন সংকীর্ণ বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিল না; তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া মুক্তি দিয়াই তবে উভয়ে উভয়কে পাওয়া সত্য হইল। আবার "তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে", এই সত্যটাই আপনাকে ব্যক্ত করিল; একবারে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া না দিলে যে সর্বস্বকে ফিরিয়া পাওয়া যায় না,

এই কথাটিই কুমারসেন তাহার সমস্ত জীবন দান করিয়া দিয়া বিক্রমকে বুঝাইয়া গেলেন। ইলা তাহার নিজকে বঞ্চিত করিয়া,তাহার জীবনের চাইতেও অধিক স্বামীকে হারাইয়া এই সত্যটাকেই স্বীকার করিল এবং বিক্রমকে তাহার সন্ধান দিল। আর, সুমিত্রা! সে ত নিজের দুর্বিষহ দুঃখ ও অপমান মাথা পাতিয়া লইয়া আপনার প্রিয়তমকে জীবনের রহস্য, প্রেমের রহস্যের সন্ধানই দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই; শেষ পর্যন্ত সেই প্রিয়তমের প্রেমেই প্রিয়তমকে ছাড়িয়া যাইতে হইল, পরিপূর্ণ প্রেমজ্যোতির অরুণালোকের মধ্যে তাহার স্বামীকে বাঁচাইবার জন্যই তাহাকে আত্মদান করিতে হইল; তবেই বুঝি বিক্রমের ভুল ভাঙ্গিল, জীবনের সন্ধান তিনি লাভ করিলেন। এ দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন তাহার বাকী ছিল; সুমিত্রাকে আত্মদান করিয়া তাহা প্রমাণ করিতে হইল, নহিলে কিছুতেই তাহা সম্ভব হইত না।

সমগ্র নাটকটিতে প্রায় সবগুলি চরিত্রই সুপরিস্ফুট, বিশেষ করিয়া বিক্রম ও সুমিত্রার, ইলা ও কুমারসেনের, এবং বৃদ্ধ ভৃত্য শঙ্করের। ঐতিহাসিক আবেষ্টনটিও কোথাও অস্পষ্ট হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু ইলা ও সুমিত্রার পরিচয় যতটা নিবিড় করিয়া আমরা পাই,এমন আর কাহারও নহে। একথা খুব সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের নাট্যে ও কাব্যে, গল্প ও উপন্যাসে নারীচরিত্র, নারীজীবনের রহস্য যেমন করিয়া ফুটিয়াছে, পুরুষচরিত্র তেমন করিয়া ফুটিবার অবসর পায় নাই। ইহার হেতু কি জানি না, তবে মনে হয়, আমাদের দেশে ও সমাজে নারীজীবনের যে সহজ দুর্বলতা, তাহা রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয়ের দরদ ও সহানুভূতিকে অতি সহজেই আকর্ষণ করিয়াছে এবং একেবারে তাঁহাকে অন্তঃপুরের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। এই দুর্বলতাকে তিনি কোথাও কঠোর হস্তে আঘাত করেন নাই, বরং তাহার উপর নিজের কোমল হৃদয়টি বুলাইয়া দিয়া সর্বত্রই নারীজীবনের যেটুকু নীরব ত্যাগের দিক, স্নেহের দিক, ভালবাসার দিক, মহত্ত্বের দিক, সেই দিকটাই উজ্জল করিয়া তুলিয়া সমস্ত দুর্বলতাকে আড়াল করিয়া দিতে চাহিয়াছেন; ইহার ফলে নারী-জীবনের পরিচয় আমাদের কাছে খুব নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে বটে,কিন্তু কোথাও কোথাও বোধ হয় কবির সৃষ্ট প্রধান নারীচরিত্রগুলি একটু বৈচিত্র্যবিহীন হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে; তাহাদের ভাব ও প্রকাশের মধ্যে সৃষ্টির বিভিন্নতা

একটু কম। সর্বত্রই তাহারা একটা করুণ মাধুর্যবিমণ্ডিত রাজ্যের মধ্যে বাস করেন এবং প্রায় সর্বত্রই তাহারা তাহাদের ত্যাগের ও প্রেমের মধ্য দিয়া নিজেদের ও পরকে অভিব্যক্ত করিয়া যান। আমার এই কথা সর্বত্র সত্য নাও হইতে পারে, কিন্তু ইলা ও সুমিত্রার জীবনে এই পরিচয়ই আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুমিত্রা একটু ধীর গম্ভীর, জীবনের কর্তব্যে জাগ্রতচিত্ত রাণী; কিন্তু দুজনেই প্রেমে অবিচল, একনিষ্ঠ, এবং দুজনেই নিজদেরকে সকল ভোগ ও সহজ আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং সুমহান ত্যাগকে বরণ করিয়া নিজের এবং নিজের প্রিয়তমের জীবনকে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তবে সুমিত্রার ত্যাগ যতটা স্বেচ্ছায়, যতটা মহৎ মর্যাদায়, ইলার ত্যাগের মধ্যে তার আভাস ততটা নাই। সুমিত্রা ও কুমারসেন মহৎ, কিন্তু ইলা মধুর; সে হয়ত আমাদের পূজা ও শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করে না, কিন্তু আমাদের ভালবাসাকে টানিয়া লয়। তবু যদি শেষ পরিণতির দৃশ্যটিতে তাহার পরিচয় আমরা আর একটু বেশী করিয়া পাইতাম! কবি সে সুযোগ আমাদের দেন নাই। সে শুধু একবার একটু আকস্মিক ক্ষণিকার মত দেখা দিয়াই নিভিয়া যায়, তাহা তাহার কোনও পরিচয় নয়। নাট্য-কৌশলের দিক হইতে বোধ হয়, এখানে একটু ত্রুটী আছে; শেষ দৃশ্যে ইলাকে মঞ্চের উপর আনিয়া মূর্চ্ছা না ঘটাইলেও কিছু ক্ষতি হইত না বরং শোভন হইত বলিয়াই মনে হয়। পঞ্চম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে তাহার যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট ছিল। শেষ দৃশ্যটিতে ইলা আমাদের চোখের আড়ালে থাকিলে আমাদের মনের অন্তরালে তাহার জন্য যে করুণ অনুভূতিটি রসসিক্ত হইয়া উঠিতে পারিত, তাহার আকস্মিক উপস্থিতি, ও মূর্চ্ছা সেই অনুভূতিটিকে একটু ক্ষুণ্ণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।

একটা কথা অবান্তর হইলেও এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। বিদেশী কাশ্মীরী কর্মচারীদের অত্যাচারের দৃশ্যের উল্লেখ করিয়া টমসন্ সাহেব বলিয়াছেন, "It will be at once grasped that the play has a double meaning; it has a political reference, which helps to explain its very considerable measure of popularity on the stage". "রাজা ও রাণী"র সমগ্র বস্তুটি আমি বিশদ ভাবেই বিবৃত করিয়াছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই তাহার ভিতরের মর্মার্থটিকেও টানিয়া বাহির করিতে

চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু কোথাও এই "political reference" একটুও আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে কি ? না সমগ্র নাটকটির মধ্যে তাহার কোনও মূল্য আছে ? ঘটনার আবেষ্টন ও সংস্থানের জন্যই এই 'বিদেশীর অত্যাচার' আখ্যানটুকুর আশ্রয় লইতে হইয়াছে ; চরিত্র-বিকাশের ক্ষেত্রে, নাট্য-রহস্যের ক্ষেত্রে ত তাহার এতটুকু মূল্যও নাই !

"রাজা ও রাণী"র অল্প কিছুদিন পরেই "বিসর্জন" রচিত হইয়াছিল। "বিসর্জন" রবীন্দ্রনাথের ও শিক্ষিত বাঙালীর প্রিয় নাটক ; বহুবার নানাস্থানে সাফল্যে অভিনীত হইয়াছে এবং আজ ইহার আখ্যানভাগ সকলের কাছেই অত্যন্ত পরিচিত। "বিসর্জনের" ঘটনাবস্তুর বিন্যাস "রাজা ও রাণী" এবং অন্যান্য নাটকের ঘটনাবিন্যাসেরই অনুরূপ, "রাজা ও রাণী"র মতনই ইহারও রচনা অমিত্রাক্ষর ছন্দে, শুধু পৌরগণের দৃশ্যগুলি গদ্যে। "রাজা ও রাণী"র প্রথম চারিটি অঙ্কে ঘটনাস্রোতের একটা শিথিল মন্থরতা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু "বিসর্জনে" তাহার আভাসও কিছু পাই না ; প্রথম হইতেই ঘটনার পর ঘটনা এমন কৌশলে সুবিন্যস্ত হইয়াছে যে, কোথাও কোন ফাঁক নাই, সর্বত্র নাটকীয়-সংস্থান অত্যন্ত জমাট হইয়া পাঠক ও দর্শকের মন এবং অনুভূতিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু এ কথাটা স্বীকার করিতে হইলে খুব সংক্ষেপে বিষয়-বস্তুটির একটু পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা, গুণবতী তাঁহার মহিষী। রঘুপতি রাজপুরোহিত, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের তেজস্বী ব্রাহ্মণ। এই মন্দিরের সেবক রঘুপতির পালিত একটি রাজপুত যুবক, নাম তার জয়সিংহ। অপর্ণা একটি সরলা কোমলহৃদয়া বালিকা। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে দেবীর পূজায় পশু-বলিদান বহুবৎসরের চিরাচরিত প্রথা ; কেহ কোনদিন এই প্রথার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করে নাই। প্রথম প্রতিবাদ জানাইল ভিখারিণী বালিকা অপর্ণা। বালিকার স্নেহের পুত্তলি ক্ষুদ্র একটি ছাগশিশুকে 'মায়ের' কাছে বলি দিবার জন্য জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া আসা হইয়াছে ; আর বালিকা চোখের জলে তাহার আহত হৃদয়ের দীপ্তি জ্বালিয়া রাজার কাছে ইহার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। সেই করুণাকাতর কণ্ঠস্বরের প্রতিবাদ মন্দিরের সেবক জয়সিংহের ভক্তহৃদয়কে এক অপরূপ বেদনায় ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে এবং

আজ সর্বপ্রথম তাহাকে বিশ্ব-জননীর প্রেমে সন্দেহাকুল করিয়াছে। সেইদিন হইতে গোবিন্দমাণিক্য নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলেন, মন্দিরে মায়ের পূজায় জীববলি হইতে পারিবে না। পুরোহিত রঘুপতি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, ধর্মের বিনাশ আশঙ্কা করিয়া রাজ্যের মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ, যুবরাজ নক্ষত্র রায় ও প্রজাবৃন্দ আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। সংশয়াকুলচিত্ত জয়সিংহও রাজার আদেশ শুনিয়া বিচলিত হইল, কিছুতেই সে আদেশকে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সংশয় নাই শুধু রাজার মনে, অন্তরের মধ্যে তিনি ভগবানের স্থির আদেশ লাভ করিয়াছেন, তিনি জানিয়াছেন,

> "মানবের
> বুদ্ধি দীপ সম, যত আলো করে দান,
> তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া, স্বর্গ
> হ'তে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয়
> টুটে। আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই নাই।"

এদিকে ব্রাহ্মণ রঘুপতি তাঁহার ক্রোধ সকল দিকে ছড়াইতেছেন, সকলকে রাজার বিরুদ্ধে, রাজার আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছেন; পুরবাসীরা রাজাদেশ অমান্য করিয়া মন্দিরে বলি লইয়া আসিতেছে, আর রাজা নিরুপায় হইয়া সৈন্যবলের সাহায্যে সে বলি ঠেকাইয়া রাখিতেছেন। জয়সিংহ পায়ে ধরিয়াও রাজাকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছে না। রঘুপতির উন্মত্ততাও ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, যুবরাজ নক্ষত্র রায়কে তিনি গোবিন্দমাণিক্যের হত্যায় প্ররোচিত করিলেন এবং জয়সিংহকেও বুঝাইলেন, 'রাজরক্ত চাই, দেবীর আদেশ!' জয়সিংহের সন্দেহ সংশয় দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল; সত্যই কি মা এত নিষ্ঠুর, সত্যই কি তিনি রক্তপিপাসু! "কিন্তু রাজরক্ত! ছি ছি; ভক্তি-পিপাসিতা মাতা, তাঁরে বল রক্তপিপাসিনী"! তবে কি বলি বন্ধ হইবে? হউক। কিন্তু না, তাহা হইতেই পারে না, তাহা হইলে যে গুরু রঘুপতির প্রতি অবিশ্বাসী হইতে হয়, প্রাণ থাকিতে তাহা সম্ভব নয়। "রাজ-রক্ত চায় যদি মহামায়া, সে রক্ত আনিব আমি! ভ্রাতৃহত্যা দিব না ঘটিতে।" কিন্তু সংশয় যে তাহার কিছুতেই কাটে না, আর অপর্ণা যে তাহার সংশয় আরও বাড়াইয়া তোলে। রঘুপতি বলেন, অপর্ণা হইতে দূরে থাকিতে, কিন্তু

তাহাকে দূরে রাখিতে যে জয়সিংহের বুকে বেদনার তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। তবুও গুরু বড়, গুরুর কথাই সত্য।

"তাই দেব গুরুদেব !
চলে যা অপর্ণা ! দয়ামায়া স্নেহ প্রেম
সব মিছে ! সরে যা অপর্ণা ! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবে দয়াময় মৃত্যু ! চলে যা অপর্ণা !"

এমনি মর্মন্তুদ বেদনা বুকে লইয়াও সে অপর্ণাকে দূরে রাখিতেই চায়, কিন্তু অপর্ণা বলে, "কেন যাব ?" এতটুকু অভিমান তাহার হয় না।

"অভিমান কিছু নাই আর ! জয়সিংহ,
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব চেয়ে বেশী ! কিছু মোর নাই
অভিমান।"

কিন্তু জয়সিংহ পারিল না রাজরক্ত আনিতে; মন্দিরের মধ্যে রাজাকে হত্যা করিতে গিয়া ছুরি তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল, পারিল না! রঘুপতির ক্রোধ আবার জ্বলিয়া উঠিল! আবার জয়সিংহকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল, "আমি এনে দিব রাজ-রক্ত শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।" রঘুপতি তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন; তাঁহারই চক্রান্তে মন্দিরের মধ্যে প্রস্তর-প্রতিমার মুখ ফিরিয়া যায় এবং সমস্ত প্রজা ভীত ও শঙ্কিত হইয়া উঠে। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য নির্বিকার, চিত্ত তাঁহার অবিচল। আবার অপর্ণা ও জয়সিংহ; জয়সিংহকে অপর্ণা টানিতেছে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের করুণায় ভালবাসায়, সমস্ত অন্ধ আচারের মরুবালিরাশির ভিতর হইতে অখণ্ড নিষ্কলুষ নিঃসংশয় প্রেমের রাজ্যের দিকে সে তাহাকে ইঙ্গিত করিতেছে; কিন্তু আর একদিকে তাহাকে টানিতেছে গুরু রঘুপতির নিষ্করুণ স্নেহ, তাহার সুকঠোর আদেশ! এই দুই সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া জয়সিংহের অন্তর প্রতি মুহূর্তে বেদনায় উৎপীড়িত হইতেছে। রাজহত্যার চক্রান্তে লিপ্ত এই অপরাধে বন্দী হইয়া এদিকে রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের বিচার-সভায় উপস্থিত হইয়াছেন; বিচারে 'অষ্টবর্ষ নির্বাসন'

দণ্ড হইয়াছে, দুই দিন পরে নির্বাসনে যাইতে হইবে। এতদিন পর রঘুপতি আজ বিচলিত হইয়াছেন,

"গেছে গর্ব্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব !

*   *   *

অন্তরেতে সে দীপ্তি নিভেছে, যার বলে
তুচ্ছ করিতাম আমি ঐশ্বর্য্যের জ্যোতি
রাজার প্রতাপ! নক্ষত্র পড়িলে খসি'
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মাটির প্রদীপ!"

কিন্তু অন্তরের হিংসাবহ্নি আজও তাঁহার নিভে নাই। 'রাজরক্ত চাই দেবীর'—একথা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া জয়সিংহের মুখ হইতে তৃতীয়বার এই প্রতিজ্ঞা বাহির করিয়া লইলেন—"রাজ-রক্ত চাহে দেবী; তাই তাঁরে এনে দিব।" এদিকে নক্ষত্র রায় গোপনে মোগল-সৈন্যবাহিনীর সাহায্য লইয়া ত্রিপুরা আক্রমণ করিতেছেন; ভাই'র বিশ্বাসঘাতকতায় বিচলিত গোবিন্দমাণিক্য কি করিবেন বুঝিতেছেন না। মন্দিরের বাহিরে ঝড় উঠিয়াছে, পূজোপকরণ লইয়া রঘুপতি মন্দিরে প্রবেশোন্মুখ; ঝড়ের উন্মত্ততা তাহার নিজের মধ্যেও হিংস্র উন্মত্ততা জাগাইয়া তুলিয়াছে। এমন সময় অপর্ণা জয়সিংহের অন্বেষণে আসিয়া উপস্থিত, কিন্তু রঘুপতি তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন—"দূর হ' দূর হ' মায়াবিনী! জয়সিংহে চাস্ তুই! আরে সর্বনাশী মহাপাতকিনী।" অপর্ণা চলিয়া গেল। একটু পরেই জয়সিংহ দৌড়িয়া আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল। রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজরক্ত কই!" জয়সিংহ স্থির অকম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,

"আছে আছে! ছাড় মোরে!
নিজে আমি করি নিবেদন!—রাজরক্ত
চাই তোর দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা। নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা!—আমি রাজপুত, পূর্ব্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ—রাজরক্ত আছে দেহে!
এই রক্ত দিব! এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা! এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ত তৃষাতুরা।"

এই বলিয়া নিজেই সে নিজের বুকে ছুরি আমূল বসাইয়া দিল এবং মুহূর্তে ই ধরাশায়ী হইল! কিন্তু জয়সিংহ এ কি সর্বনাশ করিয়া বসিল! সে যে রঘুপতির "একমাত্র প্রাণ, প্রাণাধিক জীবনমন্থন-করা ধন!" তাহাকে ছাড়িয়া রঘুপতি বাঁচিবে কি করিয়া?

"জয়সিংহ! বৎস মোর গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি; অহঙ্কার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব দূর হ'য়ে যাক্,
তুই আয়!"

এমন সময় ছুটিয়া আসিয়া অর্পণা দেখিল জয়সিংহের মৃত রুধিরাক্ত দেহ—"ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে! ফিরে দে!" কিন্তু ফিরাইয়া দিবে কে? প্রতিমা যে পাষাণ!!

জয়সিংহকে হারাইয়া রঘুপতির এতদিনে চৈতন্যলাভ হইয়াছে! দেবী ত জড় পাষাণের স্তূপ! সমস্ত ব্যথিত, বিশ্ব তাঁহার পায়ে কাঁদিয়া মরিতেছে, তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। আর "মা বলিয়া ডাকে যত জীব—হাসে তত ঘোরতর অট্টহাস্তে নির্দয় বিদ্রূপ।" মহারাণী গুণবতী মন্দিরে দেবীর চরণে পূজা লইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু দেবী কোথায়? রঘুপতি উত্তর করিল,

"দেবী বল
তারে? এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী
তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু
সহ্য কি করিত দেবী? মহত্ত্ব কি তবে
ফেলিত নিষ্ফল রক্ত হৃদয় বিদারি
মূঢ় পাষাণের পদে! দেবী বল তারে?
পুণ্য রক্ত পান করে' সে মহা রাক্ষসী
ফেটে মরে গেছে!"

দেবী নাই, দেবী নাই, দেবী কোথাও নাই সেই মন্দিরে! অপর্ণা আসিল সেই মন্দিরে দেবীর মূর্ত্তি ধরিয়া।

"পাষাণ ভাঙিয়া গেল, জননী আমার
এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!
জননী অমৃতময়ী!"

এই ত সংক্ষেপে নাট্য-বস্তুর বিবৃতি। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ঘটনার সংস্থান কোথাও এতটুকু শিথিল হইয়া উঠিতে পারে নাই; একটির পর একটি, প্রত্যেকটি আখ্যান-অংশ এমনি স্থির অথচ সচল গতিতে চলিয়া গিয়াছে যে, আমাদের বোধ ও দৃষ্টি প্রতি পদেই একটি নূতন অনুভূতির আস্বাদন লাভ করিয়া চলে। সমস্ত নাটকটির উপর দিয়া একটা ক্রুদ্ধ বাতাস যেন হু হু করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। রঘুপতির জ্বালাময়ী কথাগুলি যেন তাহার এক একটা ঝাপ্‌টা, সে-বাতাসের গতি থাকিয়া থাকিয়া বাড়িয়া বাড়িয়া চলে, তাহার মুখে জয়সিংহের দ্বিধা সংশয় বার বার উড়িয়া যায়, বার বার অপর্ণা আসিয়া বিদ্যুতের মত তাহার চিত্তকে আলোকিত করে। শুধু গোবিন্দ-মাণিক্য ঝড়ের মুখে বিরাট মহীরুহের মত দাঁড়াইয়া থাকেন। কিন্তু গতি সংহত করিবার শক্তি তাঁহার কোথায়? জয়সিংহ যেখানে বুক পাতিয়া দিয়া ঝড়ের বেগ থামাইল সেইখানে নাটকের গতিবেগও সংহত হইল, তাহার পর ধীরে ধীরে শান্তিও নামিয়া আসিল। এই যে সমগ্র নাটকটির ভিতর এই গতিবেগের সঞ্চার ইহার অন্য কারণও আছে, সে কারণটি নাটকীয় ভাববস্তুর সঙ্গে জড়িত। "বিসর্জন" আমাদের ধর্মের একটা অর্থবিহীন নিষ্ঠুর সংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, আর এই প্রতিবাদ প্রথম দেখা দিয়াছে একটি বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে এবং সেই প্রতিবাদকে ভাষা দিয়াছেন গোবিন্দমাণিক্য। নাটকটির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত প্রথার সঙ্গে এই সংগ্রাম সর্বত্র মুখর হইয়া আছে, জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তাহার বিরাম নাই। এই সংগ্রাম আরও জীবন্ত হইয়াছে ব্রাহ্মণ রঘুপতির চরিত্রে; তাহার জ্বলন্ত বিশ্বাস যেন আগুন হইয়া তাহার কথার মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এই দুই বিরোধী সমস্যাই নাটকের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বকে আগাগোড়া জাগাইয়া রাখিয়া উহাকে স্পন্দিত ও জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। কি মনের, কি বাহিরের, এতখানি দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের আর কোন নাট্যেই এমন জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠে নাই; এই হিসাবে "বিসর্জন" অতুলনীয়। জয়সিংহের মনের মধ্যে যে সংশয়ের নিষ্করুণ দ্বন্দ্ব, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব চরিত্র-বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, খুব কম নাট্যেই তাহার তুলনা আছে। আর, কি জয়সিংহ, কি রঘুপতি, কি কি গোবিন্দমাণিক্য, কি অপর্ণা, ইহাদের মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম তাহা

মনের মধ্যেই শুধু লীলায়িত হয় নাই, বাহিরে কথার ও গতি-ভঙ্গিমার মধ্যেও তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। চিত্তের ও কর্মের দ্বন্দ্বগতির এমন অপূর্ব সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের আর কোনও নাটকেই এতটা সম্ভব হয় নাই। "বিসর্জন" যে অভিনয়-সাফল্য লাভ করিয়াছে, ইহাই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ।

ভাববিকাশের দিক হইতেও "বিসর্জন" প্রতি মুহূর্ত্তে লীলা-চঞ্চলিত। প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্রেই একটা সংশয়ের চঞ্চলতা, একটা সংগ্রামের স্পন্দতা যেন দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে। এই সংশয় ও সংগ্রাম সকলের চেয়ে প্রবল জয়সিংহের চরিত্রে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই এই সংশয় প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে, এবং সে-সংশয়কে জাগাইয়াছে অপর্ণা।

> "আজন্ম পুজিনু তোরে, তবু তোর মায়া
> বুঝিতে পারিনে! করুণায় কাঁদে প্রাণ
> মানবের—দয়া নাই বিশ্বজননীর।"

এই যে সংশয় জাগিল এর নিবৃত্তি আর কোথাও হইল না, হইল শুধু মৃত্যুর মধ্যে। জয়সিংহের জীবনের সমস্তগুলি দিন তাহার শুধু নিষ্করুণ দ্বিধা সংশয়ের মধ্যে কাটিল, চিত্ত শতধা দীর্ণ হইল, প্রেমের মধ্যে শান্তির মধ্যে প্রতি মুহূর্তে আশ্রয় খুঁজিয়া খুঁজিয়া বারবার তাহাকে গুরুর আদেশে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। অপর্ণা তাহাকে প্রতিদিন মুক্ত জীবনের প্রেম ও শান্তির মধ্যে টানিতে চাহিল, আর প্রতিদিন সে তাহাকে বিমুখ করিয়া ফিরাইয়া দিল, সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহাকে ভালবাসিতে চাহিয়াও তাহার প্রকাশ চিরদিন তাহার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া কাঁদিয়া মরিল; গুরুর ইচ্ছার পদতলে, তুচ্ছ আচার ও সংস্কারের যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিতে হইল; এমন সংশয়-নিপীড়িত আপাত-ব্যর্থ জীবন কাহার! এমন করিয়া নিজে মৃত্যুকে বরণ করিয়া পরকে জীবনের সন্ধান দিয়া যায় কে? অথচ নিজের জীবনের সংশয় শেষ পর্যন্ত তাহার ঘুচিল না। শেষ পর্যন্ত একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যেই তাহাকে জীবন বিসর্জন করিতে হইল! মন্দিরের দেবী কি সত্য, না অন্তরের বিশ্বাস সত্য; গুরুর আদেশ কি বড়, না প্রেমের আহ্বান বড়; সংস্কার বড়, না হৃদয় বড়? অপর্ণা তাহাকে শিখাইয়াছে, অন্তরের বিশ্বাসই সত্য, প্রেমের আহ্বানই বড়, হৃদয়ের নির্দেশই অমোঘ; কিন্তু পিছন হইতে টানিয়াছে মন্দিরের দেবী, আজন্মের সংস্কার, গুরুর আদেশ, এবং শেষ পর্যন্ত ইহাদেরই নিষ্করুণ

বিধানের নীচে তাহাকে আত্মবিসর্জন করিতে হইয়াছে। এমন শূন্যতার মধ্যে এমন একটা জীবনের বিসর্জন, ইহাই সমগ্র নাটকটিকে একটি বিরাট শূন্য ব্যর্থতায় একটি নিষ্করুণ বেদনার ভারে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

"দেবি, আছ, আছ তুমি! দেবি, থাক তুমি!
এ অসীম রজনীর সর্ব্ব প্রান্ত শেষে
যদি থাক কণামাত্র হ'য়ে, সেথা হ'তে
ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বল মোরে,
'বৎস আছি'! নাই! নাই, দেবী নাই!
নাই? দয়া করে থাক, অয়ি মিথ্যাময়ি
মিথ্যা, দয়া কর, দয়া কর, জয়সিংহে,
সত্য হ'য়ে উঠ্। আশৈশব ভক্তি মোর
আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?
এত মিথ্যা তুই?"

এই যে আক্ষেপ, এ আক্ষেপের কোনও সান্ত্বনা আছে, না ইহার বেদনার কোনও সীমা আছে? কিন্তু, সত্যই কি তাহার জীবন ব্যর্থ, সত্যই কি তাহার আত্মদান মানুষকে কোনও মহত্তর সত্যের দিকে ইঙ্গিত করিয়া যায় নাই? এত বড় বিসর্জন কি মানুষের অন্ধকার চিত্তপুরীর একটি কক্ষও আলোকিত করে নাই?

করিয়াছে, রঘুপতিকে সে জীবনের সন্ধান দিয়া গিয়াছে; মানুষের একটা অন্ধ আচার ও সংস্কারকে চূর্ণ করিয়া তাহাকে সত্যের জ্যোতির্ময় আলোক-রেখার দিকে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছে। রঘুপতি নিষ্করুণ, কিন্তু রঘুপতি ক্রূর, কুটিল নহে; তাহার বিশ্বাস ভুল হইতে পারে, কিন্তু সে নিজকে বঞ্চনা করে নাই, সত্যই সে বিশ্বাস করে দেবী চাহেন বলি, জীবরক্ত ছাড়া তাঁহার তৃষ্ণা মিটে না। ইহাই তাহার আজন্মের সংস্কার, এই সংস্কারের জালের মধ্যে নিজেকে বন্দী রাখিয়াই সে তাহার সার্থকতা লাভ করিতে চাহিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যের গর্ব তার প্রদীপ্ত, তাহার অপমান, তাহার ক্ষমতার হ্রাস তিলমাত্রও সে সহিবে না; নিজের ও দেশের চিরাচরিত আচার ও সংস্কারকে কিছুতেই সে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না, যত কঠোর হোক রাজার আদেশ। তাহার বিরুদ্ধে যে উপায়, যে চক্রান্তই তাহাকে অবলম্বন করিতে হয়, সে তাহা করিবেই, কর্তব্যবিচ্যুতি সে কিছুতেই ঘটিতে দিবে না।

"আমি আছি যেথা, সেথা এলে'
রাজদণ্ড খসে' যায় রাজহস্ত হ'তে
মুকুট ধুলায় প'ড়ে লুটে।"

এমন প্রচণ্ড তাহার গর্ব! এই গর্বই তাহাকে রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবার যুক্তি দেয়, এই গর্বই জয়সিংহকে বার বার বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়া রাজরক্ত আনিতে পাঠায়। এই গর্বই তাহার মানব-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ প্রীতি দয়া মায়া ভালবাসাকে উৎখাত করিয়া দিয়া সমস্ত জীবনটাকে শুধু একটা ধূ ধূ-করা ভয়াল তৃষ্ণার্ত মরুভূমি করিয়া তোলে। পাপ কি, পুণ্য কি সে তাহা ভালই জানে, সত্য কি, মিথ্যা কি তাহাও তাহার অজ্ঞাত নয়, কিন্তু আত্মাভিমানের কাছে, নিজের গর্বের কাছে সব খর্ব হইয়া যায়, সত্য মিথ্যা হইয়া যায়, মিথ্যা সত্যের মুখোস পরিয়া উপস্থিত হয়, পাপপুণ্যের ভেদাভেদ চলিয়া যায়, শুধু জাগিয়া থাকে প্রচণ্ড প্রদীপ্ত নিষ্করুণ অহং। কিন্তু দ্বন্দ্ব কি তাহার চিত্তেও নাই? আছে, এই নিষ্করুণ হৃদয়ের এক কোণে একটু স্নেহের উৎস আছে। জয়সিংহকে সত্যই রঘুপতি ভালবাসে, তাহাকে হারাইবার চিন্তাও সে সহিতে পারে না, অপর্ণা তাহার প্রেমে জয়সিংহকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে, ইহা তাহার অসহ্য।

সত্য করে বলি বৎস তবে। তোরে আমি
ভালবাসি প্রাণের অধিক—পালিয়াছি
শিশুকাল হ'তে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে, তোরে আমি নারিব হারাতে।"

অন্যত্র

"বৎস তোল মুখ, কথা কও একবার
প্রাণপ্রিয় প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই!"

ইহা রঘুপতির ছলনা নয়। সত্যই রঘুপতি জয়সিংহকে ভালবাসে। কিন্তু সে ভালবাসাও যে আত্মাভিমানেরই তৃপ্তি! কিন্তু এই যে আত্মাভিমান, এই যে প্রচণ্ড গর্ব, ইহাকে চূর্ণ করিয়া ধূলায় লুটাইতে না পারিলে যে রঘুপতির মুক্তি নাই, জীবনের রহস্য, ধর্মের রহস্য যে সে জানিল না। এ অভিমান চূর্ণ করিল তাহারই স্নেহের পুত্তলি জয়সিংহ, তাহারই নিষ্ঠুর গর্বিত অন্ধ উন্মত্ত

খেয়ালের চরণে নিজকে বিসর্জন দিয়া, আর জীবনের রহস্য, ধর্মের রহস্য জানাইল অপর্ণা তাহার বালিকা-হৃদয়ের সহজ দ্বিধাবিহীন প্রেম ও বিশ্বাসের মধ্যে তাহাকে আশ্রয় দান করিয়া। কিন্তু রঘুপতির চরিত্রের শেষ পরিণতি যেন একটু অকস্মাৎ ঘটিয়াছে, এবং তাহার পূর্বাপর দৃপ্ত অনম্য চরিত্রের সঙ্গতিকে যেন একটু ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পর রঘুপতির আর পরিচয় যদি আমরা না পাইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় এই অসঙ্গতিটুকু আমাদের চোখে পড়িত না। যেখানে আছে, 'বৎস মোর গুরুবৎসল! ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর কিছু নাই চাই; অহঙ্কার অভিমান দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক্। তুই আয়!' সেইখানেই যদি রঘুপতির পরিচয়ের সমাপ্তি ঘটিত তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিতাম, তাহার জীবনের কৃষ্ণ অমাবস্যা-রাত্রির অবসান হইয়াছে, শান্ত ঊষার অরুণোদয়ের আর বাকী নাই। নাটকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু পঞ্চমাঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে তাহার যে পরিচয় আমরা পাই তাহাতে মনে হয়, যেন সমগ্র জীবনের একান্ত পরাজয়ের মধ্যে তাহার চরিত্রের তেজোদৃপ্ত গর্বটুকু একেবারে ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে, মনে হয় যেন নিজের কাছেই নিজে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। অথচ এই দুর্বলতা তাহার চরিত্রের নিজস্ব বস্তু নহে।॥ কিন্তু এই বিশ্লেষণ সত্য কিনা তাহা আমি নিজেই পরে একটু বিচার করিয়া দেখিয়া লইব।

।গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র এত শান্ত ও স্তব্ধ, এত স্থির ও অচঞ্চল লীলার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে সহসা তাহা আমাদের অনুভূতিকে স্পন্দিত করে না—জয়সিংহ, রঘুপতি ও অপর্ণাই আমাদের সমস্ত বোধ ও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া রাখে। তাহার কারণও আছে। গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র মহৎ, কিন্তু বিকাশের দিক হইতে তাহা সুন্দর নহে, তাহার মধ্যে কোন দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, সংশয় নাই; প্রতি মুহূর্তের অনুভবের নূতনত্বের মধ্যে যে রসের লীলা, মনের মধ্যে সংশয়ের যে দোলা, গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে তাহা নাই। ঘটনা-সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সে আপনাকে বিকশিত করিয়া চলে না, কাজেই তাঁহার চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ নাই।॥

।অপর্ণার চরিত্রের মধ্যেও যে এই সৃষ্টির আনন্দ খুব আছে তাহা নয়, সে চরিত্রের মধ্যেও খুব কিছু দ্বন্দ্বের লীলা নাই, সংশয়ের খুব দোলা নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও অপর্ণার চরিত্রের মধ্যে রসের একটা লীলা আপন মাধুর্যে

আপনি স্পন্দিত হইয়া আছে ; সে লীলা, সে রহস্য সকল অবস্থাতেই সুন্দর। অথচ তাহার জীবনের কোনও বিকাশ নাই, ধীরে ধীরে সে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে না। অপর্ণাকে প্রথম আমরা যখন দেখি, তখন সে শুধু একটি সরল বালিকা মূর্তি ধরিয়াই আমাদের সম্মুখে দাঁড়ায়, পরে অবশ্য ধীরে ধীরে তাহার মধ্যে জয়সিংহের প্রতি একটা স্নেহ ও প্রেমাকর্ষণের ভাব ফুটিয়া উঠে এবং সর্বশেষে জয়সিংহের বিসর্জন-দৃশ্যে তাহা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু অপর্ণার চরিত্রের ধীরে ধীরে এই যে পরিবর্তন, এ যেন জীবনের কোনও বিকাশ নয়, যেন তাহার সরলা বালিকামূর্তিরই আর একটা দিক মাত্র সরল দ্বিধাবিহীন একটি প্রেমানুভূতির ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে, যেন সে যাহা ছিল শেষ পর্যন্ত তাহাই রহিয়া গেল। মনে হয় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম, তাহার দলগুলি একটি একটি করিয়া বিকশিত হয় নাই,একটি একটি করিয়া ঝরিয়া পড়ে নাই। অপর্ণা বিচলিত করে, নিজে বিচলিত হয় না, হইলেও পরক্ষণেই নিজের সম্বিৎ নিজেই ফিরিয়া পায়। না পাইবেই বা কেন—সে যে একটি শাশ্বত সত্য, যাহার গন্ধ মধুর, যাহার স্পর্শ কোমল, যাহার রূপ সুন্দর, যাহার কোনও জন্ম নাই, বিকৃতি নাই, মৃত্যু নাই ; একটি অবিকৃত সহজ সরল সত্যের সে রহস্যমূর্তি বালিকার রূপ ধরিয়া স্নেহের ও প্রেমের শান্তস্নিগ্ধ রাজ্যের মধ্যে জয়সিংহকে, সকল সংশয়াকুল মানুষকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া আনিতে চাহিতেছে। অপর্ণা একটি আইডিয়ার রসমূর্তি, কোনও জীবনের বিকাশ নয়, রক্তমাংসের একটি মানবকন্যার রূপ তাহার মধ্যে কোথায় ফুটিয়া উঠে নাই। যদি একটি জীবনই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বিচিত্র বিকাশ কোথায়, তাহার উদয় কোথায়, অস্ত কোথায়, তাহার দুঃখের বেদনা কোথায়, সুখের অনুভূতি কোথায়, চিত্তের বিকার কোথায়, অন্তরের চঞ্চলতা কোথায়? সে যে জয়সিংহকে ভালবাসে, তাহার সংশয় ও বেদনায় বিচলিত হয়, সেখানে শুধু সে সত্যের প্রকাশকেই আরও জীবন্ত, আরও রহস্যময় করিয়া তোলে, সত্য যে কোনও জড় নিশ্চল পদার্থ নয় সে যে জীবন্ত ও নিত্য স্পন্দমান্ এই কথাই সপ্রমাণ করে। রঘুপতিও কোনও সত্যের প্রতিমূর্তি নয়, সে একটা জীবন যাহা নানান্ ঘটনার ভিতর দিয়া আবর্তিত ও বিকশিত হইতেছে। জয়সিংহও কোন বিশিষ্ট সত্যকে রূপায়িত করে না, সে নিজের জীবনকেই নানান্ সংশয়ের

ভিতর দিয়া পরিণতির দিকে লইয়া চলে। কিন্তু অপর্ণার চরিত্র ঠিক তাহার বিপরীত। সে তাহার নিজের জীবনকে বিকশিত করে না, কোন পরিণতির দিকে চালনা করে না, একটি 'আইডিয়া'কেই উদ্‌ঘাটিত করিতে সাহায্য করে, সে সত্যেরই অস্পষ্ট মূর্তি গ্রহণ করিয়া দাঁড়ায়, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া নাটকের সত্যটি ফুটিয়া উঠে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি পঞ্চমাঙ্কে প্রথম দৃশ্যের পর রঘুপতি-চরিত্রের আর কোন পরিচয় যদি আমরা না পাইতাম তাহা হইলে হয়ত ভাল হইত। একথা বলিবার পক্ষে কি যুক্তি আছে তাহা ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে প্রথমেই মনে হয়, তাহা হইলে রঘুপতির চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা পাইত এবং আমাদের কাছে রঘুপতি অনন্তকালের জন্য বাঁচিয়া থাকিতে পারিত। জয়সিংহ যেখানে একটি নিষ্ঠুর বিধানের নীচে আত্মদান করিল, যেখানে এক মুহূর্তে স্নেহের গোপন কোনটিতে প্রচণ্ড বেদনার আঘাত লাগিয়া রঘুপতির চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, যেখানে একান্ত প্রিয় জয়সিংহকে হারাইয়া অপর্ণাও কিছুতেই নিজেকে অবিচলিত রাখিতে পারিল না, সেইখানেই যদি নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিত, তাহা হইলে অভিনয় হিসাবে 'বিসর্জনে'র রসমাধুর্য্য আরও নিবিড় হইতে পারিত। শুধু ঘটনা-বস্তুর বিকাশের দিক হইতে দেখিতে গেলেও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এর পর রঘুপতি অথবা অপর্ণা, গোবিন্দমাণিক্য অথবা গুণবতী কাহার কি হইল, ঘটনার স্রোত কোন্ পথে চলিল, যে সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য গোবিন্দমাণিক্য যুঝিয়াছিলেন, সে-সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল কিনা, যে-সংশয়ের জন্য জয়সিংহ প্রাণ দিল সে-সংশয় ঘুচিল কি না, এসব জানিবার ঔৎসুক্য পাঠক অথবা দর্শকের থাকে না, জয়সিংহের বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনা-বস্তুর প্রতি তাহার মনোযোগ ও আকর্ষণ শিথিল হইয়া যায়। অপর্ণার চরিত্র যে একটা 'আইডিয়া'র রূপক হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার জন্য এই উপসংহার দৃশ্যটি কতকটা দায়ী। যেখানে জয়সিংহের মৃত রুধিরাক্ত দেহ দেখিয়া প্রতিমার চরণে আছড়াইয়া পড়িয়া অপর্ণা চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ফিরে দে! ফিরে দে! ফিরে দে!' সেইখানেই যদি অপর্ণা-চরিত্রেরও পরিচয় শেষ হইত, তাহা হইলে অপর্ণার মধ্যে আমরা স্পন্দমান মানবচিত্তের, সর্বোপরি তাহার নারী-হৃদয়ের সত্যরূপটা দেখিতে পাইতাম, এবং সেইরূপেই সে আমাদের

চিত্তের রসবোধকে বেশী তৃপ্ত করিত এবং তাহার ঐ পরিচয়ই আমাদের মনের উপর চিরকালের জন্ম দাগ কাটিয়া যাইত। কিন্তু শেষ দৃশ্যে সে আসিয়া যখন দাঁড়াইল তখন তাহার মধ্যে সেই মানব-হৃদয়ের বাস্তবরূপটি আর নাই, তখন সে এত শান্ত, এত স্থির যেন তাহার উপর দিয়া কোনও ঝড়ই বহিয়া যায় নাই, যেন তাহার চিত্তের কোন বিকারই কোন কালে হয় নাই, সে যাহা ছিল তাহাই যেন সে রহিয়া গেল। তাহার মুখের কথা কয়টিও খুব লক্ষ্য করিবার; বার দুই তিন সে শুধু বলিল, 'পিতা, চলে এস! পিতা, এস এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা', যেন এই কথা কয়টি'র ভিতর দিয়া এই মর্মটিই ব্যক্ত হইল যে, সে যে-সত্যের রহস্তমূর্তি সেই সত্যটাকেই শেষ পর্যন্ত সে জয়ী করিয়া লইল, কিছুই তাহাকে বিকৃত ও বিচলিত করিতে পারিল না, সেই সত্যের আহ্বানই রঘুপতিকে দেবীহীন মন্দির হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল। যেন বালিকা অপর্ণা কেহই নয়, যেন সত্যের রহস্তমূর্তি অপর্ণাই সব। ইহার ফলে আর একটা জিনিসও একটু বড় হইয়া উঠিয়াছে। একথা সকলেই জানেন যে 'বিসর্জনে'র মধ্যে একটা 'আইডিয়া' খুব নিবিড় হইয়া আছে, সমস্ত নাটকটিতে সেই 'আইডিয়া'টিরই সংগ্রাম। পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি নাটকটির উপর যবনিকাপাত হইত, তাহা হইলে সংগ্রামের শেষে সেই 'আইডিয়া'টাই জয়ী হইল কিনা সে খবর আমরা পাইতাম না। কিন্তু শেষ দৃশ্য-গুলিতে দেখিলাম, সেই 'আইডিয়া'টারই সম্পূর্ণ বিজয়োৎসব। একটা নির্দিষ্ট সত্যপ্রতিষ্ঠার, একটা নির্দিষ্ট 'আইডিয়া'র জয়-প্রদর্শনের এই যে প্রয়াস, ইহা 'বিসর্জনে'র রসবোধ ও অনুভূতির তীব্রতাকে একটু ক্ষুণ্ণ না করিয়া পারে নাই; এবং সেই নির্দিষ্ট সত্যটাই যে কবির মনকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল তাহাও কতকটা ধরা না পড়িয়া পারে নাই।

কিন্তু, এই ধরণের বিচারের বিরুদ্ধে কিছু যুক্তিও আছে। প্রথমেই কথা হইতেছে, পঞ্চমাঙ্কের, প্রথম দৃশ্যের অর্থাৎ জয়সিংহের বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে রঘুপতির চরিত্রের পরিচয় শেষ হইতে পারে কি? তাহা হইলে রঘুপতি চরিত্রের চরম পরিণতিটুকু বুঝিতে পারা যায় কি? তাহার ব্রাহ্মণ্যের দৃপ্তগর্ব হঠাৎ বাধা পাইয়া যে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় নিজেকে একেবারে অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই দৃপ্তগর্ব মাটির ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া চরম ব্যর্থতায় আত্মপ্রকাশ না করিলে রঘুপতির সবটুকু পরিচয় যেন কিছুতেই সম্পূর্ণ হয় না, এবং তাহার

সঙ্গে সঙ্গে নাটকটি যে-পথে যাত্রা স্থুরু করিয়াছিল তাহাও একটা যুক্তিসহ পরিণতিতে আসিয়া পৌঁছায় না। রঘুপতির দৃপ্ত গর্বিত চরিত্র যে প্রচণ্ড বেদনার আঘাতে একেবারে সকল দর্প গর্ব হারাইয়া সকল অহঙ্কার অভিমান জলাঞ্জলি দিয়া একান্ত দুর্বল অসহায়তার মধ্যে আপন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিল, এবং ধর্মের রহস্যকে জানিয়াছিল, তাহার আগেকার চরিত্রের ছায়াটুকুও যে থাকে নাই, ইহা হয়ত কিছু অস্বাভাবিক নয়। এই ধরণের জীবনে যেন এইরকম পরিণতিই দেখা গিয়া থাকে। একটা অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া যখন কাহারও সমস্ত কর্ম ও চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই অহঙ্কারের মধ্যেই সে যখন একেবারে ডুবিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই সমস্ত রস ও পানীয় সংগ্রহ করে, বেদনার আঘাত লাগিয়া যখন সেই অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহার আর আশ্রয় কিছু থাকে না, তাহার রস ও পানীয়ের উৎস শুকাইয়া যায়, এবং সেই অবস্থায় সে একান্ত নিঃস্ব ও অসহায় দুর্বলতার মধ্যে নিজের স্বরূপটিকে জানিতে পারে। মানুষের চিত্তধর্মের ইহাই স্বাভাবিক গতি। কিন্তু রঘুপতির চরিত্র যে জয়সিংহের বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইতে পারে না, ইহাই হয়ত তাহার একমাত্র কারণ নহে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জয়সিংহের চরিত্রই বুঝি সকলের অপেক্ষা করুণ-রসাত্মক এবং তাঁহার বিসর্জন দৃশ্যের মধ্যেই বুঝি নাটকের সমস্ত ট্র্যাজেডিটুকু নিহিত রহিয়াছে। সেইজন্যই তাহার বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে রঘুপতি-চরিত্রের অবসান ঘটিলেই নাটকের ট্র্যাজেডিটুকু ভাল করিয়া ফুটিতে পারিত, এই ধারণা জন্মায়; জয়সিংহের আত্মদানের ট্র্যাজেডি খুব দৃশ্যময়, সেই হেতু আপাতদৃষ্টিতে এরূপ মনে হওয়া খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে, নাটকের ট্র্যাজেডিটুকু জয়সিংহ-চরিত্রের মধ্যে ততটা নয়, যতটা রঘুপতির চরিত্রের মধ্যে; বস্তুতঃ জয়সিংহ-চরিত্র অপেক্ষাও গভীরতর ট্র্যাজেডি নিহিত রহিয়াছে রঘুপতি-চরিত্রে এবং সেই ট্র্যাজেডির বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে জয়সিংহের আত্মদানের পরমুহূর্ত হইতে। সে-মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্তও রঘুপতির একটা ঐশ্বর্য ছিল, একটা প্রচণ্ড সুবৃহৎ গর্ব ছিল, তাহা তাহার বুদ্ধির অহঙ্কার, যুক্তির অহঙ্কার, বিশ্বাসের অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার; এই অহঙ্কারই তাহার সমস্ত সত্তাটাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু জয়সিংহ যে মুহূর্তে তাহার অহঙ্কারের নিষ্ঠুর বেদীমূলে আত্মবিসর্জন করিল, সেই মুহূর্তেই তাহার

সকল অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত ঐশ্বর্য তাহার খসিয়া পড়িল, একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যে সে 'গৃহচ্যুত হতজ্যোতি' তারকার মতন কোথায় যে গিয়া পড়িল তাহার ঠিকানা নাই। রঘুপতির এই যে একান্ত রিক্ততা, ইহাই নাটকের করুণতম ও চরমতম ট্র্যাজেডি; এই ট্র্যাজেডিটুকুর বিকাশ না হইলে রঘুপতি-চরিত্রের শেষ পরিচয় কিছুতেই আমরা পাই না।

শুধু এই রঘুপতি-চরিত্রের জন্যই পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পর সমস্ত নাটকটির উপর যবনিকাপাত আমরা কল্পনাও করিতে পারিলেও সাহিত্য-সৃষ্টির দিক্ হইতে হয়ত তাহা সার্থক হইত না। একথা ভুলিলে চলিবে না যে "বিসর্জন" শুধু নাট্য নহে, শুধু অভিনয়ই উদ্দেশ্য নহে, তাহা কাব্য-নাট্য, তাহার একটা কাব্যের দিক্, সাহিত্যের দিক্, আছে। আর শুধু নাটকের দিক হইতে দেখিলেও জয়সিংহের বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকাপাত হইলে নাটকের কলাকৌশল একটু ক্ষুন্ন হইত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, তাহা হইলে একটা বেদনাময় অস্থিরতার মধ্যে নাটকটির সমাপ্তি ঘটিত, নাটকীয় কলাকৌশলের দিক হইতে তাহা হয়ত খুব ভাল হইত না, রবীন্দ্রনাথও হয়ত তাহা চাহেন নাই, এবং চাহেন নাই বলিয়াই আখ্যান-বস্তুটিকে একেবারে শেষ যুক্তিসহ পরিণতি পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া একটা স্থির অবিচল শান্তির মধ্যে সমস্ত নাটকটির উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন, পাঠক অথবা দর্শককে কোনও অস্থির চঞ্চল করুণ ব্যথাভারগ্রস্ত ভাবনার মধ্যে আন্দোলিত হইবার সুযোগ দেন নাই। বলা যাইতে পারে এই হিসাবে তিনি প্রাচীন গ্রীক নাটকের অথবা মধ্যযুগের শেক্সপীরীয় নাটকের পদ্ধতিকেই অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বলিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না, বরং আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য-রীতিই তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ "শকুন্তলা"র উল্লেখই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হইবে। "শকুন্তলা"র তৃতীয় অঙ্কের যে দৃশ্যে বিস্মৃতি হেতু দুষ্মন্ত কর্তৃক শাপগ্রস্ত শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান, সেই দৃশ্যটিই সর্বাপেক্ষা চঞ্চল ও বেদনামুখর, সেইখানে কালিদাস নাটকটির উপর যবনিকাপাত করেন নাই, সমস্ত আখ্যানটিকে আরও ঘটনা-পরম্পরার ভিতর দিয়া শেষ পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং একটি পরিপূর্ণ শান্তি ও মিলনের মধ্যে উহাকে সমাপ্তি দান করিয়াছেন। তাহার ফলে "শকুন্তলা" রস হিসাবে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রত্যেকটি চরিত্র পরিপূর্ণ-

ভাবে বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে, এবং সেইজন্যই "শকুন্তলা" নাট্যজগতের মধ্যে খুব শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমার খুব বিশ্বাস, "বিসর্জন" রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ "শকুন্তলার" নাট্য-বিন্যাসের কথা না ভাবিয়া পারেন নাই। দুষ্মন্তের রাজসভায় শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে কিংবা তাহার কিছু পরে নাটকটির উপর যবনিকাপাত আমরা কল্পনাও করিতে পারিনা, তাহা করিতে গেলে সমস্ত নাটকের ঘটনা-বস্তু ও নাট্য-বিন্যাস একেবারে আমূল পরিবর্তন করিতে হয়। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যের এবং তাহার পর সমগ্র নাটকের পরিণতির রহস্য-চাবিটি রহিয়া গিয়াছে ঐ দুর্বাসার অভিশাপটুকুর মধ্যে। সেই অভিশাপ না কাটিলে, দুষ্মন্তের বিস্মৃতির কালরাত্রি অতীত হইয়া শকুন্তলার সঙ্গে পুনর্মিলন না ঘটিলে নাটকের সমাপ্তি ত আমরা কিছুতেই কল্পনাও করিতে পারি না। "বিসর্জনে" তেমন কিছু কেন্দ্র-বস্তু নাই বটে, কিন্তু তাহারও রহস্যটি রহিয়াছে ঐ রঘুপতি-চরিত্রের চরম পরিণতিটুকুর মধ্যে; সেই পরিণতিটুকু বিকশিত হইয়া না উঠিলে "বিসর্জন" নাটকের সমাপ্তি কল্পনা করা একটু কঠিন।

"বিসর্জন"কে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, দুই বৎসর পরে রচিত 'মালিনী' নাটিকাখানির একটু শরণ লইতে হয়। "মালিনী"র ঘটনাস্রোতের মধ্যে কোনও জটিলতা নাই, কোনও আবর্ত নাই। তাহা ছাড়া "বিসর্জনে"র মধ্যে নাটকীয়দ্বন্দ্ব যতটা নিবিড়, এবং সে-দ্বন্দ্ব যতটা বহুক্ষণস্থায়ী ও বহুবিস্তৃত, "মালিনী"তে তাহা ততটা নিবিড় মোটেই নহে, এবং সেই হেতু স্বল্পকালস্থায়ী ও স্বল্পবিস্তৃত। অথচ কি চরিত্র-সৃষ্টিতে, কি আদর্শ-বস্তুতে এ দু'টি নাটকের সাদৃশ্য কত বেশী! দু'টি নাটকেই চিরাচরিত সনাতন প্রথা ও ধর্মের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া নাট্যবস্তুকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। "বিসর্জনে" দেখি পুঁথিগত আচারগত ধর্মের বিরুদ্ধে মানবধর্ম বিশ্বধর্মের প্রতীক একটি ধর্মকে দাঁড় করাইয়া দু'য়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং মানবধর্মকে শেষ পর্য্যন্ত জয়ী করা হইয়াছে। "মালিনী"তে দেখি সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে মানবধর্ম বিশ্বধর্মের প্রতীক একটি ধর্মকে দাঁড় করাইয়া দু'য়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে। দুই পক্ষের সাজসজ্জা ও যুক্তি-কৌশলও দুইটি নাটকেই একরকম, শুধু প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গিমা ভিন্ন। শুধুই কি তাই; দুইটি নাটকের প্রধান চরিত্রগুলিও যেন

একটির ছাঁচে আর একটি ঢালা। "বিসর্জনে"র রঘুপতি আর "মালিনী"র ক্ষেমঙ্কর, "বিসর্জনে"র জয়সিংহ আর "মালিনী"র সুপ্রিয় প্রায় একই; ইহাদের ভাব ও গতি, ভাষা ও প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য খুব কম।

রঘুপতির মধ্যে দেখিয়াছি সনাতন ধর্ম ও আচারের প্রতি তাহার অবিচল নিষ্ঠা, একটি প্রচণ্ড আত্মাভিমানের দীপ্তি, একটি প্রদীপ্ত প্রতিভার সুতীক্ষ্ণ যুক্তি-কৌশল যাহার সম্মুখে বার বার জয়সিংহের চিত্ত সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া মাথা নত করে। ক্ষেমঙ্করের মধ্যে নিষ্ঠার সে দ্যুতি নাই, প্রতিভার সে দীপ্তি নাই, যুক্তির সে তীক্ষ্ণতা নাই, একথা সত্য; কিন্তু সব কিছুরই প্রকার এক, দুইটি চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য শুধু তীব্রতার। রঘুপতির মতন ক্ষেমঙ্করের মুখেও যুক্তি যেন ছুরির ফলার মতন ঝলসিয়া উঠে; সুপ্রিয় তাহার প্রতিবাদ করিবার পথ ও শক্তি খুঁজিয়া পায় না। বস্তুতঃ, কি রঘুপতি কি ক্ষেমঙ্কর, ইহারা যুক্তিতে কখনও কাহারও কাছে হার মানে না, হার মানে শুধু সেইখানে যেখানে মনের মধ্যে কোথাও কোনও স্নেহের অথবা কোনও সূক্ষ্মতর অনুভূতির একটুখানি লীলা আত্মগোপন করিয়া আছে। বুদ্ধির মধ্যে জীবনের চরমতম সত্যের সন্ধানকে তাহারা জানে না, জানিতে পায় একটা পরম আঘাতের ভিতর দিয়া হৃদয়ের বেদনাময় অনুভূতির মধ্যে। সেই সত্যের সন্ধানও ক্ষেমঙ্কর শেষ পর্যন্ত পাইয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু একথা সত্য যে, সুপ্রিয়কে বার বারই তাঁহার যুক্তির ও আবেদনের কাছে মাথা নোয়াইতে হইয়াছে; হইয়াছে বলিয়াই ক্ষেমঙ্করের চরিত্র ফুটিবারও অবসর পাইয়াছে। ক্ষেমঙ্করও রঘুপতির মতন নিষ্করুণ, সেও নিজকে বঞ্চিত করে না; জয়সিংহের জন্য রঘুপতির মনে যে স্নেহের একটি নিভৃত-কুঞ্জ রচিত হইয়াছিল, সুপ্রিয়র জন্যও তেমনই ক্ষেমঙ্করের বুকে স্নেহের একটি নীরব উৎস সঞ্চিত হইয়া আছে; এবং এই দুই ক্ষেত্রেই এই স্নেহ ও ভালবাসা তাহাদের আত্মাভিমানেরই নামান্তর মাত্র!

কিন্তু একটি বিষয়ে রঘুপতি-চরিত্রের সঙ্গে ক্ষেমঙ্কর-চরিত্রের খুব মস্ত একটা অমিল আছে, এবং আমার মনে হয়, এই হিসাবে ক্ষেমঙ্করের চরিত্র-সৃষ্টিতে নাট্যকৌশলের অভিব্যক্তি বেশী। রঘুপতির চরিত্রে আমি পূর্বাপর একটু অসঙ্গতির উল্লেখ করিয়াছি। "বিসর্জনের" শেষ দৃশ্যে সমগ্র জীবনের একান্ত

পরাজয়ের মধ্যে তাহার চরিত্রের তেজোদৃপ্ত গর্বটুকু একেবারে ধুলায় মিশিয়া গিয়াছে, মনে হয় সে যেন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ক্ষেমঙ্কর-চরিত্রে এ অসঙ্গতি কোথাও নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার অহঙ্কারের দীপ্তি অটুট, অক্ষুণ্ণ, অকম্পিত, প্রোজ্জ্বল দীপশিখার মত। রঘুপতি কারাদণ্ডের কথা শুনিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, 'গেছে গর্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব!' কিন্তু ক্ষেমঙ্কর মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনিয়া একটি মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হন নাই। রাজা প্রশ্ন করিলেন, যদি প্রাণদান করি, যদি ক্ষমা করি তাহা হইলে কি করিবে? অবিচল কণ্ঠে তাহার দীপ্ত ভাষণ উচ্চারিত হইল, "পুনর্বার, তুলিয়া লইতে হ'বে কর্তব্যের ভার; যে পথে চলিতেছিনু আবার সে পথে যেতে হ'বে—" যে পথকে সে সত্য বলিয়া জানিয়াছে সে পথ সে ছাড়িবে না। এবং তাহা ছাড়িয়া তাহারই প্রিয়তম সুহৃদ সুপ্রিয় অন্যপথে চলিবে তাহাও সহিবে না। কাজেই মরিতে যদি হয়, একসঙ্গেই মরিব। রঘুপতির সম্মুখে যেমন করিয়া জয়সিংহ প্রাণ বিসর্জন দিয়া মরিয়াছিল, সুপ্রিয়র মরণ সে মরণ নয়। সুপ্রিয়র মরণ ঘটাইলেন ক্ষেমঙ্কর নিজে এবং ঘটাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন না—মৃতদেহের উপর পড়িয়া নিজেই বলিলেন, 'এইবার ডাক ঘাতকেরে।' এই তাঁহার শেষ কথা; এবং এই শেষ কথা তিনটিতেও তাঁহার চরিত্রের আজন্ম দীপ্তি ও গর্বটুকু যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সমস্ত চরিত্রটির মধ্যে সৃষ্টি হিসাবে এতটুকু কোথাও ত্রুটি নাই, এতটুকু অসঙ্গতি নাই। রঘুপতি নিজেই নিজেকে মুছিয়া ফেলে, ক্ষেমঙ্কর এমনভাবে দাগ কাটিয়া যায় যাহা মুছিবার নয়। বিশেষতঃ শেষদিকে ক্ষেমঙ্করের শৃঙ্খলিত হইয়া রাজসভায় প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া একবারে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় সংস্থান হিসাবে, ক্ষেমঙ্কর-চরিত্রের স্ফূরণ হিসাবে, সমস্ত নাটকের বিকাশ হিসাবে "মালিনী" একেবারে অপূর্ব, নিখুঁত; বুকের সমস্তটা নিঃশ্বাস যেন শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে রুদ্ধ অনুভূতির তীব্রতায় স্পন্দিত হইতে থাকে, সর্বশেষ পরিণতিটুকু এমনই নাটকীয়! সেইজন্য মনে হয় অভিনয়ের দিক হইতে "মালিনী" "বিসর্জন" অপেক্ষা সার্থকতর।

"বিসর্জনে" রঘুপতি-চরিত্রের মধ্যেই নাটকটির করুণতম ও চরমতম ট্র্যাজেডিটুকু নিহিত রহিয়াছে, সে-কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাহা হইলেও একথাটা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, জয়সিংহের

বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে রঘুপতি-চরিত্রের প্রতি আমাদের আকর্ষণ অনেকটা কমিয়া যায়, রঘুপতি-চরিত্রের একান্ত রিক্ততার যে ট্র্যাজেডি তাহা আমাদের চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে না। নাটকীয়-সংস্থানও যেন কতকটা শিথিল হইয়া পড়ে। আমার মনে হয় তাহার একটা কারণ আছে। অত্যন্ত করুণ ব্যর্থতার মধ্যে যাহাদের জীবনের অবসান হইয়াছে, এমন দুইটি চরিত্র "বিসর্জনে" পাশাপাশি রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে, একটি জয়সিংহের, একটি রঘুপতির। জয়সিংহের যে ট্র্যাজিক্ পরিণতি, তাহা একটু দৃশ্যময়, কিন্তু রঘুপতির যে পরিণতি, তাহার যে রিক্ততা তাহা দৃশ্যময় ত নয়ই, একেবারে মনের গভীরতর অনুভূতির মধ্যে নিহিত। জয়সিংহের যে পরিণতি তাহা ঘটনার মধ্যে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু রঘুপতির পরিণতি শুধু সুরের মধ্যে ধ্বনিত হয়, অনুভূতির মধ্যে রণিত হয়; একটির পরিণতির মধ্যে রহিয়াছে নাট্টীয় ধর্ম, আর একটির পরিণতির মধ্যে রহিয়াছে গীতধর্ম। সেইজন্যই একটা খুব আন্দোলনের মধ্যে চিত্ত মথিত হইয়া যাইবার পর গানের সুরের মধ্যে মন শান্তি ও বিশ্রাম কামনা করে বটে, কিন্তু নাটকীয় বস্তুর কিংবা নাটকীয় আর কোনও চরিত্রের প্রতি আকর্ষণ আর ততটা থাকে না, কিংবা আর কোনও গভীরতর ট্র্যাজেডির জন্য মনটা আবার নূতন করিয়া নাট্যবস্তুর মধ্যে ঢুকিতে চায় না; ইহার চাইতেও গভীরতর ট্র্যাজেডি যে এখনও রহিয়া গিয়াছে তাহাও ভাবিতে পারে না। তবু যদি সে ট্র্যাজেডির মধ্যে একটা সমান নাট্টীয় ধর্ম থাকিত তাহা হইলে মনটা সহজেই আবার সজাগ হইয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু তাহা এতটা গীতধর্মী যে, রসসৃষ্টি হিসাবে তাহা জয়সিংহ-চরিত্র অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান্ হইলেও, নাট্য-বিন্যাসের দিক্ হইতে সে-চরিত্রের পরিণতি কতকটা শিথিল না হইয়া পারে না।

এই যে গীতধর্মের কথা বলিলাম তাহা অপর্ণার চরিত্রে আরও বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। অপর্ণা একটি গানের সুর; তাহার সমস্ত চরিত্রের মধ্যে যে জিনিসটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা একান্তই গীতধর্মী। "বিসর্জনে"র মতন নাটকেও এই গীতধর্ম সমস্তকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে; শুধু তাহা অপর্ণার চরিত্রে নয়, শুধু তাহা রঘুপতির রিক্ত অবসানের মধ্যে নয়, সমস্ত নাটকটির আইডিয়া-প্রকাশ-ভঙ্গিমার মধ্যেও। আসল কথা হইতেছে রবীন্দ্রনাথের

প্রতিভাই মূলতঃ lyrical—গানের প্রতিভা, কবিতার প্রতিভা, সুরের প্রতিভা। তাঁহার অসংখ্য গান ও কবিতার কথা ছাড়িয়া দিয়া ছোট গল্প ও রূপক নাট্যগুলির দিকে তাকাইলে একথা স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি হইবার কথা নয়। নাটক তিনি অনেক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু একথা বলিতেই হয় তাঁহার প্রতিভা নাটকের প্রতিভা নয়; নাটকের মধ্যে নাট্যীয় ধর্ম তত নাই যত আছে গীতধর্ম, সুরধর্ম।

"মালিনী"র অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে সুপ্রিয়র সঙ্গে জয়সিংহ-চরিত্রের সাদৃশ্যের কথা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু এই সাদৃশ্যের প্রকারই শুধু এক, তীব্রতার পার্থক্য গভীর এবং এই পার্থক্যই শেষ পর্যন্ত রসসৃষ্টি-হিসাবে জয়সিংহকে সুপ্রিয় অপেক্ষা মধুরতর ও নিবিড়তর করিয়াছে। "বিসর্জনে" অপর্ণা জয়সিংহকে যে সত্যের সন্ধান দিয়াছিল, "মালিনী"তে মালিনী সুপ্রিয়কে সেই সত্যের সন্ধান দিয়াছে; কিন্তু জয়সিংহের মধ্যে দ্বন্দ্ব যত প্রবল, সে বারংবার শেষ পর্যন্ত যেমন করিয়া যুঝিয়াছে এবং মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত যেমন করিয়া সংশয়ে আন্দোলিত হইয়াছে, এবং শেষ পর্যন্ত সংশয়ের কোনও মীমাংসা করিতে না পারিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া যেমন করিয়া আত্মাহুতি দিয়াছে, সুপ্রিয়র তাহা হয় নাই। সুপ্রিয় প্রথম দিকে দু'একবার সংশয়ের খুব প্রচণ্ড দোলা অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু সংশয় যে বার বার জাগাইয়াছে, সেই ক্ষেমঙ্করই যখন দেশান্তরে চলিয়া গেল তখন সংশয় আর তাহার রহিল না, মানবধর্মের কাছে, মালিনীর কাছে তখন আত্মনিবেদন করিয়া দিতে বিলম্ব তাহার হইল না এবং পরে ক্ষেমঙ্করের হাতে যখন সে প্রাণটি তুলিয়া দিল, তখন কোনও সংশয় আর তাহার মোটে ছিল না, সে স্থির বিশ্বাস লইয়াই মরিতে পারিয়াছিল এবং তাহার মনের মধ্যে তখন মালিনীর 'সমুজ্জল শান্তি, তাহার প্রীতি, তাহার সুমঙ্গল অম্লান অচল দীপ্তিই বিরাজ' করিতেছিল। এই শান্তি, এই তৃপ্তি, এই অম্লান অচল দীপ্তি লইয়া জয়সিংহ মরিতে পারে নাই, শেষ পর্যন্ত সে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াই মরিয়াছে। এইজন্যই জয়সিংহের চরিত্র পূর্বাপর যেমন জীবন্ত, যেমন স্পন্দমান, সুপ্রিয়র চরিত্র সেই তুলনায় শিথিলতর, মন্থরতর। রসসৃষ্টি হিসাবে সেইজন্য জয়সিংহ-চরিত্র অধিকতর মূল্যবান।

"মালিনী"র আখ্যানবস্তু সরল ও স্বল্প পরিসর। রাজকন্যা মালিনী বৌদ্ধ অর্হৎ কাশ্যপের অনুগ্রহে ভগবান বুদ্ধের সত্যধর্মের আস্বাদন লাভ করিয়াছেন, রাজঅন্তঃপুর আর তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না, আপন পর সকলকে এই সত্যধর্মের আস্বাদন দিবার জন্য তাহার সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুরাগী প্রজার দল এই সত্যধর্মকে চাহে না, বরং ইহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্যই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; এ বিদ্রোহের নেতা ক্ষেমঙ্কর। তাহারা রাজার কাছে চাহিয়াছে রাজকন্যার নির্বাসন। রাজা এবং রাজমহিষী দুজনেই চাহেন কন্যাকে তাহার ধর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নারীধর্মে সংসারধর্মে ফিরাইয়া আনিতে—

> "ধর্ম কি খুঁজিতে হয়?
> সূর্যের মতন ধর্ম চিরজ্যোতির্ময়
> চিরকাল আছে! ধর তুমি সেই ধর্ম,
> সরল সে পথ! লহ ব্রত ক্রিয়া কর্ম
> ভক্তিভরে! শিবপূজা কর দিনযামী,
> বর মাগি লহ, বাছা, তারি মত স্বামী!
> সেই পতি হ'বে তোর সমস্ত দেবতা,
> শাস্ত্র হ'বে তারি বাক্য, সরল একথা।
> রমণীর ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
> পতিপুত্ররূপে!"

রাণী এইভাবে কন্যাকে বারবার সংসারধর্মে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজা যখন কন্যাকে ভর্ৎসনা করেন, তখন সেই ভর্ৎসনা হইতেই আবার প্রিয়তমা কন্যাকে আড়াল করিয়া রাখেন।

> "ভাব মনে
> এ কন্যা তোমার কন্যা, সামান্য বালিকা,
> ওগো তাহা নহে! এ যে দীপ্ত অগ্নিশিখা!
> আমি কহিলাম, আজি শুনি লহ কথা—
> এ কন্যা মানবী নহে, এ কোন্ দেবতা,
> এসেছে তোমার ঘরে! করিয়োনা হেলা,
> কোন্ দিন অকস্মাৎ ছেড়ে দিয়ে খেলা
> চলে যাবে—তখন করিবে হাহাকার—
> রাজ্য ধন সব দিয়ে পাইবেনা আর।"

কিন্তু এদিকে প্রজার দল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে; ক্ষেমঙ্কর প্রতিদিন সকলকে উত্তেজিত করিতেছে। নবধর্মের স্রোতের মুখে সনাতনধর্ম আর বাঁচেনা, সে স্রোতকে ঠেকাও, রাজকন্যার নির্বাসন চাই! কিন্তু ক্ষেমঙ্করের আজন্ম বন্ধু একান্ত সুহৃৎ স্নেহের পাত্র সুপ্রিয় নির্দোষের এই নির্বাসন কিছুতেই সহ্য করিতে রাজী নহে; উত্তেজিত সঙ্কীর্ণচিত্ত প্রজাবৃন্দের ছায়ামাত্র হইতে সে চাহেনা, 'মূঢ়তার দুর্বিনয়' সে সহ্য করিতে পারেনা।

"যাগযজ্ঞ ক্রিয়া কর্ম ব্রত উপবাস
—এই শুধু ধর্ম বলে করিবে বিশ্বাস
নিঃসংশয়ে? বালিকারে দিয়া নির্বাসন
সেই ধর্ম রক্ষা হবে? ভেবে দেখ মনে
মিথ্যারে সে সত্য বলে করেনি প্রচার—
সেও বলে সত্য ধর্ম, দয়া ধর্ম তার
সর্বজীবে প্রেম; সর্বধর্মে সেই সার—
তার বেশী যাহা আছে—প্রমাণ কি তার?"

ক্ষেমঙ্কর সুপ্রিয়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সুপ্রিয় বুঝিলনা, তবু ভালবাসার ও শ্রদ্ধার দুর্বলতা তাহাকে বলিতে বাধ্য করিল, "তব পথগামী চিরদিন এ অধীন। রেখে দিব আমি তব বাক্য শিরে ধরি! যুক্তি সূচি'পরে সংসার কর্তব্যভার, কভু নাহি ধরে!" এদিকে প্রজারা যখন মহোৎসাহে যাগযজ্ঞে ও পূজায় সিদ্ধিদাত্রী জগদ্ধাত্রীর আবাহন করিতেছে তখন ভিক্ষুণীর বেশে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল মালিনী। তাহাকেই সকলে দেবী বলিয়া ভ্রম করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল; শুধু করিল না ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়। কিন্তু মালিনী বলিল, তোমরা আমারই নির্বাসন চাহিয়াছ, স্বেচ্ছায় সে-নির্বাসন আমি লইলাম। আজ আমি তোমাদের কাছেই আসিয়াছি, "আমি ফিরিবনা আর! জানিতাম, জানিতাম, তোমাদের দ্বার মুক্ত আছে মোর তরে। * * * তবু একবার মোরে বল সত্য করে, সত্যই কি আছে কোন প্রয়োজন মোরে, চাহ কি আমায়?" প্রজারা তাহাকেই চাহিল, একদিন তাহারা এই দেবীরই নির্বাসন চাহিয়াছিল মনে করিয়া নিজেরাই ধিকৃত হইল; এবং মালিনীকে ঘিরিয়া লইয়া সকলে তাহাকে রাজগৃহে লইয়া গেল। সুপ্রিয় নড়িলনা, কিন্তু বুঝিল, যে গুরুর ধর্মে সে আশ্রয় লইয়াছে, সে ধর্ম মিথ্যা, সত্য ধর্মের সন্ধান মালিনীই পাইয়াছে, সে পায় নাই।

"মিথ্যা তব স্বর্গধাম,
মিথ্যা তব দেবদেবী ক্ষেমঙ্কর ! ভ্রমিলাম
বৃথা এ সংসারে এতকাল ! পাই নাই
কোন তৃপ্তি কোন শাস্ত্রে, অন্তর সদাই
কেঁদেছে সংশয়ে। আজ আমি লভিয়াছি
ধর্ম মোর, হৃদয়ের বড় কাছাকাছি !
সবার দেবতা তব শাস্ত্রের দেবতা
আমার দেবতা নহে ! * *

* * আজি তুমি কে আমার
জীবন তরণী 'পরে রাখিলে চরণ
সমস্ত জড়তা তার করিয়া হরণ
একি গতি দিলে তারে ! এতদিন পরে
এমর্ত্য ধরণী মাঝে মানবের তরে
পেয়েছি দেবতা মোর !"

কিন্তু দেবতার সন্ধান পাইয়াছে বলিয়াই এত সহজে সে ক্ষেমঙ্করকে ছাড়িয়া যাইবে কি করিয়া ? ক্ষেমঙ্কর বুঝাইলেন, যে-দেবতার সন্ধান সে পাইয়াছে সে মায়া মাত্র, যে-ধর্মের আভাস সে লাভ করিয়াছে তাহা ছায়া মাত্র। বুঝাইলেন, ভারতের সনাতন ধর্মের গরিমা ও ঐশ্বর্য, কল্পনার চক্ষে তাহাকে দেখাইলেন, আর্যধর্মের মহাদুর্গকে আক্রমণ করিয়াছে যত ধর্মদ্রোহী গৃহদ্রোহী, সে দুর্গকে রক্ষা করিতেই হইবে। তিনি এই দুর্গরক্ষার ভার লইয়াছেন, সুপ্রিয় কি তাঁহার পাশে দাঁড়াইবে না ? বাহির হইতে সৈন্য আনিয়া রক্তস্রোত মুক্ত করিয়া এই বিদ্রোহ-বহ্নি নিবাইতে হইবে, সেইজন্য তিনি দেশান্তরে যাইবেন। সুপ্রিয় সঙ্গে যাইতে চাহিল, কিন্তু ক্ষেমঙ্কর সঙ্গে লইতে চাহিলেন না, চাহিলেন শুধু, "তুমি ও ভুলোনা শেষে নূতন কুহকে, ছেড়োনা আমায় ! মনে রেখো সর্বক্ষণ প্রবাসী বন্ধুরে।" সুপ্রিয় বিদায় আলিঙ্গন চাহিল, কহিল,

"সখে, কুহক নূতন,
আমি তো নূতন নহি, তুমি পুরাতন,
আর আমি পুরাতন। * * *

প্রথম বিচ্ছেদ আজি! ছিনু চিরদিন
এক সাথে। বক্ষে বক্ষে বিরহ বিহীন
চলেছিনু দোঁহে—আজ তুমি কোথা যাবে,
আমি কোথা রব!"

সংশয়লেশবিহীন অবিচলিত ক্ষেমঙ্কর চলিয়া গেলেন। এদিকে সংশয়-দোলায় দুল্যমান্ নবধর্মের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত-চিত্ত সুপ্রিয়র সঙ্গে রাজোদ্যানে মালিনীর দেখা। আর শুধুই কি নবধর্মের জ্যোতিই তাহাকে উদ্ভাসিত করিয়াছে? যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই জ্যোতি তাহার চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সেই মালিনীও যে তাহার নিভৃত অন্তরে সোনার কাঠি স্পর্শ করিয়াছে। এই স্পর্শ তাহাকে চঞ্চল করিয়া মালিনীর কাছে টানিয়া আনিয়াছে। মালিনীর হাতে সে তাহার সমস্ত ভার তুলিয়া দিতে আসিয়াছে, 'দীপবর্তিকার-ছায়ার মত' সে তাহার সাথে চলিতে আসিয়াছে। মালিনীর মনেও কি জীবনের কোনও নূতন অনুভূতির আভাস জাগিয়াছে, সুপ্রিয়র অন্তর হইতে জীবনধর্মের কোনও আবেদন কি তাহার নারীচিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে? হয়ত করিয়াছে;

"হে ব্রাহ্মণ চলে যায় সকল ক্ষমতা
তুমি যবে প্রশ্ন কর, নাহি পাই কথা!
বড়ই বিস্ময় লাগে মনে! হে সুপ্রিয়
মোর কাছে জানিতে এসেছ তুমিও!"

কিন্তু সুপ্রিয় ত জানিতে আসে নাই।

"জানিবার কিছু নাই, নাহি চাহি জ্ঞান
সব শাস্ত্র পড়িয়াছি, করিয়াছি ধ্যান
শত তর্ক শত মত। ভুলাও, ভুলাও,
যত জানি সব জানা দূর করে দাও!
পথ আছে শত পথ, শুধু আলো নাই
ওগো দেবী জ্যোতির্ময়ি—তাই আমি চাই
একটী আলোর রেখা উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হ'তে।"

কিন্তু এতদিন পর সুপ্রিয় আসিয়াছে, আগে আসিলনা কেন? আজ

সুপ্রিয়র কথা শুনিয়া অজানা কি বেদনায় তাহার দুনয়ন অকারণ অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে কেন? প্রজারা আসিয়া দর্শন চাহিল, কিন্তু

"আজ নহে, আজ নহে! সকলের কাছে
মিনতি আমার! আজি মোর কিছু নাহি!
রিক্ত চিত্ত মাঝে মাঝে ভরিবারে চাহি
বিশ্রাম প্রার্থনা করি ঘুচাতে জড়তা!"

কিন্তু একদিকে মালিনী, আর একদিকে ক্ষেমঙ্কর, এই দুই সংঘাতকে সুপ্রিয় শান্ত করিবে কি করিয়া? ক্ষেমঙ্কর যে তাহার চিরন্তন বন্ধু, সে যে তাহার বন্ধু, ভাই, প্রভু।

"—সূর্য সে আমার, আমি তার রাহু,
আমি তার মহামোহ; বলিষ্ঠ সে বাহু,
আমি তাহে লৌহপাশ! বাল্যকাল হ'তে
দৃঢ় সে অটল চিত্ত, সংশয়ের স্রোতে
আমি ভাসমান। তবু সে নিয়ত মোরে
বন্ধুমোহে বক্ষমাঝে রাখিয়াছে ধরে
প্রবল অটল প্রেমপাশে, নিঃসন্দেহে
বিনা পরিতাপে।"

কিন্তু এমন যে বন্ধু তাহাকেও ডুবাইতে হইল। ক্ষেমঙ্করের বিদেশ হইতে সৈন্য আনিয়া নবধর্ম উৎপাটন করিবার সংকল্প, মালিনীর প্রাণদণ্ডের সংকল্প, আসন্ন বিদ্রোহ-সজ্জার সংবাদ সুপ্রিয় রাজার কাছে ব্যক্ত করিয়া দিল। এবং মালিনীকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাস ধীরে ধীরে শুনাইল! মালিনীই যে তাহাকে নব জন্মভূমির সন্ধান দিয়াছে, নব মানবধর্মের আস্বাদন দিয়াছে তাহাও জানাইল। সেই মালিনীর প্রাণদণ্ড দিতে ক্ষেমঙ্কর যখন সৈন্য লইয়া আসিতেছে তখন

"প্রচণ্ড আঘাতে সেই
ছিঁড়িল প্রাচীন পাশ এক নিমেষেই!
রাজারে দেখানু পত্র। মৃগয়ার ছলে
গোপনে গেছেন রাজা সৈন্য দল বলে

আক্রমিতে তারে। আমি হেথা লুটাতেছি
পুঁথি তলে—আপনার মর্মে কুটাতেছি
দম্ভ আপনার!

মালিনী ক্ষেমঙ্করের জন্য দুঃখ অনুভব না করিয়া পারিল না।

"—হায়, কেন তুমি তারে
আসিতে দিলেনা হেথা মোর গৃহদ্বারে
সৈন্ত সাথে? এ ঘরে সে প্রবেশিত আসি
পূজ্য অতিথির মত—সুচির প্রবাসী
ফিরিত স্বদেশে তার।"

রাজা বিদ্রোহ দমন করিয়া ক্ষেমঙ্করকে বন্দী করিয়া লইয়া রাজধানীতে ফিরিলেন। যথাসময়ে সংবাদ-দানের পুরস্কারস্বরূপ সুপ্রিয়কে তিনি রাজ্যখণ্ড এবং মালিনীকে দান করিয়া পুরস্কৃত করিতে চাহিলেন, কিন্তু,

"কিছু নহে, কিছু নহে, যাব ভিক্ষা করে
দ্বারে দ্বারে। * * * *
* * রাজহস্তে পুরস্কার!
কি করেছি? আশৈশব বন্ধুত্ব আমার
করেছি বিক্রয়—আজি তার বিনিময়ে
লয়ে যাব শিরে করি আপন আলয়ে
পরিপূর্ণ সার্থকতা? তপস্তা করিয়া
মাগিব পরম সিদ্ধি জন্মান্ত ধরিয়া—
জন্মান্তরে পাই যদি তবে তাই হোক
বন্ধুর বিশ্বাস ভাঙি সপ্তস্বর্গ লোক
চাহিনা লভিতে।"

—রাজা ক্ষেমঙ্করের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবেন স্থির করিলেন; মালিনী তাহার ক্ষমা মাগিয়া লইল; অগত্যা রাজা বিচারে তাহার বীরত্বের পরীক্ষা লইবেন স্থির করিলেন। ক্ষেমঙ্কর আসিয়া দাঁড়াইলেন; মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনিয়া এতটুকু বিচলিত হইলেন না। কোনও কিছু প্রার্থনা করিলেন না, শুধু বলিলেন, "বন্ধু সুপ্রিয়রে শুধু দেখিবারে চাহি।" সুপ্রিয় আসিল, ক্ষেমঙ্কর প্রশ্ন

করিলেন বন্ধু, এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ কেন করিলে? সুপ্রিয়র কিছু বলিবার নাই, শুধু,

"—বন্ধু এক আছে
শ্রেষ্ঠতম, সে আমার আত্মার নিশ্বাস,
সব ছেড়ে রাখিয়াছি তাহারি বিশ্বাস,
প্রাণসখে ধর্ম সে আমার!

কিন্তু; কে বলিবে, 'অন্তর্জ্যোতির্ময়, মূর্তমতি দৈববাণী' মালিনীর সেই শুভ্র মুখখানি তাহাকে ভুলায় নাই, কে বলিবে মালিনীর চোখের দৃষ্টির মধ্যে সে তাহার পিতৃধর্ম আহুতি দেয় নাই? সত্যই সুপ্রিয় তাহাই করিয়াছে, মিথ্যা সে বলিবে কেন?

—"সত্য বুঝিয়াছ সখে!
মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্যলোকে
ওই নারীমূর্তি ধরি! * * *
* * * * *
ওই দুটি নেত্রে জ্বলে যে উজ্জ্বল শিখা
সে আলোকে পড়িয়াছে বিশ্বশাস্ত্রলিখা—
যেথা দয়া যেথা ধর্ম, যেথা প্রেম স্নেহ,
যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।
* * * ধর্ম বিশ্ব লোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল,—নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেম-ক্রোড়ে—সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দ বেদনে
চাহি ওই উষারুণ করুণ বদনে!
ওই ধর্ম মোর।"

ক্ষেমঙ্করও তাহাকে দেখিয়াছে, কিন্তু দেখিয়াছে বলিয়াই সে তার নিজের ধর্ম, তার অহঙ্কারের ধর্ম অন্যের কাছে খাট হইতে দিবে কেন?

"উদারতা এত কি উদার!
কেহ বা ধর্মের লাগি সহি নির্যাতন
অকালে অস্থানে মরে চোরের মতন,

> কেহ বা ধর্মের ব্রত করিয়া নিষ্ফল
> বাঁচিবে সম্মানে সুখে! এ ধরণীতল
> হেন বিপরীত ধর্ম এক সঙ্গে বহে—
> এত বড় এত দৃঢ় কভু নহে নহে।"

সত্য কি মিথ্যা কি আজ আর তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই

> "—সকল সংশয়
> আজিকে লইয়া চলি অসংশয় ধামে,
> দাঁড়াই মৃত্যুর পাশে দক্ষিণে ও বামে
> দুই সখা, লয়ে দুজনের প্রশ্ন যত!
> সেথায় প্রত্যক্ষ সত্য উজ্জ্বল উন্নত ;—
> *   *   *   *
> দুইটী অবোধ
> আনন্দে হাসিব চাহি দোঁহে দোঁহাকারে
> সব চেয়ে বড় আজি মনে কর যারে
> তাহারে রাখিয়া দেখ মৃত্যুর সম্মুখে।

এই বলিয়া ক্ষেমঙ্কর অগ্রসর হইয়া সুপ্রিয়কে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন, কহিলেন,

> "এস তবে এস বুকে!
> বহুদূরে গিয়েছিলে এস কাছে তবে,
> যেথায় অনন্তকাল বিচ্ছেদ না হ'বে!
> লহ তব বন্ধু হস্তে করুণ বিচার—
> এই লহ—"

বলিয়াই সুপ্রিয়ের মাথায় হাতের লোহার শিকল দিয়া সজোরে আঘাত করিলেন। সুপ্রিয় মাটিতে পড়িয়া গেল, আর উঠিল না। ক্ষেমঙ্কর মৃতদেহের উপর পড়িয়া ঘাতককে ডাকিলেন, রাজা সিংহাসন হইতে নামিয়া খড়্গ আনিতে বলিলেন। মালিনী রাজার কাছে ক্ষেমঙ্করের ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন জানাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

"মালিনী"র আখ্যানবস্তু অত্যন্ত সরল ও স্বচ্ছ, কিন্তু সুর গভীর ও গম্ভীর। ঘটনার স্রোত অতি স্বচ্ছ সরল ভাবে অন্তিম পরিণতির দিকে দ্রুত নিরবচ্ছিন্ন

বহিয়া গিয়াছে, এবং একেবারে শেষ দৃশ্যে অন্তিম সর্বনাশ যখন 'বন্ধ্য তাই হোক' এই তিনটি মাত্র বাক্যের ভিতর দিয়া পাঠক বা দর্শকের চিত্তপটে জাগিয়া উঠে, তখন এক মুহূর্তে মনে হয়, আর উপায় নাই, এইবার সমস্ত বিশ্বের প্রলয় ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই সর্বশেষ পরিণতি সর্বতোভাবে নাটকীয়, এবং একান্তভাবে প্রাচীন গ্রীক্-ট্র্যাজেডির কথা মনে করাইয়া দেয়। "বিসর্জন" বহুভাষী, বিচিত্র ভূমিকার কথাবার্তাগুলি এত বিস্তৃত, আত্মবিশ্লেষণ এত বিশদ যে "মালিনী"র স্বল্প-ভাষণের পরিমিতি ও সংযম, আখ্যানবস্তুর সঙ্গতি ও সংহতি "বিসর্জনে" আমরা আশাই করিতে পারি না। দু'টি নাটকই ট্র্যাজেডি, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও "মালিনী"র ট্র্যাজেডি এত ঘনীভূত এবং এত প্রবল এবং এত স্বল্পকাল-বিস্তৃত যে "বিসর্জনে"র ট্র্যাজেডি সেই তুলনায় অনেকটা তরল ও নিষ্প্রভ। পাঠকের অথবা দর্শকের মনের পুঞ্জীয়মান বেদনা মাঝে মাঝে লাঘব করিবার চেষ্টা "বিসর্জনে" আছে, "মালিনী"তে তাহা অনুপস্থিত, এবং সেই হেতু "মালিনী"র ট্র্যাজেডি অনেক ঘন ও নিবিড়। এই সব কারণে, আমার মনে হয়, "বিসর্জন" অপেক্ষা "মালিনী" শিল্পসৃষ্টি হিসাবে সার্থকতর, নাট্টীয় গুণের দিক হইতেও তাহাই। অথচ, আশ্চর্য এই, "মালিনী" বাঙ্‌লা দেশে "বিসর্জনের" জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। "মালিনী"র একান্ত সুনিবিড় ট্র্যাজিক্ সর্বনাশী পরিণতিই কি তাহার কারণ?

তাহা ছাড়া "বিসর্জন" নাটক হওয়া সত্ত্বেও যে কোনও পাঠক বা দর্শকই স্বীকার করিবেন, আগেও আমি বলিয়াছি, ইহার রচয়িতার মানস একান্তই গীতিকাব্যীয় মানস। "চিত্রাঙ্গদা" ও "বিদায় অভিশাপে" যেমন পাত্রপাত্রীর উক্তির ছলে মানব হৃদয়ের কোনও চিরন্তন আবেগের বা মুহূর্তের অনুভূতির প্রকাশ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলা সত্ত্বেও তাহা লিরিকেরই স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণবিশিষ্ট, "বিসর্জনে"র বিভিন্ন চরিত্রগুলির উক্তিতেও তাহাই; জয়সিংহ, রঘুপতি, অর্পণা, গোবিন্দমাণিক্য ইহারা সকলেই এক একটি চিরন্তন হৃদয়াবেগের প্রতীক, এবং ইহাদের অধিকাংশ উক্তি ও চলন গীতিকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। "মালিনী"তে এই লিরিক্-লক্ষণ অনুপস্থিত বলিলেই চলে; ইহার ভূমিকাগুলিও কতকাংশে হৃদয়াবেগের প্রতীক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাদের চলন বলন নাটকীয়। প্রত্যেকটি দৃশ্যের উদ্ঘাটন আকস্মিক, দ্রুত চলমান ঘটনার স্রোত আকস্মিক-ভাবে দক্ষিণে বামে ঘুরিয়া যায় এবং থাকিয়া থাকিয়া পাঠক ও দর্শকের চিত্তকে

ঝাঁকুনি দিয়া সজাগ করিয়া দেয়। চরিত্রগুলি কোথাও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নাই; তাহাদের প্রত্যেকেরই গতি ও পরিণতি আছে; মালিনী অপর্ণা নয়, ক্ষেমঙ্কর জয়সিংহ নয়, অথবা সুপ্রিয় রঘুপতি নয়। "মালিনী"র আখ্যান-বস্তুর স্বচ্ছ সরলতার একটি প্রধান কারণ, ইহার দ্রুত ঘটনাস্রোতের মধ্যে কোন বাহ্য অথবা অবান্তর কাহিনীর গ্রন্থি-বন্ধন নাই; "বিসর্জনে"র মধ্যে যেমন মূল কাহিনী ছাড়া মূল কাহিনীকেই সমৃদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অন্য দুইটি কাহিনীর অবতারণা আছে, "মালিনী"তে তাহা নাই, একটি মাত্র সহজ সরল স্রোত স্বচ্ছ হইয়া শেষ পর্যন্ত বহিয়া গিয়াছে।

মালিনীর চরিত্র-চিত্রণ লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। টম্‌সন্ সাহেব বলিয়াছেন, মালিনী

> "is a very unconvincing figure till towards the end, where she wavers from her half attraction towards Supriya, drawn by the quiet fierce strength of Ksemankar. * * * Why does Malini plead for Ksemankar, after he has killed Supriya? When I spoke of the play as sketchy, I was thinking of the way in which Rabindranath, in Malini herself, suggests questions for whose solution he provides no data. He has drawn the lines of her figure so tenuously that her thoughts and actions are seen as if moving through a mist of dreams. * * * The poet has given us no means of judging, but has left Malini a beautiful but faintly draw outline."

টম্‌সন্ সাহেব মালিনী unconvincing figure এই অভিযোগ কেন করিলেন, বুঝা শক্ত, আর এমনই বা কি প্রশ্ন কবি মালিনী সম্বন্ধে তুলিয়াছেন, যাহার উত্তরের সুযোগ তিনি আমাদের দেন নাই। এমন কিছু কুয়াসার জাল ও যে মালিনীর ছবিটিকে আমাদের চোখের সম্মুখে অস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহা ও মনে হইতেছে না। তবে এ প্রশ্ন সত্যই উঠিতে পারে, সুপ্রিয়কে যে ক্ষেমঙ্কর হত্যা করিলেন সেই ক্ষেমঙ্করেরই প্রাণভিক্ষা মালিনী কেন চাহিল? প্রশান্ত বাবু বলেন,

> "It is very difficult to be quite sure—so many interpretations are possible—but in Malini, there seems to be a conflict. She is torn between two impulses—or perhaps an ideal and an impulse, the life preached by Gotama and the other life of love and friendship. Both were vague, I think. Was she in love with Supriya? Or was it Kshemankar? Or was she in love with neither? I do not know, but you feel as if there was a deeper conflict."

মালিনীর মধ্যে যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল এবং দুই বিরোধী ভাব ও আদর্শের মধ্যে তাহার চিত্ত একটু আন্দোলিত হইয়াছিল সে কথা সত্য, কিন্তু কোথাও তাহা খুব তীব্র হইয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই, এবং সে সুপ্রিয়কে ভালবাসিত, না ক্ষেমঙ্করকে, না কাহাকেই নয়, এ প্রশ্ন উঠিবার সুযোগই বা কোথায়? আর সুপ্রিয়কে যে ক্ষেমঙ্কর হত্যা করিলেন, সেই ক্ষেমঙ্করেরই প্রাণ-ভিক্ষা মালিনী কেন চাহিল, এ প্রশ্নের উত্তরও খুব কঠিন বলিয়া মনে হয় না।

মালিনীর প্রথম পরিচয় যখন আমরা পাই, তখন দেখি সে এমন একটা ধর্মের আভাস মাত্র পাইয়াছে, যে ধর্ম সহজেই একটা তরুণ চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া লয়, এবং তাহার বৃহত্তর আদর্শের চরণতলে জীবনকে উৎসর্গ করিবার ইঙ্গিত জানায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রেরণা ও জাগাইয়া তোলে। এই প্রেরণাই রাজান্তঃপুর ছাড়িয়া মালিনীকে পথে বাহির করিয়া আনে। সেইখানে আসিয়া সে সর্বপ্রথম সুপ্রিয়র পরিচয় লাভ করে। এই সুপ্রিয় তরুণ, ধর্মপ্রাণ স্থিরচিত্ত ও মহৎ। সুপ্রিয়র এই পরিচয় মালিনী প্রথমেই পায় নাই, কিন্তু প্রথম পরিচয়েই সুপ্রিয় তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং মালিনীর আত্মোৎসর্গ সুপ্রিয়র সমস্ত হৃদয় ও মনকে অভিভূত করিয়াছিল। কিন্তু তখনও মালিনী সুপ্রিয়কে ভালবাসে নাই, নবজাগ্রত নারীচিত্তের মধ্যে তখনও প্রেমের কুঁড়ি দেখা দেয় নাই। সে কুঁড়ি দেখা দিল তখন, যখন সুপ্রিয় আসিয়া তাহার কাছে আত্মনিবেদন করিল, যখন সে বলিল,

> "দেবি, লহ মোর ভার
> যে পথে লইয়া যাবে, জীবন আমার
> সাথে যাবে সর্ব তর্ক করি পরিহার
> নীরব ছায়ার মত দীপবর্তিকার।"

যখন সে বলিল,

> "ভুলাও, ভুলাও,
> যত জানি সব জানা দূর করে দাও।
> পথ আছে শত লক্ষ শুধু আলো নাই
> ওগো দেবি জ্যোতির্ময়ি—তাই আমি চাই
> একটি আলোকরেখা উজ্জ্বল সুন্দর
> তোমার অন্তর হ'তে।"

একথার পর মালিনীর মধ্যে সত্য সত্যই একটু চঞ্চলতা জাগে। সুপ্রিয় মালিনীর কাছে যাহা চাহিয়াছিল তাহা হয়ত একটু প্লেটোনিক; হৃদয়ের মধ্যে একটা অভাব যাহা ঠিক বুঝিতে বা ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায়না, যাহা আমাদের প্রতিদিনের মানবজীবনের ভালবাসা এবং বৃহত্তর ভাবময় জীবনের ভালবাসার একটা সংমিশ্রণ, যে-ভালবাসা মনস্তত্ত্বের দিক হইতে একটু জটিল, সুপ্রিয়র মনের অনুভূতি হয়ত তাহাই ছিল। কিন্তু মালিনীর মনে এমন কিছু জটিলতা ছিল বলিয়া মনে হয়না। প্রথম সূর্য্যের তাপ লাগিয়া যেমন ফুলের কুঁড়িগুলি মেলিতে থাকে, সুপ্রিয়র মনের তাপ লাগিয়া তেমনই করিয়া মালিনীর মনের কুঁড়িটিও তখন শুধু নয়ন মেলিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। এইজন্যই ত

"হে ব্রাহ্মণ, চলে যায় সকল ক্ষমতা,
তুমি যবে প্রশ্ন কর, নাহি পাই কথা!
বড়ই বিস্ময় লাগে মনে!"
"হায় বিপ্রবর!
যত তুমি চাহিতেছ আমি যেন তত
আপনারে হেরিতেছি দরিদ্রের মত!"

এমন করিয়া ত কেহ তাহার কাছে আত্মনিবেদন করে নাই; তাহার প্রতি এমন করিয়া ত কেহ আকৃষ্ট হয় নাই, এমন প্রশ্নপ্রার্থী হইয়া কেহ ত আসে নাই; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংশয়ও যে আছে মনের মধ্যে। সেই সংশয় তাহার তাহার মনের কুঁড়িটিকে ভাল করিয়া ফুটিতে দিতেছে না। সেও ত সুপ্রিয়কে সঙ্গীরূপে পাইতে চায়, কিন্তু এ কি তাহার জীবনের সঙ্গীরূপে না তার ধর্মের ও কর্মের—ইহার উত্তর তো সে নিজে দিতে পারে না, তবু সঙ্গীরূপে তাহাকে পাইতে সে চায়। একা তাহার ভয় জাগিয়া উঠিতেছে, হৃদয় তাহার কাঁপিয়া উঠিতেছে, মনে হয় সে বড় একাকিনী—সুপ্রিয়কে সে চায়। এ চাওয়া কি শুধুই বন্ধুরূপে, শুধুই মন্ত্রগুরুরূপে! বোধ হয় নয়। তাহাই যদি হইবে, তবে আজ সে দর্শনাভিলাষী প্রজাদের দেখা দিতে পারিতেছে না কেন, এত শূন্য নিজকে বোধ করিতেছে কেন, কেন সে বলিতেছে,

"আজ নহে, আজ নহে! সকলের কাছে
মিনতি আমার! আজি মোর কিছু নাহি!
রিক্ত চিত্ত মাঝে মাঝে ভরিবারে চাহি—"

বন্ধুই, সঙ্গীই যদি সে চাহিত, সুপ্রিয়র চাইতে যোগ্যতর সঙ্গী পাওয়াত কঠিন হইত না। কিন্তু সুপ্রিয়কেই তাহার চাই; তাহার সুখ দুঃখ যত, গৃহের বার্তা যত, সব কিছু যে সে আত্মীয়ের মত প্রত্যক্ষ দেখিতে, পাইতে চায়। তারপর রাজা যেখানে সুপ্রিয়কে পুরস্কৃত করিতে চাহিলেন, যেখানে কোন পুরস্কারই সুপ্রিয় লইতে চাহিল না, শুধু মালিনীর কাছে চাহিল তাহার শুভকামনা, তখন মালিনীর বুকের মধ্যে কান্না যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিল, বলিতে পারিল না কিন্তু মনের মধ্যে গুম্‌রাইয়া উঠিল

"ওরে রমণীর মন
কোথা বক্ষোমাঝে বসে করিস্ ক্রন্দন
মধ্যাহ্নে নির্জন নীড়ে প্রিয় বিরহিতা
কপোতীর প্রায়।"—

তারপর সেই দৃশ্যেই সুপ্রিয় যখন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, তখন রাজা বুঝিলেন

"বহুদিন পরে মোর মালিনীর ভাল
লজ্জার আভায় রাঙা। কপোল উষার
যখন রাঙিয়া উঠে, বুঝা যায়, তার
তপন উদয় হ'তে দেরী নাই আর!
এ রাঙা আভাস দেখে আনন্দে আমার
হৃদয় উঠিছে ভরি'—বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি অতক্ষণে
বিকশি উঠিল—দেবী নারে, দয়া নারে
ঘরের সে মেয়ে।"

পিতা কন্যার মনের কথা ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। সত্যই, আমাদের মানবজীবনের প্রতিদিনের যে প্রেম ও ভালবাসা, সুপ্রিয়র প্রতি মালিনী সেই প্রেম ও ভালবাসারই আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল; কিন্তু তাহা খুব বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, ভাল করিয়া তাহা ফুটিতে পারে নাই, শুধু তাহার উন্মেষ হইয়াছিল মাত্র।

কিন্তু সুপ্রিয়কে যদি সে ভালই বাসিত, তবে সুপ্রিয়র হত্যাপরাধে অপরাধী ক্ষেমঙ্করের ক্ষমাভিক্ষা সে করিল কেন? কারণ সুপ্রিয়র মুখেই ক্ষেমঙ্করের মহত্বের ইতিহাস, তাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ইতিহাস সে শুনিয়াছে, এবং তাহার আদর্শের, তাহার কর্মের একান্ত বিরোধী সে হইলেও সে তাহার নিষ্ঠার

প্রতি, দৃঢ়তার প্রতি, শক্তির প্রতি মনে মনে শ্রদ্ধা অনুভব না করিয়া পারে নাই। সেই জন্যই সুপ্রিয়-হত্যার পূর্বে যখন সে একদিকে সুপ্রিয়র প্রতি একটা বেদনাময় ভালবাসার অনুভূতিতে 'প্রিয় বিরহিতা কপোতীর' ন্যায় কাঁদিতেছে, তখনই আর একদিকে সে পিতার কাছে ক্ষেমঙ্করের প্রাণভিক্ষা মাগিয়া লইতেছে। তারপর, ক্ষেমঙ্কর সুপ্রিয়কে যখন শেষ দেখা দেখিতে চলিলেন তখন অজানা আতঙ্কে মালিনীর হৃদয় শিহরিয়া উঠিয়াছিল, সে দেখিয়াছিল, "কি যেন পরম শক্তি আছে ওই মুখে বজ্রসম ভয়ঙ্কর!" সর্বশেষে সেই দৃশ্য—ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়ের শেষ আলাপন। সে আলাপনও মালিনীকে অভিভূত না করিয়া পারে নাই—সম্মুখে দাঁড়াইয়াই তো সে সব শুনিয়াছে, দেখিয়াছে! কিন্তু সুপ্রিয়র হত্যার পর শেষ মুহূর্তে যে সে "মহারাজ! ক্ষম ক্ষেমঙ্করে" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তাহা ক্ষেমঙ্করকে শ্রদ্ধা করিত বলিয়া নয়, তাহাকে সে ভালবাসিত এমন কোন সন্দেহও করিবার কারণ কিছু নাই। খুব কিছু ভাবিয়া বা বুঝিয়া যে সে তাহা করিয়াছিল তাহাও নহে; আপন অন্তরের ক্ষমাগুণও যে তাহাতে স্বতঃই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও মনে হয় না। বস্তুতঃ ভাবিবার বুঝিবার কোনও অবসরই তখন ছিল না; অন্তরের কোনও ধর্মই তীব্র আবেগ-কম্পিত আকস্মিকতার মধ্যে আত্মবিকাশ করিতে পারে না। আমার মনে হয় এই শেষ মুহূর্তের ক্ষমাভিক্ষা একটা শুব্ধ অভিভূত চৈতন্যের এক মুহূর্তের অপূর্ব অভিব্যক্তি, কোনও ভাবের, কোনও চিন্তার বা কোনও অনুভূতির প্রকাশই নয়। মালিনীর মনকে জানিবার এবং বুঝিবার জন্য এই অভিব্যক্তির কোনও মূল্য নাই; কিন্তু রসসৃষ্টির দিক হইতে এই অভিব্যক্তি অপূর্ব, অতুল; তুলির একটি অস্পষ্ট রেখায় রবীন্দ্রনাথ এখানে যে বস্তুর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা তাঁহার নাট্যে খুব বেশী নাই। মালিনী সারাটি দৃশ্য সেখানে দাঁড়াইয়া—তাহার সম্মুখ দিয়া একটি ভয়কম্পিত দণ্ড কাটিয়া গিয়াছে, তাহার শেষে তাহারই সম্মুখে হঠাৎ সুপ্রিয় হতপ্রাণ হইয়া ভূমিলগ্ন হইয়াছে, ক্ষেমঙ্কর সেই মৃতদেহের উপর পড়িয়া ঘাতককে ডাকিয়াছে, রাজা খড়্গ আনিতে আদেশ দিয়াছেন,—সকলের ভূমিকাই তো শেষ হইল, কিন্তু মালিনী করিবে কি? এমন কি সে করিবে, যাহাতে নাটকের রসবোধ ক্ষুণ্ণ হইবে না, যাহাতে তাহার চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা পাইবে, নাটকের শেষ পরিণতিটি রক্ষা পাইবে। ক্ষেমঙ্করের ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া সে কি করিতে পারে, কি সে বলিতে পারে—

আর সেখানে তাহার উপস্থিত না থাকিলেই বা সে দৃশ্যের সম্পূর্ণতা কোথায়? এই সর্বশেষের ক্ষমাভিক্ষা শুধু যে নাট্য-কৌশলের দিক হইতেই সুন্দর ও সম্পূর্ণ তাহা নয়; মালিনীর সমগ্র চরিত্রটিকে ও এই কথা কয়টি একটি নূতন মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। একথা সত্য যে সে আমাদের চোখে একটু অস্পষ্ট হয়ত হইয়াছে, একটু স্বচ্ছ আবরণে যেন তার পরিচয় ঢাকা পড়িয়াছে; কিন্তু এই অস্পষ্টতা, এই স্বচ্ছ আবরণের জন্যই সে রসসৃষ্টি হিসাবে আমাদের কাছে আরও সুন্দর, আরও মধুর হইয়াছে; সে একটা 'faintly drawn outline' বলিয়া সত্যই দুঃখ করিবার কিছু নাই।

আমি আগেই বলিয়াছি, একটা আইডিয়া একটা সত্য "বিসর্জন" ও "মালিনী" এই দুইটি নাটকেই বিভিন্ন ভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে; তবে "বিসর্জনে" এই সত্যটা সমস্ত ঘটনার অন্তরালে না থাকিয়া কতকটা সম্মুখে আসিয়া স্থান দাবী করিয়াছে, "মালিনী"তে তাহা অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে, এতটা উৎকট হইয়া দেখা দেয় নাই। "বিসর্জনে"ও তাহা হইলে রসসৃষ্টি হিসাবে নাটকটি আরও অপূর্ব, আরও সুন্দর হইত সন্দেহ নাই। দু'টী নাটকেই এই সত্যটি ব্যক্ত হইয়াছে একটি তরুণী নারীচিত্তকে আশ্রয় করিয়া, "বিসর্জনে" নিকটতর করিয়াছে অপর্ণা, "মালিনী"তে মালিনী। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাটকগুলিতেও আমরা দেখিব কোনও বালক অথবা বালিকাকে আশ্রয় করিয়াই কবি-হৃদয়ের অনুভূত সত্যগুলি রূপায়িত হইয়াছে। এ কৌশল যে নাট্যবস্তুর রস ও রহস্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহা ছাড়া সেই সত্য-গুলির রূপ এবং প্রকাশও সুন্দর এবং জীবন্ত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে।

(৪)

'গান্ধারীর আবেদন' (১৩০৪)
'সতী' (১৩০৪)
'নরকবাস' (১৩০৪)
'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' (১৩০৪)
'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' (১৩০৬)

"কথা"-গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে "কাহিনী"র এই নাট্য-কাব্যগুলির কতকটা আলোচনা করিয়াছি। এই নাট্য-কাব্যগুলির মূল্য যে কাব্য হিসাবেই

বেশী, তাহার ইঙ্গিতও সেখানেই করিয়াছি, কিন্তু কাব্যমূল্য আছে বলিয়াই নাটকীয় গুণ ইহাদের নাই, একথা বলা চলেনা, বিশেষ ভাবে 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' সম্বন্ধে একথা কিছুতেই প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই নাট্যকাব্যগুলি সম্বন্ধে সকলের চেয়ে বড় ও মূল্যবান্ কথা হইতেছে, নিত্য শাশ্বত মানবধর্মের যে অম্লান মহিমা, দৃপ্ত নাটকীয় ভঙ্গিমায় এবং কাব্যের সুর-সুষমায় সেই মহিমার জয়গান। একমাত্র 'লক্ষীর পরীক্ষা' অন্যধরণের। কথাবার্তার ভঙ্গিতে, লঘু তালের ছন্দে এই নাট্যকাব্য রচনাটির মধ্যে আগাগোড়া অনাবিল হাসির স্রোত তরতর্ মুখরতায় চঞ্চলিত, ভাষণ ও প্রতিভাষণ উজ্জল ইস্পাতের তীক্ষ্নতায় ঝলকিত। এই তীক্ষ্ণ উজ্জলতা ও মুখর চঞ্চলতার উপর রাণী কল্যাণীর চরিত্র-মহিমাটি সুকোমল সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত। 'লক্ষীর পরীক্ষা' একাধিকবার অভিনীত হইয়াছে, এবং সে অভিনয় যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন, অভিনযোপ-যোগী গুণ ইহার আছে এবং ইহার অনাবিল হাস্যরস উপভোগ্য।

এই ধরণের reading drama রবীন্দ্রনাথই বাঙ্‌লা-সাহিত্যে প্রথম দান করিলেন। একথা সত্য যে "চিত্রাঙ্গদা" ও "বিদায় অভিশাপে"র মতন গীতিমাধুর্য, কাব্য-সুষমাই ইহাদেরও বৈশিষ্ট্য ; কিন্তু তাহা হইলেও 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' এবং কতকাংশে 'সতী' নাট্যকাব্যটির মধ্যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব এবং চরিত্রচিত্রণের নাটকীয় বৈশিষ্ট্য দৃপ্ত ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'গান্ধারীর আবেদনে' গান্ধারীর চরিত্রে একদিকে পুত্রস্নেহ ও স্বামীধর্ম এবং অন্যদিকে সত্য নিত্যধর্ম, ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রেও পুত্রস্নেহ ও নিত্য মানবধর্মের বিরোধ যে-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার নাটকীয় সম্ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ যাইতে দেন নাই। ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ নাই, তাহার কারণ তিনি পুত্রস্নেহে অন্ধ, এবং আত্মদৌর্বল্যে পীড়িত, কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি গান্ধারীর ধর্মদীপ্তির সম্মুখীন হ'ন, সেই মুহূর্তেই এই সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, এবং গান্ধারীর দীপ্তির সম্মুখে তাঁহার দুর্বলতা ধিক্কৃত ও লজ্জিত হয়। সত্য নিত্য ধর্মের মুখোমুখি না হইলেও সেই ধর্মের দাবী যে কি তাহা তিনি জানেন, এবং দুর্যোধনকে অধর্ম হইতে ফিরাইতে চেষ্টাও করেন, আবার গান্ধারীর সম্মুখে ক্ষীণ বিচলিত কণ্ঠে পুত্রের রাজধর্মের অমোঘ বিধানের সমর্থনও করেন। এই দুর্বলতাকে জয়মাল্য দিবে কে?

তাই, ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন ও গান্ধারী উভয়ের কাছেই পরাজিত। ধৃতরাষ্ট্রের এই সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বলীলা গান্ধারীর দৃপ্ত দীপ্তির চেয়েও নাটকীয়। গান্ধারীর হৃদয়ও পুত্রস্নেহে উদ্বেলিত; কিন্তু সেই স্নেহের বলেই তিনি অধর্মরত পুত্রকে ত্যাগ করিয়া ধর্মকেই রাখিতে চান্। তাঁহার আশীর্বাদের অধিকারী দুর্যোধন-বৈরী পঞ্চপাণ্ডব; অন্তরের মধ্যে একদিকে পুত্রের প্রতি স্বভাবজ মাতৃস্নেহ, অন্যদিকে অধর্মরত সেই পুত্রের প্রতি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বিরাগ, একদিকে অনন্ত লজ্জা, অন্যদিকে অপরিসীম দুঃখ সবকিছু লইয়া অবিচল কণ্ঠে ধর্মের দীপ্তি অনির্বাণ রাখা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইল, তিনিই পারিলেন এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করিতে,

"সৌভাগ্যের দিনমণি
দুঃখরাত্রি অবসানে দ্বিগুণ উজ্জ্বল
উদিবে হে বৎসগণ! বায়ু হ'তে বল,
সূর্য হ'তে তেজ, পৃথ্বী হ'তে ধৈর্যক্ষমা
কর লাভ, দুঃখব্রত পুত্র মোর।
* * * নিত্য হউক নির্ভয়
নির্বাসন বাস। বিনাপাপে দুঃখ ভোগ
অন্তরে জলন্ত তেজ করুক সংযোগ—
বহ্নিশিখা দগ্ধ দীপ্ত সুবর্ণের ন্যায়।
সেই মহাদুঃখ হ'বে মহৎ সহায়
তোমাদের।—সেই দুঃখে রহিবেন ঋণী
ধর্মরাজবিধি,—যবে শুধিবেন তিনি
নিজহস্তে আত্মঋণ, তখন জগতে
দেব নর কে দাঁড়াবে তোমাদের পথে।
মোর পুত্র করিয়াছে যত অপরাধ
খণ্ডন করুক সব মোর আশীর্বাদ
পুত্রাধিক পুত্রগণ! অন্যায় পীড়ন
গভীর কল্যাণসিন্ধু করুক মন্থন।"

এই দ্বন্দ্ব গান্ধারীর চরিত্রে নাটকীয় মহিমা লাভ করিয়াছে।

'সতী' নাট্য কবিতাটিতে নাটকীয় সম্ভাবনা স্ফূর্তি পাইয়াছে পিতা বিনায়ক রাওর চরিত্রে। একদিকে সমাজধর্ম ও চিরাচরিত সংস্কার, অন্যদিকে স্বভাবজ পিতৃস্নেহ এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব নাটকীয় দীপ্তি লাভ করিয়াছে সেইক্ষণে যখন দেখা

গেল সংস্কারান্ধ মাতা রমাবাই মাতৃস্নেহ মাতৃধর্ম ভুলিয়া সংস্কারের মোহে কন্যাকে তুলিয়া দিতেছেন পরপুরুষের চিতায়।

কিন্তু নাটকীয় ভঙ্গিমা ও কাব্য-সুষমা সম্পূর্ণ সঙ্গতি লাভ করিয়াছে, এবং নাটকীয় দীপ্তি সর্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদে' কর্ণ ও কুন্তী উভয়েরই মানসিক দ্বন্দ্বের কাব্যময় প্রকাশের মধ্যে। কর্ণের চিত্তে একদিকে পালয়িত্রী মাতা সুতজায়া রাধার প্রতি মমত্ব ও কর্তব্যবোধ, দুর্যোধনের প্রতি বীরের ধর্মবোধ, অন্যদিকে গর্ভ-দাত্রী মাতার এবং একস্তন্যপায়ী ভ্রাতৃবর্গের প্রতি নবজাগ্রত একাত্মবোধের চেতনা এই দুইয়ে মিলিয়া যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার নাটকীয় সম্ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্যের অনতিপ্রসার ভূমিকার মধ্যে যথাসম্ভব বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। কর্ণের বীরধর্মের মহনীয় দীপ্তি কুন্তীর মাতৃহৃদয়ের এবং কুরুক্ষেত্র রণধর্মের পটভূমিকায় সমস্ত নাট্যকাব্যটিকে এমন একটি করুণ অথচ সুদৃঢ় মর্যাদা দান করিয়াছে যাহার ফলে নাটকীয় দ্বন্দ্ব যেন আরও সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। কুন্তী যে কর্ণের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া আপন প্রার্থনা জানাইতে গিয়াছিলেন, তাহা যে শুধু মাতৃধর্মের প্রেরণায়ই নয়, পাণ্ডবদের বিজয় কামনার স্বার্থপ্রেরণাও তাহার মধ্যে ছিল এই ইঙ্গিতও নাট্যাভাস লাভ করিয়াছে কুন্তীর ভূমিকায়, এবং এই স্বার্থলোভের ইঙ্গিতই কর্ণের চিত্তকে বিমুখ করিয়া বীরধর্মে তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। ইহার সূক্ষ্ম নাটকীয় অভিব্যক্তি রচনাটির মধ্যে ব্যর্থ যায় নাই।

'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' দুইটিরই উপাদান ভারত-কথা হইতে আহৃত, 'নরকবাসে'র উপাদান জোগাইয়াছে পৌরাণিক আখ্যায়িকা, আর 'সতী'র বর্ণিত ঘটনা 'মিস্ ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েসনের পত্রিকায় মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাকওয়ার্থ সাহেব-রচিত প্রবন্ধ বিশেষ হইতে সংগৃহীত'। এই চারিটি নাট্যকাব্যেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ধর্মবোধ সবলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বকীয় ধর্মবোধই বা বলি কেন, ইহাই তদানীন্তন বাঙালী শিক্ষিত সমাজের সামাজিক ধর্মবোধ, এই সত্য শাশ্বত নিত্য ধর্মবোধই উনবিংশ শতাব্দীর মানস-প্রেরণা। এই প্রেরণা য়ুরোপে মুক্তি পাইয়াছিল, ইহার সম্বন্ধে সামাজিক চেতনা জাগিয়াছিল ফরাসী বিদ্রোহের ফলে ; এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাধনার ডানায় ভর করিয়া এই প্রেরণা শিক্ষিত

বাঙালীর মনকে সমাজধর্ম, রাজধর্ম, ব্যাবহারিক ধর্মের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া এক সত্য নিত্য মানবতার ধর্মের সন্ধান দিয়াছিল। এই মানবতার ধর্ম অতীতেও ছিল, য়ুরোপে ছিল, ভারতবর্ষেও ছিল, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে সামাজিক চেতনা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সামাজিক চেতনার জন্ম এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিত্য শাশ্বত ধর্মবোধের জন্ম তাই কিছু আকস্মিক নয়। এই মানবতার ধর্ম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত; এই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ রবীন্দ্র-চিত্তকে গড়িয়াছে, রবীন্দ্র-কবি-মানসকেও গড়িয়াছে। সেইজন্ম রবীন্দ্র-কবি-মানসের অন্যতম বাণী হইতেছে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সত্য শাশ্বত মানবধর্মের জয়গান। রাজধর্ম, ব্যাবহারিক ধর্ম, সমাজধর্ম, লৌকিকধর্ম প্রভৃতি নানা কক্ষে মানুষ ধর্মকে ভাগ করিয়াছে, এক ধর্ম অন্য ধর্মকে স্বচ্ছন্দে অবমাননা করে, এবং তাহার ফলে মানবধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিমানস ক্ষুব্ধ, পরাজিত ও বিপর্যস্ত হয়। চেতনাবান্ কবি অথবা রূপকার, ধর্ম অথবা সমাজ-নায়ক সেই ক্ষোভ ও পরাজয়কেই এমন রূপে ও বর্ণে সমাজ-দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরেন যে তাহার বলে পরাজিত ও বিপর্যস্ত মানবধর্মই খণ্ডিত ধর্মবোধের উপর জয়ী হয়। রবীন্দ্রনাথ এই চারিটি নাট্যকাব্যে তাহাই করিয়াছেন এবং সার্থক ভাবেই করিয়াছেন; "বিসর্জন", "মালিনী" প্রভৃতি নাট্যপ্রয়াসের মধ্যেও তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে, "কথা"-গ্রন্থের অনেক কবিতায়ও এই মানবধর্মের সন্ধানই মুখ্য বক্তব্য। 'গান্ধারীর আবেদনে' দুর্যোধনের রাজধর্মের কাছে গান্ধারীর মানবতার নিত্য ধর্ম লাঞ্ছিত ও পরাজিত। 'সতী' নাট্যে অমাবাইর সত্য নিত্য পতি ও সন্তানধর্ম সামাজিক আচারধর্মের পায়ে অবলুণ্ঠিত; 'নরকবাসে' রাজা সোমকের সত্য নিত্য পিতৃধর্ম ক্ষাত্রধর্মের গর্বের নিকট আহত ও অবমানিত; 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদে' কুন্তী সমাজধর্মের ভয়ে আদিম মাতৃত্বধর্ম পালন করেন নাই; সেইজন্যই পরে কর্ণের বীরধর্মের কাছে কুন্তীর মাতৃত্বধর্মের দাবী পরাভূত হইতে বাধ্য হইল। কিন্তু সকলক্ষেত্রেই এই লাঞ্ছনা ও পরাজয়, পরাভব ও অবমাননার ভিতর দিয়াই সত্য মানবধর্ম তাহার বিজয়বার্তা ঘোষণা করিয়া গেল; এইখানেই কবির সৃষ্টিপ্রয়াসের সার্থকতা। তবু, যে খণ্ডিত রাজধর্ম বা সমাজধর্ম, লোকাচার বা ব্যবহারিক ধর্মের সংকীর্ণতার প্রতি আমাদের মন বিরূপ হয়, সেই খণ্ডিত ধর্মের যুক্তি ও ভাষণ যাহাদের মুখ হইতে বাহির হইতেছে তাহারা কেহই ক্ষীণ-মানস

অথবা দুর্বল-কণ্ঠ নহেন; দুর্যোধন অথবা ভানুমতীর যুক্তি ও বাক্য-ভঙ্গিমা, কর্ণের যুক্তি বা ভাষণ তাহাদেরই উপযুক্ত, তাহারা প্রত্যেকে যে যে ধর্মে বিশ্বাসী সেই সেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তাহারা, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কলাকৌশল অতুলনীয়। প্রাচীন কাব্য ও পুরাণ ইতিহাসের কাহিনীগুলি এবং কাহিনীর চরিত্রগুলি এই নাট্যকাব্য চারিটিতে যে নূতন এবং অতুলনীয় মহিমা ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে, যে নূতন সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে, যে নূতন অর্থ-নির্দেশ লাভ করিয়াছে তাহা সম্ভব হইয়াছে নূতন যুগের নূতন মানস-দৃষ্টির বলে, এবং সে সম্বন্ধে কবির সচেতন সৃষ্টি-প্রতিভার সহায়তায়।

"কথা"-গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা পূর্বেই আমি বলিয়াছি যে, "কথা" ও "কাহিনী" এই দুই গ্রন্থেরই উপাদান আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে আহৃত। ইহা কিছু আকস্মিক নয়। আমাদের অতীত ইতিহাসের অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনা ও কাহিনীর মধ্যে যে ত্যাগ, ক্ষমা, বীর ধর্ম এবং মানব-মহত্ত্বের যে-সব গুণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই এই গ্রন্থ দুইটির প্রাণরস জোগাইয়াছে, এবং পরে ইহারই ধারা গীতি-কবিতাকারে প্রার্থনায় রূপান্তরিত হইয়া "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানব মহত্ত্বের, মানবের চিরন্তন সত্য নিত্য ধর্মের যে মহান্ রূপ আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে থাকিয়া থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার উপলব্ধিতে ধরা দিয়াছে, এবং এই দুই গ্রন্থে রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি, ফরাসী বিপ্লবের ফলে য়ুরোপে যে-চিন্তাধারা মুক্তিলাভ করিয়াছিল তাহার আদর্শ ছিল সর্ববন্ধনমুক্ত মানবধর্মের আদর্শ, সত্য নিত্য ধর্মের আদর্শ। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদেই বাঙ্‌লাদেশের শিক্ষিত সমাজের মনে সেই আদর্শ প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, শতাব্দীর শেষাশেষি বাঙালী চিত্তে স্বাজাত্যবোধ জাগিবার ফলে এই আদর্শ আরও গভীর ভাবে মুদ্রিত হয়, এবং রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেই এই আদর্শ শ্রেষ্ঠ বাণীরূপ লাভ করে। এই সত্য নিত্য মানবতার আদর্শ আসিল অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাধনার ডানায় ভর করিয়া, কিন্তু রবীন্দ্র-মানসের চেষ্টা হইল এই আদর্শের সন্ধান ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে খুঁজিয়া

বাহির করা। সেই চেষ্টা সার্থক কাব্য ও নাট্য-রূপান্তর লাভ করিল "বিসর্জনে", "মালিনী"তে, "কথা"-গ্রন্থের গাথাগুলিতে, "কাহিনী"-গ্রন্থের নাট্যকাব্যগুলিতে।

(৫)

রবীন্দ্রনাথ একান্তই গীতধর্মী কবি, একথা সকলেই জানেন। তাঁহার এই গীতধর্মী মানস শুধু যে বিচিত্র কাব্য-রূপের মধ্যেই প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহাই নয়, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস এমন কি প্রবন্ধ-রচনায়ও এই মানসের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। যে সাহিত্য-রূপের মধ্যে কল্পলোকের সঙ্কেত ও রহস্য প্রকাশের অবসর বেশী, মনের লীলা যেখানে অবাধে পক্ষ বিস্তারের সুযোগ পায়, রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের প্রসার এবং বৈচিত্র্যও সেইখানে তত বেশী। কিন্তু যেখানে এই বস্তু জগতের ঘটনা ও পরিবেশের তরঙ্গলীলা এই ইন্দ্রিয় জগতের সকল দৃশ্য বস্তুকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, মনন ও বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া বস্তু-পরিবেশ সম্বন্ধে একান্তভাবে চিত্তকে সজাগ রাখে, রবীন্দ্র-মানস সেই জাগ্রত বিক্ষুব্ধ বিচিত্রতার মধ্যে সহজ বিহারের আনন্দ খুঁজিয়া পায় না, সর্বদাই তাহার পশ্চাতে সঙ্কেত-রহস্যময় ইন্দ্রিয়াতীত ভাব-বস্তুটিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তবে তাহার প্রতিভা তৃপ্তি পায়। সেইজন্যই আমার মনে হয় শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় যখন বলিয়াছিলেন।

> "—রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, ছোটগল্পে, উপন্যাসে, য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে মূল সুর তাহার বিচিত্র খেলা আছে, বিশ্বমানবিকতায় তিনি বাল্জাক্, ব্রাউনিঙ্, হুগো প্রভৃতি কোনো লেখক হইতেই ন্যূনতর ন'ন বটে, তবে তাঁর মানবসৃষ্টিতে সেই বৈচিত্র্য কোথায়, সে বাস্তবতা কোথায়, সে অভিজ্ঞতার স্তরপর্য্যায় কোথায়, সে উত্থানপতনের তরঙ্গমালা কোথায়, সে পাপপুণ্যের ঘাতপ্রতিঘাত কোথায়, যাহা সমুদ্রের মত য়ুরোপীয় সাহিত্যকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছে। এইজন্য লিরিক্ কাব্যে যেখানে বস্তুর বালাই নাই, শুধু ভাবের লীলাসঙ্গীতে তিনি ক্রন্দমান সেখানে তিনি অতুল। এইজন্য ছোটগল্পে যেখানে ঘটনার চেয়ে ঘটনার মর্মনিহিত সুরটিই রচনার যোগ্য সেখানেও তাঁর তুলনা নাই; কিন্তু নাট্যোপন্যাসে নয়, অবশ্য রূপক নাট্য বাদে।"

তখন তিনি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে রবীন্দ্রনাথ ঠিক্ বাল্‌জাক্, ব্রাউনিঙ্ বা হুগোর যুগের লেখক নহেন; পৃথিবীর চিন্তাধারা, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শ সে যুগ হইতে অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াছে। ঘটনার স্তর-পর্যায়, উত্থান-পতনের তরঙ্গমালা মানব-হৃদয়কে বিচিত্র দোলায় দোলা দেয়, চিত্তকে সংক্ষুব্ধ করে এ কথা সত্য; কিন্তু য়ুরোপীয় সাহিত্যও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেই এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল যখন সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, বাস্তব ঘটনার তরঙ্গলীলার মধ্যে, মানুষের জীবনের সংক্ষুব্ধ সংগ্রামের আপাতঃ অভিভবের মধ্যে সাহিত্যকে নিবদ্ধ হইতে দিলে অন্তরের সঙ্কেত রহস্যটিকে ধরা যায় না; তাহাকে খুঁজিতে হইবে সকল ঘটনার সকল সংগ্রামের মর্মার্থটিকে, ভারতবর্ষের প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধান ও সাহিত্যানুশীলন যেমন করিয়া সকল ঘটনা সকল সংগ্রামের পশ্চাতে খুঁজিয়াছে, সন্ধান লাভ করিয়াছে একটি চরম সত্যের, একটি গোপন রহস্যের। সেইজন্যই কি ষ্ট্রীণ্ড্‌বার্গ, কি ইব্‌সেন, কি মেটারলিঙ্ক, কি ইয়েট্‌স্, সকলের রচনার মধ্যেই পাই একটি নীরবতার সাধনা, একটি মুখর স্তব্ধতার পূজা—ইহাদের, বিশেষ করিয়া মেটারলিঙ্কের, ইয়েট্‌সের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে আছে একটি মগ্নচৈতন্যের রাজ্য যেখানে একটি মানবাত্মা অপর একটি মানবাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে বাক্যহীন ভাষায় কথা বলে। কর্ম-ক্লান্ত সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধ য়ুরোপের মর্মস্থল হইতে একটি আর্তনাদ ইহাদের শ্রুতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে-আর্তনাদের সান্ত্বনা ইহারা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে সুরু করিয়া বিগত মহাসমর পর্যন্ত (১৯১৪-১৯১৯) য়ুরোপীয় সাহিত্য এই জিনিষটিই শিল্পরূপ পাইয়াছে যে, শান্তি ও নীরবতার মধ্যেই মানুষ মানুষকে চিনিতে পারে ও জানিতে পারে; উত্থান-পতনের, ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গমালার মধ্যে নয়, মানুষের একটুখানি শান্ত দৃষ্টির মধ্যে, একটি মুহূর্তের নীরব পরিচয়ের মধ্যে, একটি মাহেন্দ্রক্ষণের হস্তস্পর্শের মধ্যেই সমস্ত জীবনের রহস্য নিহিত আছে; সেই একটি মুহূর্তেই যাহা জানিবার, বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার, তাহা আমরা জানিতে, বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারি। ইহাই হইতেছে মহাসমর-পূর্ব য়ুরোপীয় সাহিত্যের মূল সুর; য়ুরোপে ইহার উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের সাহিত্যনায়কেরা। মেটারলিঙ্ক নিজেই তাঁহার একটি প্রবন্ধে এই সুরের আভাস প্রদান করিয়াছেন,

"Indeed it is not in the actions but in the words that are found the beauty and greatness of tragedies that are truly beautiful and great, and this is not solely in the words that accompany and explain the action, for there must perforce be another dialogue beside the one which is superficially necessary. And, indeed, the only words that count in the play are those that at first seemed useless, for it is therein that the essence lies. Side by side with the necessary dialogue will you almost find another dialogue that seems superfluous ; but examine it carefully, and it will be borne home to you that this is the only one that the soul can listen to profoundly, for here alone is it the soul that is being addressed" ('The tragical in daily life', "The treasure of the humble," p. 111)

মেটারলিঙ্ক অন্যত্র বলিয়াছেন,

"It is no longer a violent, exceptional moment that passes before our eyes—it is life itself. Thousands and thousands of laws there are mightier and more venerable than those of passion......It is only in the twilight they can be seen and heard, in the meditation that comes to us at tranquil moments of life."

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের এই সঙ্কেত-রহস্যের অনুগামী কবি, অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখক। কিন্তু সাহিত্যের এই যে বিশিষ্ট সুর, ইহা রবীন্দ্রনাথের কাছে একেবারে নূতন কিছু নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সমস্ত মর্মকে উদ্ঘাটন করিয়া এই আদর্শ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সত্যকেই জীবনে সাধনা করিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের আদিপর্বের সমস্ত সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার ভিতর হইতে এই চিরন্তন সত্যটিকেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঘটনাও কর্মকৃতির ভিতর তাঁহার কবিধর্ম ততটা বিকশিত হয় নাই, যতটা হইয়াছে তাহার নিংড়ান ঘনরসের ভিতর। তিনি যখন পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির মধ্যে ডুবিয়া আছেন তখনও যাহা দৃশ্য, যাহাকে ধরিতে ছুঁইতে ভোগ করিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে তিনি আনন্দসৃষ্টি করিতে পারেন নাই; খুঁজিয়াছেন সঙ্কেতকে, অরূপকে, রূপাতীতকে। জীবনের দৈনন্দিন অসংখ্য ঘটনার

উপর দিয়া শুধু চোখ বুলাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু মন ডুবিয়া গিয়াছে তাহাদের অনেক নীচে, সেই অন্তরের তলদেশে যেখানে কোনও কথা নাই, কোনও কাজ নাই; আছে শুধু একটি প্রশান্ত স্থির অথচ সুতীব্র অনুভূতির সুর।

গান ও কবিতা, নাট্য ও নিবন্ধ, গল্প ও উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ অজস্র রচনা করিয়াছেন; কিন্তু, আজ যদি কেহ প্রশ্ন করে, কোন্ বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলে হঠাৎ তাহার কিছু জবাব দিতে পারা যায়না। তবে একটা জিনিষ খুবই সত্য বলিয়া মনে হয় যে মানব-চিত্তের দ্বন্দ্ব যেখানে যত নিবিড় ও প্রবল, সংগ্রাম যত সূক্ষ্ম ও বিচিত্র, অথচ কার্যের মধ্যে, বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে, দৃশ্য ঘটনার মধ্যে যাহার প্রকাশ খুব কম এবং সেই অনুপাতে হৃদয়ের মধ্যে যাহার অনুভূতি খুব তীব্র, মানব-চিত্তের সেই রহস্যের গভীরতা যেখানে যত বেশী, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেইখানে তত বেশী ফুটিয়াছে। সেইজন্য দেখি যেখানে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত খুব বেশী, জগৎ ও জীবনের উত্থান-পতনের তরঙ্গমালা যেখানে ঠেলাঠেলি করিয়া মরিতেছে, শতকণ্ঠের কোলাহল যেখানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেইখানে মূক হইয়া গিয়াছেন। সেই কলহের মধ্যে, সেই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, সেই উত্থান-পতনের তরঙ্গ-লীলার মধ্যে তিনি নিজেকে কখনও ভাল করিয়া জড়াইতে পারেন নাই, দূরে থাকিয়া এ সকলের অন্তরের মধ্যে যে মূল সুরটি তাহাই ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেইজন্যই নাটক বলিতে সাধারণতঃ যে ঘটনা-বহুল বৈচিত্র্যবহুল সাহিত্যের রূপ আমরা বুঝিয়া থাকি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সে-নাটকের সৃষ্টি নাই। তাঁহার হাতে নাটক যে-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা মোটেই ঘটনাগত নহে, ভাবগত। এবং এইজন্য রবীন্দ্রনাট্যের একটা বিশেষ রূপ আছে, যাহা বাঙ্‌লা নাট্য-সাহিত্যে ত নাইই, সংস্কৃত নাট্যেও ঠিক তেমনটি দেখা যায়না। কিন্তু ঘটনার লীলাবৈচিত্র্যই যাহার প্রাণ, যেমন সাধারণ নাট্য ও উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেইখানে সার্থক হইতে পারে নাই। সেইজন্যই উপন্যাস তাঁহার হাতে ততটা জমিয়া উঠে নাই, যতটা জমিয়াছে ছোটগল্প, যেখানে বস্তুর ঠেলাঠেলি নাই, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত নাই, আছে শুধু বস্তুর পশ্চাতে ঘটনার পশ্চাতে বস্তুর ও ঘটনার ছায়ারূপ। সেইজন্যই গীতিকাব্যে, ভাবনাট্যে, ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। উপন্যাসেও সেই-

খানেই তিনি সার্থকতা লাভ করিয়াছেন যেখানে এক একটি চরিত্রের মধ্যে মানবচিত্তের অতি সূক্ষ্ম সুকঠিন ভাবরহস্যকে তিনি রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। সেখানে তিনি অতুল।

আমার ত মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাব ও চিন্তাকে যখন একটা সাঙ্কেতিক রহস্যের ভিতরে নাট্যরূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াইছেন, তখন তাহার মধ্যে তিনি শিল্পময় জীবনকে ততটা স্থান দিতে চাহেন নাই, যতটা চাহিয়াছেন সমস্ত জীবনকে একটা পরিপূর্ণ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করিতে; আমাদের প্রতিদিনের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের, আমাদের কাল্পনিক ও ব্যাবহারিক জগতের পশ্চাতে, আমাদের দৃশ্য ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতির পশ্চাতে যে সুমহান্ সত্য নিরন্তর বিচিত্র ছন্দে আন্দোলিত হইতেছে তাহাকেই রূপ দান করিতে। তাঁহার কবিতাগুলিতে আমরা দেখি জীবনের নানান্ বিচিত্র দুঃখ ও বেদনা, তৃপ্তি ও আনন্দের অনুভূতিকে তিনি খণ্ড খণ্ড ভাবে উপভোগ করিয়াছেন, এক ভাবলোক হইতে অন্য ভাবলোকের মধ্যে ধীরে ধীরে আপনার রসতৃষ্ণাকে রূপায়িত করিয়াছেন, কিন্তু নাটকের মধ্যে ঠিক্ এই জিনিষটির অভিজ্ঞতা আমরা খুব কমই পাই। সেখানে আমরা পাই, জীবনের যে ভাবলোকের মধ্যে যখন তিনি বাস করিয়াছেন তাহার সমস্ত খণ্ড ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা ও অনুভব এক হইয়া গিয়া একটা পরিপূর্ণ সত্যকে ব্যক্ত করিতেছে। "শারদোৎসব" হইতে আরম্ভ করিয়া কি "ডাকঘর" কি "ফাল্গুনী", কি "মুক্তধারা", কি "রক্তকরবী" সর্বত্রই এই জিনিষটা কেমন করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে আমরা ক্রমে তাহা প্রত্যক্ষ করিব।

নাটক বলিতে সাহিত্যের একটা বিশেষ ভঙ্গিমাকে আমরা বুঝিয়া থাকি যাহা কাব্য কিংবা উপন্যাস হইতে পৃথক। কবি যখন কাব্য রচনা করেন, তখন তিনি নিজেই আপন মনে কথার পর কথা বিচিত্র ছন্দে গাঁথিয়া তোলেন। প্রাচীন মহাকাব্য ছিল আবৃত্তির জন্য, এখনকার গীতিকাব্যও ঠিক্ আবৃত্তির জন্য না হইলেও, আপন মনে পাঠ করিবার জন্য। তাহার রস ও সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য কবিকে কিংবা পাঠককে তাঁহার সঙ্গে আর কাহারও উপস্থিতিকে কল্পনা করিতে হয়না। উপন্যাসেও তাহাই; উপন্যাস স্বয়ং সম্পূর্ণ। লেখক তাঁহার কল্পনা ও সৃষ্ট চরিত্রের সার্থকতার জন্য যাহা

কিছু প্রয়োজন মনে করেন উপন্যাসের মধ্যে সবটুকুই বলিবার ও প্রকাশ করিবার সুযোগ যথেষ্ট। কিন্তু নাটকে কিছুতেই তাহা সম্ভবপর নয়; কাব্যে, উপন্যাসে ভাবের ও ঘটনার বিবৃতি আছে, বর্ণনা আছে; কিন্তু নাটকে আছে কথার ও গতির সাহায্যে বাস্তব ঘটনার অনুবৃত্তি বা অনুকরণ, অভিনেতার সাহায্যে নাটকে বর্ণিত কথা ও সৃষ্ট চরিত্রকে পূর্ণতর করিয়া দর্শকের আঁখির দৃষ্টি ও মনের অনুভবের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা। নাটকের মধ্যে সব কথা বলিবার স্থান নাই, সব চরিত্রকে পরিপূর্ণ করিয়া ফুটাইবার সুযোগ নাই, তাহার জন্য নির্ভর করিতে হয় অভিনেতার উপর, রঙ্গমঞ্চের উপর। সেই জন্যই সাহিত্যের এই বিশেষ ভঙ্গিমা অভিনেতা, অভিনয়-মঞ্চ ও দর্শকের সঙ্গে একান্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; শুধু পুস্তকের মধ্যে তাহার সমস্ত কথা ও ঘটনার বিবৃতি পাঠ করিয়া নাট্যরসের সম্পূর্ণ উপলব্ধি কিছুতেই হয়না। নাটক পড়িবার সময় কল্পনাকে সর্বদাই এমন করিয়া সজাগ রাখিতে হয় যে তাহার বর্ণিত সমস্ত বস্তু ও দৃশ্য যেন চোখের উপর অভিনীত হইতেছে, কিন্তু উপন্যাসে ইহার ততটা প্রয়োজন অনুভব করা যায়না। নাটকের এই বিশেষ ভঙ্গিমা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ও য়ুরোপের প্রাচীন গ্রীক নাটক হইতে আরম্ভ করিয়া বহুদিন পর্যন্ত স্বীকৃত হইয়াছে; আমাদের কালিদাস, ভবভূতির নাটক, গ্রীসের য়্যাটিক্ ট্রাজেডি, ইংলণ্ডের ক্লাসিক্যাল ট্রাজেডি, অথবা তাহার পরে রোমান্টিক যুগের নাটক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের নাটকের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট; অভিনয়ের পাত্রপাত্রীর, রঙ্গমঞ্চের ও প্রেক্ষাগৃহের সজ্জা ও ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি নাট্যরীতির আদর্শ দেশে দেশে যুগে যুগে পরিবর্তিতও হইয়াছে; কিন্তু নাটকের এই মূল সূত্রটিকে এ পর্যন্ত কেহ অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাটকের এক নূতন রূপের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টি হঠাৎ হয় নাই; ইহার পশ্চাতে একটু ইতিহাস আছে। ইংরাজী সাহিত্যে ষ্বার্ড্‌সওয়ার্থ, শেলি, ফরাসী সাহিত্যে বদ্‌লেয়ার প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষকে, তাহার সমস্ত কথা ও কর্মকে, প্রকৃতিকে, তাহার সমস্ত প্রকাশকে একটা অপরূপ অবাস্তব রহস্যের দিক্ হইতে—ইংরাজীতে যাহাকে বলি symbolical বা mystical দিক্ হইতে—বুঝিবার ও জানিবার চেষ্টা দেখা দিয়াছে। এই প্রয়াস সব চাইতে বেশী করিয়া ফুটিয়াছে নাট্যে, কবিতায় ও ছোট গল্পে; তাহারই ফলে মেটারলিঙ্ক,

ষ্ট্রীণ্ড্বার্গ, ইয়েটস্, আন্দ্রিফের রূপক-নাট্য। এই রূপক-নাট্য অভিনয়-মঞ্চ বা দর্শককে যেন কতকটা অবজ্ঞা করিয়াই চলিয়াছে; নাটক বলিতে আমরা এতদিন যাহা বুঝিয়া আসিয়াছি, রূপক-নাট্যের মধ্যে তাহার সবটুকু যেন কিছুতেই পাই না। অভিনীত না হইলেও ইহার মর্মকথাটিকে বুঝিবার, ইহার রস ও সৌন্দর্য উপভোগ করিবার সুযোগের কিছু অভাব হয় না। না হইবার কারণও আছে। (পূর্বে যে মগ্নচৈতন্যের রাজ্যের কথা, নীরবতার সাধনা, স্তব্ধতার পূজার কথা বলিয়াছি রূপক-নাট্য মনের সেই অরূপ বা রূপাতীত রাজ্যের সৃষ্টি। সে-সৃষ্টির মধ্যে বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব নরনারীর সত্যকার কোনও স্থান নাই; নাটকের প্লটের, তাহার নরনারীর গতির বা কর্মের কোনও প্রাধান্য সেইখানে নাই বলিলেও চলে। কোনও চরিত্র হয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা অভিনয়-মঞ্চের উপর চুপ করিয়াই কাটাইয়া দেয়; কেহ হয়ত দু'টি একটির বেশী কথা বলে না, কেহ হয়ত প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুপস্থিতই থাকিয়া যায়, কেহ হয় ত গানের পর গান গাহিয়াই চলে— খুব একটা সচল গতি, একটা দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম মঞ্চের উপর মুখর করিয়া তুলিয়া দর্শকের দৃষ্টি ও চিত্তকে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে একান্ত ভাবে সজাগ করিয়া তুলিবার সুযোগ সেখানে খুব কমই পাওয়া যায়।) সেই জন্যই দেখা গিয়াছে রূপক-নাট্য অভিনয়ের জন্য সব সময় একটা অভিনয়-মঞ্চেরও দরকার হয়না, যে কোনও গৃহে অথবা মুক্ত আকাশের নীচে একটা স্থান নির্দিষ্ট করিয়া আগাগোড়া একই দৃশ্যপটের সম্মুখে সবটুকু অভিনয় করা যাইতে পারে; রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" "শারদোৎসব" "ডাকঘর" প্রভৃতি নাটকের অভিনয়-সজ্জা সেইজন্যই এত সহজ, সরল ও নিরলঙ্কার। না হইবেই বা কেন? রূপক-নাট্য প্রথম হইতেই দৃশ্য বাস্তব-ঘটনাকে, বাস্তব-চরিত্রকে কিছুটা অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, মানিয়া লইয়াছে ঘটনার ও চরিত্রের যাহা রূপ তাহার পশ্চাতের অরূপ অপ্রকাশকে, ইন্দ্রিয়-প্রকাশের পশ্চাতে অতীন্দ্রিয় ইঙ্গিতকে; এই অরূপ অতীন্দ্রিয় জগৎই সাঙ্কেতিক রহস্য-নাট্যের জগৎ। সেই হেতুই দর্শক ও অভিনয়-মঞ্চ কতকটা লেখকের বিচার-বিবেচনার পশ্চাতে পড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে এবং নাটকের মধ্যে যে-সত্য ও যে-ভাবের অনুভূতির প্রকাশ লেখকের উদ্দেশ্য, সেই সত্যটাই সমস্ত ঘটনার, সমস্ত কথাবার্তা চালচলনের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের একজন

শ্রেষ্ঠ নাট্যকার Gerhart Hauptmannএর কথায় এই রূপক-নাট্যের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইবে,

"Action upon the stage will, I think, give way to the analysis of character and to the exhaustive consideration of the motives which prompt men to act. Passion does not move at such headlong speed as in Shakespeare's day, so that we present not the actions themselves, but the psychological states which cause them'"

ইহাই সাঙ্কেতিক রহস্য-নাট্যের রূপ, ভঙ্গিমা। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাট্য-প্রয়াসগুলি এই রূপ,এই ভঙ্গিমার ভিতর দিয়াই রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এক হিসাবে এই রূপক-নাট্যগুলি ছোটগল্পেরই নাট্যরূপান্তর মাত্র। মেটারলিঙ্কের "L 'Intruse," "Les Sept Princes," "L 'Interieur" প্রভৃতি নাটকগুলি যাঁহারা পড়িয়াছেন, ইয়েট্‌সের নাটক, রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর", "অচলায়তন," "রক্তকরবী" প্রভৃতি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই এ-কথা স্বীকার করিবেন। রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের নাটকগুলির সত্যকার কোনও প্লট নাই, কোনও গল্প নাই। য়ুরোপীয় সাহিত্য-সমালোচকেরা ত এই ধরণের নাটককে সোজা no-plot plays বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন! কিন্তু এই যে রূপকের কথা বলিতেছি, অরূপের ব্যঞ্জনার কথা বলিতেছি, ইহার অর্থ কি?

আমাদের মনে এক এক সময়ে এক একটা চিন্তাধারা খেলিয়া যায়, এমন একটা রাজ্যের আভাস আমরা পাই, যে-চিন্তাকে এই দৃশ্য বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আনিয়া কিছুতেই রূপ দেওয়া যায় না, যে-রাজ্যের সঙ্গে আমাদের এই প্রতিদিনের সংসারের কোনও মিল কোনও যোগ নাই, অথচ মনের মধ্যে তাহার অনুভূতি এত তীব্র,এত প্রবল, এত সত্য যে, তাহাকে কিছুতেই এড়ান যায় না, তাহাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই যে চিন্তাধারা, এই যে স্বপ্নরাজ্য, ইহার আভাস মানুষকে দিতে হইবে; কাজেই কবিকে, লেখককে আমাদের বাস্তব জগতের ভাষার এবং কর্ম্ম-কৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কবি যখন এই আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখনই বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে অন্তরের অধ্যাত্ম-চিন্তাধারার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহাতেও কবির অতৃপ্তি থাকিয়াই যায়, কারণ, যে কথার, যে-ভাষার যে-কর্ম্ম-কৃতির আশ্রয় তিনি গ্রহণ করেন, তাহারা কিছুতেই তাঁহার সূক্ষ্ম সুগভীর ভাব

ও অনুভূতিকে পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। কাজেই কথাগুলি কর্ম-কৃতিগুলি তাঁহার নিকট শুধু ছায়া মাত্র, আভাস মাত্র, গভীরতর অর্থের দিকে শুধু ইঙ্গিত করে মাত্র, তাহাকে পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে পারে না। সংস্কৃত ধ্বনি-কাব্য কতকটা এই জাতীয়। সে-কাব্যের অর্থটি আমরা পাই তার ধ্বনির মধ্যে, অর্থাৎ কথার মধ্যে নয়, পদযোজনার মধ্যে নয়, কথার অর্থের মধ্যে নয়, যাহা বলা হইল অর্থ রহিল বলা-কে ছাড়াইয়া বলা-টা শুধু অর্থের দিকে ইঙ্গিত করিল মাত্র। প্রায়ই দেখা যায় এই ধরণের লেখার মধ্যে অতি ছোট একটি কথা, অতি সাধারণ একটু আলাপ, নগণ্য ক্ষুদ্র একটি প্রাণী একটি অতীন্দ্রিয় অবাস্তব গভীরতর জগতের আভাস দেয়, অথচ কিছুতেই তাহাকে সুনির্দিষ্টভাবে বুঝা যায় না, ধরা যায় না। সেই জন্যই কি রূপক-কবিতায়, কি রূপক-নাট্যে, সমগ্র সাহিত্য-বস্তুটি জুড়িয়া একটি মায়াময় কুহেলিকা যেন সবকিছুকে ঢাকিয়া রাখে, পাঠকের চিত্তের উপর একটা মায়াস্পর্শ বুলাইয়া দেয় এবং মনের মধ্যে একটা স্বপ্নরাজ্য গড়িয়া তুলে। "ফাল্গুনী"র কিংবা "শারদোৎসবে"র কিংবা "ডাকঘরে"র হঠাৎ-বলা অনেকগুলি কথা আমরা ধরিতে পারি না বা বুঝিতে পারি না; বাস্তবিক পক্ষে সে-কথাগুলি ধরিবার বা বুঝিবার জন্য নয়, অনেকগুলি কথা মিলিয়া একটা অনুভূতির আভাসমাত্র মনের মধ্যে জাগাইবার জন্য। "মহারাজ আমার কথা বুঝবার জন্য নয়, বাজবার জন্য" ("ফাল্গুনী") এ-কথাটার একটা অর্থ আছে। সত্যই, রূপক-রচনায় সব কথা বুঝিবার জন্য নয়, শুধু মনের মধ্যে একটা সুরকে বাজাইবার জন্য; এই সুরই রূপক-রচনার সবখানি। "ডাকঘরে"র ঠাকুর্দা অথবা অমল, অথব ডাকহরকরা প্রভৃতি চরিত্রগুলি প্রায়ই কতকটা হেঁয়ালি, "রক্তকরবী"র রঞ্জন, রাজা, নন্দিনী, এদের কিছুতেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, কারণ সমগ্র রচনাটি কোথাও ইহাদের ব্যক্তিত্বের দিকে, ইহাদের কর্মকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে না, করে আমাদের দৃশ্য বস্তুর ও জগতের প্রত্যন্ত প্রদেশের সীমা ছাড়াইা একটা কল্পজগতের দিকে। রঞ্জন, নন্দিনী, অমল, এরা সবই সেই কল্পজগতের অধিবাসী, কাজেই এদের ভাষা রাজা অথবা কবিরাজ মশায় বা ঠাকুর্দা ইহারা সহজে বুঝিতে পারে না, আর আমরা পাঠকেরাও তাহাদের কথার সুরটুকু শুধু ধরিতে পারি, কথাটিকে পারি না, ছায়াটিকে পারি, কায়াটি ছায়ার মত মিলাইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সব রূপক-নাট্যেই,

পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রে যাহাকে বলে ঘটনা বা action তাহা নাই বলিলেই চলে, শুধু একটু কাঠামো মাত্র আছে, তাহারই ভিতর দিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া মানব-মনের ও প্রকৃতি-জগতের একটি সুমহান্ সুমধুর সত্য আমরা আবিষ্কার করি। মানুষ যে অনির্বচনীয় অন্ধকারের মধ্যে তাহার অন্তরের মণিটিকে হারাইয়াছে, কবি যেন একটু আলোর আভাসে, একটু জ্যোতির ইঙ্গিতে সকলকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে চাহেন। কবিরাজ আসিয়া চরক-সুশ্রুত হইতে শ্লোক উচ্চারণ করেন, রাজা শারদোৎসব করিতে বাহির হ'ন্, অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিয়া পড়ে, লোহার জাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া রাজা সকলের সঙ্গে উৎসবে যোগদান করেন, ঘটনা হিসাবে ইহাদের মূল্য কতটুকু? ইহারা ত মায়া ছায়া মাত্র, কিন্তু ইহারাই এক একটি অমূল্য সত্যকে উদ্ঘাটিত করিয়াছে; অমল মরিয়া যায়, উপনন্দ বসিয়া বসিয়া প্রভুর ঋণ-শোধ করে, আর নন্দিনী-রঞ্জন প্রাণ দেয়, কিন্তু ইহারা যে সত্যের আভাস দিয়া যায় সেই আভাস, সেই অনুভূতিই নিত্য, শাশ্বত। ইহারা যাহা করে তাহা একটা চঞ্চল মুহূর্তের প্রকাশ মাত্র, ইহাদের কর্মকে বুঝি অন্তরের নিত্য অনুভব দিয়া। ইহাদের রূপের মধ্যে, ইহাদের সীমার মধ্যে একটা অরূপের অসীমের আভাস সুস্পষ্ট। সাহিত্যের কোনও বিভাগ যে এই ধরণের সঙ্কেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহার কারণ এই যে মানুষের ভাষা অথবা কর্ম-কৃতি কিছুতেই মানব-মনের সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতিকে ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, লেখক অথবা কবিকে বাধ্য হইয়াই তখন অন্য কিছুর আশ্রয় খুঁজিতে হয়, অথচ তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। সঙ্কেত-নাট্য কি কবিতায় যে একটা অস্পষ্টতা, একটা কুয়াসার জাল আচ্ছন্ন হইয়া থাকে তাহার কারণ ইহাই। অথচ আমরা জানি, এই যুগে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ভাষাসম্পদ্ বা ঘটনার পরিবেশ-রচনার ক্ষমতা আর কাহারই বা আছে! মানব-মনের কত সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতিকে তিনি তাঁর অনির্বচনীয় ভাষায় রূপায়িত করিয়াছেন, কত বাক্যহীন মূককে ভাষা দিয়াছেন, কিন্তু এমন সূক্ষ্মতর গভীরতর অনুভূতিও কবিচিত্তকে দোলা দিয়াছে যাহা ফুটাইয়া তুলিতে তিনি ভাষা পা'ন্ নাই, মূক হইয়া গিয়াছেন, এবং আকার-ইঙ্গিতে তাহার আভাস মাত্র দিয়াছেন। অমল কি তাহার দূরের অজানার অনুভূতিকে ভাষা দিতে পারিয়াছে, রঞ্জন কি তাহার ভালবাসাকে কথায় প্রকাশ করিতে পারিয়াছে, নন্দিনী কি তাহার জটিল অনুভূতিকে

ফুটাইতে পারিয়াছে? কবির মনে ইহাদের প্রত্যেকের অনুভূতি অতি তীব্র, অতি একান্ত ভাবে সত্য, কিন্তু সেই সুতীব্র অনুভূতি, সুনিবিড় সত্যের সম্মুখে কবির ভাষা মূক হইয়া যায়, শুধু অস্পষ্ট গুঞ্জন-ধ্বনি জাগিয়া থাকে।

ইহাই সাঙ্কেতিক রহস্তের রূপ। কিন্তু এ-রূপ রবীন্দ্রনাথ পাইলেন কোথায়? আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এ-রূপ রবীন্দ্রনাথের কাছে নূতন নয়। (এ-কথা সত্য যে আমাদের বাঙ্‌লা সাহিত্যে সাঙ্কেতিক রহস্তের এই বিশেষ অভিব্যক্তি কোথাও দেখা যায় নাই, সংস্কৃত সাহিত্যেও খুব কমই আছে; কিন্তু আমাদের দেশের ভাব ও চিন্তাধারার মধ্যে ইহার সন্ধান আমরা যথেষ্ট পাই। ইন্দ্রিয় জগতের পশ্চাতে অতীন্দ্রিয় জগৎকে জানিবার সাধনা, ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া ব্যক্তির অন্তরাত্মার সন্ধান লইবার ব্যগ্রতা, সকল কর্মের পশ্চাতে চরম সত্যকে পাইবার চেষ্টা ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সাধনার সর্বোত্তম আদর্শ; ভারতবর্ষের ইতিহাসের মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকে, আদর্শকে জানিয়াছেন।) পরিণত যৌবনকাল হইতেই তাঁহার প্রবন্ধে কবিতায় এই অরূপকে অতীন্দ্রিয়কে জানিবার একটা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে এবং মনের মধ্যে সত্যের আভাস ও ভাবের অনুভূতি ক্রমে যতই তীব্র ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এই অরূপ অতীন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি ততই আরও অস্পষ্ট, আরও কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া দেখা দিয়াছে। "খেয়া" হইতে আরম্ভ করিয়া এই রূপক-সঙ্কেত অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতি বহুদিন আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে; মনের এই অতি সূক্ষ্ম, সুতীব্র, একান্ত সত্য ভাব ও অনুভূতিই তাঁহাকে সাহিত্যের এই সাঙ্কেতিক রহস্তের জগতে আনিয়া পৌঁছাইয়াছে।

কিন্তু এই ধরণের নাটকের যে-রূপ, অর্থাৎ তাঁহার "ডাকঘরে" "অচলায়তনে" "ফাল্গুনী"তে "মুক্তধারায়" "রক্তকরবী"তে নাটকের যে রূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও কি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি? হঠাৎ এ কথার কি যে জবাব দিতে হইবে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। ভারতবর্ষের কি প্রাচীন কি আধুনিক কোনও সাহিত্যেই এই ধরণের নাটকের সাক্ষাৎ আমরা পাইনা; দেশের অতীত ও বর্তমান কোনও নাট্যরূপের সঙ্গেই এই নাটকগুলির একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। সংস্কৃত নাটকের যে রূপ ও অভিনয়-রীতি আমরা জানি, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লার যে নাট্য-রীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত,

রবীন্দ্র-নাট্যের রূপ ও অভিনয়-রীতি তাহার সহিত কোনই যোগ স্থাপন করিতে পারেনা। আমাদের দেশের যাত্রাভিনয় বা কথকতার নাট্যরীতির সঙ্গেও যে কোনও গভীর সাদৃশ্য আছে তাহা ও মনে হয়না। এমনাবস্থায় যদি বলি, রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট নাট্যরূপ সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজস্ব সৃষ্টি নহে, কতকটা পাশ্চাত্য রূপ দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহা হইলে খুব ভুল করিব কি? মনে রাখিতে হইবে, আমি সঙ্কেতের রূপের কথা বলিতেছিনা, রচনারীতির কথা বলিতেছি না, ভাব বা অনুভূতির স্বরূপের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি শুধু নাট্যরূপের কথা। কথাটাকে ভাল করিয়া খুলিয়াই বলিতেছি।

য়ুরোপে সেক্‌স্‌পীয়র হইতে আরম্ভ করিয়া মোটামুটি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত নাট্যের একটা নির্দিষ্ট রচনারীতি এবং একটা বিশিষ্ট ভঙ্গিমা চলিয়া আসিতেছিল। এখনও যে তাহা চলেনা, এমন কিছুতেই বলা যায় না, তবে তাহার আদর কতকটা কমিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্র-পূর্ব বাঙ্‌লা নাটকে আমরা কতকটা প্রাচীন সংস্কৃত নাটক এবং পাশ্চাত্য নাটক-রচনারীতির ও অভিনয়-পদ্ধতিরই প্রভাব দেখিতে পাই। কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়র অথবা তাঁহার পরবর্তী নাট্যকারেরা মানুষের ইন্দ্রিয়-সংগ্রামকে অভিনয়-মঞ্চে নানান্ ঘটনার সাহায্যে যেমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যেমন করিয়া সে-সংগ্রামকে ভাষা দিয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পাশ্চাত্য নটগুরুরা সে-ভাষাও সে-রূপ লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা, বিশেষ করিয়া স্ট্রীণ্ডবার্গ, মেটারলিঙ্ক, ইয়েট্‌স্, আন্দ্রিফ, হাউপ্‌টম্যান প্রভৃতি সাহিত্য-নায়কেরা নাট্য-রীতির একটা আমূল পরিবর্তন করিতে চাহিতেছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন বর্তমান মানবের ভাব ও চিন্তাধারা উন্নত, মার্জিত ও সংস্কৃত এবং জীবনের দৈনন্দিন ইন্দ্রিয়-সংগ্রামের ধারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল। এই নবলব্ধ জীবনের সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতিকে ফুটাইবার জন্য নাটকের নূতন রচনা-রীতি, নূতন প্রয়োগ-পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে হইবে। শুধু কাব্যেই নয়, নাটক-রচনা এবং অভিনয়ের মধ্যেও সঙ্কেতের, অরূপের, অতীন্দ্রিয়ের আভাস ও প্রকাশকে ফুটাইতে হইবে; বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের জন্য ইন্দ্রিয়ের যে সংগ্রাম তাহাকে নয়, অরূপকে জানিবার, অতীন্দ্রিয়ের আস্বাদন লাভের জন্য আত্মার যে নিরন্তর সংগ্রাম, তাহাকে রূপ দিতে হইবে। হ্যামলেট অথবা ওথেলোর মধ্যে অরূপ আত্মার যে চিরন্তর সংগ্রামের অস্পষ্ট আভাস, তাহাকেই সমগ্র

নাটকটির ভাবে ও ভাষায় পরিপূর্ণ করিয়া রূপায়িত করিতে হইবে, বহিরিন্দ্রিয়ের যে সংগ্রাম ওথেলো অথবা হ্যামলেটের কর্ম-কৃতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে নয়। ভাবের মধ্যে, চিন্তাধারার মধ্যে এই পরিবর্তনের ফলেই যুরোপের রূপক-নাট্যের যে-রূপ তাহার সৃষ্টি। তাহারই ফলে মেটারলিঙ্কের মত একাঙ্ক নাটক, ষ্ট্রীণ্ডবার্গের নাটক, আন্দ্রিফের নাটক, ইয়েট্স্এর নাটক প্রভৃতির সৃষ্টি। আমি পূর্বেই বলিয়াছি রূপ অপেক্ষা অরূপ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অতীন্দ্রিয়ের আভাস চিরকাল রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে দোলাইয়াছে; কবিতায় তাহার প্রকাশ বিশেষভাবে "খেয়া" হইতেই দেখা গিয়াছে, কিন্তু নাটকে এই অরূপের, সঙ্কেতের যে প্রকাশরীতি ও ভঙ্গিমা তাহা সহজে দেখা যায় নাই। একটা রূপকে, একটা ভঙ্গিমাকে হয়ত তিনি খুঁজিতে-ছিলেন, কিন্তু তাহা সহজে তিনি পান নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাঙ্কেতিক রহস্য-নাট্য "শারদোৎসব" রচিত হইয়াছিল ১৩১৫ সালে। তাহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য, কাব্য-নাট্য অনেক রচনা করিয়াছিলেন। "বাল্মীকি-প্রতিভা" "মায়ার খেলা" হইতে আরম্ভ করিয়া "বিসর্জন" "মালিনী" পর্যন্ত রবীন্দ্র-নাথ নাটকের যে-রূপকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে কিছুতেই "শারদোৎসব" "ডাকঘর" "মুক্তধারা" "রক্তকরবী"র রচনা-রূপের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান দিতে পারা যায়না। "শারদোৎসব" হইতে আরম্ভ করিয়াই পুরাতন নাট্য-রূপ হঠাৎ একেবারে বদলাইয়া গেল। এই নব নাট্যরূপ যে কি বস্তু তাহার আভাস পূর্বেই দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার মনে হয় এই বিশিষ্ট নাট্যরূপের বিকাশ একেবারে আপনা হইতে হয় নাই। "মালিনী"র পর, "শারদোৎসবে"র আগে রবীন্দ্রনাথ আর কোনও উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেন নাই। "মালিনী" রচিত হইয়াছিল ১৩০৩ সালে "শারদোৎসব" রচিত হইয়াছিল ১৩১৫ সালে। এই সুদীর্ঘ বার তের বৎসরের মধ্যে ১৩০৭ সালে একটি মাত্র প্রহসন, "চিরকুমার সভা" রচিত হইয়াছিল। তাহার পর "শারদোৎসবে" যে সঙ্কেত-নাট্যের রূপ দেখা দিল তাহা পূর্বতন নাট্য-রূপ হইতে একেবারেই পৃথক। আমি পূর্বেই বলিয়াছি নাটকের মধ্যে অরূপের অতীন্দ্রিয়ের প্রকাশ কি রূপে কি ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করা যায় তাহা হয়ত তিনি খুঁজিতেছিলেন; এই সুদীর্ঘ বার বৎসরের নীরবতার অবকাশে তিনি তাহার আভাস লাভ করিলেন দেশের অতীত সাহিত্য-সাধনার মধ্যে

নয়, নিজের সৃষ্টি প্রচেষ্টার মধ্যে বলিয়াও মনে হয়না, পাইলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য-সাধনার নাট্য-রূপের মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর অরুণোদয়ের পূর্বেই এই বিশিষ্ট নাট্য-রূপ সেখানে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এই নাট্য-রূপ দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারেন নাই। নহিলে সুদীর্ঘ একযুগ পরে "শারদোৎসবে", "অচলায়তনে" "ডাকঘরে" হঠাৎ "রাজা ও রাণী", "বিসর্জনের" নাট্য-রূপ বদ্‌লাইয়া গিয়া নূতন রূপ অবলম্বনের কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইনা।

আমি সমস্ত জিনিসটাকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া ভুল করিলাম কি না জানিনা; ইহাও হইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই নব নাট্য-রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন, পাশ্চাত্য নাট্য-রূপ দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই। এ-সম্ভাবনাকে আমি কিছুতেই অস্বীকার করিব না, তবে বিশ্ব-সাহিত্যের ধারাস্রোতের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাট্যগুলির রূপ ও ভঙ্গিমা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমার কাছে এই অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই নব নাট্যরূপের প্রভাবই রবীন্দ্র-নাট্যকে সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত করিতে পারে নাই; তিনি সেই রূপের আভাস মাত্র পাইয়াছিলেন, ছায়াটিকে মাত্র জানিয়াছিলেন; তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের পথ তাঁহাকে নিজেই আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল। কারণ, য়ুরোপীয় রূপক-নাট্যের রূপ ও রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাট্যের রূপ এই দু'য়ের মধ্যে কতকটা পার্থক্য একটু মনোযোগী পাঠকের চোখে ধরা না পড়িয়াই পারেনা। একটী দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। আমি একবার বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় কোনও কোনও নাটকের অভিনয়ের জন্য একেবারেই কোনও বিশেষ অভিনয়-মঞ্চের প্রয়োজন হয়না; "শারদোৎসব", "অচলায়তন" "রাজা" প্রভৃতি নাটককে দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে কয়েকবারই ইহাদের অভিনয় হইয়াছে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে উদার আকাশের তলে গাছপালা লতাপাতার প্রকৃতির চিরসুন্দর আবেষ্টনের মধ্যে। শুধু নাটকবর্ণিত চরিত্র গুলিই সেই অভিনয়কে সমৃদ্ধ করেনা, উদার আকাশ, উন্মুক্ত প্রান্তর, প্রকৃতির আপন দুলাল পত্রপুষ্পগুলিও সেই অভিনয়ে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যোগদান করে, নহিলে কিছুতেই অভিনয়টি সার্থক হইয়া উঠেনা। প্রকৃতির মধ্যে

নাটকের এই যে ভাষা আবিষ্কার, এই যে একটা সত্যকার যোগ, ইহা পাশ্চাত্য নাট্য-রূপ ও রীতির মধ্যে খুব কমই পাই। "শকুন্তলা" নাটকের শকুন্তলার পতিগৃহ-গমনের দৃশ্যটি একবার সকলকে স্মরণ করিতে বলি। আশ্রমের বৃক্ষলতা, আশ্রম-মৃগটি সেখানে না থাকিলে সে-দৃশ্যটি এমন করিয়া ফুটিতে পারিত কি? রবীন্দ্রনাথ এই বস্তুটিকে একান্ত ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং নাট্যরীতির মধ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত শ্রদ্ধেয় ৺অজিতবাবু অন্য সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-নাট্যের রূপকের এবং পাশ্চাত্য নাট্যের রূপকের ভাবধারার কতখানি পার্থক্য তাহার একটু আভাস মাত্র দিবার জন্য এই সম্পর্কে তাহা অজিতবাবুর ভাষাতেই উল্লেখ করিতেছি।

> "মেটারলিঙ্কের Intruder পড়ি, আর রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' পড়ি—Intruder'এ মৃত্যুর আগমনের যে সব রূপক দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিতান্তই বাহ্যিক, কখনো কখনো বালসুলভ কল্পনাত্মক! আজ কেমন একটা শিরশিরে হাওয়া দিয়াছে, বাগানে মালীর কাস্তের ক্যাচ ক্যাচ শব্দ শুনা যাইতেছে, এ সব সূচনার মধ্যে মৃত্যুর বাহ্যভীতির নিকটা আছে, তার গভীরতর মাধুরী নাই। 'ডাকঘরে'র মৃত্যু সমস্ত জীবনের বিচিত্র সৌন্দর্যকে সুদূরে বিলম্বিত করিয়া সেই সুদূরের আহ্বানকে মৃত্যুর আহ্বান করিয়াছে, এবং 'তমসঃ পরস্তাৎ' মৃত্যুরাজকে বালসখা করিয়া তাঁর আবির্ভাবকে অত্যন্ত আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে।"

"রক্তকরবী"র মধ্যে দেখি, নাটকীয় চিত্রে চরিত্রে রঞ্জনের স্থান কোথাও নাই, একবারও তার দেখা আমরা কোথাও পাই না। অথচ যতক্ষণ নাটকটি পাঠ করি অথবা অভিনীত হইতে দেখি আমাদের সমস্ত মনটা পড়িয়া থাকে রঞ্জনের উপর, সে-ই নন্দিনীর এবং আমাদের সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখে। "ডাকঘরে"ও দেখি ডাকহরকরা কোথাও নাই, রাজা কোথাও দেখা দেন্ না, অথচ তাহারাই অমলের মনকে, আমাদের মনকে টানে। "রাজা"-নাটকেও রাজাকে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ এই রাজার জন্যই যত না আমাদের আকুলতা! এই যে নাটকের কেন্দ্র-বস্তুটিকে এমন করিয়া নাটক হইতে বাহির করিয়া দিয়া দূরে নাগালের সীমার বাহিরে বসাইয়া রাখিয়া আমাদের মনকে টানা, এই ভঙ্গি-মাটিও যেন রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব। দূরের অসীমের তৃষ্ণাকে এমন সুন্দর করিয়া ফুটাইবার কৌশলটি পাশ্চাত্য রূপক-নাট্য-রচয়িতাদের কাহারও মধ্যে থাকিলেও এমন তীব্র হইয়া কোথাও বোধ হয় নাই। এই রকম ছোটখাট

অথচ কুশলী দৃষ্টান্ত আরও হয়ত দেওয়া যাইতে পারে। সেই জন্যই বলিতে-ছিলাম, রূপক-নাট্যের বিশেষ ভঙ্গিমার ছায়াটিকে হয়ত রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য নাটক হইতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু কায়া তাঁহাকে নিজে সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, এবং তাহার বিকাশের পথ তিনি নিজেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

এই ধরণের নাটককে সত্যকার নাটক বলিতে কাহারও কাহারও আপত্তি আছে। বিদেশেও হইয়াছে, আমাদের দেশেও রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে এ আপত্তি কেহ কেহ তুলিয়াছেন। সাহিত্য-কথার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে এ আপত্তির কথা একদিন তুলিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপক-নাট্যের অভিনয়-সাফল্যের প্রশ্নও উঠিয়াছিল। প্রথম কথাটির উত্তর আমার মনে আছে। তাহার মর্মকথা এই, 'নাটক বলিতে আপত্তি যদি কাহারও থাকে, তাহার উত্তরে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। তুমি ইহাকে 'নাটক' না বলিয়া যদি বল 'কবিতা' অথবা 'কবিতা' না বলিয়া যদি বল আর কিছু, তাহাতে আমি আপত্তি করিবনা, 'নাটক' নামের প্রতি এমন কিছু মায়া আমার নাই। আমি যদি আমার মনের ভাব ও অনুভূতিকে মধুর করিয়া সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলেই আমার সৃষ্টি সার্থক, তুমি ইহাকে কি নামে অভিহিত করিবে সে ভাবনা আমার নয়।' এমন সুন্দর সহজ সম্পূর্ণ কবিজনোচিত উত্তর আর কি হইতে পারে! তবু, সাহিত্য-সমালোচকের বিশ্লেষণ-দৃষ্টি দিয়া দেখিলেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই বিশেষ রূপকে 'নাটক' বলিয়া অভিহিত করিতে আমার কোনও দ্বিধাবোধ নাই। দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে কোনও উত্তর পাইবার সুযোগ সেদিন হয় নাই, কিন্তু আমার মনে হয় সে-সম্ভাবনা যদি অল্পও হয়, তাহা হইলেও রবীন্দ্র-নাট্যের শিল্পমূল্যের, তাহার রস ও সৌন্দর্যের কিছু হ্রাস হইবে না। এ-কথা সত্য যে কবিগুরুর প্রায় নাট্যেই দু'টি একটি চরিত্রের কথায় ও ভঙ্গিমায় এমন কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ থাকে, যাহা অভিনয়ের সময় দর্শক ও শ্রোতার দৃষ্টি ও শ্রবণকে এড়াইয়া যায়, গভীরতর অনুভূতিকে স্পর্শ করিবার অবসর পায় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কি শান্তিনিকেতনে, কি কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে অভিনীত রূপক-নাট্যের অভিনয় যখনই দেখিয়াছি, তখনই ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে, সমগ্র সত্যটি, সমগ্র রহস্যটি কখনই দর্শকের অনুভূতিকে স্পর্শ এবং তাহার

প্রয়োগ-কলা ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন দর্শকের শিল্প ও সৌন্দর্যবুদ্ধিকে উদ্রিক্ত না করিয়া পারেনা। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে আজও তাঁহার কোনও রূপক-নাট্যই সার্থকতায় অভিনীত হইতে পারে নাই, আমার মনে হয় তাহার কারণ নাটকের সূক্ষ্ম এবং জটিল রীতি ও ভঙ্গিমা ততটা নয়, যতটা অভিনেতাদের মধ্যে সূক্ষ্মভাব ও অনুভূতিকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতার অভাব, অল্প কথা ও নীরবতার মধ্য দিয়া, অতি তুচ্ছ ঘটনা-পর্যায়ের ভিতর দিয়া অন্তরের অত্যন্ত তীব্র অথচ অস্পষ্ট ভাবাভাসকে রূপদান করিবার নিপুণতার অভাব, এবং অভিনয়ের মধ্যে, নাটক-বর্ণিত ঘটনার মধ্যে, উত্থান-পতনের তরঙ্গ-লীলার মধ্যে শুধু বহিরিন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির, শুধু দৃশ্য জগতের ইন্দ্রিয়-সংগ্রামের আস্বাদন লাভের ইচ্ছা। আমাদের জীবনে অজ্ঞাত রাজ্যের অজানা রহস্যের বিচিত্র দ্বন্দ্বের পরিচয় লাভের প্রয়োজন যদি থাকে, অরূপের অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম অনুভূতি যদি আমাদের মহত্তর রস ও সৌন্দর্য-বুদ্ধিকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে, এই কথা যদি আমাদের দেশের অভিনেতা ও দর্শকেরা কখনও উপলব্ধি করেন, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্যের অভিনয় সাফল্য লাভ না করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। অন্ততঃ রবীন্দ্র-রূপক-নাট্যের মধ্যে অভিনয়-ব্যর্থতার কোনও কারণ আছে বলিয়া ত আজও বুঝিতে পারিতেছি না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে এই যুগের সাঙ্কেতিক-রহস্যময় নাটক-রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন ও থাকিবেন, তাহা তাঁহার রূপক-সাহিত্যের জন্য নয়, কিম্বা তাহার এই নব নাট্য-রূপের জন্যও নয়। তাঁহার নাটকের শিল্প-সৌন্দর্য, কথার অপূর্ব ভঙ্গিমা, ভাষার সরল সৌন্দর্য, এগুলিও তাঁহাকে রূপক-নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অমরত্ব দিবে না। তিনি স্মরণীয় থাকিবেন, নাটকের মধ্যে তিনি আমাদের জীবনকে যে পূর্ণ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার জন্য, যে অরূপ অতীন্দ্রিয় সঙ্কেত-রহস্যময় অনুভূতির আভাস দিয়াছেন তাহার জন্য। আমি পূর্বেও বলিয়াছি, নাট্যের মধ্যে তিনি শিল্পময় সৌন্দর্যময় জীবনকে ততটা স্থান দেন নাই, যতটা চাহিয়াছেন সৌন্দর্যের উৎসটিকে জানিতে, আত্মার আকাঙ্ক্ষার বস্তুটিকে লাভ করিতে। অরূপ রূপের, অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সন্ধানে কবিচিত্তের এই যে যাত্রা, আত্মার বিচিত্র অনুভূতি ও উপলব্ধির যে-ইতিহাস তাহাই রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্যগুলিকে অমরত্ব দান করিবে। রবীন্দ্রনাথ

ত শুধু রূপের বা ভঙ্গিমার কুশলী কারু নহেন, তিনি যে প্রাণরসের স্রষ্টা, তিনি যে মানব ও প্রকৃতির রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করেন। তিনি সেই সত্যের সন্ধানে তাঁহার সাহিত্য-সাধনাকে চিরকাল নিয়োগ করিয়াছেন, যে-সত্য শিব ও সুন্দর। তাঁহার খুব অস্পষ্ট মায়াময় কাব্য অথবা নাট্য-রূপের মধ্যেও এমন একটা সহজ সরল রস ও সৌন্দর্যের অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়, যাহা মনকে একটু দোলা না দিয়া পারে না। বড় বড় কথায় বহু বাক্যবিন্যাসের সাহায্যে সুকঠিন তত্ত্ব বা উপদেশ প্রচারের চেষ্টা তাঁহার কাব্যে অথবা নাট্যে কোথাও নাই, তবু একটা সুন্দর সত্যের পূর্ণ পরিণতির ইঙ্গিত তাঁহার সবগুলি সাঙ্কেতিক রহস্য-নাট্যের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই সত্যের ইঙ্গিত, এই পরিণতির আভাসই রবীন্দ্র-সাঙ্কেতিক-নাট্যের অন্তর-রহস্য।

(৫)

"শারদোৎসব" (১৩১৫)
    "ঋণশোধ" (১৩২৮)
"প্রায়শ্চিত্ত" (১৩১৬)
    "পরিত্রাণ" (১৩৩৬)
"রাজা" (১৩১৭)
    "অরূপরতন" (১৩২৬)
"অচলায়তন" (১৩১৮)
    "গুরু" (১৩২৪)
"ডাকঘর" (১৩১৮)
"ফাল্গুনী" (১৩২১)
"মুক্তধারা" (১৩২৯)
"রক্তকরবী" (১৩৩০)

"শারদোৎসব" রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঋতু-প্রশস্তির নাটিকা। প্রথম শান্তিনিকেতনে এবং পরে নানাস্থানে এই নাটিকা বারংবার অভিনীত হইয়াছে। ইহার স্বচ্ছ ও সতেজ অনাবিল গতি, নিরলঙ্কার সারল্য এবং রূপক-বিবর্জিত ভাবরহস্যের আবেদন পাঠক অথবা দর্শকের সহজ রসবোধকে পরিতৃপ্ত করে;

কবির পরবর্তী নাটকগুলির সঙ্কেত ও রূপক-রহস্য-বাহুল্য "শারদোৎসবে" নাই। আছে শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যে মানুষ যে উৎসবানন্দ অনুভব করে, উপভোগ করে, তাহার প্রতি কবিমানসের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কবি মনে করেন আনন্দকে সত্যভাবে উপভোগ করা যায় ছুটীর মধ্যে, অবসরের মুক্তির মধ্যে; এই ছুটী ও মুক্তি মানুষ অর্জন করে কর্মের ভিতর দিয়া, দুঃখের তপস্যার ভিতর দিয়া; দুঃখই বস্তুতঃ মানুষকে আনন্দের অধিকারী করে। কর্ম এবং কর্তব্যের ঋণশোধেই মানুষের যথার্থ ছুটি ও মুক্তি। উপনন্দ শারদীয় উৎসবের আনন্দ হইতে নিজকে বঞ্চিত করিয়া প্রভুর ঋণশোধ করিবার জন্য নিজের উপর দুঃখের সাধনাকে ডাকিয়া লইয়াছিল। কবির ধারণা এই উপনন্দর সঙ্গেই শরৎ প্রকৃতির আনন্দের যোগ, কারণ সে দুঃখের সাধনা দিয়া আনন্দের ঋণশোধ করিতেছে, এবং এই দুঃখের রূপই শারদীয় সৌন্দর্য, ইহাই আনন্দ ও মাধুর্য। উপনন্দ ও ঠিক এই দৃষ্টি দিয়াই তাহার কর্মের দায়কে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল কিনা, সে প্রশ্ন হয়ত এখানে অবান্তর। কবির ধারণায় সে পারিয়াছিল, এবং এই ধারণাই রাজ-সন্ন্যাসীর ভূমিকায় রূপ পাইয়াছে; এই মনন-ভঙ্গিকে ব্যক্ত করিবার জন্যই উপনন্দর সৃষ্টি। যত সব ছেলে মেয়ে তাহারা সব ঠাকুরদাদাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে উৎসবের আনন্দে মাতিবার জন্য, উপনন্দ শুধু নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়া একমনে নিজের কর্তব্যে রত প্রভুর ঋণশোধের চেষ্টায়, ইহার মধ্যে একটু বেদনাবোধ আছে বই কি? কিন্তু কবি এবং কবিরই মনের রূপক রাজ-সন্ন্যাসী বলেন, এই বেদনাই আনন্দ, এবং এই আনন্দের সন্ধান উপনন্দই পাইয়াছে, কাজেই রাজ-সন্ন্যাসী তাহারই মধ্যে পাইলেন তাহার আনন্দের সাথী। এই দৃষ্টিভঙ্গি কবিজনোচিত এবং রোমাণ্টিক, সন্দেহ নাই, এবং এই বিশেষ ভাবরহস্যকে কবি রসোত্তীর্ণ করিয়া পাঠক ও দর্শকের অধিগম্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, গান ও ভাবণের এবং ইহার পরিবেশের সাহায্যে। এই ভাবরহস্যকে রসোত্তীর্ণ করিতে সাহায্য করিয়াছে। ইহার সহজ নিরলঙ্কার ভাষণ, ইহার সুর ও ইঙ্গিত, এবং উপনন্দ ও ঠাকুরদাদার চরিত্র।

অন্যান্য নাটক-নাটিকাগুলির মতন "শারদোৎসব" ও একটা 'আইডিয়া'র বাহন, এই 'আইডিয়া'টি কি তাহার একটু আভাস উপরে দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কবি নিজেও একাধিকবার বিভিন্ন স্থানে এই নাটিকার অন্তর্নিহিত 'আইডিয়া'টি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্য্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখ্‌তে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটি একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজ্‌ছেন তার সাথী। পথে দেখ্‌লেন ছেলেরা শরৎ প্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ—সমস্ত খেলাধূলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে এক মনে কাজ করছিল। রাজা বল্‌লেন, তাঁর সত্যকার সাথী মিলেছে, কেন না ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎ প্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণশোধ করছে, সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। * * * আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এই জন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে, ভয়ে কিম্বা আলস্যে কিম্বা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে, জগতে সেই-ই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই, ও তো গাছ তলায় বসে' বসে' বাঁশির সুর শোনাবার কথা নয়।" ('আমার ধর্ম', "প্রবাসী", ১৩২৪, পৌষ, ২৯৭ পৃঃ)।

অন্যত্র কবির ব্যাখ্যা এইরূপ,

" * * * হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করলে তবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার মিলন সার্থক হয় * * *। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটেছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো অনেক বড় হ'য়ে উঠে। * * * তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় প'রে চারিদিক্ হ'তে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে। সেই হৃদয়ে যদি কোনো রঙ্ না লাগে, কোনো গান জেগে না ওঠে তা হ'লে মানুষ সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে।

"সেই বিচ্ছেদ দূর করবার জন্য আমাদের আশুনে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করে নিয়েছি। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই একটি নাটকের পালা। নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে? লক্ষেশ্বর, সেই বণিক আপনার স্বার্থ নিয়ে টাকা উপার্জন নিয়ে সকলকে সন্দেহ ক'রে ভয় ক'রে ঈর্ষ্যা ক'রে সকলের কাছ থেকে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন ক'রে বেড়াচ্ছে। এই উৎসবের পুরোহিত কে? সেই রাজা যিনি আপনাকে ভুলে সকলের সঙ্গে মিল্‌তে বা'র হ'য়েছেন; লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্যের শতদল পদ্মটিকে যিনি চান। সেই পদ্ম যে চায় সোনাকে সে তুচ্ছ করে। লোভকে সে বিসর্জন দেয় বলেই লাভ সহজ হয়ে সুন্দর হ'য়ে তার হাতে আপনি ধরা দেয়।

"কিন্তু এই যে সুন্দরকে খোঁজবার কথা বলা হ'লো, সে কি? সে কোথায়? সে কি একটা পেলব সামগ্রী, একটি সৌখীন পদার্থ? এই কথারই উত্তরটি এই নাটকের মাঝখানে রয়েছে।

"শারদোৎসবের ছুটীর মাঝখানে ব'সে উপনন্দ তার প্রভুর ঋণশোধ করছে। রাজ-সন্ন্যাসী এই প্রেম-ঋণ শোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখতে পেলেন। তাঁর তখনি মনে হ'লো শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য। * * *

"রাজসন্ন্যাসী উপনন্দকে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এই ঋণশোধই যথার্থ ছুটি, যথার্থ মুক্তি। * * * তাই তিনি উপনন্দকে বলেছিলেন, তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ, আর ছুটীর পর ছুটী পাচ্ছ। * * *

"উপনন্দ তার প্রভুর নিকট হ'তে প্রেম পেয়েছিল, ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের পথ বেয়ে সে যতই সেই প্রেমদানের সমান ক্ষেত্রে উঠছে ততই সে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করছে। দুঃখই তাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণের সঙ্গে ঋণশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তাই কুশ্রীতা।" ('শারদোৎসব', "বিচিত্রা", ১৩৩৩, আশ্বিন, ৪২১ পৃঃ)।

কিন্তু তত্ত্ব যাহাই হউক, এবং সে-তত্ত্ব যুক্তি-গ্রাহ্য হউক বা না হউক, সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠি হইতেছে তাহা বস্তু ও ঘটনার, কল্পনা ও অনুভূতির প্রকাশ-শৃঙ্খলার অমোঘ ও অনিবার্য ফলস্বরূপ দেখা দিতেছে কিনা। উপনন্দের ঋণশোধের মধ্যেই যে রহিয়াছে উৎসবের অন্তর্নিহিত আনন্দের যোগ, এই তত্ত্বকথাটা ব্যক্ত হইতেছে শুধু রাজ-সন্ন্যাসীর ভাষণের মধ্যে, তাহার কর্মকৃতির মধ্যে, কতকটা ঠাকুরদাদার ভাষণ এবং কর্মের মধ্যেও। কিন্তু উপনন্দ নিজে তাহার ঋণশোধের কর্মের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিল কি? অন্ততঃ তাহার ভাষণ ও কর্মের মধ্যে সে পরিচয় সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই, বরং কর্তব্য তাহার কাছে কতকটা বেদনার ভার, যদিও সে ভার সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে। রাজ-সন্ন্যাসীর আনন্দের সন্ধান তাহার নিজের দেহ মনকে আনন্দে উল্লসিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে-সন্ধান উপনন্দ পায় নাই, উৎসব-মত্ত ছেলেরাও পায় নাই; তাহারা সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে পুঁথি নকল করার কাজে লাগিয়াছে বটে, এবং হয়ত তাহার মধ্যে সন্ন্যাসীর চিত্তানন্দ ছেলেদের মনেও সংক্রামিত করার চেষ্টা আছে, কিন্তু তাহা কতকটা 'আইডিয়া' প্রকাশের প্রয়োজনে, কতকটা মেকানিক্যাল! ছেলেদের আনন্দ দায়িত্ববোধহীন, এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক! আসল কথাটা হইতেছে, নাটকের অন্তর্নিহিত 'আইডিয়া'টা কেন্দ্রীকৃত হইয়াছে শুধু

সন্ন্যাসীর চরিত্রে, সে-আনন্দবোধের ও অনুভূতির স্পর্শ আর কাহারও খুব বেশী লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; উপনন্দ বরং একটু বেদনাভারাক্রান্তচিত্ত বলিয়াই মনে হয়, এবং ঠাকুরদাদা ও ছেলেদের সহজ আনন্দোল্লাস কতকটা অন্যজাতীয়, ভারমুক্ত, তত্ত্বনিরপেক্ষ। এই দুই আনন্দের মধ্যে একটি সংযোগ-সাধনের প্রয়াস নাটকে আছে বটে, কিন্তু তাহা খুব সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই বলিয়া যেন মনে হয়। তাহার ফলে অন্তর্নিহিত 'আইডিয়া'টিই যেন বড় হইয়া দেখা দেয় নাটকীয় রূপ ও সৌন্দর্য ছাড়াইয়া।

তাহা ছাড়া, উৎসবানন্দ ভোগ করিবার পক্ষে যে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা সেই লক্ষেশ্বর তাহা হইতে মুক্তি-কামনার, তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিবার সজ্ঞান অনুভূতি কাহারও মধ্যে নাই, রাজ-সন্ন্যাসীর মধ্যেও নয়। বরং উপনন্দ ও রাজ-সন্ন্যাসী এই দুইজনই এই বাধার দুঃখ ও বেদনাকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার পাওনা মিটাইবার মধ্যেই যেন যথার্থ মুক্তি, ইহারই দিকে ইঙ্গিত করিতেছেন। রাজ-সন্ন্যাসী যে কার্ষাপণ গুণিয়া দিয়া উপনন্দকে লক্ষেশ্বরের কবল হইতে মুক্ত করিয়া লইয়াছেন তাহার মধ্যেও এই ইঙ্গিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি উৎসবানন্দ ভোগের পক্ষে কতখানি সহায়ক, তাহাও সাহিত্য-বিচারের মধ্যে আসিয়া পড়ে। কবি-মানসের পরিচয়ের জন্যও এই ইঙ্গিতের বিচার অপরিহার্য। একথা বলা যাইতে পারে, লক্ষেশ্বর-রূপ বাধা হইতে মুক্তি কামনার সজ্ঞান অনুভূতি না থাকিয়া ভালই হইয়াছে ; বরং উপনন্দ যে তাহার কবলে আবদ্ধ এবং উৎসবানন্দ হইতে বঞ্চিত ইহার দ্বারাই এই বাধার স্বরূপ ভাল করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই যুক্তি যথার্থ, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আরও ভাল হইত যদি উপনন্দের আত্মদান সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইত, যদি উপনন্দের মুক্তির কোন উপায়ই না থাকিত ; তাহা হইলে এই বাধার সামাজিক স্বরূপ আমাদের মধ্যে আরও নিবিড় ভাবে প্রকাশ পাইত, আরও ঘনীভূত হইত। উপনন্দ নিঃশেষে আপনাকে প্রভুর ঋণশোধের চক্রে নিষ্পেষিত করিয়া প্রমাণ করিয়া যাইত, সে অশেষ, অক্ষয় ; তাহা অপেক্ষা লক্ষেশ্বরের বড় পরাজয় আর কিছু হইত না! কিন্তু নাটকে যাহা আছে তাহাতে লক্ষেশ্বরকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, উপনন্দ নিজকে নিজের বলে মুক্ত করে নাই, রাজ-সন্ন্যাসী তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন পাওনাদারের পাওনা মিটাইয়া।

কিন্তু, "শারদোৎসব" উপভোগ্য তাহার তত্ত্ব বা 'আইডিয়া'র জন্য নয়

উপভোগ্য ইহার কবিজনোচিত রোমান্টিক পরিবেশের জন্য, ইহার সরল সহজ রূপক-বর্জিত ভাষণের জন্য, সর্বোপরি ইহার গীতিমাধুর্যের জন্য।

এই "শারদোৎসব" নাটক ১৩২৮ সালে "ঋণশোধ" নামে পুনর্লিখিত এবং কতকটা পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয়।

"প্রায়শ্চিত্ত" নাটিকাটি রচিত হয় ১৩১৬ সালের গোড়ায়। ইহার বিষয়বস্তু "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট"-নামীয় উপন্যাস হইতে গৃহীত; "মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতই হইয়াছে।" বিষয়বস্তু এক হইলেও চরিত্র-পরিচয় দুই গ্রন্থে সর্বত্র একরূপ নয়। "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট"-গ্রন্থের আলোচনা আমি অন্যত্র করিয়াছি, কাজেই বিস্তারিত চরিত্রালোচনার প্রয়োজন এখানে নাই। উদার ও মধুর চরিত্র বসন্ত রায়ের নূতন কিছু পরিচয় এই নাটকে নাই; বিভা, সুরমা এবং উদয়াদিত্যেরও নাই। তবে ঘটনা-সংস্থানের কৌশল অনেক পরিণত এবং ভাষণ-ভঙ্গি নাটকীয়, এবং পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের পরিচয় একটু নূতন। দ্বিতীয়বার বিবাহোদ্যত রমাই-ভীত বরবেশী রামচন্দ্র বিভার কথা স্মরণ করিয়া যখন বলিতেছেন, "সেনাপতি, আমি তোমাকে গোপনে বল্‌চি, কাউকে বলোনা, আমি তাকে কিছুতে ভুল্‌তে পারচিনে। কাল রাত্রে আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি", এবং ফর্ণাণ্ডিজকে আদেশ করিতেছেন মোহনকে খবর দিয়া বিভাকে পূর্বাহ্নেই দুঃসংবাদ জানাইয়া সাবধান করিয়া দিতে, তখন রামচন্দ্রের চরিত্রে নূতন আলোকপাত হইতেছে, এবং দানব রামচন্দ্রের হৃদয়ে মনুষ্যধর্মের স্পর্শ লাগিতেছে। বিভার জীবনের ট্র্যাজেডি তাহাতে আরও ঘনীভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, এবং তাহা কবিজনোচিত সমাপ্তি লাভ করিয়াছে উপসংহারে। এই উপসংহার "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট"-গ্রন্থের উপসংহার অপেক্ষা অধিকতর কলাকুশলতার পরিচায়ক, এবং বিভা-চরিত্রের মধুরতর ও সহজতর সমাপ্তি।

কিন্তু, "প্রায়শ্চিত্ত"-নাটকের লক্ষ্যণীয় বস্তু হইতেছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর সৃষ্টি। এই ভূমিকাটি "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট"-গ্রন্থে নাই। রবীন্দ্র-নাটকে এই জাতীয় রসিক অথচ বৈরাগী, আত্মভোলা, চিরনবীন, সদানন্দময়, নির্ভীক, সত্যসন্ধ, স্বচ্ছ, সুনির্মল, অত্যাচার অবিচারের চিরশত্রু, দুঃখী দুর্গতদের পরম-সুহৃৎ নিত্য সত্যধর্মের মধুর সাধক এবং রহস্য-ইঙ্গিতময় একটি চরিত্রের উদ্বোধন প্রথম

আমরা দেখি "শারদোৎসব" নাটকে ঠাকুরদাদার চরিত্রে। এই চরিত্রই স্বল্প রূপান্তরে দেখা যায় "প্রায়শ্চিত্ত" এবং "মুক্তাধারা" নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে, "অচলায়তনে" দাদাঠাকুর চরিত্রে, "ফাল্‌গুনী"তে সর্দার বা বাউল চরিত্রে, "ডাকঘরে", "রাজা" ও "অরূপ রতন"-নাটকে ঠাকুরদাদার ভূমিকায়। "এই একলা মোদের হাজার মানুষ দাদাঠাকুর" যত দুঃখ, যত অত্যাচার অবিচার, যত বেদনার ভার সব অক্লেশে বহন করেন, হাসিয়া খেলিয়া গান গাহিয়া গুরু তত্ত্বকথাকে লঘু হাওয়ায় ভর করাইয়া সকল ভারকে হাল্কা করিয়া দেন। এই দাদাঠাকুর প্রত্যেকটি নাটকের সদা-উন্মুক্ত প্রশস্ত প্রসারিত গবাক্ষ; এই গবাক্ষ দিয়াই যত পুঞ্জীভূত ব্যথা বেদনা, যত বদ্ধ দূষিত বাতাস সব বাহির হইয়া যায়, এই গবাক্ষ দিয়াই সত্য ও ন্যায় ধর্মের ভারমুক্ত স্বচ্ছ সহজ সুনির্মল আলোকের দীপ্তি ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করে। ইনিই যেন তাহার লঘু উন্মুক্ত প্রশস্ত ডানায় সমস্ত নাট্যীয় বিষয়বস্তুটিকে অক্লেশে বহন করিয়া লইয়া যান। নাট্যীয় চরিত্র হিসাবে এইখানেই তাহার সার্থকতা, নাটকীয় আঙ্গিকের দিক হইতে এইখানেই তাহার যথার্থ মূল্য; তবে প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই তাহার দেখা পাই বলিয়া, এবং প্রায় একই রূপে পাই বলিয়া "একলা মোদের হাজার মানুষ দাদাঠাকুর" আমাদের কাছে তাহার নূতনত্ব কতকটা হারাইয়া ফেলিয়াছেন; আমরা দেখিবার মাত্রই তাহাকে চিনিয়া ফেলি, এবং রবীন্দ্র-নাটকের একটি অতি সুপরিচিত আঙ্গিক হিসাবেই তাহাকে স্বীকার করিয়া লই। এই দাদাঠাকুরটি না থাকিলে কবির নিজের কথাটি নাটকে আর বলা হয় না, নিজের মনটি আর প্রকাশ করা হয় না, কাজেই তিনি প্রায় অপরিহার্য।

বহুদিন পর, ১৩৩৬ সালে "প্রায়শ্চিত্ত" কিছু পরিবর্তিত হইয়া "পরিত্রাণ" নামে প্রকাশিত হয়।* পুরাতন নাট্য-রচনাকে নূতন রূপ দেবার ইচ্ছা ও

---

* "১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে [কবি] এই নাটককে আরও কিছু পরিবর্তন করিয়া 'পরিত্রাণ' নামে প্রকাশ করেন। ইহাতেও ধনঞ্জয় চরিত্র আছে। এখানেও রাজশক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহায় প্রজাদের পক্ষ হইয়া তিনি উদয়াদিত্য রাজকুমার এবং সুরমা যুবরাজ-মহিষী বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ পালন করিয়া চলিয়াছেন, এবং পুনঃ পুনঃ কারাবরণ ও মৃত্যু পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। এই নাটক দুইখানি [প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণ] প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া লেখা হইলেও ইহাদের মধ্যে আমাদের দেশের আধুনিক কালের রাজনৈতিক অবস্থার ছায়া পড়িয়াছে।" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "রবিরশ্মি" ২য় খণ্ড, ৮৪ পৃঃ।

চেষ্টা প্রথম দেখা যায় "অচলায়তনে"র (১৩১৮) পরিবর্তিত রূপ "গুরু" নাটিকায় (১৩২৪), এবং দুই বৎসর পর "রাজা" (১৩১৭) নাটকের রূপান্তর "অরূপ রতন" নাটকে (১৩২৬)। পরে এই চেষ্টা আরও অনেক রচনাতেই দেখা গিয়াছে, যথা, "শারদোৎসবে"র রূপান্তর "ঋণশোধে" (১৩২৮), "প্রায়শ্চিত্তে"র রূপান্তর "পরিত্রাণে" (১৩৩৬), "রাজা ও রাণী"র রূপান্তর "তপতী"তে (১৩৩৬)। ইহার ফল যে সর্বত্রই ভাল হইয়াছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

"প্রায়শ্চিত্ত" অথবা "পরিত্রাণ" দুইটিই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত নাটক; "রাজা ও রাণী"র রূপান্তর "তপতী"ও তাহাই। ইহারা "বিসর্জনো"ত্তর নাট্য-পর্বের রচনা হওয়া সত্ত্বেও ইহাদিগকে সাঙ্কেতিক রহস্যময় বস্তুনিরপেক্ষ মানসিক আকুতির নাট্যপ্রয়াসগুলির সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত করা যায়না। ন্যায় ও সত্যধর্মের একটা অধ্যাত্ম আকুতি ইহাদের মধ্যেও আছে কিন্তু তাহা রূপক অথবা সাঙ্কেতিক রহস্যময় নয়।

"রাজা" নাটকে এই রহস্যময় সাঙ্কেতিকতার উপস্থিতি আবার নূতন করিয়া দেখা যাইতেছে। ইহার মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ তাহা কোনও ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া নয়, বিভিন্ন চরিত্রের কল্পনা ও ভাবধারাকে আশ্রয় করিয়া। চোখের সম্মুখে যাহা ঘটিতেছে তাহার অংশ অত্যন্ত অল্প, সেই অল্পের মধ্যেও খানিকটা অবান্তর, অধিকাংশই অদৃশ্য। প্রধান নায়ক যিনি সেই রাজাকে ত মঞ্চের উপর কখনও দেখাই যায়না। ভাব-কল্পনার দৃষ্টি যোগ করিতে না পারিলে এই নাটকের এবং এই ধরণের সঙ্কেতধর্মী নাটকের সবটা কিছুতেই দেখিতে পাওয়া সম্ভব নয়।

একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে "রাজা", "অচলায়তন" ও "ডাকঘর" এই তিনটি নাটকই "গীতাঞ্জলি" ও "গীতিমাল্যে"র মাঝখানে রচিত। যে অধ্যাত্ম আকুতি, যে ভাগবত মানস-লীলা এই যুগের কাব্যে আমরা দেখিয়াছি, স্বভাবতঃই তাহা এই তিনটি নাট্যপ্রয়াসের মধ্যেও দেখা যাইতেছে। অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষার যে বিচিত্র অনুভূতির রূপ "খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে" ধরা পড়িয়াছে, তাহাই তাহার সমস্ত গীতধর্ম লইয়া নাট্যে সঙ্কেত-রহস্যে রূপান্তরিত হইয়াছে এই তিনটি প্রচেষ্টায়।

১৩২৬ সালের শেষাশেষি, অভিনয়োদ্দেশ্যে কবি "রাজা" নাটকটিকে সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করিয়া "অরূপ রতন" নামে প্রকাশ করেন। "রাজা" ও "অরূপ রতন" একাধিকবার অভিনীত হইয়াছে। কবি একাধিক স্থানে এই নাট্য-প্রয়াস দুইটির অন্তর্নিহিত 'আইডিয়া' নিজের অননুকরণীয় ভাষায় ও ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন জন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না; নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভুলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা একথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাঁধিয়া গেল; সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গ লাভ করিল, যে-প্রভু কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়, এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।" ("অরূপ রতন" নাটিকার ভূমিকা)।

সুদর্শনাও অন্ধকার ঘরের রাজাকে প্রথম চিনিতে পারেন নাই, পারিয়াছিলেন শুধু সুরঙ্গমা দাসী ও সত্যসন্ধ ঠাকুরদাদা। তাহারা নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্যে সেই রাজাকে পাইয়াছিলেন, সুদর্শনার সৌভাগ্য হয় নাই সে-অভিজ্ঞতা লাভের।

"আপনার অভিজ্ঞতার ভিতরে ভগবানকে না পাইলে কি আর পাওয়া। পড়িয়া ত আছে শাস্ত্রের রাজপথ। কিন্তু অন্ধকারের স্বামী চাহেন না, আমরা সেই মজুরখাটা, সরকারী পথ ধরিয়া তাঁহার মন্দিরে যাই। শাস্ত্রের আলোকে তিনি বিশেষ করিয়া আমারই নহেন, সেখানে তিনি সরকারী। এই অন্ধকার কক্ষে তিনি আমার চেষ্টার দ্বারা, প্রেম-নিয়ন্ত্রিত সেবার দ্বারা বিশেষ করিয়া ব্যক্তিবিশেষের। * * * অন্ধকারের সাধনা যাঁহার সম্পূর্ণ হইয়াছে তিনি রাজাকে সর্বস্থানেই দেখিয়া থাকেন, ভুল তাঁহার হয় না। ঠাকুরদাদা

এই সাধনায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, রাজাকে ভুল করিবার সম্ভাবনা তাঁহার নাই। সুরঙ্গমার পক্ষেও সেই কথা। 'রাজা নাটকের আলোচনা', "শান্তিনিকেতন পত্রিকা", ১৩৩২, শ্রাবণ।

তবু রাণী সুদর্শনা সুরঙ্গমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, সে কথা ত পরের জ্ঞান ও অনুভবের কথা।

"রাণী ভুল করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুক্তির উপায় তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। সুবর্ণকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, সুন্দর বলিয়াই। সুন্দরের প্রতি আসক্তিই তাঁহার রক্ষার বীজমন্ত্র। তিনি যখনই জানিতে পারিলেন, এ সৌন্দর্য্য প্রকৃত নহে, ইহার সহিত সত্যের যোগ নাই, তখন তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'ভীরু! ভীরু! অমন মনোমোহন রূপ, তার ভিতরে মানুষ নেই। এমন অপদার্থের জন্ত নিজকে এত বড় বঞ্চনা করেছি।' কিন্তু বঞ্চিত যাহা হইয়াছে তাহা রাণীর চোখ, হৃদয় নহে। * * * এতদিনে রাণীর ভুল ভাঙিল, চোখের উপর বিশ্বাস টুটিল, চোখে যাহা সুন্দর লাগে তাহার চেয়ে গভীরতর সৌন্দর্য্যের জন্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিল, তাঁহার অন্ধকার ঘরের সাধনা পূর্ণ হইল। এইবার তিনি অন্ধকার ঘরের স্বামীকে আলোকের প্রাসাদে পূজা দিতে পথের ধূলায় বাহির হইলেন। 'রাজা নাটকের আলোচনা', "শান্তিনিকেতন পত্রিকা", ১৩৩২, শ্রাবণ।

অন্যত্র কবি বলিয়াছেন,

"রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখ্‌তে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হ'য়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তারপরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পথ।" "আমার ধর্ম", "প্রবাসী", ১৩২৪, পৌষ, ২৯৭ পৃ।

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নাটকে ভাবগত দ্বন্দ্ব ছাড়া দৃশ্যগত দ্বন্দ্ব রচনার একটা চেষ্টাও আছে। ভাবগত দ্বন্দ্ব ত খুবই স্পষ্ট; দৃশ্যগত দ্বন্দ্ব সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সচেতন। "রাজা" নাটকেও তাহার প্রমাণ আছে, এবং ইতিপূর্বেই অন্যত্র তাহা আলোচিতও হইয়াছে। এইস্থানে তাহা উদ্ধার করা যাইতে পারে।

"এই নাটকখানির একদিকে অন্ধকার-গৃহচারিণী রাণী, অন্যদিকে বসন্তের উৎসবে উন্মত্ত বহুজনাকীর্ণা নগরী। * * * 'ডাকঘরে' দেখিতে পাই পথপার্শ্বে বাতায়নে একাকী রুগ্ন বালক অমল, সম্মুখের পথে স্ফীতকায় সংসার তাহার মোড়ল দইওয়ালা পাহারাওয়ালা ফকির ও ঠাকুরদার দল লইয়া ছুটিয়াছে। 'শারদোৎসবে' 'বেত্রসিনীতীরচারী বালক উপনন্দ ঋণশোধে ব্যস্ত; অন্যত্র ছুটির আনন্দে বালকের দল, ঠাকুরদাদা, লক্ষেশ্বর ও

সম্রাট বিক্রমাদিত্য। 'রক্তকরবী'তেও একই দৃশ্য। রুদ্ধ ধনভাণ্ডারের দেওয়ালের বহু ঊর্ধ্বে ছোট একটি বাতায়নের মতো এই স্বর্ণসন্ধানী যক্ষপুরীর বুকের উপরে রঞ্জনের ভালোবাসার কাজল-পরা নন্দিনী। এখানেও সেই একই পালা। অন্ধকার ঘরে সুদর্শনা। এই কক্ষটিতে রাজাকে তাঁহার উপলব্ধি করিতে হইবে প্রথমে; তারপরেই না তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিবে বাহিরের আলোকে।" 'রাজা নাটকের আলোচনা' "শান্তিনিকেতন পত্রিকা", ১৩৩২, শ্রাবণ।

"অচলায়তন" নাটক রচিত হয় ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসে; ছয় বৎসর পর ১৩২৪ সালের ফাল্গুন মাসে এই নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত অভিনয়োপযোগী সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহার নাম "গুরু"।*

এই নাটকটিতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের বাঙ্‌লাদেশের উদার পাশ্চাত্যভাবধারায় পুষ্ট শিক্ষিত স্বাধীনতা-কামী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজ-মানসের রূপ রূপকের আশ্রয়ে অতি সুস্পষ্ট-রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের তথা বাঙ্‌লাদেশের সমগ্র ইতিহাসের এইরূপ সুস্পষ্ট সজ্ঞান বোধের পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া বাঙ্‌লা সাহিত্যে আর খুব বেশী ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। আমাদের দেশে শতাব্দী সঞ্চিত স্তূপীকৃত শাস্ত্রপুঁথি, আচার নিয়মের বিধিবিধানের ক্রমসংকুচীয়মান রেখার বিচিত্র গণ্ডী, অহোরাত্র মন্ত্রতন্ত্র পাঠের গুঞ্জনধ্বনি, বর্ণ ও জাতির অভিমানের অহংকারের যে অলীকছায়ার স্বপ্নের অচলায়তন গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে বাঙালীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-মানস একদিন সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। একজটা দেবীর কাল্পনিক ভয়কে এই মানস একদিন অস্বীকার করিয়াছিল, বলিয়াছিল, হাজার বৎসরের এই বন্ধ দুয়ার, উত্তর দিকের বন্ধ জানালা মিথ্যা, অচলায়তনের এই ঐতিহাসিক-বোধ মিথ্যা। বারংবার এই বন্ধ দুয়ার গুরুর আবির্ভাবে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে; বারংবার মিথ্যা অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিয়া উত্তর পশ্চিম পূর্বদক্ষিণ হইতে উন্মুক্ত বাতাস, উন্মুক্ত জ্ঞান মহাগুরুর রূপ ধরিয়া সবেগে

---

* শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটের বাড়ীর ছাদে "প্রথমে যেদিন অচলায়তন নাটক পাঠ করেন, সেদিনই উহার নাম 'গুরু' রাখিবার ইচ্ছা কবি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা 'অচলায়তন' নামটিকেই অধিক সমর্থন করাতে তাহাই বহাল থাকিয়াছিল। এখন এই অচলায়তন শব্দটি বাংলা ভাষায় একটি বিশেষ গূঢ়ার্থক মূল্যবান্ শব্দ হইয়া উঠিয়াছে।" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "রবিরশ্মি" ২য় খণ্ড, ১১০ পৃ।

সজোরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাদের সঞ্জীবিত ও সচেতন করিয়াছে। অচলায়তন গড়িয়া তুলিলে এইভাবেই তাহা ভাঙিয়া পড়ে, ইহাই ঐতিহাসিক নিয়ম, ইহাই ভারতবর্ষের, বাঙ্‌লাদেশের ইতিহাস ; এই ঐতিহাসিক শিক্ষাটি, এই সজ্ঞান বোধটি "অচলায়তনে" ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গুরু যখন আসেন শোনপাংশু অস্পৃশ্য অন্ত্যজ হরিজনদের লইয়াই আসেন, বিদ্রোহের উন্মত্ত কোলাহল লইয়াই আসেন, পঞ্চক তাহার পূর্বাভাস, আচার্য তাহার দ্যোতক। অচলায়তনের বদ্ধ দরজা যখন খুলিয়া যায়, প্রাচীর যখন ভাঙিয়া পড়ে তখন মনে হয়, পঞ্চকেরই হইল জয়, গুরুই হইলেন ঐতিহাসিক সত্য, বিদ্রোহই হইল জয়ী। কিন্তু ইহাই কি শেষ কথা ? রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, তাহা শেষ কথা নয়। পঞ্চক সত্য হউক, ইহা নিশ্চয়ই কাম্য, কিন্তু মহাপঞ্চক কি একান্তই মিথ্যা ? ইহারা দুই সহোদর ভাই, একজন বিদ্রোহের প্রতীক, আর একজন নিষ্ঠা ও ঐতিহ্যের রূপক। বিদ্রোহই একমাত্র সত্য নয়, ঐতিহ্যবোধ এবং নিষ্ঠাও অন্যতম সত্য। মহাপঞ্চকের এই সজাগ ঐতিহ্যবোধ ও নিষ্ঠাই বিদ্রোহের ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন সাধনার নূতন সভ্যতার ইমারৎ গড়িয়া তোলে। এই নূতন সাধনায় মহাপঞ্চকেরও প্রয়োজন আছে ; তাই ত পঞ্চকের প্রশ্নের উত্তরে দাদাঠাকুর বল্‌লেন, এখানেও মহাপঞ্চকের "অনেক কাজ। * * * কি করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠ্‌তে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ ভয় জীবন মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করবার রহস্য ওর হাতে আছে।" আবার বিদ্রোহী-দেরও প্রয়োজন আছে ; তাই পঞ্চক সুভদ্রকে বলে, "এখন তুমি আছ ভাই, আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলি উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিমের সমস্ত দরজা জানালাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।"*

---

* "রবীন্দ্র-জীবনী রচয়িতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "অচলায়তনে"র এই সমাজ-বোধটি সুন্দর ধরিয়াছেন ; তাঁহার বক্তব্য উদ্ধৃতির যোগ্য। "উপাখ্যানটির মধ্যে পঞ্চক ও মহাপঞ্চক দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি ; ইহারা পরস্পরের সহোদর ভ্রাতা, সুতরাং সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। অথচ একজন বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি, অপরজন মূর্তিমান্ নিষ্ঠা। * * * মোট কথা নিষ্ঠা ও নিষ্ক্রমণের মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়াছে। কিন্তু কবি এই বিরোধকেই চরম বলিয়া স্বীকার করিলেন না। গুরু আসিলেন, অচলায়তনের প্রাচীর ধ্বংস হইল, বাহিরের আকাশ দৃশ্যমান হইল, বাহিরের বাতাস আয়তনের প্রাঙ্গণে বহিল। অস্পৃশ্য সর্তক শোনপাংশু

রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই নাটকের রূপক ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;

"যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে-বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, * * * অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।

"আমি ত মনে করি য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেছে [১৯১৪-১৮] সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেকদিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহঙ্কারের প্রাচীর ভাঙ্‌তে হ'চ্ছে। তিনি আস্‌বেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিলনা, কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আসবেন তার জন্ম আয়োজন অনেকদিন থেকে চল্‌ছিল। য়ুরোপের সুদর্শনা যে মেকি রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী বলে ভুল করেছিল, তাই তো হঠাৎ আগুন জ্বল্‌লো, তাইতো সাত রাজার লড়াই বেধে গেল, তাই তো যে ছিল রাণী তাকে রথ ছেড়ে, আপন সম্পদ ছেড়ে পথের ধূলোর উপর দিয়ে হেঁটে মিলনের পথে অভিসারে যেতে হচ্ছে। * * *" 'আমার ধর্ম', "প্রবাসী", ১৩২৪, পৌষ, ২৯৭ পৃঃ।

"ডাকঘর" রচিত হয় ১৩১৮ সালের শেষাশেষি। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা, বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্কেত-রহস্যময় গীতধর্মী এই নাটকটি-

---

সকলে আসিল। মনে হইল পঞ্চকের জয়, বিদ্রোহেরই জয়। কিন্তু মহাপঞ্চকের নিষ্ঠাকে কেহ অশ্রদ্ধা করিতে পারেন না। সেই বিধ্বস্ত আয়তনেই নূতন করিয়া সাধনার আয়োজন হইল, নিষ্ঠার মধ্যেই সত্যের রশ্মি আসে। চঞ্চলতাই জীবনের একমাত্র লক্ষণ নহে, চঞ্চল বিদ্রোহ সমাহিত হইলে সত্যকে অন্তরে পাইবার অবসর হয়।

" * * * রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের মনের মধ্যে যে কথাটি বিশেষভাবে জাগিতেছিল তাহারই রূপ এই নাটকে। ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই বিদ্রোহী ; তিনি চিরদিনই হিন্দু সমাজের জীর্ণ সংস্কার ও মলিন আচারকে আঘাত করিয়াছেন। কিন্তু সাময়িক হিন্দু-ব্রাহ্ম বিতর্কে তিনি নিজকে হিন্দু বলিয়া হিন্দু জাতির সংস্কৃতির মূল আদর্শকেই সর্বোচ্চ স্থান দিলেন।

তিনি ব্রাহ্ম বটে, তবে তিনি হিন্দুও। তিনি একাধারে পঞ্চকের বিদ্রোহ ও মহাপঞ্চকের নিষ্ঠা। হিন্দু সমাজের অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙ্গিলে যখন সর্বজাতি সর্ব মানব সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে, সেই দিনই হিন্দু সার্থক। রবীন্দ্রনাথ সেই হিন্দুত্বকে বিশ্বাস করেন যাহা প্রগতিকে স্বীকার করে ও সংস্থিতিকেও ত্যাগ করে না। এই সময়ের স্বপ্ন তাঁহার অবচেতন মনে এই নাটকীয় রূপ লইয়াছিল।" "রবীন্দ্র-জীবনী" ১ম খণ্ড, ৪২৫-২৬ পৃ।

রচিত হইয়াছিল তিনদিনে, শান্তিনিকেতন আশ্রমের পরিবেশের মধ্যে। প্রথম অভিনীত হইয়াছিল জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে; উপস্থিত ছিলেন, গান্ধীজি, লাজপৎ রায়, মালবীয়জি, টিলক, খাপার্দে প্রভৃতি দেশনায়কেরা।

রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে, 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'। ('ডাকঘরে' এই সুদূরের সঙ্কেত, অজানার ইঙ্গিত সকরুণ গীতিমাধুর্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অমল, সুধা, ঠাকুরদাদা, ডাক-হরকরা ও অদৃশ্য রাজাকে কেন্দ্র করিয়া এমন সুন্দর করুণ একটি রহস্য ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, এবং এমন সুকৌশলে শেষ পর্যন্ত সে-রহস্যটিকে ধরিয়া রাখা হইয়াছে, যাহার তুলনা অন্য সাঙ্কেতিক রহস্যময় নাট্যগুলিতে নাই। একটি গানও এই নাটকে না থাকা সত্ত্বেও এমন গীতধর্মী নাটক রবীন্দ্রনাথ আর রচনা করেন নাই; সমস্ত নাটকটিই যেন একটি সঙ্গীত যাহার সুরের রেশ বহুক্ষণ মনের মনে বাজিতে থাকে, যাহার ক্ষীণ সৌরভ সমস্ত বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে।

রুগ্ন বালক অমল অভিজ্ঞ বিষয়ী মাধব দত্তের পোষ্যপুত্র; সম্পর্কে সে অমলের পিসেমশায়। অপত্য সম মমতায় মাধব রুগ্ন অমলকে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে; কবিরাজ বলিয়াছে, বাইরের শীতলতা লাগিলেই রোগ দুরারোগ্য হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু অমল বিছানায় শুইয়া বাইরের আকাশ দেখিতে পায়, দূরের ইঙ্গিত তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে। জানালার পাশ দিয়া দইওয়ালা হাঁকিয়া যায়, মালীর মেয়ে সুধা ফুল তুলিতে যাইবার সময় তাহার সঙ্গে দুই চারিটি কথা বলিয়া চলিয়া যায় দূরের পথ ধরিয়া, পাঁচমুড়া পাহাড়ের চূড়া ঐ দেখা যায় দূরে, সেখানকার বিচিত্র দেখা-না-দেখা ছবি মনকে টানে উহার কাছে, রাঙা মাটীর পথ কোথায় কোন্ নিরুদ্দেশ দিগন্তে গিয়া মিশিয়াছে—এ সমস্তই যেন সুদূরের, অজানার ডাক, তাহারই ইঙ্গিত। সেই ইঙ্গিত আসে অদৃশ্য এক রাজার নিকট হইতে, বহন করিয়া আনে ডাকহরকরা। সংসারী যাহারা, বিষয়ী যাহারা, তাহারা অঙ্কের হিসাব মানিয়া চলে, হাতের মুঠায় যাহা ধরিয়া ভরিয়া রাখা যায় তাহাতেই তাহাদের বিশ্বাস; সুদূরের আহ্বান, অজানার ইঙ্গিত তাহারা শুনিতে পায় না, দেখিতে পায়না। কিন্তু অমলের কিশোর মন তাহার সহজ বোধ দিয়া অনুভূতি দিয়া সহজেই সেই ইঙ্গিত দেখিতে পায়, সে-আহ্বান শুনিতে পায়, নিরাসক্ত সহজ এবং সরল ঠাকুরদাদাও

পারেন। তাহারা জানেন, ডাকহরকরা রাজার নিকট হইতে সেই আহ্বানের সেই ইঙ্গিতের লিপি বহন করিয়া আনিতেছে। বিশ্বজগতের যত কিছু রঙ্‌ ও আলো, গন্ধ ও বর্ণ, শব্দ ও ধ্বনি, সুর ও গান, প্রেম ও ভালবাসা যাহা কিছু মানুষের চিত্তকে তার রুদ্ধ আবেশান্ধকার হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনে তাহা সমস্তই ত রাজার ডাকঘরের লিপি ; প্রতি মুহূর্তেই রাজা এই লিপি পাঠাইয়া সমস্ত স্পর্শালু হৃদয়কে ডাকিতেছেন সুদূরের পথে, ইঙ্গিত করিতেছেন অজানার নিরুদ্দিষ্ট দিগন্তে। অমল বিছানায় শুইয়া শুইয়া ডাক-হরকরার হাত হইতে সেই লিপির প্রতীক্ষা করিতেছে। একদিন সে আসিল মৃত্যুর রূপ ধরিয়া। অমলের রুদ্ধ রুগ্ন জীবনের অবসান হইয়া গেল, মাধব দত্ত বা কবিরাজের আসক্তি ও বিধিবিধান তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, কিন্তু অমল সুদূরের আকুতি রাখিয়া গেল তাহার সুধার প্রেম-স্মৃতির মধ্যে।

বালক অমল সুদূরের আহ্বান, অজানার ইঙ্গিতানুভূতির প্রতীক হিসাবেই সত্য, তাহা না হইলে রুগ্ন বালক-চিত্তের প্রকাশে হিসাবে অমলকে খানিকটা 'মরবিড্‌' বা দুঃখ-বিলাসী এবং অতিরিক্ত প্রবীণ এবং প্রাজ্ঞ বলিয়াই মনে হয়। তাহার ভাষণ একটু অতিরিক্ত চিন্তাভারগ্রস্ত এবং বালক বা কিশোর হিসাবে একটু বেশী কবিসুলভ।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই নাটকের অমল চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজের বাল্যাবস্থার রুদ্ধ পীড়িত দুঃখভারগ্রস্ত কবি-মানসের প্রতিরূপ খানিকটা দেখিয়াছেন। তাঁহার এই ব্যাখ্যা আমারও কতকটা সত্য বলিয়া মনে হয়।

> "ডাকঘরে অমলের যে-চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা যেন তাঁহারই বাল্যকালের রুদ্ধজীবনের কথা। রুদ্ধগৃহে বালকের চিত্ত বাহিরের প্রত্যেকটি ঘটনায় সাড়া দিতেছে। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার অধিকার তাহার নাই; নিষেধের বাধা তাহাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কল্পনাশীল মন সমস্ত দেখিতেছে, সমস্ত যেন উপভোগ করিতেছে। বাহিরের সহিত মিলিত হইবার জন্য অন্তরের নিরন্তর ক্রন্দন চলিতেছে; কিন্তু সে-মিলন সম্ভব হইতেছে না। কবিরাজরূপী সংসার ও মোড়লরূপী সমাজ রহিয়াছে। সকলের অন্তরই রাজার কাছ হইতে পত্র আসিবার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সেই সময়ে একটা রুদ্ধজীবনের ব্যর্থতা কোথায় যেন পীড়িত করিতেছে; বাহিরে যাইবার জন্য প্রাণ চঞ্চল ; সেই তাহার চিরদিনের ক্রন্দন, সেই নিজের বেষ্টনী হইতে মুক্তির

জন্ম ব্যাকুলতা, তাহারই সুর ধ্বনিয়াছে এই নাটকে।" "রবীন্দ্র-জীবনী", ১ম খণ্ড, ৪৯৭—৯৮ পৃ)

"ডাকঘর" রচনার প্রায় চারি বৎসর পর, ১৩২১ সালের ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথ বসন্তোৎসবের নাটক "ফাল্গুনী" রচনা করেন। ইহার ভিতর কবি একবার য়ুরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। "ফাল্গুনী" বসন্তের প্রশস্তি সঙ্গীত। বসন্তোৎসব যৌবনের উৎসব, যুবকেরা সব উৎসবে যোগদানের জন্ম উন্মুখ, কিন্তু এই উৎসব ত দায়িত্ব-বিরহিত কর্তব্য-নিরপেক্ষ আমোদোৎসব মাত্র নয়। "শারদোৎসবে"র ধুয়াটিও ঠিক তাই। এই আনন্দোৎসবের অধিকারী তাহারাই যাহারা জরার অবসাদ হইতে মুক্ত, যাহারা মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিয়াছে, যাহারা চিরনবীন, প্রাণ যাহাদের অফুরন্ত! "ফাল্গুনী"র এই যে বাণী, এই বাণীর সঙ্গে "বলাকা"র যৌবনের জয়গানের যোগ অভিন্ন, কারণ দুই-ই একই সময়ের একই মানসের কবিকল্পনা। এবং "ফাল্গুনী" যে "সবুজপত্রে"ই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিতও নিরর্থক নয়।

"ফাল্গুনী"র মর্মবাণী কবির অনবদ্য ভাষায় ও ভঙ্গিতে ব্যক্ত করাই ভাল।

"জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে' জীবনকে সে পায় নি'। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস ক'রেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন। যখন সাহস ক'রে তার সামনে দাঁড়াতে পারিনে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি; নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে যায়, সেই সর্দার মৃত্যুর তোরণ-দ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হ'চ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এতো অনায়াসে হ'বার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন ক'রে তবে সেই নব-জীবনের আনন্দে পৌঁছানো যায়। তাই যুবকেরা বললে, আনব সেই জরা-বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা, এই বসন্ত-উৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন ক'রে নির্জীব করতে চায়, তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব-

বসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। * * * ফাল্গুনীতে বাউল বল্‌ছে, 'যুগে যুগে মানুষ লড়াই করছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ। যা'রা মরে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারা পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে, আমরা পথের বিচার করিনি', আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। * * * বসন্তের কচি পাতায় এই যে পত্র এ কাদের পত্র? যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে, তারাই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি আঁকড়ে থাক্‌তে পারত, তা' হ'লে জরাই অমর হতো, তা' হ'লে পুরাতন পুঁথির কাগজে সমস্ত অরণ্য হয়ে যেত * * *। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চির-নবীনতা প্রকাশ করে, এই তো বসন্তের উৎসব। * * * মানুষ তার জীবনকে সত্য করে, বড় করে, পেতে চাচ্ছে। তাই মানুষের সভ্যতায় যে-জীবনটা বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, সে ত কেবলই মৃত্যুকে ভেদ করে। * * *"

"ফাল্গুনী"র এই মর্মবাণীর মধ্যে যে সুসম্পূর্ণ সুসমঞ্জস ইতিহাস-বোধ এবং সমাজ ও বৃহত্তর মানব-সভ্যতার আবর্তন বিবর্তন সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান-দৃষ্টি ধরা পড়িয়াছে, সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল। আমাদের এই জরাগ্রস্ত সমাজে এই বোধ ও দৃষ্টির সামাজিক চেতনা ছিলনা বলিলেই চলে, তাহার সাহিত্যিক রূপ ত ছিলই না। আমাদের মৃত্যুভীত জরাগ্রস্ত জীবনই কবির মনে এই চেতনা জাগাইয়াছে, তাহার অনুভূতিকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে, এবং সেই অনুভূতি অপূর্ব কাব্যময় রূপান্তর লাভ করিয়াছে। "ফাল্গুনী"র মূল সুরের সঙ্গে "বলাকা"র মূল সুরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে, একথা যে কোনও বোদ্ধা রসিক পাঠকের কাছেই ধরা পড়িবে। তাহার কারণ সুস্পষ্ট; এই দুই গ্রন্থ একই কালের একই কবি-মানসের সৃষ্টি, এবং একই সামাজিক চেতনাদ্বারা উদ্‌বুদ্ধ; এই চেতনা আমাদের জীবন ও যৌবনের বন্দী দশা সম্বন্ধে, আমাদের মৃত্যুভীতি সম্বন্ধে, আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত স্থবিরত্ব সম্বন্ধে, আমাদের অবিপ্লবী মনোভাব সম্বন্ধে। সামাজিক চেতনা, সমাজ-সত্ত্বা সম্বন্ধে যথার্থ বোধ ও বিজ্ঞান দৃষ্টি কি ভাবে কতখানি গীতধর্মী কাব্য ও নাট্যরূপ লাভ করিতে পারে, কতখানি রহস্যময় সাহিত্যরূপ লাভ করিতে পারে, "অচলায়তন," ও "ফাল্গুনী", "মুক্তধারা" ও "রক্তকরবী" বাঙ্‌লা নাট্য-সাহিত্যে তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

"ফাল্গুনী" অভিনয় হইবার প্রাক্‌কালে কবি অভিনেয় বস্তুর ভূমিকাস্বরূপ "বৈরাগ্য-সাধন" নামে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করেন এবং দুইই একত্রে অভিনীত হয়। এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি "ফাল্গুনী"র ভূমিকা ত বটেই, ব্যাখ্যা এবং

কৈফিয়ৎও বলা যাইতে পারে ; ইহা অবোধ অরসিকদের "ফাল্গুনী" বুঝাইবার চেষ্টা, এবং এ-চেষ্টা স্বপ্রকাশ ; ইহার সাহিত্যমূল্য যে খুব বেশী, বলা যায়না। চুয়ান্ন বৎসরের রবীন্দ্রনাথ "বৈরাগ্য সাধন"-অভিনয়ে কবিশেখরের ভূমিকায় যে চঞ্চল জীবন-রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, "ফাল্গুনী"-অভিনয়ে বাউলের ভূমিকায় যে শান্ত সমাহিত জীবনচেতনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কল্পনা সেই চিত্তেই সম্ভব যে-চিত্ত "ফাল্গুনী"র জীবনধর্মকে একান্তভাবে অনুভব করিতে পারে। আর রূপ-সজ্জা ও অভিনয়-নৈপুণ্যের কথা নাই বলিলাম; যাহারা তাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহাদের পক্ষে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। "ফাল্গুনী" শিক্ষিত বিদগ্ধ বাঙালীর ও বঙ্গসাহিত্যের চিত্তমরুদেশে নূতন প্রাণরসের সঞ্চার করিয়াছে; গতিশীল সবল প্রাণশক্তির লীলা গানে, ভাষণে, সৌরভে শুধু এই নাটিকাটিকেই যে সুন্দর ও সার্থক রূপদান করিয়াছে তাহাই নয়, বাঙালীর চিন্তাধারাকেও নূতন প্রাণ শক্তি দান করিয়াছে।

"ফাল্গুনী"র উৎসর্গপত্র উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্র-জীবনের তথ্য হিসাবেই নয়, রবীন্দ্র-মানসের পরিচয় হিসাবে, "ফাল্গুনী"র পাদটীকা হিসাবে।

> "যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গু নদীটিকে বৃদ্ধ কবির চিত্তমরুর তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের এবং সেই সঙ্গে সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী আমার সকল গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান্ দিনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মত সমর্পণ করিলাম।"

"ফাল্গুনী"-রচনার প্রায় সাত বৎসর পর ১৩২৮ সালের পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন নাটক রচনা করেন, "মুক্তধারা"। এই সাত বৎসরে কবির জীবনে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফলে মানসিক-পরিবেশ ও অনেকখানি বদলাইয়াছে। কবি যখন "ফাল্গুনী" লিখিতেছিলেন, "বলাকা"র যৌবনধর্মী জীবন-প্রাচুর্যের কবিতাগুলি লিখিতেছিলেন, তখন য়ুরোপের মহাসমর চলিতেছে, তাহার মধ্যে তিনি শক্তি ও যৌবনের লীলাপ্রাচুর্যই দেখিয়াছিলেন এবং তাহারই জয়গান করিয়াছিলেন ; রাত্রির তপস্যা দিনের আলোক টানিয়া বাহির করিবে, মৃত্যুর মধ্য দিয়াই অমৃত লাভ হইবে, এই আশাই কবি করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে মহাসমর শেষ হইয়াছে ; শান্তি ও সভ্যতা ফিরিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু কবি ও মনীষীদের স্বপ্ন সত্য ও সার্থক হয় নাই, পৃথিবী-ব্যাপী মানুষ মুক্তি লাভ করে নাই, অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে নাই। ধনিকের

যন্ত্রসভ্যতার লৌহশৃঙ্খল তাহাকে আরও নূতন করিয়া দৃঢ়তর করিয়া বাঁধিয়াছে, পরৈশ্বর্য লোলুপ জাতীয়তা ও সাম্রাজ্যবাদের যূপকাষ্ঠে সে আরও বেশী করিয়া বাঁধা পড়িয়াছে। য়ুরোপে, আমেরিকায়, জাপানে সেই মানুষের চেহারা কবি ইতিমধ্যে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহার অন্তরের পরিচয় তিনি লইয়া আসিয়াছেন, এই সব দেশের মনীষীদের সঙ্গে বহুল ভাব ও চিন্তা বিনিময় হইয়াছে, স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধের সংকীর্ণতার চেহারাটা ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, Nationalism সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা বিদেশে করিতে হইয়াছে, চীনের উপর জাপানের অত্যাচারের মূল কারণটাও ধরিতে পারিয়াছেন, "ঘরে বাইরে"-উপন্যাস উপলক্ষ্য করিয়া অন্ধ জাতীয়তা-বোধের অপদেবতার চেহারাটা দেশবাসীকেও দেখাইয়াছেন, অমৃতসর-অনাচার হইয়া গিয়াছে, 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করিয়াছেন, গান্ধীজীর অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম পর্বের অবসান হইয়া সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা চলিতেছে, পূর্ণাঙ্গ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অসংখ্য ঘটনাবর্তের মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিলাম, এবং তাহাও সন তারিখের যথাক্রম ধরিয়া করিলাম না; বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজনও নাই। শুধু এই কথাটি মনে রাখিলেই চলিবে যে ১৩২৩ সালে একবার জাপান ও আমেরিকায় ঘুরিয়া আসা ছাড়া আবার ১৩২৭ ও '২৮ সালে এক বৎসরেরও বেশী য়ুরোপের সর্বত্র এবং আমেরিকায় কাটাইয়াছেন, এবং সে-য়ুরোপ ও আমেরিকা সমরোত্তর পাশ্চাত্য জগৎ। ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে ইহার বেশী আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই মনে করি। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তনের ছয়মাসের মধ্যে "মুক্তধারা" এবং দুই বৎসরের মধ্যে "রক্তকরবী" রচিত হয়। এই দুইটি নাটকেরই ভাব ও চিন্তার পটভূমি হইতেছে সমরোত্তর য়ুরোপ, অথবা সাধারণ ভাবে যুদ্ধপরবর্তীযুগের সমগ্র পৃথিবী, বিষয়বস্তুর পটভূমি যদিও কাল্পনিক ভারতবর্ষের কোনও এক কল্প কালের কাল্পনিক রাজ্যের। অর্থাৎ কোনও একটা বিশেষ রূপকের মধ্য দিয়া আমাদের বিশেষ কালের একটি বিশেষ চিন্তাধারা কবির অনুভূতির মধ্যে ধরা দিয়াছে এই দুইটি নাটকেই। য়ুরোপে ধনিক-কবলিত এই যান্ত্রিক-সভ্যতা যে-রূপে ও আকারে দেখা দিয়াছে আমাদের দেশে তাহা সেই রূপে ও আকারে দেখা দেয় নাই একথা সত্য, সামাজিক পরিবেশ ও এক নয় তাহাও সত্য, তবু এই সভ্যতার ধর্ম সর্বত্রই

এক, এবং চিন্তাধারাও একই। একথা সত্ত্বেও, স্বভাবতঃই মনে হয় আমাদের স্বদেশের বস্তুপটভূমি এবং দেশীয় পরিবেশ রবীন্দ্র-চিত্তে এই চিন্তাধারা ও অনুভূতি সঞ্চার করে নাই, করিয়াছে সমরোত্তর য়ুরোপ, এই য়ুরোপই তাহাকে এই নূতন চৈতন্য দিয়াছে, এবং সেই চেতনায় দেশের পরিবেশ ও পটভূমিকে তিনি নূতন করিয়া দেখিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন, অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা প্রত্যক্ষগোচর ছিল না তাহা এই চৈতন্যের বলে বোধ ও অনুভূতির গোচর হইয়াছে, কবির নিজের ও তাঁহার অগণিত পাঠকেরও। এই পটভূমি মনের পশ্চাতে রাখিয়া "মুক্তধারা" ও "রক্তকরবী" পাঠ করিলে উহাদের মর্মোদ্ধার সহজ হইবে।)

উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ তাহার শিল্পী যন্ত্ররাজ বিভূতিকে দিয়া বহু কৌশল ও পরিশ্রমের ফলে শিবতরাই রাজ্যের জল-চলাচলের যে মুক্তধারা তাহা বাঁধ বাঁধিয়া বন্ধ করিয়াছেন; উদ্দেশ্য শিবতরাইয়ের অবাধ্য প্রজাদের বশ মানান। জলসরবরাহের পথ বন্ধ হওয়াতে অশেষ কষ্টে পড়িয়া প্রজারা ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়াছে; দেশে দুর্ভিক্ষ, খাজনা দিতে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে। যুবরাজ অভিজিৎকে পাঠান হইয়াছে প্রজাদের শাসন করিবার জন্য। অভিজিৎ প্রেমের দ্বারা সস্নেহ হিতসাধন দ্বারা প্রজাদের বশ করেন, এবং উত্তরদিকের নন্দীসঙ্কটের গড় ভাঙিয়া দেন। তাহাতে শিবতরাইয়ের লোকদের বাণিজ্যের খানিকটা সুবিধা হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে উত্তরকূটের ক্ষতি হয়। উত্তরকূটবাসীদের স্বদেশ ও স্বাজাত্যাভিমান প্রবল, সেই প্রীতি ও অভিমানে তাহারা শিবতরাইবাসীদের সর্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত নয়, বস্তুতঃ তাহারা মুক্তধারার বাঁধ তুলিয়া তাহাই করিয়াছে। রাজসভায় যুবরাজ অভিজিতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া তাহারা তাহাকে সেখানকার শাসনভার হইতে মুক্ত করিয়া উত্তরকূটে ফিরাইয়া আনিল। নূতন শাসনকর্তা হইয়া গেলেন রাজার শ্যালক; তাহার অত্যাচারে দুদিনেই প্রজারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষের উপর আবার শাসকের অত্যাচার; শিবতরাইয়ের ক্ষুব্ধ ক্রন্দন মুক্তধারার বাঁধের গর্জনে ডুবিয়া গেল। শিবতরাইয়ের দুঃখ উত্তরকূটের অধিবাসীদের আনন্দোৎসবের কারণ হইল; মুক্তধারার বাঁধ তাহাদের গর্ব ও ঐশ্বর্যের উৎস। কিন্তু এই বাঁধ বাঁধিতে কত মজুরের আবশ্যিক-শ্রম লাগিয়াছে, কত তরুণ প্রাণ ইহার নির্মম দাবীর নীচে বলি

হইয়াছে। তাহাদের ক্ষীণ ক্রন্দন উৎসবের উন্মত্ততার মধ্যেও শোনা যাইতেছে, ‘সুমন্, আমার সুমন···’বলিয়া কাঁদিয়া বেড়ায় সুমনের মা অম্বা ; পাগল বটুক সকলকে সাবধান করিয়া দিয়া হাঁকিয়া চলে, ‘সাবধান বাবা, যেওনা ওপথে... বলি দেবে...নরবলি !’ এদিকে অভিজিৎ রাজার কাকা বিশ্বজিতের কাছে শুনিয়াছেন, তিনি রাজকুলের কেহ নহেন, রাজা মুক্তধারার নিকট তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়া পুত্রস্নেহে পালন করিতেছেন মাত্র। তিনি রাজকুলের নহেন, তিনি ব্যক্তিবিশেষের নহেন, তিনি সকলের, তাঁহার কোন বন্ধন নাই, সকলের সঙ্গে তিনি বন্ধনে যুক্ত, তাঁহার বিশেষ কোন ঘর নাই, সকল ঘরই তাঁহার ঘর, তিনি সকল দেশের, সকল জাতির। উত্তরকূটের উৎসবের সঙ্গে তাই তাঁহার কোন যোগ নাই, সেখানে মানবাত্মা পীড়িত ও লাঞ্ছিত ; অম্বার কান্না, পাগলা বটুকের ক্ষোভ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে। তিনি যন্ত্ররাজ বিভূতিকে, উত্তরকূটবাসীদেরকে শিবতরাইয়ের সর্বনাশ হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বিজ্ঞানগর্বে গর্বিত, ঐশ্বর্যে উন্মত্ত, স্বদেশাভিমানে অন্ধ বিভূতি ও উত্তরকূটবাসী সে-কথা শুনিবে কেন ? রাজাজ্ঞায় অভিজিৎ বন্দী হইলেন। বন্দীশালায় আগুন লাগিল। রাজখুল্লতাত বিশ্বজিৎ যুবরাজকে উদ্ধার করিয়া মোহনগড়ে লইয়া যাইতে চাহিলেন, যুবরাজ রাজী হইলেন না। যুবরাজ বন্দীশালায় নাই শুনিয়া উত্তরকূটের লোকেরা পাগলের মত তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে ; সেই অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ তাহারা শুনিতে পাইল, রুদ্ধ জলস্রোত মুক্তি পাইয়া গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, যন্ত্ররাজ বিভূতির বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছে। সেই দিশাহারা উন্মত্ত জনসংঘের দুয়ারে কুমার সঞ্জয় সংবাদ বহন করিয়া আনিল, যুবরাজ অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভাঙিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যে-যন্ত্রকে তিনি ভাঙিয়াছেন সেই যন্ত্রও তাহার প্রতিশোধ লইয়াছে, আহত যুবরাজ অভিজিৎ স্রোতের মুখে পড়িয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন কেহ বলিতে পারে না।

যে-ভাবে এই নাটকের আখ্যান-বস্তুটি বিবৃত করিলাম তাহাতে মুক্তধারার কবিত্ব-মাধুর্য ধরা পড়িবার কথা নয়, সে-কবিত্ব ছড়াইয়া আছে অভিজিতের মুক্ত-মানসের গভীর দ্যোতনায়, ব্যঞ্জনাময় ভাষণের মধ্যে, ধনঞ্জয়ের গানে ও ভাষণে, ভৈরবপন্থীদের গানে। তাহা ছাড়া সর্ববন্ধনমুক্ত মানবাত্মার চিরন্তন যে-আদর্শ, সকল বন্ধনকে আঘাত করিয়া ছিন্ন করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার

যে-শাশ্বত আদর্শ সকল যুগের সকল মানবাত্মাকে দুর্নিবার বেগে টানিয়াছে তাহার পরিচয়ও নাটকটিতে সুস্পষ্ট; এবং সে-আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে নাটকীয় আখ্যান-বিন্যাসের কলাকৌশলের মধ্যে, ধনঞ্জয় ও অভিজিতের চরিত-রেখা ও ভাষণের মধ্যে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে "মুক্তধারা"য় সমসাময়িক সমাজ-মানসের চেতনা। আমাদের কালে স্বদেশ ও স্বাজাত্যাভিমান মানুষকে কিরূপ অন্ধ ও স্বার্থলোলুপ করিয়া তুলিয়াছে, জড়-যান্ত্রিকতা মানুষের প্রাণকে লইয়া তাহার মনুষ্যত্ব লইয়া কি ভাবে ছিনিমিনি খেলিতেছে, মানুষের মস্তিষ্ক-প্রসূত যন্ত্র কি করিয়া মানুষের মস্তিষ্ককে ছাড়াইয়া যাইতেছে, এ সমস্তই আধুনিক সমাজ-মনকে অল্পবিস্তর আলোড়িত করিতেছে। "মুক্তধারা" এই আলোড়নের কাব্যময় রূপ। রবীন্দ্রনাথ এই যান্ত্রিক-সভ্যতার যুগকে একান্তভাবে অস্বীকার করেন না। কিন্তু যে-যান্ত্রিকতা মানুষকে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরাগ সর্বজনবিদিত। সেই বিরাগের প্রকাশ "মুক্তধারা"য়ও আছে। প্রভু জাতির দৌরাত্ম্য এবং পরাধীন জাতির দুঃখের রূপও সুস্পষ্ট। অবশ্য, বলা যাইতে পারে, যান্ত্রিকতার প্রতি কবির বিরাগ কার্যকারণ-বিচারলব্ধ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত নয়; যন্ত্র যে মানুষকে অতিক্রম করিয়া যায় তাহা যন্ত্রের অথবা যান্ত্রিকতার দোষ নয়, এমন কি যন্ত্ররাজ বিভূতিরও নয়, তাহা সমাজ-ব্যবস্থারই দোষ; আপাতদৃষ্টিতে শুধু মনে হয়, যন্ত্রটাই দোষী, যন্ত্রনির্মাতাই বুঝি দোষী। সেই জন্য যন্ত্ররাজ বিভূতির সঙ্গে যুবরাজ অভিজিতের যে দ্বন্দ্ব তাহা সমাজ-চৈতন্যের সজ্ঞান পরিচয় নয়; অভিজিৎ যন্ত্রটাকে আঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়াছেন, কিন্তু যাহারা যন্ত্রের সাহায্যে মানুষকে দাস করিয়াছে, তাহাদের আঘাত করেন নাই। কিন্তু এ ত হইল যুক্তির কথা, এই যুক্তি হয়ত কবির অনুভবের মধ্যে ধরা দেয় নাই; কিন্তু তিনি এই যান্ত্রিকতাকে যে-দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন, যে-ভাবে ইহাকে অনুভবের মধ্যে পাইয়াছেন তাহার সমস্ত রূপটিই যে "মুক্তধারা"য় আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

কিন্তু একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে। অভিজিৎ যুবরাজ, কিন্তু তিনি রাজার পুত্র নহেন, রাজা তাঁহাকে মুক্তধারার ঝরণার নীচে কুড়াইয়া পাইয়া পুত্রের মতন লালন করিয়া যৌবরাজ্য দিয়াছেন, এ খবর অভিজিৎ জানিলেন খুড়ামহারাজ বিশ্বজিতের মুখে সক্রিয় বিরোধের পূর্বাহ্নে।

আখ্যানবস্তুর জন্য কিংবা নাটকীয় সংস্থানের জন্য এই জ্ঞানের কি খুব প্রয়োজন ছিল? রাজার ঔরসজাত পুত্রের পক্ষে কি এই ধরণের মনন অথবা ক্রিয়া সম্ভব ছিল না? তাহা না হওয়ায় গল্পের দিক হইতে অথবা গল্পার্থের দিক্ হইতে লাভ কি এবং কোথায় হইল? একথা অবশ্য সহজবোধ্য যে কবি হয়ত অভিজিৎ-মানসের পরিবেশটিকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন যাহাতে স্বভাবতই মনে হইবে কি জন্ম-ব্যাপারে, কি শিক্ষায় দীক্ষায় সকলভাবে সে সর্ববন্ধনমুক্ত, সর্বসংস্কারমুক্ত, স্বীয় শ্রেণী ও সমাজ-সংস্কার হইতে সে বিচ্যুত, সে বৃন্তহীন পুষ্পের মত আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সবচেয়ে দৃঢ় যে বন্ধন সেই জন্মের বন্ধনেও সে কাহারও সঙ্গে জড়িত নয়, এবং সেইজন্যই সমস্ত বন্ধনকে অস্বীকার করা তাহার পক্ষে সহজ হইয়াছে, রাজসিংহাসনের, রাজধর্মের সংস্কার প্রভুধর্মের সংস্কার কিছুই তাহার জীবন-স্রোতকে বাঁধিতে পারে নাই, যন্ত্ররাজ বিভূতির বাঁধও নয়। "গোরা"-উপন্যাসে গোরার জন্মরহস্যের মধ্যেও এই ধরণের একটা যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয়। সেকথা যথাস্থানে আমি আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু, ইহা কি যথেষ্ট যুক্তিসহ? বুদ্ধদেব ত রাজবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও ত যুবরাজ ছিলেন, জন্মের বন্ধনে তিনি শুদ্ধোদনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এবং তিনি তাহা জানিতেন; কিন্তু তাঁহার পক্ষে ত সম্ভব হইয়াছিল সর্ববন্ধনমুক্তির সাধনা করা, তাহাতে কৃতকার্য হওয়া এবং সেই সর্ববন্ধনমুক্তির বাণী প্রচার করা, কথায় ও-কর্মে, বচনে ও জীবনে। তিনি জন্মের বন্ধনে কাহারও সঙ্গে জড়িত নহেন, এ-জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার হয় নাই। এই ধরণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয়। শিল্পের দিক্ হইতে রসের দিক্ হইতে যদি লাভবান্ হওয়া যাইত তাহা হইলে ইহাতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার যেন মনে হয়, তেমন ভাবে লাভবান্ আমরা হই নাই। একটু রহস্যময় পরিবেশ-সৃষ্টি হয়ত ইহাতে হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট লাভ নয়, বরং যেন মনে হয় যে মুহূর্তে অভিজিৎ জানিলেন জন্মের বন্ধনে তিনি রাজা, রাজবংশ বা রাজ-সিংহাসনের সঙ্গে জড়িত নহেন সে-মুহূর্তেই তাঁহার জীবনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব অনেকটা শিথিল ও তরল হইয়া গেল, অন্ততঃ সবচেয়ে বড় একটা বাধাও বন্ধনের বাঁধ বিনা চেষ্টায় বিনা আঘাতেই অতি সহজে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। গোরার জীবনেও তাহাই। ভারতবর্ষে, ভারতীয় সাধনা ও ঐতিহ্যের ক্রোড়ে ভারতীয় রক্তের জোরে

নাড়ীর বন্ধনে বাঁধা গোরার জীবনে যে-দ্বন্দ্ব ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, যেমন করিয়া তাহার মন ও চিত্ত সেই দ্বন্দ্বে আবর্তিত হইতেছিল, তাহা শিথিল ও তরল হইয়া গেল, এমন কি সমস্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়া গেল সেই মুহূর্তে যে-মুহূর্তে তাহার জন্মরহস্যের যবনিকা উত্তোলিত হইল, যে-মুহূর্তে সে জানিল সে আনন্দময়ীর পুত্র নয়, অভারতীয় এক অজ্ঞাত আইরিশ যুবকের পুত্র। সর্ববন্ধনমুক্ত মানবতার সন্ধান ও প্রতিষ্ঠাই যাহার আদর্শ জন্মের বন্ধনও তাহার কাছে অন্যতম বন্ধন মাত্র, অন্য সকল বন্ধনের মত তাহাকে অতিক্রম করার মধ্যেও মুক্তির মূল্য নিহিত, তাহাকে পাশ কাটিয়া এড়াইয়া গিয়া নয়। মহাভারতকারের কবিমানস কিন্তু তাহা করে নাই।

> সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
> দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্।

কর্ণ তাঁহার জন্মের বন্ধনকে অস্বীকার করেন নাই, তাহাকে স্বীকার করিয়াই তাঁহার পৌরুষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কুন্তীর নিকট হইতে পরে যখন তিনি তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত জানিয়াছিলেন তখন যদি তিনি তাহা মানিয়া লইয়া পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতেন, এবং সেই মানিয়া লওয়ার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার পৌরুষই শুধু অবমানিত হইত তাহাই নয়, কর্ণচরিত্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্য শিথিল ও তরল হইয়া যাইত। কর্ণ রাধাপুত্র বলিয়াই নিজকে জানিতেন, কিন্তু এই জ্ঞানের বন্ধনকে তিনি এড়াইয়া যান নাই, কুন্তীর নিকট জন্মবৃত্তান্ত জানিবার পরও নয়; তিনি মুখোমুখি হইয়া সেই বন্ধনকে স্বীকার করিয়াছেন। গোরা ও অভিজিৎ দুইজনই যেন তাহাকে এড়াইয়া গিয়া নিজেদেরকে এক সুকঠিন দ্বন্দ্ব হইতে বাঁচাইয়াছেন।

"প্রায়শ্চিত্ত"-নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী এখানেও আছেন, এবং প্রায় একই রূপে ও আত্মায়; আর, খুড়ামহারাজ যে "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" উপন্যাস অথবা "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের রাজা বসন্তরায়ের অতি নিকট আত্মীয় তাহা খুব অমনোযোগী পাঠকের চোখও এড়াইবেনা বলিয়াই মনে হয়।

"মুক্তধারা" একান্তভাবে নাট্যধর্মী; 'আইডিয়া'র বাহন হওয়া সত্ত্বেও, কাব্যময় হওয়া সত্ত্বেও ইহার নাটকীয় রসই প্রধান এবং প্রথম উপভোগ্য। ইহার ঘটনা-সংস্থান, চরিত্রাভিব্যক্তি এবং ভাষণও একান্তই নাটকীয়, কিন্তু প্রায় একই যুক্তি ও গল্পার্থের বাহন হওয়া সত্ত্বেও "মুক্তধারা"র পরবর্তী নাটক "রক্তকরবী" সম্বন্ধে একান্তভাবে একথা বলা চলেনা। "রক্তকরবী" গীতধর্মী, "রক্তকরবী" নাটকীয় কাব্য। নাট্টীয় রস "রক্তকরবী"তে অনুপস্থিত। "মুক্তধারা"র ঘটনার আবর্ত আছে, হয় মঞ্চের উপর না হয় দর্শকের মনের ভিতর। "রক্তকরবী"তে এই আবর্ত নাই; একটিমাত্র সংস্থান গল্পের মধ্যে স্থির হইয়া আছে। একদল লোক, তাহারা সমাজের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজ-মানসের বিভিন্নস্তরের প্রতীক; তাহারা সকলেই লোভের, প্রথা ও সংস্কারের শৃঙ্খলে নিজেদের কারাগারের মধ্যে আবদ্ধ। সেই কারাগারের জানালার লোহার জালের বাহির হইতে প্রেম ও প্রাণশক্তির প্রতীক, মুক্ত জীবনানন্দের প্রতীক নন্দিনী হাতছানি দিয়া সকলকে ডাকিতেছে, 'চলে এস, চলে এস, তোমাদের সকল শিকল ছিঁড়ে মুক্ত জীবনপ্রাচুর্যের প্রেম ও আনন্দের জগতে চলে এস।' আর, তাহার সেই উন্মাদন আহ্বানে কারাগারের ভিতরে যত লোক সকলে চঞ্চল ও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, সকলের হৃদয়ের দ্বারে আঘাত লাগিয়াছে। এই ত গল্পার্থ, ইহাই ত গল্পের সংস্থান। এই সংস্থানের মধ্যে প্রত্যেকটি ব্যক্তি নিজ নিজ শ্রেণী ও স্তরের বিশিষ্টরূপে বিশিষ্ট মানস লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে অপূর্ব কলা কৌশলে, অসাধারণ শিল্পকৃতিত্বে, গভীর সামাজিক চেতনায়। এই ধরণের স্বল্পপরিসর গল্প-সংস্থানের ভিতর এবং গীতধর্মী গল্পার্থের মধ্যে যথেষ্ট ঘটনাবর্ত ও নাটকীয় সম্ভাবনা উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়।

"রক্তকরবী" রচিত হইয়াছিল ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মকালে, শিলঙের শৈলবাসে; তখন ইহার নামকরণ হইয়াছিল "যক্ষপুরী"। দেড় বৎসর পর অনেক কাটাছাঁটা করিয়া ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের "প্রবাসী"তে যখন উহা সর্বজনগোচর হয় তখন ইহার নাম হইল "রক্তকরবী"। নাম লইয়া বিব্রত হইবার কিছু কারণ নাই, সেক্সপীয়ারকে স্মরণ করিয়া বলা যাইতে পারে নামে কিছু আসিয়া যায় না, তবু আমার মনে হয় "যক্ষপুরী" নামটি এই নাটকের পক্ষে সার্থকতর ছিল, যদিও "রক্তকরবী" নাম অধিকতর কবিত্বময়।

যক্ষপুরীর রাজার রাজধর্ম প্রজাশোষণ; তাহার অর্থলোভ দুর্দম। সেই লোভের আগুনে পুড়িয়া মরে সোনার খনির কুলীরা। রাজার দৃষ্টিতে কুলীরা ত মানুষ নয়, তাহারা স্বর্ণলাভের যন্ত্র মাত্র, তাহারা ৪৭ক, ২৬৯ক মাত্র, তাহারা জড়-যান্ত্রিকতার যন্ত্র-কাঠামোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ মাত্র, মানুষ হিসাবে তাহাদের কোনও মূল্য নাই। মনুষ্যত্ব, মানবতা এই যন্ত্রবন্ধনে পীড়িত ও অবমানিত। জীবনের প্রকাশ সেই যক্ষপুরীতে নাই। প্রেম ও সৌন্দর্য হইতেছে জীবনের প্রকাশের সম্পূর্ণ রূপ, নন্দিনী তাহার প্রতীক, এই নন্দিনীর আনন্দ-স্পর্শ যক্ষপুরীর রাজা পান নাই তাঁহার লোভের মোহে, সন্ন্যাসী পান নাই তাঁহার ধর্মসংস্কারের মোহে, মজুররা পায় নাই অত্যাচার ও অবিচারের লোহার শিকলে বাঁধা পড়িয়া, পণ্ডিত পায় নাই তাঁহার পাণ্ডিত্যের এবং দাসত্বের মোহে। সেই যক্ষপুরীর লোহার জালের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক, প্রাণশক্তির প্রতিমূর্তি নন্দিনী হাতছানি দিয়া সকলকে ডাকিল; যক্ষপুরীর কারাগারের ভিতরে একমুহূর্তে সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল, মুক্ত জীবনানন্দের স্পর্শ সকলের দেহে মনে লাগিল, এ যেন বসন্তের বাতাস। রাজা নন্দিনীকে পাইতে চাহিলেন যেমন করিয়া তিনি সোনা আহরণ করেন তেমন করিয়া শক্তির বলে কাড়িয়া লইয়া পাওয়ার মতন করিয়া, ধরিয়া ছুঁইয়া পাওয়ার মতন করিয়া, কিন্তু তেমন করিয়া প্রেম ও সৌন্দর্যকে লাভ করা যায় কি? নন্দিনীকে তিনি তাই পাইয়াও পাননা; বাতাস আসিয়া গায়ে লাগে কিন্তু তাহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারেন না। এমন যে মোড়ল সেও বিচলিত হইল, সেও নন্দিনীকে ভালবাসিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ পাইল বিরোধের মধ্য দিয়া। পণ্ডিত, কিশোর, কেনারাম, সকলেই চঞ্চল হইল এই জীবনানন্দের রূপ দেখিয়া, প্রাণ-প্রাচুর্যের মধ্যে বাঁচিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া জালের বাহিরের দিকে হাত বাড়াইল। নন্দিনী রঞ্জনকে ভালবাসে, নন্দিনীই রঞ্জনের মধ্যে এই প্রেম জাগাইয়াছে; কিন্তু সে ত যন্ত্রের বন্ধনে বাঁধা, এবং সেই যন্ত্রই শেষ পর্যন্ত তাহাকে বিনাশ করিয়া প্রেমকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল, জীবনের সঙ্গতি নষ্ট করিয়া দিল। ইহাই যান্ত্রিকতার ধর্ম বলিয়া কবি বিশ্বাস করেন, অনুভব করেন। নন্দিনীর প্রেমাস্পদ বলি হইল যান্ত্রিকতার যূপকাষ্ঠে, এবং তাহারই মধ্য দিয়া জীবন হইল জয়ী আবার প্রেমকেই সন্ধান করিয়া ফিরিয়া

পাইবার জন্য। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এই দৃষ্টিভঙ্গিই বহু কবিতায় গাথায় নাট্যে গল্পে তিনি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

"রক্তকরবী"তে সমাজচেতনা "মুক্তধারার" মতন এতটা প্রকাশ্যে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে না; "রক্তকরবী"র দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিক, আগেই বলিয়াছি, ইহা গীতধর্মী। এই কবি-মানস লইয়াই রবীন্দ্রনাথ বর্তমান জড়-যান্ত্রিকতা ও জীবনধর্মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সন্ধান করিয়াছেন। ইহা সত্য হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, তবে "রক্তকরবী" তাহারই কাব্যময় রূপ।*

---

* প্রথম রচনার তারিখ, ১৩৩৫। বর্তমানে স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ত, পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। কোন কোন অংশ "প্রবাসী" (১৩৩৭), "ভারতবর্ষ" (১৩৩৪) "বাতায়ন" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত।

উপন্যাস

(১)

বাঙ্‌লা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্প যদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন রবীন্দ্রনাথ, সার্থক উপন্যাসের সূচনা করিয়া গিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র। আমাদের সাহিত্যে উপন্যাসের দৃঢ় সুপ্রশস্ত রাজপথ কাটিয়া দিয়া গিয়াছেন তিনিই। যে সূর্য্যালোক-দীপ্ত বাস্তব জীবন, যে সংঘাত-বিক্ষুব্ধ জীবন ও সমাজ-প্রবাহ এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মায়াঘন বর্ণচ্ছটার যে বিচিত্র-সমারোহ, যে গীতধর্মী কাব্যময় ভাব ও বর্ণোচ্ছ্বাস এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে কার্যকারণ-ধর্মী সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ এখনও পর্যন্ত আমাদের উপন্যাসের উপজীব্য তাহার সমস্তই সূচনা করিয়া গিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তবনিষ্ঠা রোমান্সের রামধনুর রঙে রহস্যমণ্ডিত, অতিপ্রাকৃতের স্পর্শে অসাধারণ; বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিগূঢ় ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহার উপন্যাস এই রহস্য ও অতিপ্রাকৃতের কল্পনায়, কাব্যের ঝঙ্কারে, সতেজ আদর্শবাদে এবং সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক সমারোহে রোমান্সধর্মী। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে য়ুরোপীয় এবং বাঙ্‌লা সাহিত্যেও ইহাই ছিল উপন্যাসের প্রকৃতি। সামাজিক প্রয়োজনেই, সামাজিক বিবর্তনের ফলেই এই প্রকৃতির উদ্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উত্তরাধিকার লইয়াই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-যাত্রার সূত্রপাত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র নহেন, দুই মানসও বিভিন্ন; রবীন্দ্রনাথের কাল বঙ্কিমচন্দ্রের কালও নয়, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সমাজধর্মের চেতনাও এক নয়।

এই বিভিন্নতার স্বরূপ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে; তাহাতে রবীন্দ্র-উপন্যাসের ধর্ম আবিষ্কার সহজ হইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মানস যে-যুগের পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল সে-যুগ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধ্যান ধারণাপুষ্ট ভারতীয় মানসের প্রথম সাংস্কৃতিক প্রকাশের যুগ। পশ্চিমের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে উনবিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে বাঙ্‌লার শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যে মানসিক আলোড়নের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে অনেকটা স্থিতি লাভ করিয়াছে।

শিক্ষিত বাঙালী আপন সম্বিৎ অনেকটা ফিরিয়া পাইয়াছে, এবং নবলব্ধ জ্ঞান ও চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ ও সঞ্জীবিত হইয়া নিজের ঘরের, নিজের জাতির দিকে নূতন দৃষ্টি লইয়া তাকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারই দেশ তাহারই চিরপরিচিত আবেষ্টন তাহারই কাছে নূতন করিয়া ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট, এবং নূতন বিধানে প্রথম আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সরকারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ; এক কথায় তিনিই তদানীন্তন বিকাশোন্মুখ শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ ও সেই সমাজ-মানসের প্রতীক। এই সমাজ-মানস অত্যন্ত জটিল।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণোয়ালিস্ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পত্তন করিয়াছিলেন বাঙলা দেশে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদেই তাহার অনিবার্য ফল ধীরে ধীরে দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের ফলে দেশের প্রাচীন বড় বড় সামন্ত পরিবারগুলি, ছোটবড় রাজবংশগুলি ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিবর্তে একান্তভাবে ভূমি-স্বত্বাধিকারী নূতন এক জমিদার সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মধ্যস্বত্বাধিকারী এবং চাকুরীজীবি, ক্রমবর্দ্ধমান নানা বৃত্তিজীবি এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীও গড়িয়া উঠিতেছে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি হইতেই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র এই নবজাগ্রত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারা তখনও একটা সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই, তাহা তখনও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই, সেই জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ, দ্বন্দ্ব সমস্যা তখনও পরিষ্কার হইয়া দেখা দেয় নাই। আর অচণ্ডাল যে অগণিত জনসাধারণ তাহাদের জীবন-প্রবাহ এত সরল, এত দীন ও রিক্ত যে বঙ্কিমচন্দ্রের মানস অথবা তদানীন্তন মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসের পরিধির মধ্যে তাহাদের কোনও স্থান ছিলনা বলিলেই চলে, অন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের জীবনধারার মধ্যে গল্প ও উপন্যাসের উপাদানের সন্ধান পান নাই, সজাগ চেষ্টাও হয়ত তাঁহার ছিলনা। বাকী রহিল সদ্য বিলুপ্ত প্রাচীন সামন্ত সমাজ, এবং এই সমাজেরই ধ্যান ধারণায় ও ঐতিহ্যে পুষ্ট ভূমি-স্বত্বাধিকারী নূতন জমিদার সমাজ। এই দুই সমাজই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উপজীব্য ; মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানস দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই সমাজের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

আগেই বলিয়াছি, প্রাচীন সামন্ত-সমাজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার

স্মৃতি তখনও তপ্ত। তাহার নানা শৌর্য বীর্য, নানা উদ্বেলিত বিক্ষোভ, নানা বিরোধী আদর্শের সংগ্রামের কাহিনী, গোষ্ঠী-স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল অতীত তখন প্রথম নবজাগ্রত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-মানসকে নানা ভবিষ্যৎ কল্পনায় নাচাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এই নিকট অতীতের ছায়াময় অস্পষ্টতার মধ্যে নূতন পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণাপুষ্ট মানস তাহার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত আহরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহারই মধ্যে আত্মগৌরবের সন্ধান করিতেছে। অথচ এই অতীত নিকট অতীত হইলেও সে-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন, বিকৃত ও ছায়াময়। এই ধরণের অস্পষ্ট অতীতকে কেন্দ্র করিয়াই রোমান্টিক ভাব-কল্পনা মুক্তি পায়। বঙ্কিমচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল। মধ্যযুগে মুসলমান আমলের অবসানের যুগ এক বিরাট শূন্যতা ও অরাজকতার যুগ। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির অধিকাংশই এই যুগের কথা ও কাহিনী লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। যেখানে ঐতিহাসিক জ্ঞান অসম্পূর্ণ, খণ্ডায়িত, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চস্তরের ঐতিহাসিক কল্পনার সাহায্যে শূন্যস্থান পূরণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বল্পজ্ঞাত বা অজ্ঞাত অতীত ছায়াময় হইতে বাধ্য, এবং ছায়াময় বলিয়াই উপন্যাসে তাহা রোমান্সের সজীব ও বর্ণবিহ্বল চিত্রণের এবং অতিপ্রাকৃতের অসাধারণতার মায়াস্পর্শের অপেক্ষা রাখে। শুধু অপেক্ষা রাখে না, এই জাতীয় পরিবেশের মধ্যেই আদর্শবাদী কবিমানস রোমান্টিক ভাব-কল্পনার সাহায্যে নিজকে মুক্ত করিবার স্বাভাবিক প্রবণতা প্রকাশ করে। উপন্যাসে কাব্যের ঝঙ্কারও এই রোমান্টিক ভাব-কল্পনারই অন্যদিক। আর বঙ্কিমের উপন্যাসে যে সতেজ আদর্শবাদের পরিচয় আছে তাহাও এই যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসেরই প্রকাশ। এই মানস কতকটা গড়িয়া উঠিয়াছিল মিল্, বেন্থাম্, কোঁৎ, ফরাসী বিদ্রোহের ইতিহাস পড়িয়া, কতকটা গড়িয়া উঠিয়াছিল ভারতের দূর ও নিকট অতীতের নবলব্ধ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া। এই দুই ভাবধারার সংঘাতের ফলে নূতন এক আদর্শমালা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসকে আশ্রয় করিতেছিল; এই আদর্শমালায় বলিষ্ঠ স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধই সর্বাপেক্ষা সজীব ও বর্ণময়। কিন্তু এই বোধ তখনও গোষ্ঠী ও ধর্ম মহিমায় আচ্ছন্ন।

ভূমি-স্বত্বাধিকারী নূতন অভিজাত শ্রেণীও বঙ্কিমচন্দ্রের মানসকে সৃষ্টি-প্রেরণা দিয়াছে; অন্ততঃ দুইটি উপন্যাসে তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু যেহেতু, এই

শ্রেণী-মানসের সঙ্গে বঙ্কিমের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর, ইহাদের জীবন-প্রবাহ বিচ্ছিন্ন ছায়াময় অতীতের কাহিনী নয়, স্পষ্ট জীবন্ত বর্তমান, সেই হেতু বঙ্কিমের এই ধরণের উপন্যাস অধিকতর বাস্তবনিষ্ঠ, ইহাদের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের অসাধারণত্বের স্পর্শ অনেকাংশে সংযত, এবং আদর্শবাদী কবিমানসও বাস্তবনিষ্ঠা দ্বারা নিয়মিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যুগের অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতন যুক্তিবাদী ; তদানীন্তন বাঙালীর রহস্যময় মানসে যুক্তিধর্মের স্পর্শও লাগিয়াছে। সেই হেতু কার্যকারণধর্মী ঘটনা ও মনোবিশ্লেষণও বঙ্কিম-মানসের অন্যতম ধর্ম। এই বিশ্লেষণ গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা যথেষ্ট দীর্ঘায়ত নয়, ঘটনা ও মনোবিকাশের স্তরগুলি যথেষ্ট পরিমাণে এবং পরিপূর্ণ স্বচ্ছতায় বিকশিত হইয়া উঠে নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া একটা বিশেষ অবস্থার মর্মভেদ করিয়া আবার সংকুচিত হইয়া অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে আর কিছু না হউক পাঠকের মনে বাস্তবতার অনুভূতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ হয়ত ছিলেন না, কারণ বাস্তবনিষ্ঠাপেক্ষা রোমান্সনিষ্ঠা ছিল তাঁহার প্রবলতর।

১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় ; রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩২ বৎসর। তাঁহার প্রথম উপন্যাস "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" ১২৮৮-৮৯, এবং দ্বিতীয় উপন্যাস "রাজর্ষি" ১২৯২ সালে রচিত হয়। কিন্তু তাঁহার প্রথম সার্থক উপন্যাস "চোখের বালি" রচিত হয় ইহার দশবৎসর পর ১৩০৮ সালে, এবং এই সময় হইতে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যেই সমাজ-মানস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চেতনার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয় উপন্যাসে অথবা ছোটগল্পে যতটা প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া সম্ভব, কাব্যে, বিশেষভাবে গীতি-কবিতায় তাহা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অধিকাংশই অত্যন্ত গীতধর্মী হওয়ার ফলে সেখানেও এই পরিচয় গীতিকাব্যের মতই অত্যন্ত অপরোক্ষ।

যাহাই হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের কাল ও রবীন্দ্রনাথের কালের মধ্যে বাঙ্‌লাদেশে যে সামাজিক বিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহা এইবার দেখা যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতকের শেষাশেষি বিংশ শতকের গোড়ায় বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ পুরাপুরি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বরূপ বিশিষ্ট রেখা ধরিয়া সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে ; তাহার ধ্যান ধারণা ও আদর্শ, তাহার অন্তর্নিহিত মানসিক দ্বন্দ্ব, তাহার জীবন সংগ্রাম ইত্যাদি সমস্তই এই পঞ্চাশবৎসরে অল্প

বিত্তর প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে, তাহার জীবন-প্রবাহ একটি বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইতেছে এবং বেগবান তরঙ্গমুখর সেই ধারাটি অন্যান্য শ্রেণীর বা সমাজ-অংশের জীবন ধারাকে ছাপাইয়া যাইতেছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসই প্রগতিশীল এবং সমাজের সকলপ্রকার কর্মে ও প্রতিষ্ঠানে ইহাদেরই আধিপত্য ; এই শ্রেণীই সামাজিক আদর্শ ও ধ্যান ধারণার নিয়ন্তা। বঙ্কিমের কালে মধ্যবিত্ত-সমাজের এই প্রতিষ্ঠা ছিলনা। দ্বিতীয়তঃ, ভূমি-স্বত্বাধিকারী অভিজাত সমাজের প্রতিষ্ঠা তখনও অক্ষুণ্ণ আছে, কিন্তু যেহেতু তাহাদের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে ভূমি ও প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রবিধিব্যবস্থা অটুট রাখার উপর সেই হেতু তাহাদের মনোভাব ও আদর্শ রক্ষণশীল, প্রগতি-বিরোধী। এই সমাজ-শ্রেণীর অধিকাংশই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধ্যান-ধারণা হইতে নিজদেরকে অনেকাংশে মুক্ত রাখিয়াছিলেন ; স্বল্প সংখ্যক মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি পরিবার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এই আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহারা অভিজাত সমাজের লোক হইলেও তাহাদের মানস মধ্যবিত্ত-সমাজাদর্শেই গঠিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এই অভিজাত সমাজ-মানসের মধ্যে এক-দিকে যেমন প্রবল ছিল পৌরাণিক হিন্দুসংস্কৃতির নাগর ও গ্রাম্য প্রকাশের ধারা, অন্যদিকে তেমনই ছিল সুদূর দিল্লী-আগ্রা-লক্ষ্ণৌ-পাটনার নিম্নস্তরের ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতির ধারা, অবশ্য শেষোক্ত ধারা জীবনের দেউড়ি পার হইয়া অন্দরমহলে ততটা প্রবেশ করিতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ, প্রাচীন সামন্ত-সমাজের স্মৃতি এই পঞ্চাশ ষাট বৎসরে একেবারেই ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। এই স্মৃতি বঙ্কিমের কালে বিকাশোন্মুখ মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসকে যে-ভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের কালে সেই স্মৃতির সেই জোর আর ছিল না। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের কালের চেহারার তফাৎ সংক্ষেপে এইটুকু।

রবীন্দ্রনাথ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার শীলে ও শালিনতায় তদানীন্তন বাঙলাদেশের অভিজাত সমাজের শ্রেষ্ঠ পরিবারগুলির অন্যতম, হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির দুইধারার শ্রেষ্ঠ সঙ্গমস্থল। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে এই অভিজাত পরিবার ও সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া লালিতপালিত হইয়াও তাঁহার নিজের মন রস আহরণ করিয়াছে মধ্যবিত্ত সমাজ-মানস হইতে। প্রিয়নাথ সেন, লোকেন্দ্র নাথ পালিত মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া সতীশচন্দ্র রায়, মোহিতচন্দ্র সেন,

অজিতচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় প্রভৃতি পর্যন্ত তাঁহার সকল বন্ধু সুহৃৎ সহকর্মী সকলই মধ্যবিত্ত-সমাজের লোক। এই প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অভিজাত-মানস আশ্রিত, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত। এই মধ্যবিত্ত সমাজের বিচিত্র সুখ দুঃখ, অন্তর ও বাহিরের বিচিত্র সরু মোটা দ্বন্দ্ব, কলহ ও আনন্দ কোলাহল, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য ও বিষাদ, আদর্শের বিরোধ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বাজাত্যবোধ ইত্যাদি সমস্তই রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য।

উপরি উক্ত সামাজিক বিবর্তনের ফলেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে ধর্ম ও প্রকৃতির বিভিন্নতার সৃষ্টি। প্রাচীন সামন্ত-সমাজের ছায়াময়ী স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক সমারোহ এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস বিদায় লইল। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের স্মৃতির সঙ্গে দৈনন্দিন সমাজ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়া বলিষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু ইতিহাসের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গেল, ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ধরা পড়িয়া গেল, তাহার অস্পষ্ট খণ্ডতা প্রকট হইয়া উঠিল, জীবনের প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার স্রোতে ঐতিহাসিক সমারোহ ভাসিয়া গেল, পড়িয়া রহিল প্রাত্যহিক জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম, দৈন্য ও রিক্ততা, তাহার উদ্বেলিত বিক্ষোভ ও আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে বিদায় লইল বঙ্কিমের রোমান্টিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি, অতিপ্রাকৃতের অসাধারণত্বের মায়াময় স্পর্শ। প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিক জীবনে অসাধারণতার, অতিপ্রাকৃতের স্পর্শের কোনও অবকাশ নাই। বঙ্কিমের রোমান্স ছিল বাহ্য-বৈচিত্র্য ও আকস্মিক অপ্রত্যাশিত সংঘটন-নির্ভর; মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসের প্রকাশে ইহাদের আর কোনও প্রয়োজনীয়তা রহিল না। রবীন্দ্রনাথও রোমান্টিক, কিন্তু তাঁহার রোমান্টিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি অন্য প্রকৃতির। রবীন্দ্রনাথের রোমান্স আশ্রয় করিয়াছে প্রকৃতির সহিত মানবমনের গভীর আত্মীয়তাকে, জীবনের অতীন্দ্রিয় রহস্যলোককে, মানবমনের সূক্ষ্ম গভীর সমাহিত ভাবলোককে। এই রোমান্স একান্তই অন্তর্মুখী, এই প্রকৃতির রোমান্স বাহিরের ঘটনা-বৈচিত্র্য অথবা আকস্মিক অসাধারণত্বের কোনও অপেক্ষা রাখে না। এই রোমান্সই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পগুলিকে গীতধর্মী করিয়াছে, এবং এই রোমান্সই রবীন্দ্র-উপন্যাসে কাব্যের ঝঙ্কার ও সুষমা দান করিয়াছে।

আমি আগে বলিয়াছি, সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অধিকতর বাস্তব-নিষ্ঠ, কিন্তু বাস্তবানুভূতি যে সূক্ষ্ম ও সুবিস্তৃত কার্যকারণসম্বন্ধ-বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে, বঙ্কিমের উপন্যাসে সেই দীর্ঘায়ত তথ্য ও মনোবিশ্লেষণ নাই। কেন নাই, সংক্ষেপে তাহার হেতুও আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জের ভিড়ের মধ্যে, বর্ণবহুল তথ্য ও চরিত্রের সমারোহের মধ্যে তাহার অবসরই বা কোথায়? সামাজিক উপন্যাসেও যেখানে জীবন-সমালোচনা কল্পনার রঙে রঞ্জিত এবং মহৎ আদর্শের দীপ্তিতে আলোকিত সেখানেও এই বিস্তৃত বিশ্লেষণের অবসর অল্প। যে মধ্যবিত্ত-সমাজ রবীন্দ্র-উপন্যাসের উপজীব্য সেই মধ্যবিত্ত-সমাজ ঘটনাবহুল নয়, তথ্য-সমৃদ্ধ নয়; তাহার জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহ ধীর ও মন্থর, সাধারণ ঘটনা স্বাভাবিক কারণে সংঘটিত হওয়াই এই সমাজের সাধারণ নিয়ম, ঘাতপ্রতিঘাত দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ গ্লানি বিরোধ যাহা কিছু দেখা দেয় এই জীবনে, তাহাও স্বাভাবিক কারণেই, সমাজের অন্তর্নিহিত বিরোধী আদর্শের সংঘর্ষের ফলে। মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের এই স্বাভাবিক প্রবাহের চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের গল্পে-উপন্যাসে সূক্ষ্ম সুবিস্তৃত সুনিপুণ বিশ্লেষণ লাভ করিয়াছে। এই জীবনের প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব সমস্যা গ্লানি বিরোধ কলহ আনন্দ ঘাতপ্রতিঘাত সমস্তই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া বিস্তৃত করিয়া কার্যকারণপরম্পরা এমনভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন যাহার ফলে পাঠকের মনে বাস্তবানুভূতি দৃঢ় ও প্রবল হইয়া মুদ্রিত হয়, এবং সমাজের বিচিত্র চিন্তা ও কর্মপ্রবাহ বিচিত্র ধারণা ও আদর্শ, এক কথায় সমাজ-জীবন সম্বন্ধে চেতনা জন্মায়। এই হিসাবেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বঙ্কিম-উপন্যাসাপেক্ষা অধিকতর বাস্তবনিষ্ঠ, রবীন্দ্রোপন্যাসে বাস্তবানুভূতি প্রবল। তাঁহার পরবর্তী পর্যায়ের ছোটগল্পে এবং "চোখের বালি" হইতে আরম্ভ করিয়া সকল উপন্যাসেই এই বাস্তবনিষ্ঠা মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত বিরোধগুলি, দ্বন্দ্বসমস্যাগুলিকে টানিয়া বাহির করিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সম্বন্ধে চেতনাই সামাজিক চেতনা। এই গভীরতর বাস্তব নিষ্ঠাই রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্যের প্রধান হেতু। এই গভীরতর বাস্তবতাই পরবর্তী কালে মধ্যবিত্ত সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া নূতন ভাবে সত্যও বাস্তবানুভূতি সঞ্চার করিতেছে।

সাধারণভাবে এই সামাজিক পটভূমি মনের পশ্চাতে রাখিয়া এবং রবীন্দ্র-উপন্যাসের ধর্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি উপরের কথা কয়েকটি স্মরণে রাখিয়া এইবার এক একটি করিয়া কালানুক্রমিক উপন্যাসগুলি আলোচনা করা যাইতে পারে।

(২)

"বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" (১২৮৮—৮৯)

"রাজর্ষি" (১২৯২)

"বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" ও "রাজর্ষি" এই দুইটি উপন্যাসই বঙ্কিমচন্দ্রের চক্রবর্তী-ছত্রছায়ায় বসিয়া লিখিত। (বাঙ্‌লা সাহিত্যে তখনও বঙ্কিম-রমেশের ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুরা মরশুম চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২০—২৪ বৎসর। বয়সটা এমন যখন নিজেকে নিজে খুঁজিয়া পাওয়াটা খুব সহজ নয়, অথচ প্রতিবাসীজনের প্রভাব এড়াইয়া চলা আরও কঠিন।) তাহার উপর "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" রচনা যখন আরম্ভ হয়, তখন 'হৃদয় নামক অরণ্যের' মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছেন; সমস্ত চিন্তা ও আবেগ তখনও অস্পষ্ট কুয়াসার জালে আচ্ছন্ন। এই সময়ের "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" এমন কি কতকাংশে "প্রভাত-সঙ্গীত"-কাব্যেও যেমন, এই দু'টি উপন্যাসেও বাস্তব সংসারের দৃঢ়ত্বের পরিচয় বিশেষ কিছু নাই। এই অস্ফুট অপরিণত অবস্থার প্রকাশগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন, "ছেলেবেলা হইতেই বাহিরের লোকসংশ্রব হইতে বহুদূরে যেমন করিয়া গণ্ডীবদ্ধ হইয়া মানুষ হইয়াছিলাম তাহাতে লিখিবার সম্বল পাইব কোথায়? ("জীবন-স্মৃতি" বিশ্বভারতী সং, ২২০ পৃ)। প্রায় এই সময়কার সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে অন্যত্র বলিতেছেন, "তখন বিদ্যাও ছিল না, জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প, তাই গদ্যপদ্য যাহা লিখিতাম তাহার মধ্যে বস্তু যেটুকু ছিল ভাবুকতা ছিল তাহার চেয়ে বেশী" ("জীবন-স্মৃতি", ২৬১ পৃ)। এই অপরিণত মানসের সৃষ্টি সম্বন্ধে কবির নিজের এই বিশ্লেষণ ও মন্তব্য অপেক্ষা যথার্থতর বিচার আর কিছু হইতে পারে না। এই বিচার সমসাময়িক কাব্য-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যে-পরিমাণে সত্য ঠিক সেই পরিমাণেই সত্য প্রথম দুইটি উপন্যাস-প্রচেষ্টা সম্বন্ধেও।

ইহাদের মধ্যেও বস্তু যেটুকু আছে ব্যক্তি-মানসের উদাস অনুপলব্ধ ভাবুকতা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী; লেখকের নিজের চিত্ত ও মন যেমন এই সময় অস্পষ্ট কুহেলিকায় আচ্ছন্ন, উপন্যাস দু'টির অধিকাংশ চরিত্রই তেমনই অস্পষ্ট, অগভীর, কুয়াসাচ্ছন্ন। দুইটি উপন্যাসেই ঘটনা-বিন্যাস ও জীবন-সমালোচনা অত্যন্ত সহজ, জটিলতা-বিহীন; অবিমিশ্র গুণ বা অবিমিশ্র দোষ প্রত্যেকটি চরিত্রের ধর্ম, অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় অথবা বিরোধী আদর্শ বা উপাদানের সমন্বয় কোনও চরিত্রে বা ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে নাই বলিলেই চলে।

"বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" ও "রাজর্ষি" দুইই পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত; দুয়েরই ঘটনা-বিন্যাস ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে বিধৃত। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই ইতিহাসের বৈচিত্র্যকোলাহলময় রঙ্গভূমি ছায়ার মত অস্পষ্ট, ইতিহাস একটা অর্থহীন আশ্রয় মাত্র; ইতিহাসের জীবন ও উদ্দীপনা উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার কোনও পরিচয় কোথাও নাই। প্রতাপাদিত্য অথবা বসন্তরায়, গোবিন্দমাণিক্য অথবা রঘুপতি ইহারা প্রত্যেকেই এক-একটি ধর্ম ও প্রকৃতির এক-একটি বিশেষ প্রতিমূর্তি; ইতিহাসের নায়ক না হইলেও ইহাদের কোনও ক্ষতি ছিল না। যে জটিল মানস-জীবন ও কর্মপ্রবাহের সুনিপুণ বিশ্লেষণ ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রকে বিচিত্রতা দান করিয়া জীবন্ত বাস্তব করিয়া তোলে, তাহাদিগকে প্রসার ও নমনীয়তা দান করিয়া জীবনের সমগ্র রূপ গড়িয়া তোলে সেই বলিষ্ঠ কল্পনার এবং কার্য-প্রণালীর পরিচয় এই উপন্যাস দু'টিতে নাই। থাকিবার কথাও নয়। প্রথমতঃ, রবীন্দ্র-মানস তখনও অপরিণত, বস্তুর সঙ্গে তাহার পরিচয় তখনও বিশেষ কিছু হয় নাই, জীবনের অভিজ্ঞতাও অল্প। দ্বিতীয়তঃ, যে-ইতিহাসের কাঠামোকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন, সে-আশ্রয় তাঁহার কাছে অর্থহীন, তাহা অস্পষ্ট, বিস্মৃতির স্মৃতিমাত্র, সেই ইতিহাসের সঙ্গে ইতিহাসগত মানুষগুলির যেন কোনও সহজ প্রাণের সম্বন্ধ নাই। সেই যুগের অধিকাংশ উপন্যাস ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথও তাহাই করিয়াছিলেন। এই দু'টি উপন্যাস সম্বন্ধে ইতিহাসের কথা সেই হেতু অবান্তর। "বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে" যশোহর ও চন্দ্রদ্বীপের পারিবারিক কলহ, এমন কি ফর্ণাণ্ডিজ্‌ অথবা পাঠান দস্যুদ্বারা রায়গড়-রাজ বসন্তরায়ের হত্যা, 'রাজর্ষি"তে মোগলসৈন্যের আক্রমণ অথবা শাহ্‌সুজার রাজধানী, উপন্যাসের দিক হইতে

ইহারা কোনও মূল্যই বহন করে না, ইহারা কিছুই উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রকে সার্থকতা দান করে না।

তবু, এই দু'টি উপন্যাসেও রবীন্দ্র-মানসের বিশেষ ধর্মটি কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এই অপরিণত বয়সেও ইতিহাসের অর্থহীন কল-কোলাহল এবং বাহ্য ঘটনা-বৈচিত্র্যের পশ্চাতে তিনি স্নেহ-প্রেম-প্রীতিপূর্ণ উদার মুক্ত প্রাণের অখণ্ড শান্তির সন্ধান করিয়াছেন; এই উদার মুক্তি ও শান্তিই তাহাকে ইতিহাসের ও সাধারণ মানব-সংসারের চঞ্চল কর্মপ্রবাহ হইতে দূরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। "বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে" প্রতাপাদিত্যের নির্মম ক্রূরতা ও হিংস্র ভীষণতার, রামচন্দ্রের নির্বোধ ঔদ্ধত্যের পাশে পাশে যদি বসন্তরায়ের মুক্ত উদার প্রাণের আনন্দময় সারল্য, বিভার কারুণ্যমণ্ডিত বিষাদগ্রস্ত মুখশ্রী, উদয়াদিত্যের ভাগ্য-বিপর্যস্ত জীবনের ম্লানিমার কথা চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে সহজেই বুঝা যাইবে শেষোক্ত চরিত্রগুলির স্বচ্ছ সহজ মুক্ত জীবনধারার প্রতিই লেখকের পক্ষপাত বেশী। "রাজর্ষি"তেও রঘুপতি, নক্ষত্ররায় অপেক্ষা গোবিন্দমাণিক্য ও কোমল হৃদয় হাসি ও তাতার, জয়সিংহের দ্বিধাগ্রস্ত জীবনের সৌন্দর্যের প্রতিই কবির পক্ষপাত। এই স্বচ্ছ কোমল সুকুমার, মুক্ত উদার জীবন-প্রবাহই রবীন্দ্র-কবিচিত্তকে দোলা দিয়াছে। অবশ্য, চরিত্র-সৃষ্টির দিক্ হইতে রঘুপতিই সকলের চেয়ে জীবন্ত এবং সে-ই সর্বাপেক্ষা লেখকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতির উপরই তিনি সমস্ত বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রের কোনও প্রসার নাই, সহজ ও সরল না হইলেও তাহার মধ্যে খুব বিরোধী উপাদানের সংগ্রাম নাই। তাহার পরিচয় অন্যান্য চরিত্রের মত খণ্ডিত ও একদেশী, অনেকটা অস্পষ্ট ভাবুকতায় আচ্ছন্নও বটে। বিরোধী উপাদানের সংগ্রাম একমাত্র রঘুপতি চরিত্রেই আছে, এবং সেই হেতুই এ-চরিত্র জটিল ও জীবন্ত; কিন্তু এই দুই বিরোধী আদর্শ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্ব খুব সমন্বয়িত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, এক প্রকৃতির উপর আর এক প্রকৃতির প্রভাব যেন নাই। নক্ষত্ররায়েরও প্রাক্-সিংহাসনলাভের জীবনের মধ্যে কোনও মিশ্র বা বিরোধী গুণের সমাবেশ নাই; তবে সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরে ভিতরে যে মানসিক বিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাতে লেখকের খুব সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় এই অপরিণত ভাবকল্পনার মধ্যেই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

"বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে" প্রতাপাদিত্যের চরিত্রও গোবিন্দমাণিক্যের মত খণ্ডিত ও একদেশী ; উপন্যাস-গত চরিত্রের যে প্রসার ও নমনীয়তা কোনও চরিত্রকে বাস্তব ও জীবন্ত করিয়া তোলে, যে বিরোধী উপাদানের দ্বন্দ্ব উপন্যাস-গত চরিত্রকে জটিল, গভীর ও রহস্যময় করিয়া তোলে প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে অথবা এই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রেও তাহার পরিচয় কমই আছে, ঘটনা-সংস্থানের মধ্যেও তাহা নাই। উদয়াদিত্য, সুরমা অথবা বিভার জীবনেও উপন্যাসোচিত গভীরতা অথবা জটিলতা কিছু নাই। আর, বসন্তরায় ত সহজ সরল উদার আনন্দের প্রতিচ্ছবি মাত্র ; এই বৃদ্ধ "একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মত, অম্লরসের আভাসমাত্র বর্জিত।" কিশোর রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে তাঁহার সেই বয়সের কাব্যরচনার একটি শ্রোতা লাভ করিয়াছিলেন ; তাঁহার নাম শ্রীকণ্ঠবাবু।

"* * * ভালো লাগিবার শক্তি ইঁহার এতোই অসাধারণ যে মাসিকপত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচক পদ লাভের ইনি একেবারেই অযোগ্য। বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মত—অম্লরসের আভাসমাত্র বর্জিত—তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু আঁশও ছিলনা। মাথাভরা টাক, গোঁফ-দাড়ি কামানো স্নিগ্ধ মধুর মুখ, মুখ-বিবরের মধ্যে দন্তের কোনো বালাই ছিলনা, বড়ো বড়ো দুই চক্ষু অবিরাম হাস্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারী গলায় যখন কথা কহিতেন তখন তাঁহার সমস্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের পার্সিপড়া রসিক মানুষ, ইংরাজির কোনো ধার ধারিতেন না। তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্য সঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার এবং কণ্ঠে গানের আর বিরাম ছিল না।

"পরিচয় থাক্ আর নাই থাক্ স্বাভাবিক হৃদ্যতার জোরে মানুষমাত্রেরই প্রতি তাঁহার এমন একটি অবাধ অধিকার ছিল যে কেহই সেটি অস্বীকার করিতে পারিত না। * * * সকল মানুষের সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধটি স্বভাবত নিষ্কণ্টক ছিল ; তিনি কাহারো সম্বন্ধেই সঙ্কোচ রাখিতেন না; কেননা তাঁহার মনের মধ্যে সঙ্কোচের কারণই ছিল না।

"তিনি এক একদিন আমাকে সঙ্গে করিয়া একজন য়ুরোপীয় মিশনারির বাড়িতে যাইতেন। সেখানে গিয়া তিনি গান গাহিয়া, সেতার বাজাইয়া, মিশনরির মেয়েদের আদর করিয়া, তাহাদের বুটপরা ছোট দুইটি পায়ের অজস্র স্তুতিবাদ করিয়া সভা এমন জমাইয়া তুলিতেন যে তাহা আর কাহারো দ্বারা কখনই সাধ্য হইত না। আর কেহ এমনতরো ব্যাপার করিলে নিশ্চয়ই তাহা উপদ্রব বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু শ্রীকণ্ঠবাবুর পক্ষে ইহা আতিশয্যই নহে, এই জন্য সকলেই তাঁহাকে লইয়া হাসিত, খুসি হইত। *

"আবার তাঁহাকে কোন অত্যাচারকারী দুর্বৃত্ত আঘাত করিতে পারিত না। অপমানের চেষ্টা তাঁহার উপরে অপমান রূপে আসিয়া পড়িত না।* * *

"কেহ দুঃখ পায় ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না, ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। এইজন্য বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস বা শকুন্তলা হইতে কোনো একটা করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইত, তিনি দুই হাত মেলিয়া নিষেধ করিয়া অনুনয় করিয়া কোনো মতে থামাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।" ("জীবন-স্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ৫৩-৫৮ পৃষ্ঠা)

এই সময় রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবপদকর্তা বসন্তরায়ের পদাবলীর খুব অনুরক্ত পাঠক ও শ্রোতা ছিলেন; এই পদকর্তার পদাবলী সম্বন্ধে তিনি আলোচনাও করিয়াছিলেন। কিশোর জীবনের স্মৃতি হইতে শ্রীকণ্ঠবাবুর চরিত্রটি এবং পদকর্তা বসন্তরায়ের নামটি এই দুইটিকে মিলাইয়া যেন লেখক রায়গড়ের রাজা বসন্তরায়টিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধরণের স্বচ্ছ মুক্ত উদার সদানন্দ-জীবনের প্রভাব সাঙ্কেতিক রহস্যময় রবীন্দ্র-নাট্যগুলিতে সুস্পষ্ট।

(৩)

"চোখের বালি" (১৩০৮)
"নৌকাডুবি" (১৩১০-১১)

কোনও একখানি উপন্যাস যদি কোনও সাহিত্যে উপন্যাসের প্রচলিত ধর্ম ও প্রকৃতি একেবারে বদ্‌লাইয়া দিয়া নূতন যুগের সূচনা করিয়া থাকে, নূতন বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"। প্রায় পনেরো বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনা করিলেন; ইতিমধ্যে তাঁহার কবিজীবন "কড়ি ও কোমল-মানসী-সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি-কল্পনা"র সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া "নৈবেদ্যে" আসিয়া পৌঁছিয়াছে; বিচিত্র কর্ম ও চিন্তাপ্রবাহ তাঁহার জীবনকে বিচিত্র ছন্দ বিচিত্র অনুভূতিতে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই পনেরো ষোল বৎসরে জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার কম হয় নাই, বস্তুর সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওয়ার ফলে নিজের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে চেতনাও কম হয় নাই। এই সুদীর্ঘ কালের জীবন-ইতিহাসের মধ্যে তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট। মধ্যবিত্ত-সমাজের মানুষ, তাহার সুখ ও দুঃখ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা শক্তি ও দুর্বলতা, আনন্দ ও বিরোধ সকলই ইতিমধ্যে তাঁহার নিকটতর

হইয়াছে, এবং সমসাময়িক কালের ভাবাদর্শের ছোঁয়াচও তাঁহার চিত্তে লাগিয়াছে, শুধু লাগিয়াছে নয়, তাহার মগ্ন-চেতনার মধ্যে সেই সব ভাবাদর্শ ও বাস্তব জীবনধারা নূতন অনুভূতি, নূতন অনাস্বাদিত রসের সঞ্চার করিয়াছে। "চোখের বালি"তে ইহারা সমস্তই রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল।

"চোখের বালি" "নষ্টনীড়" গল্পের সমসাময়িক রচনা। দুইয়েরই ধর্ম এক; কাঠামো এবং আশ্রয় বিভিন্ন। "চোখের বালি" বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রথম সমাজ-জীবনাশ্রিত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-মূলক সমস্যা-নিষ্ঠ উপন্যাস। এই ধরণের উপন্যাসের পর্ব-সূচনা হইল এই গ্রন্থটি দ্বারা। ইহার আগে বাঙ্‌লা সাহিত্যে উপন্যাস ছিল প্রধানতঃ ঘটনা-নির্ভর; ঘটনার সুন্দর যথাযথ সমাবেশই ছিল উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য; "বৌঠাকুরাণীর হাট" এবং "রাজর্ষি" ও সেই আদর্শকেই অনুসরণ করিয়াছে। "চোখের বালি "ঠিক ইহার বিপরীত; ইহার আখ্যানভাগ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, দীর্ঘায়ত ইহার চরিত্র চতুষ্টয়ের মনোবিশ্লেষণের ধারা। ঘটনার পৌর্বাপর্য মনোবিকাশের সহায়ক মাত্র। সমস্ত গল্পভাগ এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলা যায়; কিন্তু তাহা আখ্যানমাত্র, তাহার মধ্যে বাস্তবানুভূতি নাই; এই বাস্তবানুভূতির সঞ্চার হয় তখনই যখন আমরা জানিতে পারি বিনোদিনী ও আশা, মহেন্দ্র ও বিহারীর চিত্ত-গহনের নানা চিন্তা ও ভাবের আনাগোনার খবরগুলি, তখনই তাহারা প্রকাশ্যে যাহা করে তাহার সত্য অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এই ধরণের বিশ্লেষণ, মানুষের বিচিত্র কর্মের ও চিন্তার কার্যকারণ-সম্বন্ধটিকে আবিষ্কার করার এই জাতীয় প্রয়াস, এবং বস্তুর অন্তর্নিহিত ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা "চোখের বালি"ই বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করিল।

"চোখের বালি" প্রকাশিত হইয়াছিল নবপর্যায় "বঙ্গদর্শনে"র প্রথম বৎসরে। "নৈবেদ্যে"র কবিতা রচনা তখন সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। "সাধনা"র যুগে যেমন, এখনও তেমনই রবীন্দ্র-প্রতিভার স্ফুরণ সকল দিকে। কবিতা ও উপন্যাস রচনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মপ্রচেষ্টা, নানা ভাবাদর্শের সংগ্রাম ইত্যাদি সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক আলোচনা ইত্যাদি চলিতেছে। অথচ আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির কত প্রভেদ! "নৈবেদ্য"র সুরের সঙ্গে "চোখের বালি"র জীবন-দর্শনের মিল খুঁজিয়া পাওয়া সত্যই কঠিন; অথবা "চোখের বালি"র সঙ্গে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ', 'আমাদের সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' ইত্যাদি লইয়া যে তর্ক বিতর্ক

আলোচনা তাহারই বা যোগ কোথায়, অথচ একটু গভীরভাবে দেখিলে মনে হয়, বিভিন্ন দিকে কবি-মানসের এই যে স্ফুরণ, তাহা আমাদের জীবন সম্বন্ধে কবিচিত্তে একটি পূর্ণ অখণ্ড দর্শন গড়িয়া তুলিতেই সহায়তা করিয়াছে, সমাজ-জীবন সম্বন্ধে গভীরতর চেতনা সৃষ্টি করিতেই সাহায্য করিয়াছে। বিভিন্ন দিকে সাহিত্য-প্রচেষ্টার বিভিন্ন সুর আপাতদৃষ্টিতে যতটা বিচ্ছিন্ন মনে হয়, সত্য সত্যই তাহা ততটা বিচ্ছিন্ন নয়, তাহারা এক অখণ্ড জীবন-দর্শনের খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন রূপ মাত্র।

"চোখের বালি"র ঘটনা-বিন্যাস কতকটা শিথিল। তাহা ছাড়া সমস্ত গল্পভাগ আগাগোড়া এত সহজ সরলভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে এমন জটিল মানসিক ভাঙাগড়ার মধ্যেও কোথাও গল্প খুব জমাট ও দৃঢ় হইয়া উঠে নাই। অথচ তাহার সুযোগ ছিল। যে-বিনোদিনীর চিত্র লেখক আঁকিয়াছেন এবং আমাদের ধ্যান ও বিশ্বাসের মধ্যে তাহার সুদৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই বিনোদিনী যখন তাহার গ্রামের বাড়ীতে একচিত্তে বিহারীর ধ্যানে মগ্ন তখন হঠাৎ পাগলের মতন মহেন্দ্র একদিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; আর একদিন বিনোদিনী তাহার তৃষিত বুভুক্ষিত দেহচিত্ত একেবারে মহেন্দ্রের হাতে প্রায় তুলিয়াই দিয়াছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই শ্লেষবিদ্ধ হইয়া নিজকে সংকুচিত করিয়া লইয়াছিল; আরও একদিন সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এলাহাবাদে যমুনার নির্জন পরিবেশের মধ্যে বিনোদিনী বিহারীকে পাইয়াছিল একান্তভাবে নিজের করপুটের মধ্যে। এই সমস্তই গল্পের চরম মুহূর্ত, এবং এই সব মুহূর্তের নাটকীয় সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু এই সব চরম মুহূর্তেও লেখক অবিচলিত; তাঁহার মানসিক প্রশান্তি ও সংযম এত বেশী যে তিনি এই সব চরম মুহূর্তেও কোথাও তাহার সরল সহজ বর্ণনা ভঙ্গিকে এতটুকু গতিবেগ কিংবা মোহাবেগ দান করেন নাই, কোথাও তাহাকে নাটকীয় বঙ্কিমগতি দান করিয়া পাঠককে মোহগ্রস্ত করিয়া তুলেন নাই। সমস্ত গল্পটি যেন একটি সমতল রেখা; উত্তেজিত মুহূর্ত আছে প্রচুর, কিন্তু লেখকের মনে উত্তেজনা নাই, রচনায়ও নাই। নাই যে তাহার কারণ লেখকের একান্ত প্রশান্ত সংযত মানস যাহা "সোনার তরী", "চিত্রা" "কল্পনা"র অনেক কবিতায়ও সুস্পষ্ট; আর এক কারণ তাহার অখণ্ড রোমান্টিক জীবন-দর্শন। বিনোদিনী সম্বন্ধে, মহেন্দ্র সম্বন্ধে, বিহারী সম্বন্ধে

গোড়া হইতেই তিনি একটী সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস ধারণা তাঁহার মনে স্পষ্ট করিয়া আঁকিয়া লইয়াছেন; তাহা কতটুকু বাস্তবনিষ্ঠ, কতটুকু নয়, সে-প্রশ্ন পরে আলোচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু এই সুস্পষ্ট ধারণানুযায়ীই তিনি গল্পের চরম মুহূর্তগুলি যেমন গড়িয়াছেন তেমনই গড়িয়াছেন চরিত্রগুলির ব্যবহার, এবং ভাষার এবং বর্ণনার গতি বর্ণনা যদি বিচলিত হয়, আবেগ-চঞ্চল হয়, তাহা হইলে চরিত্রগুলির পরিণতি সম্বন্ধে যে-ধ্যান লেখকের মনে আছে তাহা অবিচলিত থাকিবে কি? কোনও চরিত্রেরই চরম সম্পূর্ণ সর্বনাশ ত লেখকের ধ্যানের মধ্যে ছিলনা, কাজেই চরম উত্তেজিত মুহূর্তে বর্ণনাকে চঞ্চল করিয়া, নায়ক নায়িকাকে চঞ্চল করিয়া তাহাদের সর্বনাশ ঘটাইলে পাঠকের মনে জীবন-দর্শনের অখণ্ডতা অটুট থাকিবে কি?

"চোখের বালি"র ঘটনাস্রোত চরিত্রগুলির নিজস্ব গভীর উৎস হইতেই প্রবাহিত। আশা, বিহারী, মহেন্দ্র, বিনোদিনী এই চারিজনের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই উপন্যাসের বিচিত্র ও জটিল ঘূর্ণীর সৃষ্টি করিয়াছে। এই চারিজনের মধ্যেও আবার মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর চিত্তদ্বন্দ্বই জটিলতর, সে জটিলতাকে ঘনীভূত করিয়াছে আশা ও বিহারীর সম্বন্ধ, এবং চারিজনের আকর্ষণ বিকর্ষণকে নূতন ফাঁসে, জটিলতর গ্রন্থিতে জড়াইয়াছেন রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা। পুত্রসর্বস্ব অভিমানী রাজলক্ষ্মী নিজেই পুত্রবধূ আশাকে এক হাতে খর্ব করিয়াছেন, আর এক হাতে পরোক্ষভাবে বিনোদিনীকে দিয়া নিজের পুত্রকে প্রলুব্ধ করিয়াছেন। অন্নপূর্ণার অপরাধ আশার মাসি হওয়া। এ-অপরাধে তাঁহার কোনও হাত ছিলনা; কিন্তু তিনি মহেন্দ্রের অপরাধে নিজেকে দোষী মনে করিয়া কাশীবাস করিতে গিয়া মহেন্দ্রর দুর্দম প্রবৃত্তির যথেচ্ছচারিতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গেলেন। আশা কতকটা অস্পষ্ট ও ছায়াময়; মহেন্দ্রর উন্মত্ত অসংযত হৃদয়াবেগ ও বিনোদিনীর দীপ্তির পাশে সে কতকটা নিষ্প্রভ, প্রায় অবলুপ্ত; তাহার ব্যক্তিত্বের পরিচয় একটু মাত্র পাওয়া যায় মহেন্দ্রের দ্বিতীয়বার গৃহ-ত্যাগের পর ধীরে ধীরে, এবং পরে একেবারে শেষদিকে রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুশয্যায় বিহারীর উপর নির্ভরে এবং মহেন্দ্রের প্রতি ব্যবহারে; অনেক ঝড় অনেক বিপ্লবের পর সে সত্য মনুষ্যত্ব লাভ করিল। বিহারীর ব্যক্তিত্ব ও ফুটিল অনেক বিলম্বে; প্রথম দিকে ত তাহার কোনও নিজস্ব সত্বাই নাই, সে-শুধু মহেন্দ্র-

চরিত্রকে ফুটাইতে সহায়তা করিয়াছে মাত্র। তাহার এই ব্যক্তিত্বকে টানিয়া বাহির করিয়াছে বিনোদিনী, সে-ই তাহাকে তাহার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তাহার যৌবনোন্মেষ ঘটাইয়াছে। বালির বাগানে দরিদ্র কেরাণীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার যখন সে স্বেচ্ছায় তুলিয়া লইয়াছে, তখন একান্ত কর্তব্যনিষ্ঠ বিহারীর সর্বপ্রথম মনে হইল, "এ কাজে কোনো সুখ নাই, কোনো রস নাই, কোনো সৌন্দর্য নাই, ইহা কেবল শুষ্ক ভার মাত্র। কাজের কল্পনা বিহারীকে কখনো ইতিপূর্বে এমন করিয়া ক্লিষ্ট করে নাই।" এই বালির বাগানেই "বিহারীর মধ্যে যে-যৌবন নিশ্চলভাবে সুপ্ত হইয়াছিল, যাহার কথা সে কখনো চিন্তাও করে নাই, বিনোদিনীর সোনার কাঠিতে সে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে।" তারপর তাহার পরিপূর্ণ উন্মেষ ঘটিল এলাহাবাদে বিহারীর নির্জন ঘরে বিনোদিনী যেদিন বিহারীর পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। মহেন্দ্রের শ্লেষ ও অপমান হইতে বিনোদিনীকে রক্ষা করিবার জন্য বিহারী যখন বিবাহের প্রস্তাব করিল কেবল তখনই আমরা বিহারীর স্বাধীন সত্ত্বার প্রথম ও শেষ এবং একমাত্র পরিচয় পাইলাম।

মহেন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই কারণ তাহার সম্বন্ধে সকল কথাই লেখক নিজেই বলিয়া দিয়াছেন; এক হিসাবে মহেন্দ্র-চরিত্রই এই উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ও পূর্ণবিশ্লেষিত। যে অসংযত ও অস্বাভাবিক মাতৃভক্তি ও নববধূ-প্রেম লইয়া তাহার জীবন আরম্ভ, যে প্রবল আত্মাভিমান প্রথম হইতেই তাহার মধ্যে স্ফীতিলাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে, সেই অসংযম ও আত্মাভিমানই তাহাকে বিনোদিনীর সম্মোহনে ভুলাইয়াছে, এবং তাহারাই আবার বিনোদিনীকে দূরে সরাইয়া তাহার প্রতি বিমুখ ও করিয়াছে। মহেন্দ্র গোড়া হইতেই spoilt child ; না চাহিতেই, নিজের যোগ্যতার প্রমাণ না দিয়াই সে সব কিছু পাইয়াছে, এমন কি আশাকেও। বিহারীর হাত হইতে আশাকে এত সহজে সে পাইয়াছে, বিহারীর বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাস সে এত সহজে লাভ করিয়াছে যে স্বতঃই সে মনে করিয়াছিল, কোনও মূল্য না দিয়াই,যোগ্যতার পরিচয় না দিয়াই সে বিনোদিনীকেও পাইবে। দুর্বল, অসংযত, আত্মাভিমানী মহেন্দ্র সে পরিচয় দিতে পারিলনা। স্বভাবে সে দীন, চরিত্রে সে দুর্বল! হঠাৎ মনে হয়, মহতী বিনষ্টিই এই জাতীয় লোকদের একমাত্র পরিণতি হওয়া উচিত, কিন্তু তাহাকেই কিনা লেখক ফিরাইয়া দিলেন তাহার আশাকে, তাহার

সুখের সংসারের মধ্যে! ইহাই কি হইল সুবিচার! আর জীবন ও যৌবন যাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, অথচ পরিপূর্ণ মূল্য দিয়া যে জীবন ও যৌবনকে কামনা করিল সেই বিনোদিনীকেই দিলেন উভয় হইতেই নির্বাসন! কিন্তু, এ বিস্ময়-প্রশ্ন বোধ হয় খণ্ডিত জীবন-দর্শনজাত। দীনস্বভাব, দুর্বলচরিত্র বলিয়াই মহেন্দ্রকে একেবারে মহতী বিনষ্টির গহ্বরে ঠেলিয়া দিতে হইবে কেন? শাস্তি ত সে যথেষ্ট পাইয়াছে; বিনোদিনীকে সে হারাইয়াছে, যে মোহ-মরীচিকা তাহাকে পথভ্রান্ত করিয়াছিল তাহা ঘুচিয়া গিয়াছে, বিহারীর শ্রদ্ধাও সে হারাইয়াছে, এবং যে-আশার কাছে সে ফিরিয়া আসিল সেই আশা আগেকার আশা নয়, এই আশা বাড়ীর কর্ত্রী, বিহারী তাহার রক্ষক ও সুহৃৎ এবং এই আশার কাছে মহেন্দ্রকে অপরাধীর মতন আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে; যে সুখের সংসারে সে ফিরিয়া আসিয়াছে সে-সংসারেও আগে তাহার যে জায়গা ছিল, এখন "সে-জায়গা ঠিক আর তেমনটি নাই।" এতগুলি মূল্য তাহার কাছ হইতে আদায় করিয়া লইয়া তবে লেখক তাহাকে মহতী বিনষ্টি হইতে রক্ষা করিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ইহাই অখণ্ড জীবন-দর্শন; জীবনের খণ্ডিত রূপের মধ্যেই মহতী বিনষ্টির স্থান আছে, অখণ্ড রূপের মধ্যে নাই। আর শিল্পীর প্রধান কর্তব্য ত মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনায়, ভাব ও অনুভবের মধ্যে বিশ্বাস সঞ্চার করা; সেই দিক্ দিয়া মহেন্দ্রর এই পরিণতি লেখক যে-ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা কিছু অবিশ্বাস্য নয়, অস্বাভাবিক ও নয়, অবাস্তব ত নয়ই।

কিন্তু বিনোদিনী চরিত্রের পরিণতি সম্বন্ধে ঠিক্ একথা বলা চলে না। সে-ক্ষেত্রে আর্ট ও জীবন-দর্শন এই উভয় দিক্ হইতেই একটু আপত্তি করিবার আছে। কিন্তু সে-কথা বলিতে হইলে বিনোদিনীর চরিত্র একটু বিস্তৃত করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হয়। (জীবন-বঞ্চিত অতৃপ্ত-কাম বিনোদিনীর যৌন-জীবনের ব্যক্তিত্ববোধই তাহার চরিত্রে যাহা কিছু জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে।) মহেন্দ্রের যৌবন ত তাহারই ভোগ্য ছিল, ঘটনাচক্রে তাহা হয় নাই, তাহার জায়গায় বসিয়াছে আশা; সেই আশাকে অবলম্বন করিয়া যখন সে মহেন্দ্রের জীবনে অবতীর্ণ হইল, তখনই ঘূর্ণাবর্তের সূচনা। ঈর্ষাদগ্ধ বিনোদিনী ধীরে ধীরে অতি সুকৌশল প্রেমাভিনয়ের যে-মোহজাল বিস্তার করিল মহেন্দ্র তাহার মধ্যে নিজকে ধরা দিল। কিন্তু বিনোদিনী সহজেই কিছুদিনের

মধ্যেই বুঝিতে পারিল মহেন্দ্র দীনস্বভাব, দুর্বল, ব্যক্তিত্বহীন ; তাহার উপর নির্ভর ও বিশ্বাস করা চলেনা। অথচ মহেন্দ্ররই পাশে পাশে ছায়ার মত যে সঙ্গী, সেই বিহারী অচল, অটল, গভীর ও দৃঢ়চরিত্র। কাজেই মহেন্দ্রের উপর তাহার অশ্রদ্ধা ও বিরাগ ক্রমশঃ যতই বাড়িতে লাগিল, ততই সে বিহারীর প্রতি উন্মুখ হইতে আরম্ভ করিল। মহেন্দ্রর উপর যদি সে নির্ভর ও বিশ্বাস করিতে পারিত, তাহা হইলে সে যে মহেন্দ্র ও আশার দাম্পত্যপ্রেমের উপর জয়ী হইয়াছে, এই মনে করিয়াই হয়ত সে তাহার দেহমনের মহাবুভুক্ষার উপরও জয়ী হইতে পারিত, প্রণয়িনী বিনোদিনী বিজয়িনী বিনোদিনীর কাছে হয়ত হার মানিত। কারণ, মহেন্দ্রর প্রতি তাহার যে-আকর্ষণ তাহা ঈর্ষ্যাজনিত, অধিকার-বোধজনিত ; মহেন্দ্রের উপর সে-অধিকার প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলেই সে-আকর্ষণের বিলুপ্তি। সে-অধিকার প্রতিষ্ঠার অর্থ ছিল মহেন্দ্র ও আশার সর্বনাশ। যাহাই হউক, তাহা হইল না। ধীরে ধীরে বিহারীর প্রতি তাহার অনুরাগ বিকশিত হইয়া উঠিল, এবং একদিন অনিবার্য বেগে যখন তাহা আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিল তখন অন্তরের অকৃত্রিম আবেগে বিহারীর পা বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, "একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়োনা, মন্দকে ভালবাসিয়া একটু মন্দ হও ঠাকুরপো"। কিন্তু বিহারীর কাছে প্রত্যাখ্যান ছাড়া আর কিছু সে পাইল না। তাহা সত্ত্বেও, এর পরেও যখন মহেন্দ্র ভিখারীর মতন বিনোদিনীর পায়ে পায়ে ফিরিল, তখনও যখন বিনোদিনী একদিনের, একমুহূর্তের জন্যও মহেন্দ্রর হাত হইতে তৃষ্ণার জল পান করিলনা, তখন এই আশাই একান্ত করিয়া পাঠকের মনকে, বুদ্ধিকে অধিকার করে, বিনোদিনীকে যে লেখক নষ্ট হইতে দিলেন না, মহেন্দ্রর সর্বগ্রাসী প্রবৃত্তি হইতে যে তাহাকে রক্ষা করিলেন সে শুধু বিহারী-তীর্থে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবেন বলিয়া। কিন্তু লেখক তাহা করিলেন না। এলাহাবাদের নির্জন ঘরে বিনোদিনী যখন বিহারীকে সব কথা খুলিয়া বলিল, অনাবিল-হৃদয় বিহারী বিশ্বাস করিল, বিশ্বাস করিয়া সর্বপ্রথম যখন সে তাহার ব্যক্তিত্ব-বোধনের প্রমাণ দিল, বিনোদিনীর প্রেমকে সার্থকতা দিবার জন্য ভালবাসিয়া শ্রদ্ধা করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল, তখন কিনা বিনোদিনী বলিয়া বসিল, "ছি ছি, একথা মনে করিতে লজ্জা হয়! আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারেনা! ছি ছি, একথা

তুমি মুখে আনিয়ো না। * * * ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে! তোমার ঔদার্য্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি একাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না। * * * ভুল করিয়োনা,—আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবেনা, তোমার গৌরব যাইবে, আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাক, আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও।" কিন্তু, এই বিনোদিনী কোন্ বিনোদিনী? এই বিনোদিনীর সঙ্গে ত লেখক আমাদের পরিচয় করান নাই। এই কল্পলোকের, রোমান্স রাজ্যের অধিবাসিনী বিনোদিনীকে ত আমরা জানিনা। হঠাৎ বিনোদিনীর এই অভাবনীয় অস্বাভাবিক পরিণতি কি করিয়া হইল, কেন হইল? না ইহা আর্টের দিক্ হইতে সত্য না অথণ্ড জীবন-দর্শনের দিক্ হইতে। গল্পের ভিতর হইতে অনিবার্যভাবে এই বিনোদিনী গড়িয়া উঠে নাই; যে স্থূল বাস্তবতা বিনোদিনী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তাহার সঙ্গে এই ধরণের কল্পলোকের আদর্শবাদের সংযোগ ও সমন্বয় কোথায়? আর অথণ্ড জীবন-দর্শনের দিক্ হইতেই বা ইহার যৌক্তিকতা কোথায়? ঘটনা-চক্রে যে জীবন-বিড়ম্বিত, সে জীবনকে পাইবার জন্য মূল্য ত কম দেয় নাই, তবু তাহার কলঙ্কস্পর্শবিহীন প্রেম প্রেমের তীর্থে পৌছিয়া জীবনের সার্থকতা পাইবেনা কেন? যে-যুক্তি দিয়া সে বিহারীকে নিরস্ত করিল সে-যুক্তি ত সামাজিক যুক্তি, তাহা না আর্টের যুক্তি না অথণ্ড জীবন-দর্শনের। আর্টের যুক্তি হইতে হইলে কার্যকারণ-সম্বন্ধের ইঙ্গিতের প্রয়োজন ছিল, তাহা এক্ষেত্রে নাই; আগেই বলিয়াছি, বিনোদিনীর এই শেষ পরিচয় অনিবার্যভাবে গড়িয়া উঠে নাই। একথা আমি ভুলি নাই, বাঙ্‌লাদেশের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থায়, সামাজিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে যৌন-ব্যক্তিত্ববোধ থাকা সত্বেও বিধবা-জীবনের পরিণতি এইরূপই ছিল। কাজেই সমাজ-বুদ্ধির দিক হইতে বিনোদিনীর পরিণাম একান্ত সত্য ও বাস্তবনিষ্ঠ। কিন্তু সমাজ-বুদ্ধির বাস্তবতা ও আর্টের বাস্তবতা ত এক নয়। লেখক বিনোদিনীকে একটা অনিবার্য পরিণামের দিকে লইয়া যাইতেছিলেন পাঠকের মনের একান্ত বাস্তবানুভূতির মধ্য দিয়া, কিন্তু শেষ সীমায় পৌছিবার অব্যবহিত পূর্বে হঠাৎ সামাজিক বাস্তবনিষ্ঠা তাহার শিল্পী-মানসকে অভিভূত করিয়া দিল, বিনোদিনীর অনিবার্য পরিণাম না ঘটাইয়া

তাহাকে তিনি কল্পলোকের ভাবাদর্শের মধ্যে বিসর্জন দিলেন! জীবন যাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে শিল্পী রবীন্দ্রনাথও তাহাকে বঞ্চনা করিলেন!

তবু, বিনোদিনীই "চোখের বালি"র একমাত্র সত্য; সে-ই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত গল্পটিকে উদ্দীপ্ত ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার দৃপ্ত যৌবনের উজ্জ্বল দীপ্তিই উপন্যাসটির প্রাণ। সে শয়তানী নয়, সে তাহার অবরুদ্ধ কামনার, অতৃপ্ত যৌন বাসনার আগুনে সংসার পোড়ায়নি, নিজকেই শুধু সে দীপ্তিমতী করিয়াছে। কোথাও সে পাঠকের শ্রদ্ধাকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করে নাই। ক্ষুরের ধারের মত দুর্গম পথেই সে আনাগোনা করিয়াছে, অথচ কোথাও তাহার পায়ের নীচে এতটুকু ক্ষতচিহ্ন নাই। বিনোদিনী বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণীর স্ফুটতর স্পষ্টতর বিস্তৃততর রূপ; বিনোদিনী দামিনী, অভয়া, কিরণময়ীর পূর্বাভাস।

সমাজ-সত্তার রূপ "চোখের বালি"তে কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার একটু আলোচনা এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক নয়। বিংশ শতকের সূচনা হইতেই বাঙ্‌লাদেশের সমাজ-জীবনের নূতনতর জটিলতা, বিভিন্ন ভাব ও চিন্তাধারার গতি ও প্রকৃতি রবীন্দ্র-ধ্যান-ধারণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। বাঙালীর সুবৃহৎ পরিবার ও গোষ্ঠী-জীবনের ভাঙনের আভাস ইতিপূর্বেই দেখা গিয়াছিল; বঙ্কিমের উপন্যাসে তাহার ছায়া লক্ষ্য করা খুব কঠিন নয়। সে-আভাস বিংশ শতকের গোড়ায় স্পষ্টতর হইল; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং তাহারই অনিবার্য ফলস্বরূপ নারীর যৌন-স্বাধীনতাবোধ দৃঢ়তর হইল, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয় করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কিন্তু এ-সমস্তই হইল মধ্যবিত্ত-সমাজের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকদের মধ্যে; কারণ, আগেই বলিয়াছি, বৃহত্তর বাঙালী সমাজের মধ্যে এই শ্রেণীই সামাজিক প্রগতির মুখপাত্র, সামাজিক ধ্যান-ধারণার নিয়ন্তা। এই সব নূতনতর জটিলতর সমাজ-সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ রবীন্দ্র-মানসের আয়তনভুক্ত হইতে বিলম্ব হয় নাই। এই মধ্যবিত্ত-সমাজের সমস্যা, দায় ও কর্তব্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন ঐতিহ্যবোধ রবীন্দ্র-মানসের বিশিষ্ট লক্ষণ।

সুবৃহৎ পরিবার ও গোষ্ঠী জীবনের দায়ীত্ব ও কর্তব্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের বিদ্রোহ "চোখের বালি"র অনেক জায়গায় সুস্পষ্ট ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "নবযৌবনা নববধূর সমস্ত মিষ্টরস যে কেবল

ঘরকন্নার দ্বারা পিষ্ট হইতে থাকিবে” স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধ ইহা সহ্য করিতেই রাজী নয়। মহেন্দ্র একাধিকবার ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ গোষ্ঠীবদ্ধ পরিবারে স্বাভাবিক বিস্তার ও মুক্তিলাভ করিতে পারে না; আধুনিক স্বামী-স্ত্রী এই ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্বাধীন অস্তিত্ব কামনা করে। শ্বশ্রূ-শাসিত পরিবারে বধূ হওয়াই নারীর অস্তিত্বের একমাত্র পরিচয় নয়, তাহার অন্যতর পরিচয় হইতেছে স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের সম্মিলিত স্বাধীন গোষ্ঠীজীবনবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচয়। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ একান্ত সাম্প্রতিক বাঙালী সমাজে নারীকে স্বামী হইতে পৃথক করিয়া নারী হিসাবে নারীর একান্ত স্বাধীন অস্তিত্বও কামনা করিতেছে; রবীন্দ্রনাথেরই পরবর্তী উপন্যাসে উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের এই চেতনারও পরিচয় দেখা যায়।

এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধেরই অনিবার্য প্রকাশ নারীর যৌন-স্বাধীনতাবোধ। এই বোধ সমাজে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে তাহা বঙ্কিম-চেতনার বহির্ভূত ছিলনা। “কৃষ্ণকান্তের উইলে”র রোহিণী-চরিত্রে তাহার পরিচয় আছে; কিন্তু যেহেতু এই বোধ তখনও প্রবল হইয়া উঠে নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তাহা একান্তই নূতন, সমসাময়িক সমাজবুদ্ধির পরিপন্থী, সেই হেতু রোহিণী বঙ্কিম-চন্দ্রের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই, দরদ ও সহানুভূতিও আকর্ষণ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের কালে রোহিণী বিনোদিনীতে বিবর্তন লাভ করিয়াছে; নারীর যৌন-স্বাধীনতাবোধের রূপ প্রচলিত সংস্কারকে আহত করা সত্ত্বেও আমাদের বোধ ও বুদ্ধির মধ্যে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সামাজিক প্রগতির সাহিত্যিক প্রকাশের এই-টুকুই পার্থক্য।

“নৌকাডুবি” “চোখের বালি”র দুই বৎসর পরের রচনা, ১৩১০-১১ সালের নবপর্যায় “বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত হইয়াছিল। এই উপন্যাস “স্মরণ”, “উৎসর্গ” প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থের, ‘স্বদেশী সমাজ’, ‘সফলতার সদুপায়’ প্রভৃতি বিখ্যাত সামাজিক ও রাজনীতিক প্রবন্ধের প্রায় সমসাময়িক। তখনকার বাঙালী পাঠক “নৌকাডুবি” পড়িয়া কি মনে করিয়াছিল, জানিনা, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে আমরা একটু বিস্মিত হই এই ভাবিয়া যে “চোখের বালি”-

রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে দুই বৎসর পর "নৌকাডুবি"র মত রোমান্টিক-ঘটনা-নির্ভর উপন্যাস কি করিয়া নিঃসৃত হইল। আর্ট এবং মননশীলতা এই উভয় দিক্ হইতেই "নৌকাডুবি" "চোখের বালি" অপেক্ষা অপরিণত, অথচ কালগণনার দিক্ হইতে "নৌকাডুবি" "চোখের বালি"র পরের রচনা। * এই অপরিণতি ঘটনা-সংস্থানের শিথিলতা ও বিষয়বস্তুর দুর্বলতার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। "নৌকাডুবি"-উপন্যাস লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের রচনা নয়, মাসিক-পত্রের তাগাদায় মাসের পর মাস বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন ভাবে লেখা। "বঙ্গদর্শনে"র অনেক পাতাই রবীন্দ্রনাথকে নিজের লেখা দিয়া ভরাট্ করিতে হইত; এবং যে-বৎসর "নৌকাডুবি" "বঙ্গদর্শনে" ছাপা হইতে আরম্ভ হয়, সেই বৎসর সম্পাদকের হাতে ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস আর ছিল না। কাজেই বাধ্য হইয়া রবীন্দ্রনাথকে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছিল। অন্তরের প্রেরণায় আর প্রয়োজনের তাড়নায় রচনার মধ্যে পার্থক্য কিছু আশ্চর্যের কথা নয়!

"নৌকাডুবি"র ঘটনা-বিন্যাস ত সোজাসুজি রোমান্স-প্রবণ কল্পনার সৃষ্টি। আধুনিক মন উপন্যাসে এতটা আকস্মিক ঘটনার উপর সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চায়না। সমস্ত গল্পটিই প্রায় আকস্মিক ঘটনার ফ্রেমে বাঁধা; রমেশ ও কমলার জটিল সম্বন্ধের গ্রন্থি গড়িয়া উঠিয়াছে একটি আকস্মিক বিপর্যয়ের উপর; কমলা ও নলিনাক্ষের পুনর্মিলনও প্রায় সর্বাংশেই দৈব-ঘটনা-নির্ভর। কমলা যে রমেশের স্ত্রী নয়, একথা আবিষ্কার করিতে রমেশের তিন মাস লাগাটা একটু অস্বাভাবিক; যে-ভুলের উপর রমেশ-কমলার জটিল সম্বন্ধটি দিনের পর দিন ক্রমশঃ জটিলতর হইতেছিল তাহা এত দীর্ঘ-বিলম্বিত যে তাহাও একটু অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। এ ভুল ভাঙান, এবং সমস্ত জটিলতার অবসান ঘটান এমন কঠিন বা অসম্ভব ব্যাপার কিছু ছিলনা। তাহা ছাড়া, হেমনলিনীর সঙ্গে বিবাহের আগে রমেশ কেন যে কমলা-রহস্য উদ্ঘাটনে কোনও ইচ্ছা বা চেষ্টা দেখাইলনা তাহারও খুব একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। এতগুলি বাধা অতিক্রম করিতে পারিলে তবে "নৌকাডুবি"র সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য এবং বাস্তব-নিষ্ঠার পরিচয়লাভ সহজ হয়।

---

* শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই ত তাঁহার "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা"-গ্রন্থে "নৌকাডুবি"কে "চোখের বালি"র আগেকার রচনা বলিয়াই ভুল করিয়াছেন! ২০০ এবং ২০৪ পৃ।

এই নিষ্ঠা ও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায় কমলার চরিত্রে। তাহার প্রণয়াবেগ কি করিয়া ধীরে ধীরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, কি করিয়া রমেশের দিকে উন্মুখ হইয়াছে, এবং দ্বিধায় আন্দোলিত ও সংকুচিত রমেশের দুর্বল সন্দেহাকুল ব্যবহারে কি করিয়া ধীরে ধীরে প্রীতি ও ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে, কি করিয়া শৈলজার সংস্পর্শে আসিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার প্রেমের অপূর্ণতা ও অবাস্তবতা সম্বন্ধে সচেতন হইল, কি করিয়া রমেশের প্রতি তাহার প্রণয় বিরাগে রূপান্তরিত হইল তাহা অতি নিষ্ঠা ও নিপুণতায় চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু তারপরেই কমলাকে যে-রূপে আমরা দেখি তাহাতে তাহার সূক্ষ্ম হৃদয়-বৃত্তির কোনও পরিচয় নাই। হেমনলিনীর কাছে রমেশের যে-চিঠিতে নিজের জটিল জীবন-রহস্য কমলার নিকট উদ্ঘাটিত হইল তাহাতে সে যে খুব অভিভূত হইল এমন মনে হয় না, যে-আবেগ আমরা তাহার জীবনে দেখিয়াছি সেই আবেগের কোনও প্রকাশই এ-ব্যাপারে দেখা গেল না। যে-মুহূর্তে সে জানিল, সে রমেশের স্ত্রী নয়, নলিনাক্ষ তাহার স্বামী, সেই মুহূর্তেই নলিনাক্ষের প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল, এবং তাহাকে ফিরিয়া পাইবার আগ্রহে সে চক্রবর্তী-পরিবারের স্নেহ-চক্রান্তের মধ্যে জড়াইয়া পড়িল, যে-রমেশের সঙ্গে সে এতদিন ঘর করিল, মেলামেশা করিল, সেই রমেশের কথা একবারও মনে পড়িল না, একথা ভাবিতে বাস্তবানুভূতি অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয় বই কি! কমলার এই ব্যবহার এবং নলিনাক্ষের অতি-মানুষ জীবন-ভঙ্গি দুইয়ে মিলিয়া এই পুনর্মিলন ব্যাপারটিকে কেমন যেন একটু রোমান্টিক করিয়া তুলিয়াছে।

রমেশ আগাগোড়াই দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্বল। যে সমস্যা তাহার জীবনে দেখা দিয়াছিল সে-সমস্যা তাহার চরিত্র অপেক্ষা বড় এবং কঠিন। কমলার সঙ্গে ব্যবহারে যে-দ্বিধা ও দুর্বলতা সে দেখাইয়াছে, হেমনলিনীর সঙ্গেও তাহাই। নলিনাক্ষের নাম জানা বা তাহার সন্ধান পাওয়া হয়ত তাহার পক্ষে সম্ভব ছিলনা, কিন্তু কমলা-রহস্য সে কমলা ও হেমনলিনী উভয়ের কাছেই যে কোনও মুহূর্তেই উদ্ঘাটিত করিতে পারিত। কিন্তু নিজের দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বলতায় তাহা পারে নাই। একটা শঙ্কিত অস্থিরতা তাহার আগাগোড়া সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে সুস্পষ্ট ; সহজ সরল পথে নিজে সে অতি সহজেই সমস্ত সমস্যা ঘুচাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু সে চলিয়াছে স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া।

হেমনলিনীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম এবং একটা সহজ ভদ্রতা ও শুচিতাবোধ তাহাকে দিয়াছে প্রবৃত্তি-সংযম ; সেই সংযমের সঙ্গে এই একান্ত দুর্বল দৈব-নির্ভরতা মিলিয়া তাহার জীবন-সমস্যাকে এতটা দীর্ঘায়ত ও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

হেমনলিনীর মূল্য ঐতিহাসিক। যে শান্ত একনিষ্ঠ প্রেমে সে আত্ম-সমাহিত সেই প্রেমের গৌরবে সে ফুটিয়া উঠে নাই ; নলিনাক্ষের শিষ্যা অথবা ভাবী-পত্নীরূপেও তাহার পরিচয় খুব স্পষ্ট নয় ; তাহার চরিত্রের একদিকের সুস্পষ্ট আকৃতি ধরা পড়ে শুধু পিতা অন্নদাবাবুর সঙ্গে সূক্ষ্ম সহানুভূতি-সম্বন্ধের মধ্যে। কিন্তু সাধারণ ভাবে তাহার নীরব, সংযত, সমাহিত স্বভাব, সূক্ষ্ম অনুভব-ক্ষম মন ও হৃদয়, কোমল অথচ দৃঢ় বীর্য, বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখে অচঞ্চল অবিচল দীপ্তি নারীত্বের এক নূতন পরিচয় বহন করিয়া আনিয়াছে, এবং এই পরিচয়ই জীবনের পূর্ণতর অভিজ্ঞতায়, বিচিত্রতর রসে ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হইয়া পরে সুচরিতায়, লাবণ্যে, কুমুদিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। হেমনলিনী ইহাদের সকলের পূর্বাভাস।

"নৌকাডুবি"র গল্প-বর্ণনার ভঙ্গি অত্যন্ত লঘু ও সরল ; গল্প-বর্ণিত চরিত্রগুলিও অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সহজ। বর্ণনার ভাষা যেমন কোথাও আবেগ-কম্পিত নয়, তেমনই চরিত্র ও ঘটনা-বিশ্লেষণের মধ্যেও কোথাও খুব গভীর ও জটিল আলোড়নও কিছু নাই। সেই সুদীর্ঘ ষ্টীমার-যাত্রায়ই কেবল রমেশ ও কমলার মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতে একটা গভীর আবর্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সচেতন লেখক তখনই রমেশ ও চক্রবর্তী খুড়াকে গল্পের মধ্যে আনিয়া সমস্ত মেঘ কাটাইয়া গল্পের স্বচ্ছ সরল প্রবাহ ফিরাইয়া আনিয়াছেন। অনেক তপশ্চর্যা, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রমেশের সঙ্গে যখন হেমনলিনীর দেখা হইল, কিংবা নলিনাক্ষের নিকট হইতে যখন সে বিদায় লইল, তখন সেই সব দৃশ্যেও খুব গভীর আবেগ বা আকুলতার বা রহস্যময়তার আভাস পাওয়া যায় না। নলিনাক্ষ ও কমলার মিলনদৃশ্যেও খুব নিবিড় রহস্যময় আনন্দানুভূতির ইঙ্গিত নাই। লেখকের মানসিক সংযম ও প্রশান্ত প্রকৃতিই এই মৃদু স্বচ্ছন্দ সমতল গতি ও বর্ণনা-ভঙ্গির উৎস।

(৪)

"গোরা" (১৩১৪-১৫)

"গোরা" ১৩১৪-১৫ বঙ্গাব্দে রচিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই "প্রবাসী" মাসিক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। "গোরা" বাঙ্‌লা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত একমাত্র উপন্যাস যে-উপন্যাসে সমগ্র শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বিশেষ যুগের সমস্ত সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা ও আদর্শ, সমস্ত বিক্ষোভ ও আন্দোলন, ধর্ম ও জাতীয় জীবনের নূতন আদর্শ-সন্ধানের সমস্ত ভাবাবেগ ও চিন্তা-বিপর্যয়, যুক্তিতর্কের উত্তাপ, অনুভূতির উদ্দীপনা, বুদ্ধি ও বীর্যের দীপ্তি, এক কথায় একটি সমগ্র দেশ ও জাতির পুরোগামী এক শ্রেণীর সমগ্র জীবনধারা রূপ গ্রহণ করিয়াছে। একমাত্র এই উপন্যাসটিতেই বৃহত্তর অর্থে সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও আদর্শের সঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষের ব্যক্তিগত সংযোগের অবস্থান লইয়া সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, "গোরা"র প্রসারিত পটভূমি, ইহার সুবিস্তৃত পরিধি, বিশাল ও গভীর জাতীয়-সত্তার তুলনা আজ পর্যন্তও বাঙ্‌লা উপন্যাসে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তিগত জীবনই ইহাদের একমাত্র পরিচয় নয়; ব্যক্তিগত পরিচয় অতিক্রম করিয়া ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি বৃহত্তর সত্তা আছে; সে-সত্তা বৃহত্তর সামাজিক ও জাতীয়-জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। একান্ত সাম্প্রতিক সাহিত্যে ইহাই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, এই হিসাবেই বর্তমান যুগে উপন্যাসই মহাকাব্যের স্থান অধিকার করিয়াছে। "গোরা" মহাকাব্যের বিশালতা ও প্রসার লইয়া বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রথম এবং আজ পর্যন্ত একমাত্র আধুনিক উপন্যাস।

"গোরা"র এই বৈশিষ্ট্যের মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে বাঙ্‌লা দেশের সমসাময়িক ভাব ও আদর্শ-সংঘাতের, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র-আবর্তের এবং তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের একটু পরিচয় সংক্ষেপে লওয়া প্রয়োজন।* ঊনবিংশ শতকের শেষদিক হইতেই আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় বিক্ষোভ ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতেছিল; সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটীশ প্রভুদের ঔদ্ধত্য ও অবিচার

* বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী", ১ম খণ্ড, ৩৫২—৩৭১ পৃ।

ভারতবাসীর, বিশেষভাবে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙালীর মনকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছিল। এই রাষ্ট্রীয় বিক্ষোভ হইতেই স্বাজাত্যবোধ এবং জাতীয় আত্মানুসন্ধানের সূচনা দেখা দেয়। উনবিংশ শতকের শেষদিক হইতেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নানা ভাবুক ও কর্মী নানাভাবে দেশের বিচিত্র জীবনাদর্শের মধ্যে, আপাতবিরোধী বিচিত্র ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতির মধ্যে মূলগত ঐক্যের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। এই চেষ্টা আরও প্রবল হইয়া দেখা দেয় বিংশ শতকের গোড়ায়। বাঙ্‌লা দেশের যে-কয়জন মনীষী এই ঐক্যাদর্শ-সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শুধু অন্যতম নহেন, প্রধানতম। রবীন্দ্রনাথ এই ঐক্যাদর্শের সন্ধান পাইলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের ত্যাগ ও তপোবনাদর্শের মধ্যে, মন্ত্র-সাধনা, বৃহত্তর আধ্যাত্মিক সাধনা এবং গভীরতর অর্থে বর্ণাশ্রম-আদর্শের মধ্যে। "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে তাহার পরিচয়ও সুস্পষ্ট। ১৩০৮ সালে নবপর্যায় "বঙ্গদর্শনে"র সম্পাদনভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শ প্রচারে ব্রতী হন্। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে তাঁহার যে বিতর্ক হয় তাহাতে তিনিই প্রথম বলেন যে সংকীর্ণ অর্থে সামাজিক ব্যাধি বা তাহার প্রতীকার বলিয়া কিছুই নাই, ব্যাধি সমগ্র জাতীয় জীবনের, এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি হইতেই তিনি আমাদের সমগ্র জীবনাদর্শের, জীবন-সমস্যার ব্যাখ্যা করিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ লইয়া যে-আলোচনা ("বঙ্গদর্শন", ১৩০৮, জ্যৈষ্ঠ) তাহার মধ্যেও তিনি একই আদর্শের কথা বিভিন্ন দিক দিয়া বিচার করিলেন। 'নেশন' ও 'ন্যাশনলিজম', হিন্দু ও হিন্দুত্ব, হিন্দুসমাজ ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাঁহার আদর্শ ও চেতনা এই সময়েই গড়িয়া উঠে। এই সময়ই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়। এই সব পরিচয়, তর্কবিতর্ক ও আলোচনা ইত্যাদি উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্র-মানসের মধ্যে আমাদের জাতি, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, সাধনা ইত্যাদি সব কিছু লইয়া একটা অখণ্ড জীবনাদর্শ, সমগ্র জীবনদর্শন গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। 'ব্রাহ্মণ', 'চীনম্যানের চিঠি,' 'বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্য', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'অত্যুক্তি', 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি', প্রভৃতি প্রবন্ধ ও আলোচনায়, 'রাজকুটুম্ব', 'ঘুষাঘুষি', 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' 'ধর্মপ্রচার' প্রভৃতি বক্তৃতা ও প্রবন্ধে এই অখণ্ড জীবনাদর্শের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শেষোক্ত বক্তৃতাটির মধ্যেই একথাও

আছে যে মানুষ যখন সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্মসাধনাকে আধ্যাত্মিক সাধনা বলিয়া গ্রহণ করে তখন ধর্ম-সাধনা খণ্ডিত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়। ধর্ম কোনও বিশেষ কালের মধ্যে, স্থানের মধ্যে, বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের মধ্যে, শাস্ত্র ও আপ্তবাক্যের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নাই। এই সব প্রবন্ধ, আলোচনা ও বক্তৃতা-রাজির মধ্যে এমন সব যুক্তি, ভাবোদ্দীপনা, চিন্তাপর্যায়, এমন কি বাক্যভঙ্গি ও বক্তব্যাংশ আছে যাহা "গোরা"-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রে, ব্যবহারে, কথাবার্তায়, তর্কবিতর্কে একেবারে রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে "নৌকাডুবি" উপন্যাসেই নলিনাক্ষ, হেমনলিনী, অন্নদাবাবুর মধ্যে ইহার কতকটা রূপ কোনও মনোযোগী পাঠকেরই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। যাহা হউক, বাহিরের নানা ঘটনা ও ঘাতপ্রতিঘাতে মনের মধ্যে এই ভাবে যখন একটা অখণ্ড জীবনাদর্শ রূপ লইতেছে, ঠিক্ এমন সময় ১৩১২ সালে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বাঙ্‌লাদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল।

শতাব্দী-সঞ্চিত দুঃসহ বেদনা ১৩১০ সালে আন্দোলনের সূচনা হইতেই শিক্ষিত দেশের নরনারীর চিন্তায় ও কর্মে রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল। এই আন্দোলন দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার মূল ধরিয়া টান দিল। রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়িলেন না; শুধু যে বাদ পড়িলেন না তাহা নয়, তিনিই হইলেন অন্যতম কর্ণধার। 'দেশের কথা', 'স্বাদেশিকতা' ইত্যাদি সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন হইল, ("বঙ্গদর্শন" ; ১৩১১, ২১০--১৪) স্বাদেশিকতাকে তিনি স্বদেশের ঊর্দ্ধে স্থান দিলেন না, আন্দোলনের ভাবাবেগকে তিনি কর্মের মধ্যে রূপ দিতে চাহিলেন, 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন। 'ছাত্রগণের প্রতি সম্ভাষণ', 'সফলতার সদুপায়', 'প্রাইমারী শিক্ষা', 'অনুবৃত্তি', 'দেশীয় রাজ্য', 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', 'বিজয়া সম্মিলনী' ইত্যাদি বক্তৃতা ও আলোচনা উপলক্ষ্য করিয়া তদানীন্তন বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শ একটি তাঁহার মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিল। 'বিলাসের ফাঁস', 'রাজা ও প্রজা', 'শিক্ষা-সমস্যা', 'আবরণ', 'জাতীয় শিক্ষা', 'ততঃ কিম্' ইত্যাদি প্রবন্ধে এই আদর্শ আরও স্পষ্ট হইল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ লক্ষ্য করিতেছিলেন, আমাদের সমসাময়িক সমাজ এবং রাষ্ট্রচিন্তা ও ভাবাদর্শ বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত, সমগ্রতা হইতে বিচ্যুত ও খর্বিত। নেতৃত্ব ও কর্মপদ্ধতি লইয়াও সংকীর্ণ মননশীলতার পরিচয় তাঁহার কাছে ধরা পড়িয়া গেল; কর্মীদের মধ্যেও বিরোধ দেখা দিল। "সন্ধ্যা",

"যুগান্তর", "বন্দেমাতরম্" ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া দেশের যুবচিত্তে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রসার লাভ করিল; আর, জামালপুরের হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের অন্তরের বিরোধও অত্যন্ত উৎকটভাবে প্রকট হইয়া উঠিল। এই সব চিন্তা ও ঘটনার আবর্তের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজ-চিন্তার যে রূপান্তর ঘটিতে আরম্ভ করে তাহার সর্বপ্রথম পরিচয় পাওয়া যায় 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে ("প্রবাসী", ১৩১৪, শ্রাবণ)। এদিকে কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধ সম্পূর্ণ হইল; বিপ্লবী রুদ্রপন্থা বোমাপর্বে রূপান্তরিত হইল। 'পথ ও পাথেয়', 'সমস্যা', 'সদুপায়' প্রবন্ধে, কিন্তু বিশেষ করিয়া 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে রবীন্দ্র-সমাজ-মানসের রূপান্তর আরও সুস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল; স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ কি করিয়া ধীরে ধীরে নানা আবর্তের ভিতর দিয়া আর এক রবীন্দ্রনাথে রূপান্তরিত হইলেন, তাহার পরিচয় এই প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলিতে ধরা যায়। এই উভয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই "গোরা" উপন্যাসের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই বিচিত্র ভাব ও চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়াই "গোরা"র বিভিন্ন চরিত্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। সমসাময়িক চিন্তা ও কর্মধারা হইতে বিচ্যুত করিয়া দেখিলে তাহাদের সবটুকু পরিচয় কিছুতেই পাওয়া যায় না। "গোরা"র সাহিত্য-বিশ্লেষণের আগে সেই জন্যই ইহার পশ্চাতে যে সমাজ-মানস ক্রিয়াশীল তাহার পরিচয় লওয়া প্রয়োজন হইল।

কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলা প্রয়োজন যে এই ক্রিয়াশীল, গতিশীল সমাজ-মানসের পরিচয়ই "গোরা"-উপন্যাসকে ইহার সুসমৃদ্ধ সাহিত্যমূল্য দান করে নাই। যে বুদ্ধি ও অনুভব-দীপ্ত তর্কজাল, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদর্শ ও মতামতের আলোড়ন "গোরা"য় এতখানি জায়গা জুড়িয়া আছে তাহার উপর উপন্যাসটির সাহিত্যমূল্য এতটুকু নির্ভর করে না। এ-সব আদর্শ ও মতামত সত্য কি মিথ্যা, লেখকের পক্ষপাত কোন আদর্শ ও মতামতগুলির উপর বেশী, সে-প্রশ্নও সাহিত্যালোচনায় অবান্তর। "গোরা" মহৎ ও বৃহৎ উপন্যাস সাহিত্যিক কারণেই। সে-কথা বোধ হয় একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। "গোরা"য় গোরা অথবা বিনয় অথবা সুচরিতার মুখে যে-সমস্ত যুক্তিতর্কজাল বিস্তার লাভ করিয়াছে, যে-সমস্ত আদর্শ ও মতবাদ রূপায়িত হইয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিই তাহাদের হৃদয়ের গভীর আলোড়নে

আলোড়িত; তাহারা শুধু যুক্তি বা মতবাদ মাত্র থাকে নাই, তাহারা হইয়া উঠিয়াছে বাণীমূর্তি। তাহাদের জীবনের প্রত্যেকটি কর্মকৃতি তাহাদের যুক্তি ও আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহারা প্রত্যেকেই তাহাদের যুক্তি ও আদর্শের জীবনরূপ। তাহাদের জীবন-দর্শনের সঙ্গে তাহাদের জীবনের কোনও পার্থক্য নাই। গোরা, বিনয়, ললিতা ও সুচরিতা যে-ভাবে আবর্তিত বিবর্তিত হইয়াছে, তাহা একান্তভাবেই তাহাদের যুক্তিতর্ক ও মতামতের অনুগামী। এক কথায় এই সব মতামত ও যুক্তিতর্ক উপন্যাসগত চরিত্রগুলিকে শুধু সমৃদ্ধ করে নাই, উপন্যাসটিকে শুধু মনন-সমৃদ্ধি দান করে নাই, চরিত্রগুলিকে রূপায়িত ও রসায়িত করিবার জন্যই এইসব তর্কজাল ও আদর্শ-বিরোধের প্রয়োজন ছিল। উপন্যাসের ঘটনা-সংস্থানও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে এই সব তর্ক ও মতামত। এক-একটা বিশেষ ঘটনার পরিস্থিতি কোন একটা বিশেষ যুক্তিকে বস্তুর ধর্মের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে, অথবা কোনও বিশেষ যুক্তি বা মতকে পরিপূর্ণ রূপ দিবার জন্যই একটা বিশেষ ঘটনার পরিবেশ ইচ্ছা করিয়াই লেখক সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত "গোরা"য় ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত; তাহা আর পাঠককে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই! "গোরা" বৃহৎ ও মহৎ ইহার সুনিপুণ ঘটনা-সংস্থানের জন্য, গোরা-বিনয়-ললিতা-সুচরিতার চরিত্র-বিকাশের ধারা ও গতিভঙ্গির জন্য, ইহার বিষয়বস্তুর সচল গতিশীল প্রাণাবেগের জন্য, ইহার মননসমৃদ্ধির জন্য, ইহার গভীর ও সুউচ্চ আদর্শ মহিমার জন্য, ইহার কবি-কল্পনার জন্য, ইহার বস্তুধর্মের দৃঢ়তার জন্য। সমাজ-মানসের দ্যোতনা "গোরা"র এই সাহিত্য-মহিমাকে দৃঢ় বস্তুভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া নূতনতর সমৃদ্ধি দান করিয়াছে।

আগেই বলিয়াছি, "গোরা"-গ্রন্থের বিভিন্ন চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াও প্রত্যেকেরই একটা বৃহত্তর সামাজিক সত্তা আছে, এবং প্রত্যেকটি চরিত্রই এই বৃহত্তর সত্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন; এত বেশী সচেতন যে সকলেরই চেষ্টা এক-একটা বিশেষ মতের বিশেষ চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠা এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন নিয়ন্ত্রণ। তাহারা সকলেই যেন এক-একটি মতবাদের, এক-একটি চিন্তাধারার মুখপাত্র। ইহাদের যুক্তিতর্কজালে "গোরা"র আকাশ অনেকখানি আচ্ছন্ন। পরেশবাবুর

অবাস্তব অবিমিশ্র ধর্ম ও সত্যানুগত জীবনের ভাষা, বিনয়ের সুকুমার হৃদয়ের দ্বিধাকণ্টকিত জীবনের ভাষা, আর গোরার মুখের ভাষায় ভারতীয় আত্মবোধের যে-পরিচয় হৃদয়াবেগের প্রাচুর্যের তাড়নায় সবেগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এ-সমস্তই এত সহজে আমাদের এত বেশী পরিচিত হইয়া যায় যে, গোরা, বিনয় অথবা পরেশবাবু, এমন কি পানুবাবু, আনন্দময়ী ইত্যাদিকে দেখিবামাত্রই আমরা বলিতে পারি কাহার যুক্তিতর্ক, চিন্তাধারা কোন্ পথে প্রবাহিত হইবে, কোন্ বাঁকে কখন মোড় ফিরিবে। ইহার ফলে "গোরা"র চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট দীপ্তি ও উজ্জ্বলতা, যথেষ্ট গভীরতা লাভ করে নাই, এমন অভিযোগ মাঝে মাঝে শোনা যায়। ব্যক্তিগত জীবন সমাজ-বোধ ও স্বদেশ-চেতনার নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফলে জীবনের প্রয়োজন এবং আর্টের প্রয়োজনের মধ্যে একটা বিরোধ বাধিয়াছে, এই রকম একটা প্রশ্ন "গোরা" সম্বন্ধে মাঝে মাঝে উঠিয়া থাকে।

আমার মনে হয়, "গোরা"র চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে এই প্রশ্ন অথবা অভিযোগ করা চলে না, যদিও পরেশবাবু বা আনন্দময়ী সম্বন্ধে ইহা কতকটা স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু এই দুইজনই আমাদের প্রতিদিনের সংসারের সেই জাতীয় জীব যাঁহাদের ব্যক্তিত্ব বলিয়া কোন পদার্থই নাই। ইঁহারা দুইজনই আদর্শচরিত্র নর ও নারী, কিন্তু তাঁহাদের এই আদর্শ চরিত্রের বিকাশ কি করিয়া হইল, কোন্ পথে হইল তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ইঁহারা দুইজনেই অবাস্তব রক্তহীন জীব। যে-অভিযোগের কথা আগে বলা হইয়াছে তাহা গোরা অথবা বিনয়, ললিতা অথবা সুচরিতা সম্বন্ধে একেবারেই সত্য নয়। গোরা তর্ক করিয়াছে প্রচুর, তাহার যুক্তিতর্ক, মতবাদ ও চিন্তাধারার সঙ্গে তাহার জীবনের কোনও বিচ্ছেদ নাই, একথাও সত্য, কিন্তু তাহা তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা স্ফুরণে কোন বাধার সৃষ্টি করে নাই। তাহার দীর্ঘায়ত যুক্তিজাল তাহার মুখের কথা মাত্র নয়, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির ও সমাজ-বোধের আস্ফালন মাত্র নয়, তাহার প্রত্যেকটি যুক্তি ও ভাষণ অন্তরের গভীর আবেগে ও প্রেরণায় আলোড়িত, দ্বন্দ্বসংগ্রামে উদ্বেলিত; হৃদয়ের গভীরতম উৎসের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ গাঢ় ও গভীর। বিনয়ের প্রতি তাহার সম্বন্ধ, আনন্দময়ীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বারবার তাহার যুক্তি ও মতবাদকে খণ্ডিত, দ্বিধাগ্রস্ত ও পরিবর্তিত

করিয়াছে; তাহার সমস্ত যুক্তিতর্কের পশ্চাতে একটি গভীর ও সবল প্রাণের সুকুমার স্পন্দন পাঠকের অনুভূতিকে স্পর্শ না করিয়া পারে না। সুচরিতার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ-বিকাশের মধ্যে এই পরিচয় আরও সুস্পষ্ট। মতবাদের, যুক্তিতর্কের সংঘর্ষের ভিতর দিয়াই গোরার অন্তরে প্রেমের রক্তকমল ফুটিয়াছে; তর্ক-মন্থনের ফলেই গোরার হৃদয়-সমুদ্রও মন্থিত হইয়াছে। গোরা পরম উৎসাহে প্রবল আগ্রহে সুচরিতার সঙ্গে তাহার মতবাদ লইয়া তর্ক করিয়াছে, তাহা সুচরিতাকে তাহার মতানুবর্তিনী করিবার জন্য ত বটেই, কিন্তু সেই উৎসাহ ও আগ্রহের পশ্চাতে আছে তাহার অবচেতন চিত্তের বিপুল প্রেমাবেগ; এই প্রেমাবেগই গোরার যুক্তিতর্ককে প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত কম্পিত করিয়াছে। যুদ্ধসজ্জার বাহিরাবরণ, যুক্তিতর্কের বর্ম ভেদ করিয়া এক অসতর্ক মুহূর্তে নির্জন গঙ্গাতীরে একদিন যে-প্রেম বিদ্যুচ্চমকের মত দেখা দিয়াছিল, সেই একটি মুহূর্তই শুধু গোরার সুগভীর ব্যক্তিজীবনের একমাত্র পরিচয় নয়, প্রতিদিনের তর্কবিতর্কের মধ্যেও অবচেতন চিত্তের এই প্রেম প্রচ্ছন্ন। অবিমিশ্র যুক্তিতর্কের প্রশ্রয় গোরা দেয় নাই, কিংবা দেশের আত্মবোধের, জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখাইতে গিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব কোথাও পীড়িত হয় নাই, একথা অবশ্য বলা যায় না, তবু সমগ্র ভাবে দেখিলে তাহার ব্যক্তিত্ব, তাহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত জীবন মেঘমুক্ত সূর্যের মতন স্পষ্ট ও উজ্জ্বল, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিনয়, সুচরিতা ও ললিতা সম্বন্ধেও একথা সত্য। ইহারা প্রত্যেকেই জীবন্ত ও বাস্তব, প্রাণরসে সমৃদ্ধ। বিনয়ও তর্ক করিয়াছে; গোরার মতবাদ অপেক্ষা গোরার প্রতি তাহার স্নেহ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাহার নিজের যুক্তিতর্ককে হয়ত তত জোরাল করিয়া তুলিতে পারে নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার মতবাদ কম যুক্তিসহ নয়। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের স্নেহবন্ধনই তাহাকে সুকঠিন দ্বন্দ্বের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, এবং এই দ্বন্দ্বই তাহার ব্যক্তিত্বকে মতবাদের অভিভবের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। তাহার যুক্তিতর্কজাল সমস্তই তাহার হৃদয়বৃত্তি দ্বারা গভীর ভাবে আলোড়িত ও প্রভাবান্বিত। আর সুচরিতা ও ললিতার ত কথাই নাই। সুচরিতার হৃদয়ের গভীর স্তরে প্রেমের নিঃশব্দ পদসঞ্চার, তাহার দুর্নিবার পরিবর্তন, তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব সমস্তই তাহার ব্যক্তিত্বের দ্যোতক। ললিতার সহজ অধিকার-বোধ, সুচরিতার প্রতি ক্ষণিক

ঈর্ষা, অস্থির চাঞ্চল্য, দৃপ্ত তেজস্বিতা, এবং প্রকাশ্য বিদ্রোহ-ঘোষণা প্রভৃতি সমস্তই তাহার গভীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। এই জন্যই "গোরা" সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে যে-আপত্তি উঠিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে আমার একটু আপত্তি আছে।

পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধ ইতিমধ্যেই একটু ইঙ্গিত করিয়াছি। পরেশবাবু অপেক্ষা আনন্দময়ী অনেক সহজ ও স্বাভাবিক। তাহার বিকাশ ও পরিণতি পাঠকের বাস্তব-বোধকে পীড়িত করেনা। অবশ্য একথা সত্য, আনন্দময়ীর পূর্বপরিচয় আমাদের কাছে অজ্ঞাত, তাহার চরিত্র-বিশ্লেষণও উপন্যাসে খুব দীর্ঘায়ত নয়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে স্বচ্ছ, মুক্ত, সহজ ও সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়, যে সর্ব-সংস্কারমুক্ত সহজ সকরুণ অন্তর্দৃষ্টি, যে সুগভীর অভিজ্ঞতা ও সুতীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় তাহার কর্মে ও ভাষণে, আচারে ও ব্যবহারে আমরা দেখিতে পাই তাহার উৎস সন্ধান করিতে সুদূর-বিসর্পী কল্পনার আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজন হয় না। নিঃসন্তান আনন্দময়ীর কোল জুড়িয়া গোরা যেদিন আসিয়া বসিল সেইদিন হইতেই তিনি তাহার আবাল্য সংস্কার যাহা কিছু তাহা বিসর্জন দিয়াছিলেন; অজ্ঞাত আইরিশ-যুবক-জাত গোরাকে কোলে লইয়া সে-সংস্কার পালন করা কিছুতেই চলিত না। আর, যে সহজ সকরুণ অন্তর্দৃষ্টির বলে তিনি গোরা, অথবা বিনয় অথবা সুচরিতার মনোজগতের সমস্ত সূক্ষ্মলীলাই 'দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ' দেখিতে পাইয়াছেন, সেই অন্তর্দৃষ্টিও একান্তভাবেই মাতৃহৃদয়ের সন্তান-বাৎসল্যের দৃষ্টি; এই মাতৃহৃদয় দিয়াই তিনি গোরার হৃদয় মনের সূক্ষ্মতম তন্তুগুলির স্পন্দন দেখিতে ও অনুভব করিতে পারিয়াছেন, এবং গোরার বেলায় পারিয়াছেন বলিয়াই বিনয় অথবা সুচরিতা অথবা ললিতার বেলায়ও তাহা কঠিন হয় নাই। সর্ব-সংস্কারমুক্ত, মতামত-নিরপেক্ষ, সুগভীর সহানুভূতি-দৃষ্টিসম্পন্ন, সকল চিত্তের পরমাত্মীয়, সকল সঙ্কীর্ণতা মলিনতা মুক্ত এবং সুগভীর বোধ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই মহীয়সী মহিলাটির উপন্যাস-গত চরিত্রের একমাত্র রহস্য-চাবী হইতেছে গোরা স্বয়ং।

পরেশবাবু আনন্দময়ীর মতন এত স্বচ্ছ ও সহজ নহেন, তাঁহার বোধ ও বুদ্ধি, অনুভব ও অন্তর্দৃষ্টি সহজ-সংস্কারগত নয়। তাঁহার কর্ম ও ভাষণ যুক্তি-শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অধ্যাত্মবোধ সত্য, এবং অভিজ্ঞতার উপর

প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাঁহার ভাবনা ও তাঁহার জীবন দুইয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায় নাই, এক কথায় তাঁহার যুক্তিতর্কের ভাবনে তাঁহার হৃদয়ের আলোড়নের স্পর্শ লাগে নাই। তাহা ছাড়া, তাঁহার অধ্যাত্মবোধের চেহারাটা অনেকটা পাণ্ডুর ও বর্ণহীন, সে-অধ্যাত্মবোধ তাঁহার চরিত্রকে মহিমান্বিত করে নাই, ব্যক্তিত্বের দ্যুতি দান করে নাই। একমাত্র সুচরিতা ছাড়া আর কেহই তাঁহার দ্বারা তেমন করিয়া প্রভাবান্বিতও হয় নাই, কিন্তু তাহাও পরেশবাবুর কৃতিত্বে ততটা নয় যতটা সুচরিতার সকৃতজ্ঞ স্নেহ-ব্যাকুল হৃদয়ের উন্মুখ ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলে। কন্যা ললিতা কতকটা যে প্রভাবান্বিত হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু সে-প্রভাব এত শিথিল ও তরল যে প্রথম আঘাতেই তাহার ভিত্তি শুধু যে ভাঙিয়া পড়িল তাহাই নয়, সে-প্রভাবকে অতিক্রম করার চেষ্টাই হইয়া উঠিল প্রবল। পানুবাবু এবং নিজের স্ত্রী বরদাসুন্দরীর কথা দূরে থাক, যে দুইজন তাঁহার হৃদয় মনের একান্ত নিকটবর্তী ছিল তাঁহার বর্ণহীন বস্তুহীন জীবন সেই দুইজনকেও শেষ পর্যন্ত তাঁহার নিজের সমাজের অধ্যাত্মাদর্শের পরিধির মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সমগ্র গ্রন্থটিতে এতখানি জায়গা জুড়িয়া থাকিয়াও, সুউচ্চ বেদীতে বসিয়া মহৎ আদর্শানু-প্রেরিত এত কথা কহিয়াও, সকল ঘটনাবর্তের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত থাকিয়াও কোথাও যেন তিনি নাই, কোথাও যেন তাঁহার এতটুকু প্রভাবের চিহ্নও নাই। এমন আদর্শ চরিত্র, অথচ পারিপার্শ্বিকের দিক্ হইতে এত অপ্রয়োজনীয়, এমন নিষ্প্রভ, এমন দীপ্তিহীন, শক্তিহীন, বর্ণহীন, জীবনহীন! শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনে এই প্রশ্ন অনিবার্য, পরেশবাবুর মতন লোকের অধ্যাত্মবোধ কি গভীরতর অর্থে সত্য ও সার্থক? উপন্যাসটির ভিতরেই এই প্রশ্নের যে উত্তর আছে তাহা যে একান্তই সত্য ও বাস্তবনিষ্ঠ এ-সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই। পরেশবাবুর সার্থকতা পরেশবাবুতেই, ঐখানেই তাঁহার শেষ; ব্যক্তি-জীবনের বাহিরে বৃহত্তর পরিবার অথবা সমাজ-জীবনে এই ধরণের চরিত্রের কোন সার্থকতাই নাই। (আর, উপন্যাসেও সার্থকতা ততটুকুই যতটুকুর প্রয়োজন ইহাদের অসার্থকতা দেখাইবার জন্য।) অথচ একান্ত ভাবধর্মী ধর্মসাধনার ইতিহাসে এই ধরণের চরিত্র যে বিরল নয় তাহা ত সকলেই জানেন; এক সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের এক শ্রেণীর লোকদের ধর্মসাধনা এই পথেই প্রবাহিত হইয়াছিল, এবং ইহারা না পারিয়াছিলেন নিজদের ধর্মদর্শনকে

বাঁচাইতে, না পারিয়াছিলেন পরকে নিজেদের অধ্যাত্ম-মহিমায় অনুপ্রাণিত করিতে। ব্রাহ্ম-সমাজের আয়তনের মধ্যে পরেশবাবুর মতন লোককে যাহারা চলাফেরা করিতে দেখিয়াছেন কেবল তাহারাই বুঝিতে পারিবেন এ-চরিত্র কতখানি সত্য ও বাস্তবনিষ্ঠ, তাহারাই বুঝিবেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ কত সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ।

ঠিক্ এই কথাই সমান জোরের সঙ্গে বলা চলে পানুবাবু ও বরদাসুন্দরী সম্বন্ধেও। ব্রাহ্ম-সমাজের মুক্তধারা একদিন দেশের মধ্যবিত্ত সমাজে যে নূতন জীবন-প্রবাহ বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহার স্রোতের মুখে ইহাদের মত অনেকেই ভাসিয়া আসিয়াছিলেন। অধ্যাত্মপ্রেরণা বা ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতি-মূলক উন্নত সমাজাদর্শের অন্তরপ্রেরণা কিছুই ইহাদের ছিল না, সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণাও কিছু ছিল না; অথচ সঙ্কীর্ণ ধর্ম ও সমাজগণ্ডীর যে নিম্নস্তরের গর্ব এই জাতীয় লোককে স্ফীত, সঙ্কীর্ণ, বিকৃত, বিপরীত, অনুদার ও অনুভব-অক্ষম করিয়া তোলে তাহা ইহাদের পরিপূর্ণ মাত্রায়ই আছে। নিজেদের ধর্ম ও সমাজগণ্ডী সম্বন্ধে ইহারা অতি-সচেতন, এবং বৃহদাদর্শের আড়ালে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণ চেষ্টার সুযোগ ইহারা সহজেই খুঁজিয়া পান। অথচ ইহাদের আধ্যাত্মিক দর্প ও নিজেদের ধর্ম ও সমাজের উৎকর্ষ সম্বন্ধে উগ্র ও অভ্রান্ত বিশ্বাস শুধু যে ব্রাহ্ম-সমাজের এই জাতীয় জীব সম্বন্ধেই সত্য তাহা নয়, যে-কোনও নব ধর্ম ও সমাজান্দোলনের পক্ষেই ইহা সত্য; সকল নব আন্দোলনের স্রোতেই এই ধরণের জীব কিছু ভাসিয়া আসে; তবু, ব্রাহ্ম-সমাজ সম্পর্কে এই ধরণের চরিত্রাভাস উপন্যাসের গল্পবস্তুটিকে বাস্তব-নিষ্ঠার দীপ্তি দান করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অন্যদিকে চিরবহমান হিন্দুসমাজের মহিম ও হরিমোহিনী পানুবাবু ও বরদাসুন্দরীর সঙ্গে যে-ভাবে অপূর্ব ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিতে হয়। মহিম, গোরা ও বিনয়ের সুউচ্চ আদর্শের আড়ালে আশ্রয় লইয়া স্থূল বিষয়বুদ্ধিতে যতটুকু স্বার্থ সুবিধা আদায় করিয়া লওয়া যায় তাহার জন্য সচেষ্ট। সে একান্তই বণিক-ধর্মী, স্থূল; কোন সূক্ষ্ম দ্বিধাদ্বন্দ্বের জটিলতা তাহার মধ্যে নাই; এক হিসাবে সেও পানুবাবুর মতনই একান্ত আত্ম-সচেতন। পানুবাবু ও মহিম একই জাতীয় জীব, দুই আধারে দুই রূপ লইয়াছে মাত্র। ঠকিবেনা বলিয়া সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিন্তু এই হিন্দু-সমাজের

মধ্যেই মহিম অপেক্ষাও চতুর স্থূল সাংসারিক বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকের অভাব নাই, সে মহিমেরই জামাতা অবিনাশ। এই ধরণের জীব বিষয়বুদ্ধিতে একজন আর একজনকে হারাইবার জন্ত সচেষ্ট। এমন জীবকেও হিন্দুসমাজে চলাফেরা করিতে অনবরতই দেখা যায়। হরিমোহিনীর চরিত্র কিন্তু এতটা সহজবোধ্য নয়; এ-চরিত্র একটু নূতন এবং এই ধরণের বিকাশ ও পরিণতি সচরাচর দেখা যায় না। হরিমোহিনী সম্পত্তিবিচ্যুতা পরমুখাপেক্ষী কুণ্ঠিতা হিন্দু-বিধবা। কিন্তু সুচরিতার উপর স্নেহাতিশয্য তাহাকে কতকটা অভাবনীয় পরিণতি দান করিয়াছে। তাহার উপর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত যে-সব কৌশল তিনি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে বিষয়বুদ্ধি ও আত্ম-অধিকারবোধ সম্বন্ধে চেতনার অভাব নাই। এবং এই বোধ ও চেতনার, ছলনা ও কৌশলের ও সাহসের কাছে গোরাকেও হার মানিতে হইয়াছে। যে বিষয়বুদ্ধির অভাবে দেবররা তাঁহার সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া কাড়িয়া লইয়াছিল, সেই বিষয়বুদ্ধিই বৃদ্ধবয়সে অবস্থাসঙ্কটে ঘটনার আবর্তে কি করিয়া এমন ভাবে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁহাকে প্রবৃত্ত করিল তাহা ভাবিলে একটু বিস্মিত হইতে হয় বই কি? শুধু সুচরিতার প্রতি স্নেহাতিশয্যের যুক্তি দিয়া ইহাকে যেন ব্যাখ্যা করা যায় না।

মধ্যবিত্ত-সমাজলভ্য উচ্চশিক্ষা বিনয়কে একটা সহজ উদারতা দিয়াছে; গোরা তাহার একান্ত সুহৃৎ, এবং দুজনে গভীর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। গোরার সুদৃঢ় মতামতের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু সে-শ্রদ্ধা গোরার প্রতি প্রীতি হইতেই সঞ্জাত; তাহার উদার সুকুমার হৃদয় ও বুদ্ধির পক্ষে গোরার যুক্তি ও মতামত, তাহার জীবন-দর্শন অতিরিক্ত মাত্রার দৃঢ় ও অনমনীয়। ললিতাকে অবলম্বন করিয়া পরেশবাবুর বাড়ীতে এবং ব্রাহ্ম-সমাজে যখন তাহার গতিবিধি আরম্ভ হইল তখন নবধর্মান্দোলনের আদর্শ তাহার উদার হৃদয়কে আরও বিস্তার ও প্রসার দান করিল। ইহার কৃতিত্ব অনেকাংশে ললিতার, এবং কতকাংশে গোরারও। গোরার দৃঢ় অনমনীয়তাও বিনয়কে প্রসারিত করিতে কম সহায়তা করে নাই। গোরার সঙ্গে তর্কে সে সর্বদাই পর্যুদস্ত, তবু সে সর্বদাই উদার ও প্রশস্ত হৃদয়বৃত্তির পথই সমর্থন করিয়াছে। আর ললিতা তাহার জীবনে যে বিবর্তন আনিয়াছে তাহা ত অনস্বীকার্য। "চোখের বালি"তে বিনোদিনী যদি বিহারীর ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন করিয়া

থাকে, "গোরা"য় বিনয়ের ব্যক্তিত্ব উদ্বোধন করিয়াছে ললিতা। পূর্বজীবনে বিনয় ছিল গোরার ছায়ামাত্র; ললিতা প্রথম দর্শনেই তাহা আবিষ্কার করিয়াছিল, এবং তাহা তাহার ভাল লাগে নাই। নিষ্করুণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও নির্মম আঘাতের পর আঘাত করিয়া ললিতা বিনয়কে গোরার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়াছে, এবং তাহাকে স্বীয় ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট রেখা দান করিয়াছে; এক কথায় ললিতাই বিনয়কে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই সুকঠিন প্রয়াসের প্রত্যেকটি স্তর লেখক অতি কৌশলে বিন্যস্ত করিয়াছেন; অভিনয় ও ষ্টীমার-যাত্রার ঘটনা বিষয়-বিন্যাসের দিক হইতে সেই জন্যই সার্থক। বিনয়ের জীবনে প্রেমের প্রথম আবির্ভাব, বিনয়ের উপর প্রথম হইতেই ললিতার অধিকারবোধ, প্রেমের উদ্ভব, বিনয় সম্বন্ধে সুচরিতাকে লইয়া ললিতার ক্ষণিক ঈর্ষা, গোরার সহিত ললিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, গোরা-রাহু হইতে বিনয়ের মুক্তি, প্রভৃতিতে স্তরে স্তরে ললিতার যে-পরিচয় লেখক অপূর্ব কৌশলে আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন তাহার সুস্পষ্ট পরিণতি আমরা দেখিলাম ষ্টীমার-যাত্রা উপলক্ষে ললিতার দীপ্ত প্রেমের অকুণ্ঠিত নিঃসঙ্কোচ প্রকাশের মধ্যে। তাহার পর যে-ললিতার পরিচয় সেই ললিতা বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহ লেখকের সমসাময়িক সমাজ-চেতনার পরিচয়। ললিতা ব্রাহ্ম পরেশবাবুর কন্যা, বিনয় হিন্দু-সমাজের ব্রাহ্মণানুশাসন দ্বারা শাসিত; এ দু'য়ের বিরোধ বিংশ শতকের প্রথম পাদে প্রবল ছিল বই কি? কিন্তু সমস্ত বিরোধ, সমস্ত বাধা ললিতাকে ক্রমশঃ আরও তেজস্বিনী বিদ্রোহিনী করিয়া তুলিল, সে-তেজ ও বিদ্রোহ বিনয়ের মধ্যেও সঞ্চারিত হইল এবং শেষ পর্যন্ত ললিতার দৃপ্ত তেজস্বিতার সম্মুখে সমস্ত কৃত্রিম বাধা ও বিরোধ স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল। বিদ্রোহ জয়ী হইল।

ললিতা যদি বিনয়কে পাইল তাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে সমস্ত বাধা বিরোধ ঠেলিয়া দিয়া, সুচরিতা গোরাকে লাভ করিল উজ্জ্বল আত্মানুসন্ধানের দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া বৃহত্তর বিস্তৃততর সমন্বয়িত জীবনরূপের মধ্যে। সুচরিতা তেজস্বিনী বিদ্রোহিনী নয়। পরেশবাবুর স্নেহের মধ্যে, তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবের মধ্যে সে আশ্রয় লাভ করিয়াছে; নম্রতায় ও ভক্তিতে সে আনত, নিজের সম্বন্ধে সে একান্তভাবে উদাসীন। এই সুচরিতাও পানুবাবুকে গ্রহণ করিতে পারিল না, তাহার প্রধান হেতু পানুবাবু নিজে, দ্বিতীয়তঃ পরেশবাবুর

প্রতি তাহার অকুণ্ঠিত প্রশ্নলেশহীন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তাহার শান্ত, নম্র, আত্মসুখ-উদাসীন হৃদয়ে গোরার প্রতি আকর্ষণের সূত্রপাত হইয়াছিল গোরার উপেক্ষায়। সেই উপেক্ষাই সর্বপ্রথম তাহার বেদনার তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছিল। তাহার পর হইতে এই আঘাতের আর বিরাম নাই! গোরা তাহার আন্তরিক স্বদেশাভিমানের উচ্ছ্বাসে, প্রবল প্রদীপ্ত জীবনরাগে বারবার সুচরিতাকে সবলে আকর্ষণ করিয়াছে, বারবার তাহার ধর্ম ও সমাজাদর্শের ভিত্তিকে টলাইয়াছে, বারবার তাহার জীবনের মূল ধরিয়া টানিয়াছে। সুচরিতার ধর্মবিশ্বাস বা ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শে বিশ্বাস ত শুধু তাহার মুখের কথা মাত্র নয়, সে তাহার অন্তরের সম্পদ যে-সম্পদ সে পরেশবাবুর নিকট হইতে পাইয়াছে। গোরার প্রত্যেকটি আঘাতের পরই সে বারবার জোর করিয়া পরেশবাবুর শিক্ষা ও আদর্শকে জড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে, বারবারই গোরা তাহার সে-মুষ্টি শিথিল করিয়া দিয়াছে, এবং বারবার সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেবলই আন্দোলিত হইয়া ক্রমশঃ শেষ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বই, এই আত্মানুসন্ধানই তাহার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করিয়া তাহার চারিদিকে কোমল কমনীয় দীপ্তি বিকীর্ণ করিয়াছে। বারবার কক্ষচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও সে কখনও এই শান্ত কমনীয় দীপ্তি হারায় নাই। বোধ হয় এই কারণেই লেখক সুচরিতার সঙ্গে গোরার যখন মিলন ঘটাইলেন তখন সুচরিতাকে তাহার পূর্বসংস্কার হইতে পূর্ব-ধ্যান-ধারণা হইতে একান্ত-ভাবে বিচ্যুত, বৃন্তচ্যুত করিতে হইল না। গোরা সুচরিতার হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল অস্ফুট প্রেমের ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথ দিয়া, যুক্তিতর্কের পথ দিয়া নয়, কিংবা তাহার আদর্শ-মহিমায় ভর করিয়াও নয়। সেই প্রেম যখন ক্রমশঃ নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল তখন সুচরিতা সেই প্রেমের জোরেই গোরার বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার নগ্ন আত্মার জ্যোতির্ময় রূপ দেখিতে পাইয়াছিল।

গোরা সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই কিছু বলা হইয়াছে, কিন্তু গোরার কথা ত বলিয়া শেষ করিবার নয়, তাহাকে বুঝিতে পারাই বড় কথা। "গোরা"-গ্রন্থ জুড়িয়া গোরা বসিয়া আছে; গোরার উপস্থিতি সর্বত্র। সে তাহার যুক্তিতর্কের উদ্দীপনায়, সে তাহার স্বদেশাত্মার বাণীমূর্তিতে, সে তাহার প্রদীপ্ত সুদীর্ঘ আকৃতিতে, সে তাহার চলাফেরায়, সে তাহার কর্মকৃতিতে। তাহার সম্বন্ধে সকল কথাই লেখক সবিস্তারে বলিয়া দিয়াছেন, গ্রন্থের আরম্ভ হইতে শেষ

পর্যন্ত। স্বদেশের আত্মাকে সে যে-মূর্তিতে দেখিয়াছে, চিনিয়াছে, সেই মূর্তির ধ্যানই তাহাকে সকল কথায় ও কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, এবং সে-কথা ও কর্মের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই; দুইয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। তাহার ভারতবর্ষের ধ্যান হিন্দুর ভারতবর্ষের ধ্যান, তাহার জীবন-দর্শন ও জীবন-সাধনা হিন্দুধর্মের ধ্যান-ধারণাগত; দোষগুণ লইয়া তাহার সমগ্র রূপটিই গোরা তাহার ভারতবর্ষের উপর আরোপ করিয়াছে। হিন্দুর গৌরবময় অতীত, তাহার জাতিভেদ, সমাজ ও ব্যক্তির পরস্পর সম্বন্ধের আদর্শ, মূর্তিপূজা,আচার ও নিয়ম-নিষ্ঠা সমস্তই তাহার ভারত-ধ্যানের সমগ্রতার মধ্যে সমন্বয়িত হইয়াছে। দেশকে ভালবাসিয়াছে বলিয়াই দেশধর্মের যাহা কিছু বিকার তাহাকেও সে প্রীতি ও সহানুভূতির চোখে দেখিয়াছে। কিন্তু এই ধরণের দেশাত্মবোধ বা স্বদেশ-পূজার মধ্যে ঔদার্য্য নাই, দৃষ্টির ও বুদ্ধির প্রসারতা নাই, মানব-মহত্বের সুবিপুল আদর্শের স্পর্শ নাই, ভিন্নতর আদর্শকে বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার সুযোগ নাই। এই ধরণের দেশাত্মবোধ স্বধর্ম ও স্বসমাজাদর্শ দ্বারা সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ স্বদেশ-সাধনার পথ হইতে গোরার মুক্তিলাভ ঘটিত না যদি সুচরিতার প্রেম-স্পর্শ তাহার হৃদয়ে আসিয়া না লাগিত। সুচরিতার প্রেম তাহাকে বৃহত্তর সমন্বয়ের পথে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে, তাহাকে ব্যক্তি-জীবনের দীপ্তি দান করিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে-রহস্যকে অবলম্বন করিয়া গোরা বৃহত্তর সমন্বয়ের মধ্যে মুক্তির সন্ধান পাইল, সুচরিতাকে লাভ করিল, সে-রহস্য সম্বন্ধে আমার একটু আপত্তি আছে। এ-আপত্তির কথা আমি অন্যত্রও বলিয়াছি,* এখানেও একটু বিস্তারিতভাবে সে-কথা বলা যাইতে পারে।

গোরা তাহার জীবন-দর্শন ও জীবনাদর্শ লইয়া এমন একটা জায়গায় আসিয়া পৌছিয়াছিল, সুচরিতার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ এমন একটা স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল যেখানে দাঁড়াইয়া সুচরিতার সঙ্গে মিলন এবং নিজের আদর্শ ও সাধনা অক্ষুণ্ণ রাখা দুইই একসঙ্গে চলিতে পারেনা। সুচরিতার সঙ্গে মিলন ত শুধু বিবাহমাত্র নয়, তাহা যে বৃহত্তর জীবনাদর্শের মধ্যে মুক্তি। অথচ সুচরিতা

---

* এই গ্রন্থের "নাটক ও নাটিকা" অধ্যায়ে "মুক্তধারা"-নাটক সম্পর্কিত আলোচনায় অভিজিৎ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

ও গোরা দুইজনকেই সার্থকতা দিবার জন্য এই মুক্তি প্রয়োজন। এই মুক্তি দিবার জন্যই প্রয়োজন হইল গোরার জন্ম-রহস্যের অবতারণা। যে-মুহূর্তে গোরা আনন্দময়ীর মুখে তাহার জন্মবৃত্তান্ত শুনিল, সেই এক মুহূর্তেই সে জানিল হিন্দু ধর্ম ও সমাজের যে-নিয়ম ও আচার ব্যবহারের মধ্যে এতদিন সে নিজের বোধ ও বুদ্ধিকে প্রসারিত করিয়াছে, যে বিশেষ সাধন-পথকে সে নিজের বোধ ও বুদ্ধিকে প্রসারিত করিয়াছে, যে বিশেষ সাধন-পথকে সে নিজের পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সে-পথের পথিক হইবার, সেই সমাজের সাধারণ সভ্য হইবার অধিকারও তাহার নাই। অথচ তাহার দেশানুরাগ মিথ্যা নয়, অন্তরের গভীরতম স্তরে তাহার মূল। একমুহূর্তে গোরা আজ জানিল দেশানুরাগের সঙ্গে সমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহারের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর সে তাহার জীবনদর্শন গড়িয়া তুলিয়াছিল সেই সম্বন্ধের ভিত্তিভূমি মিথ্যা, অলীক কল্পনা মাত্র। কেবল তখনই সম্ভব হইল সুচরিতার সঙ্গে মিলন ও পূর্ণতর মুক্তি। কিন্তু লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, এই মিলন ও মুক্তি গোরা অর্জন করে নাই; তাহার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, তাহার প্রদীপ্ত প্রতিভা কোন মূল্য দিয়া ইহা অর্জন করে নাই। মনে হয় যেন, সে সুবৃহৎ এক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তির কোনও উপায় ছিল না; এমন সময় এক আকস্মিক রহস্যাবতারণা তাহাকে এই মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়া গেল! ইহা খুব সহজ মীমাংসা সন্দেহ নাই, কিন্তু গোরার পথ ত সহজ মীমাংসা খুঁজে নাই। এই রহস্যের পথ দিয়া গোরার মুক্তি, মন যেন ইহাতে সহজে সায় দিতে চায় না! আমি একথা ভুলি নাই গোরাকে মুক্তি দিতে হইলে তাহাকে শ্রেণীচ্যুত করা প্রয়োজন। যে সমাজ ও শ্রেণীর পরিবেশের মধ্যে গোরার জীবনাদর্শ, ধ্যান-ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই হিন্দুসমাজ ও মধ্যবিত্তশ্রেণী অত্যন্ত দৃঢবদ্ধ, অনমনীয়; সেই শ্রেণী ও সমাজের মধ্যে গোরাকে আবদ্ধ রাখিয়া তাহার মধ্যে মুক্ত বিপ্লবী মানসের ধর্ম সঞ্চার করা সম্ভব ছিল না। এই জন্মরহস্যের অবতারণার মধ্যে গোরাকে সেই শ্রেণীভ্রষ্ট করার প্রয়াস রবীন্দ্র-চেতনার মধ্যে ছিল, একথা সহজেই বলা যায়। হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহার ও নিয়ম-সংযমের প্রতি গোরার ঐকান্তিক নিষ্ঠা তাহার দৃষ্টিকে যে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা রবীন্দ্রনাথ জানিতেন; যে সামাজিক পরিবেশ এই নিষ্ঠার জন্মদাতা সেই পরিবেশের বিলুপ্তি ছাড়া গোরার দৃষ্টি মুক্ত ও স্বচ্ছ করিবার

উপায় কোথায়? সেই বিলুপ্তির পথ হিন্দুসমাজ হইতে তাহাকে সরাইয়া আনা। জন্মরহস্যের ভিতর দিয়াই তাহা সম্ভব হইল। কিন্তু এ যেন একান্তই দৈবানুগ্রহ! দৈবানুগ্রহ ছাড়া গোরাকে শ্রেণীভ্রষ্ট করার অন্য উপায় কি কিছু ছিল না? গোরা-চরিত্রের সঙ্গে যেন এই দৈবানুগ্রহের কল্পনা সহজে করা যায় না। আর গোরা না হয় এই দৈবানুগ্রহ অবলম্বন করিয়া শ্রেণী ও সমাজভ্রষ্ট হইয়া নিজের মুক্তি পাইল, কিন্তু অন্য যাহাদের এই শ্রেণীবিচ্যুতির প্রয়োজন তাহারা এই দৈবানুগ্রহের সুযোগ পাইবে কোথায়? আমার যেন মনে হয়, এই জন্ম-রহস্যের অবতারণায় গল্পের বস্তুধর্ম একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের চরিত্র-বিকাশের একটা গোড়ার কথা, সমান শক্তিসম্পন্ন পক্ষ প্রতিপক্ষ। যে হার মানিবে, তাহাকে তিনি কোথাও কখনও দুর্বল করিয়া গড়েন নাই। প্রত্যেকের যুক্তিতর্ক সমান দীপ্ত ও ঘাতসহ, প্রত্যেকেই স্ব-মহিমায় সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। কেহই কাহারও কাছে সহজে হার মানিবার মতন দুর্বল নয়। কিন্তু "গোরা"য় ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের তত্ত্বালোচনায় এতটা পক্ষপাতলেশহীন দৃষ্টির পরিচয় যেন নাই! ব্রাহ্মসমাজের ও ধর্মের স্বপক্ষীয় যুক্তিগুলি যুক্তিই রহিয়া গিয়াছে, সে-যুক্তিতে যেন প্রাণাবেগের স্পর্শ লাগে নাই। পানুবাবু ও বরদাসুন্দরীকে ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র বলা চলে না; পরেশবাবুকেও নয়, তিনি ত কোনও বিশেষ সমাজেরই নহেন। হিন্দুধর্ম-পক্ষীয়, অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির যে-আদর্শ হিন্দু-ভারতীয় মানসের আশ্রয়, সেই অর্দ্ধেক সত্য ও অর্দ্ধেক কল্পনার হিন্দুধর্ম, হিন্দু-ইতিহাস ও সভ্যতার সপক্ষীয় যুক্তিই লেখকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে; সেই সব যুক্তির পশ্চাতেই লেখকের অন্তর্দৃষ্টির প্রেরণা ও প্রাণাবেগের স্পর্শ লাগিয়াছে। অথচ অন্যদিক্ দিয়া যে সংযম-নিয়ম, রীতি-নীতি, আচার-নিষ্ঠার উপর প্রচলিত দৈনন্দিন আচরণের হিন্দুধর্ম দাঁড়াইয়া আছে, সেই সংযম-নিয়ম আচার-ব্যবহারের বহিরাবরণের ভিত্তি একমুহূর্তে তিনি টানিয়া ফেলিয়া দিতে সহায়তা করিয়াছেন গোরার শেষ পরিণতির মধ্য দিয়া। কথাটা দাঁড়াইতেছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ গোরার মুখ দিয়া, তাহার জীবনাচরণের ভিতর দিয়া যে-হিন্দু আদর্শের আকৃতি গড়িয়া তুলিয়াছেন, যে-আদর্শের পাদমূলে গোরা পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়াছে, সেই আদর্শ অনেকটা রোমান্সধর্মী, অনেকটা ভাবাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত, যে-ভাবাদর্শের পরিচয় "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে, সমসাময়িক প্রবন্ধে সুস্পষ্ট। "গোরা"-

গ্রন্থেও এই ভাবাদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়।

"গোরা"র সমাজ-চেতনার পরিচয়ের প্রতি ইঙ্গিত ইতিমধ্যে অনেকবারই করিয়াছি। এই উপন্যাসে যে-বাস্তবনিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায় তাহা এই সমাজ-চেতনার উপরই প্রতিষ্ঠিত। গোরাকে শ্রেণীভ্রষ্ট করার প্রয়াসে এই চেতনার সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, গোরা ও সুচরিতার, বিনয় ও ললিতার বিবাহ-ব্যাপার লইয়া সংস্কারগত আচারপদ্ধতি ও স্ত্রী-পুরুষের যৌন-ব্যক্তিত্ববোধের মধ্যে যে বিরোধ স্বপ্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে তাহাও বাঙলা দেশের সমসাময়িক সমাজ-চেতনার পরিচায়ক। ইহারা চারিজনই যে এই বিরোধ কাটাইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যেও রবীন্দ্র-মানসের প্রগতি-ধর্ম লক্ষ্য করা যায়। গোরা যে দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে দেশের সংস্কৃতিগত ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর নিজের জীবন-দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছিল, সে-সম্বন্ধ যে অলীক ও মিথ্যা কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা উদ্ঘাটন করিয়াও লেখক প্রগতি-সম্পন্ন মনন-ভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গ-ধর্মের দৃঢ়তাদানের প্রয়াস গোরার জীবনের অন্যান্য কর্মকৃতির মধ্যেও সুস্পষ্ট। সে যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পায়ে হাঁটিয়া দেশের পরিচয় লইতে বাহির হইয়াছিল, গ্রামে গিয়া গ্রামের লোকদের ভাল করিয়া জানিয়া বুঝিয়া ভালবাসিয়া তাহাদের সঙ্গে একটা সহজ সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল, এ সমস্তই দেশপ্রীতি ও স্বদেশ-সেবার দিক্ হইতে কতকটা রোমাণ্টিক ভাব-কল্পনার প্রকাশ হইলেও গোরাচরিত্রকে বাস্তবজীবনের ধর্মানুগত করিবার একটা সজাগ চেষ্টা যে ইহার মধ্যে আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? "গোরা"র ঘটনা-সংস্থানে শিথিল গ্রন্থি যে নাই, তাহা নয়। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। বিনয় ও ললিতার বিবাহ কি রীতি ও পদ্ধতিতে হইতে পারে ইহা লইয়া যুক্তিতর্কজাল প্রায় তিন অধ্যায় জুড়িয়া বিস্তৃত, অথচ এই সুদীর্ঘ পল্লবিত যুক্তিতর্কজাল না বিনয় না ললিতা না আর কাহারও চরিত্রের উপর নূতন কোনও আলোকপাত করে, নূতন কোনও বিকাশ বা পরিণতির কোনও আভাস দেয়। সমস্যা মীমাংসার দিক্ হইতে তাহার যৌক্তিকতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উপন্যাসের কলাকৌশল বা চরিত্রবিকাশের দিক্ হইতে তাহার কোনই সার্থকতা

নাই। এই ধরণের শিথিল গ্রন্থির দৃষ্টান্ত আরও দু'একটি দেওয়া যায়। ইহার কারণ অনুমান করা খুব কঠিন নয়। "গোরা"-রচনার সমসাময়িক কালে বাঙ্‌লা দেশে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ও ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে হিন্দুসমাজের সঙ্গে ধর্ম ও সমাজাদর্শ লইয়া, ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠান লইয়া উদ্দীপ্ত তর্কবিতর্ক শিক্ষিত সমাজকে আলোড়িত করিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ব্রাহ্ম বনাম বৃহত্তর অর্থে হিন্দু সমস্যা লইয়াও বাক্‌-বিতণ্ডা চলিতেছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ তাহাতে খুব বড় একটা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; "গোরা"য় তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাক্‌-বিতণ্ডার, যুক্তি তর্কজালের সার্থকতা ততখানিই যতখানি চরিত্রবিকাশ বা ঘটনার অন্তর্নিহিত অর্থোদ্ঘাটনের জন্য প্রয়োজন। "গোরা"য় দুই তিনটি স্থানে মাত্র যুক্তিতর্কজাল এই প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। একান্ত নিকটবর্তী কাল বলিয়া ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব সমস্যাকে দেখিবার সুযোগ হয়ত লেখকের হয় নাই; সেই কারণেও হয়ত ইহারা অপ্রয়োজনে এতখানি জায়গা জুড়িয়া আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন, এই ধরণের শিথিলতার দৃষ্টান্ত "গোরা"র মত বৃহৎ গ্রন্থে দুই একটির বেশী নাই।

এই সমস্ত ছোটখাট দুই চারিটি ত্রুটি সত্ত্বেও "গোরা"-উপন্যাস বাঙ্‌লা-সাহিত্যে অতুলনীয়। যে সুবৃহৎ ভাবকল্পনার মধ্যে "গোরা"র সৃষ্টি সে ভাবকল্পনার প্রসার বাঙ্‌লা উপন্যাসে আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের সংকীর্ণ দীনচেতন জীবনধারা অবলম্বন করিয়া "গোরা" বাঙলা-সাহিত্যে যে প্রবাহের সঞ্চার করিয়াছিল তাহাতে নূতন গতিবেগ আজও দেখা দিল না। "গোরা" বাঙলা উপন্যাসে জীবনের যে সমগ্র রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, সেই সমগ্রতার দৃষ্টি আজ পর্যন্ত বাঙ্‌লা উপন্যাসে দ্বিতীয়বার আত্মপ্রকাশ করিল না।

(৫)

যে সমগ্র-দৃষ্টি ও জীবন-দর্শনের সমগ্রতার কথা বলিয়া "গোরা"-আলোচনা শেষ করিয়াছি, সেই সমগ্র-দৃষ্টি "গোরা"-পরবর্তী রবীন্দ্রোপন্যাসে অনুপস্থিত। "গোরা"-রচনার পাঁচ বৎসর পর "চতুরঙ্গ" এবং ছয় বৎসর পর

"ঘরে বাইরে" রচিত হয়। এই দুইখানি গ্রন্থ হইতেই রবীন্দ্রোপন্যাসের তৃতীয় পর্বের সূচনা, এবং এ-পর্ব কতকটা একান্ত সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাব-কল্পনায়, ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গিতে, বিষয়-বিন্যাসে, সর্বোপরি, জীবন-সমালোচনায় এই পর্বের রচনাগুলি পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলি হইতে একেবারেই পৃথক। এ-কথা উপন্যাসগুলি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আরও পরিষ্কার হইবে, কিন্তু এখানেই সাধারণ ভাবে দুই চারিটি কথা বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বাবু * এই পার্থক্যের বিশ্লেষণ সবিস্তারেই করিয়াছেন, এবং এ-বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমি একমত বলিয়া ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই নিরস্ত হইব।

"গোরা" ও "গোরা"-পূর্ববর্তী বাঙ্‌লা উপন্যাসে তথ্য ও ঘটনা-বিন্যাসের পৌর্বাপর্য এমন ভাবে সজ্জিত, এবং উপন্যাসোক্ত চরিত্রবিকাশের স্তরগুলি এমন ভাবে গ্রথিত হইয়াছে যে পাঠকের মনে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও চরিত্রগুলি একটা অখণ্ড সমগ্ররূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠে। সকল ঘটনা, সকল চরিত্রের আমৃত্যু সকল তথ্যই উপন্যাসে কথিত হয় না, কিন্তু যতটুকু হয় তাহাতেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু অথবা চরিত্রগুলির একটা সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস রূপ আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে; আংশিক বা খণ্ডিত বর্ণনার মধ্যেই জীবনের সমগ্র রূপ প্রতিফলিত হয়। উপন্যাসের বৃহত্তর ঐক্য জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশকে একত্রে গাঁথিয়া একটা পরিপূর্ণ রূপ দান করে। "চোখের বালি" বা "গোরা" বা বঙ্কিমের যে কোনও সার্থক উপন্যাস হইতেই এ-কথার দৃষ্টান্ত অতি সহজেই আহরণ করা যায়। উপন্যাসের এই সমগ্রতার ধর্ম, বৃহত্তর ঐক্যের ধর্ম "গোরা"-পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে অনুপস্থিত।

দ্বিতীয়তঃ, "গোরা" ও "গোরা"-পূর্ববর্তী বাঙ্‌লা-উপন্যাসে চরিত্রবিকাশ আমাদের বোধ ও বুদ্ধির গোচর হয় বিস্তারিত ঘটনা ও মনোবিশ্লেষণের ভিতর দিয়া। এই পর্বের উপন্যাসগুলিতে এই দুইই, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; তথ্য সন্নিবেশ বিরল এবং যতটুকু আছে তাহাও অসম্পূর্ণ। মনোবিশ্লেষণও দীর্ঘায়ত নয় এবং তাহার বিভিন্ন স্তর সুস্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা হয় নাই। ঘটনা অথবা মনোবিশ্লেষণের সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা আপাতদৃষ্টিতে ধরাও পড়েনা; তাহার

* "বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা", ২৩০—২৩৩।

আবিষ্কার নির্ভর করে পাঠকের বুদ্ধি ও কল্পনার উপর। পাঠকের বুদ্ধি ও কল্পনা যদি শিথিল হয় তাহা হইলে অনেক ঘটনার মর্ম, অনেক চরিত্রের ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত তাহার বোধ ও অনুভূতি এড়াইয়া যাইতে বাধ্য। অনেক ঘটনার গ্রন্থি আপাতদৃষ্টিতে শিথিল ও আকস্মিক; এই শিথিলতা দৃঢ় হয় যদি বিভিন্ন ঘটনার যোগসূত্রটি আবিষ্কার করা যায়। তাহা কঠিন হইলেও অসম্ভব নয়, কারণ লেখক নিজেই তাহা সূক্ষ্ম সঙ্কেতে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। "চতুরঙ্গে"র আলোচনায় একথা স্পষ্ট হইবে। এই যে সূক্ষ্ম সঙ্কেতের আকস্মিক বিদ্যুদ্দীপ্তি, এই দীপ্তির সাহায্যেই মুহূর্তমধ্যে কোনও বিশেষ চরিত্র অথবা ঘটনার সমগ্র ইতিহাসটুকু পড়িয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। দামিনী বা কিটির সকল কথা ত উপন্যাসে বলা নাই, কিন্তু দু'টি একটি স্থানে স্বল্প কথায় চকিত ঘটনার উপর যে ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত বিদ্যুচ্চমকের মত দীপ্তি পাইয়াছে, সে-ইঙ্গিত যাহার চোখ এড়াইয়া যাইবে সে কিছুতেই দামিনী অথবা কিটিকে বুঝিবে না। সেইজন্য, ঈষন্মুক্ত সঙ্কেত, ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতই এই পর্বের উপন্যাসগুলির ধর্ম।

যে-ধর্মের কথা এইমাত্র বলিলাম তাহা কবির ধর্ম। বস্তুতঃ, কবি-কল্পনার ঐশ্বর্যই এই পর্বের উপন্যাসগুলিকে ইহাদের সাহিত্য-মূল্য দান করিয়াছে। এই কবি-কল্পনার সন্ধানী আলোই এক একটি তথ্য ও চরিত্রের মর্মোদ্ঘাটন করে। শুধু যে বর্ণনা বা ভাষার ব্যঞ্জনার মধ্যেই এই কবি-ধর্ম ব্যক্ত তাহা নয়, এই কবিধর্মের দীপ্তিই উপন্যাসগত বিরলতথ্য ও সূক্ষ্ম-রহস্যময় চরিত্রগুলিকে আলোকিত করিয়া আমাদের বোধ ও বুদ্ধির গোচর করে। এই কবি-কল্পনার দীপ্তি ও ঐশ্বর্যই উপন্যাসগুলির প্রধান আকর্ষণ।

এই পর্বের উপন্যাসগুলি বুদ্ধি-প্রধান। ইহাদের রস ও রহস্য প্রধানতঃ বুদ্ধিগম্য। তথ্য-সন্নিবেশই হউক আর চরিত্রই হউক, সমস্তই বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে হয়। ভাষা এবং বর্ণনা-ভঙ্গিও বুদ্ধিদীপ্ত। যে-সমস্ত পরিবেশ-সৃষ্টি আবেগ-প্রধান হওয়ার সুযোগ ছিল সেগুলিও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতর অস্ত্রে বিশ্লেষিত; হৃদয়বৃত্তির আবেগলীলাই যে-বস্তু-পরিবেশ বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সেই পরিবেশ ও চরিত্রও শুষ্ক বুদ্ধির খরতাপে শাণিত ও উত্তপ্ত। ভাবাবেগের মোহকুয়াসা যেন বুদ্ধির প্রখর আলোকে শুকাইয়া উবিয়া গিয়াছে। এই

একান্ত বুদ্ধি-প্রাধান্যের সঙ্গে কবি-কল্পনার এক অভিনব সমন্বয় এই উপন্যাস-গুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই পর্বের উপন্যাসগুলির ভাষা এবং বর্ণনা-ভঙ্গিও লক্ষ্য করিবার। দৃঢ় অথচ হ্রস্ব ও সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত ভাষা epigramএর গভীর ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত অন্তরে ধারণ করিয়া বুদ্ধির প্রখর দীপ্তি ও উত্তাপের সঙ্গে সমান তালে পদক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে। শ্রীকুমার বাবু বলিতেছেন,

> "Meredith-এর উপন্যাসের মত রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাসে একপ্রকার তীক্ষ্ণ কঠিন বুদ্ধির চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য (intellectual brilliance), দ্রুত অবসরবিহীন সংক্ষিপ্ততার মধ্যে গভীর অর্থ-গৌরবের দ্যোতন (epigram) আমাদিগকে পাতায় পাতায় চমৎকৃত ও অভিভূত করে। এইরূপ সংক্ষিপ্ত অর্থগৌরবপূর্ণ উক্তি প্রত্যেক উপন্যাস হইতেই প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কল্পনাময় ভাব-বিভোরতার ও ক্ষুরধার বুদ্ধির শাণিত চাকচিক্য—উভয় ধারাই পাশাপাশি বিদ্যমান। লেখকের বর্ণনাভঙ্গিও এই বুদ্ধিবৃত্তির অতিরেকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে—কতকগুলি অধ্যায় যেন প্রথম বর্ণনা বলিয়া মনে হয় না, ঈষৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত, epigram-সমাকীর্ণ কোন পূর্বতন বর্ণনার সংক্ষিপ্ত সার-সঙ্কলন বলিয়াই বোধ হয়। * * * লেখকের বর্ণনা যেন আখ্যায়িকার সমতল ভূমি ত্যাগ করিয়া epigram-এর উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিয়াছে। * * * উপন্যাসের প্রত্যেক চরিত্রটিরই কথাবার্তা ঠিক একই সুরে বাঁধা, সকলেই epigram-এর ধনুকে টঙ্কার দিতেছে, কেহই ঠিক সরল স্বাভাবিক ভাষায় নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে রাজী নয়। * * * চরিত্রানুযায়ী ভাষার পার্থক্য রক্ষার চেষ্টা কোথাও দেখা যায় না এবং এই সুরের অভিন্নতা নাটকীয় সুসঙ্গতির প্রবল অন্তরায়-স্বরূপ হইয়াছে। এই হ্রস্ব, বাহুল্য-বর্জিত ভাষাই উপন্যাসগুলির গতিবেগ প্রচণ্ডরূপে বাড়াইয়া দিয়াছে, কোথাও রহিয়া সহিয়া রসোপভোগের অবসর নাই। কেবল স্থানে স্থানে প্রেমের মুগ্ধ বিহ্বলতা বা ধ্যানময় আত্ম-বিস্মৃতির বর্ণনাতে লেখক নিজ প্রচণ্ড গতিবেগের পায়ে কবি-কল্পনা ও ভাব-গভীরতার স্বর্ণশৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত সর্বত্রই উদ্দাম ঝড়ের হাওয়ার মত একটা নিঃশ্বাসহীন চঞ্চলতা উপন্যাসগুলিকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। * * *"
> "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা", ২৩২-৩৩।

শ্রীকুমারবাবুর এই বিশ্লেষণ ত আমার সত্য বলিয়াই মনে হয়।

(৬)

"চতুরঙ্গ" (১৩২১)

"ঘরে বাইরে" (১৩২২)

"গোরা"-রচনার প্রায় ছয় বৎসর পর ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন এই চারি মাসে চারিটি গল্প পৃথক পৃথক ভাবে "সবুজ পত্রে" প্রকাশিত হয়; গল্পগুলির নাম ছিল 'জ্যাঠামশায়', 'শচীশ' 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস'। দ্বিতীয় গল্পটি বাহির হইবার মাত্রই বুঝা গেল, ইহারা পৃথক পৃথক গল্প নয়, একটি সুবৃহৎ গল্পের বিভিন্ন অধ্যায় মাত্র। পরে যখন "চতুরঙ্গ" নাম লইয়া গল্প চারিটি একসঙ্গে গ্রন্থাকারে গ্রথিত হইল তখন একথা আরও পরিষ্কার হইল, তখন ভাল করিয়া বুঝা গেল, ভিতরের একটি ঐক্যসূত্রে গল্পগুলি গাঁথা।

"চতুরঙ্গ" লইয়া বাঙ্গালী সাহিত্যিক মহলে একেবারে উল্টা রকমের মতামত শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে "চতুরঙ্গ" শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আবার কাহারও কাহারও মতে 'রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাস-সমূহের মধ্যে "চতুরঙ্গ" সর্বাপেক্ষা কাঁচা ও আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত (fragmentary)।* শেষের মত্‌টি শ্রীকুমার বাবুর; তিনি বলেন "সমস্ত বিষয়ের আলোচনা অপূর্ণ", "শচীশ ও দামিনীর দ্রুত পরিবর্তনগুলি যেন অনেকটা নিয়মহীন উদ্দাম খেয়ালেরই অনুবর্তন করিতেছে বলিয়া মনে হয়। যেন একটা পাগলা হাওয়া যদৃচ্ছাক্রমে চরিত্রগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও তাহাদের পরস্পর সম্পর্কটিকে অস্থির পরিবর্তনের ঘূর্ণাবর্তে সর্বদা বিবর্তিত করিতেছে। উদ্দেশ্য-গভীরতার অভাব সর্বত্রই পরিস্ফুট।"

এই পর্বের উপন্যাসগুলির আলোচনার গোড়াতেই আমি বলিয়াছি, এবং সকলেই তাহা জানেন যে "চতুরঙ্গ" অথবা "শেষের কবিতা" জাতীয় উপন্যাসগুলি প্রধানতঃ বুদ্ধিগম্য, ইহার রসোপলব্ধি বুদ্ধিসাধ্য; সহজ সংস্কার হইতে অথবা ভাবাবেগ হইতে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উৎসারিত হয়, সে-আনন্দ আহরণ এই উপন্যাসগুলি হইতে আশা করা অন্যায়; লেখক তাহা চাহেন নাই, চাহিলে

* "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা", ২৩৪ পৃ।

দামিনীর মৃত্যুর করুণ রসবস্তুটিকেও তিনি শুষ্ক আবেগের তাপে উত্তপ্ত করিয়া দু'টি মাত্র কথায় ব্যক্ত করিতেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন, বুদ্ধির দীপ্তি দিয়াই পাঠক শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাসকে বুঝিতে চেষ্টা করুক। এমন কি পরোক্ষে তিনি দামিনীকে দিয়া এবং স্বাভাবিক উপায়ে বিশিষ্ট একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া লীলানন্দ স্বামী ও শচীশের একান্ত ভাবমুগ্ধ রসাবেশের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ কটাক্ষই করিয়াছেন। সেইজন্য "চতুরঙ্গে"র প্রত্যেকটি পরিবেশ, প্রত্যেকটি চরিত্র বুঝিতে হইলে জাগ্রত বুদ্ধির আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় নাই; বস্তুধর্মের সঙ্গে সুনিবিড় পরিচয় ছাড়া "চতুরঙ্গের" রসোপলব্ধি সম্ভব নয়। শ্রীবিলাস যে-দৃষ্টি, যে মনন-ভঙ্গি লইয়া শচীশ ও দামিনীকে জানিয়াছে, বুঝিয়াছে, পাইয়াছে, সেই দৃষ্টি, সেই মনন-ভঙ্গিই "চতুরঙ্গে"র রহস্য-কুঞ্চিকা। প্রভাত বাবু শ্রীবিলাসকে বলিয়াছেন 'বেচারী'। শ্রীবিলাস 'বেচারী' নয়! "চতুরঙ্গে"র একপ্রান্তে চিত্ত-শক্তিতে দৃঢ় জগমোহন, আর এক প্রান্তে বুদ্ধিতে ও বস্তুধর্মে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবিলাস। শ্রীবিলাস জগমোহনের শিষ্যত্ব করিয়াছে, শচীশের সাকরেদী করিয়াছে, লীলানন্দ স্বামীর দলে ভিড়িয়া প্রাণপণে কীর্তন করিয়াছে, দামিনীর ফরমায়েস খাটিয়াছে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তাহার দৃষ্টি মতাবিষ্ট বা মোহাবিষ্ট হয় নাই। 'কোনো রাঙা চেলির ঘোম্‌টার নীচে সাহানা রাগিণীর তানে' সে দামিনীকে বিবাহ করে নাই। 'দিনের আলোতে সব দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া বুঝিয়াই' সে একাজ করিয়াছিল। সকল বস্তুর সঙ্গে একান্ত-ভাবে জড়িত থাকিয়াও সে যে-ভাবে তাহার দৃষ্টি স্বচ্ছ ও বুদ্ধি মোহমুক্ত রাখিয়াছে, লেখকও পাঠকের কাছে এই স্বচ্ছ দৃষ্টি ও মোহমুক্ত বুদ্ধির দাবী করিয়াছেন।

গল্প-বস্তুর সমস্ত বিষয়গুলির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থে নাই একথা সত্য, কিন্তু, থাকিতেই হইবে এও ত একটা সংস্কার মাত্র। পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নাই, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ বোধ ও রসোপলব্ধির ইঙ্গিত লেখক রাখিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধি ও কল্পনা দিয়া তাহা স্ফুটতর ও স্পষ্টতর করিয়া লওয়া কঠিন নয়। পাঠকের কাছে এইটুকু দাবী করা কিছু অসঙ্গতও নয়।

"চতুরঙ্গে"র প্রথম অধ্যায়টি যাঁহারা ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে জ্যোঠামশাই ব্যক্তিটি উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের লোক; নাস্তিক, পজিটিভিষ্ট, এবং নাস্তিক বলিয়াই চিত্তশক্তিতে দৃঢ়, হিউম্যানিষ্ট

বলিয়াই হিন্দুসমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহারে অবিশ্বাসী। যতদিন জ্যেঠামশাই ছিলেন ততদিন তাঁহার ধর্ম ও বিশ্বাসই ছিল শচীশের আশ্রয়; জ্যেঠামশায়ের চিত্তবলই তাহারও চিত্তবল। সে যে ননীবালাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল তাহা কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায়, লোকহিতের প্রেরণায়, জানিয়া বুঝিয়া নিজের চিত্তবলের উপর নির্ভর করিয়া নয়। বস্তুতঃ জ্যেঠামশায়ের শিষ্যত্ব করিয়াও সে নিজের প্রতিষ্ঠা-ভূমি কিছু পায় নাই, আত্ম-সত্তার পরিচয় পায় নাই। সেইজন্যই জ্যেঠামশায় যখন বিদায় লইলেন তখন লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব লইয়া 'খাওয়া ছোঁওয়া স্নান তর্পণ যোগযাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে' সে বাকী রাখিল না। যে ছিল নাস্তিক, জাত ধর্ম যে কিছুতেই মানিত না সে একেবারে রসচর্চার রসাতলে ডুবিয়া গেল। উনবিংশ শতকের শেষপাদে ও বিংশ শতকের গোড়ায় ইহাই ছিল নাস্তিক্যের পরিণতি; যুক্তিবাদের উত্তুঙ্গ শিখরে যাহারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,নিছক বুদ্ধি ও যুক্তি যখন তাহাদের আর রক্ষা করিতে পারিল না, তখন তাঁহারাই সমস্ত যুক্তি বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়া ভাবের আসমানে মনটাকে বুঁদ করিয়া দিয়া একেবারে নিরবচ্ছিন্ন রসসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, চোখ মেলিয়া দেখিতে পর্যন্ত চাহিলেন না। লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে এই রকম যখন শচীনের অবস্থা তখন একদিন 'কি একটা কারণে অসময়ে তা'র শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাঠের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দামিনী তা'র চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া কর, দয়া কর, আমাকে মারিয়া ফেল!' এই দামিনী "মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবন রসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মত লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলি ভরপুর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।" সেই দামিনী ভালবাসিয়া সমুদ্রতীর-শায়ী গুহার মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে শচীশের পায়ে নিজকে লুটাইতে গিয়াছিল। জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক চেতনায় হোক অচৈতন্যে হউক শচীশ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। গুহা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুরাতন ভাববাষ্পাচ্ছন্ন জীবন যখন আরম্ভ হইল তখন ধীরে ধীরে শচীশের মধ্যে আলোড়ন দেখা দিল; 'জপে তপে অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই,

কিন্তু চোখ দেখিলে, বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তা'র পা টলিতেছে।' দামিনীর প্রতি আকর্ষণ অনিবার্য হইয়া উঠিল, এবং শেষ পর্যন্ত সে বলিতে বাধ্য হইল, 'আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, এমন করিয়া তফাৎ হইয়া থাকিয়ো না।' দামিনী ক্রমশঃ তাহার জীবনে সত্য হইয়া উঠিল, ভিতরে ভিতরে একটি তুমুল অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল, কিন্তু ঠিক এই সময়ে ভাববিহ্বলতার রঙীন ফানুস এক শিষ্যের স্ত্রীর আত্মহত্যা উপলক্ষ করিয়া ফাটিয়া ধূলায় লুটাইল। কিন্তু তাহাতে শচীশের সমস্যা মিটিল না, তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়িয়াই চলিল, হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে চিত্তের গভীরতর সত্তার একটি সংগ্রাম নিরন্তর তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল; দামিনী ত রূপ, সেই রূপতৃষ্ণা তাহার আছে, কিন্তু তাহার গভীরতর সত্তা অরূপের মধ্যে ডুব মারিবার জন্য ব্যগ্র। শেষ পর্যন্ত সে তাহাই করিল; এক ঝড়ের রাত্রে প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে উদ্বেলিত বিপর্যস্ত দামিনীকে সে বলিল, "যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড় দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া কর, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।" শচীশের জীবনের মূল ধরিয়া নাড়িয়া দিয়াছিলেন জ্যোঠামশায়, তারপর সে আর কোথাও মূল প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই, কেবলই এক কক্ষ হইতে আর এক কক্ষে ঘুরিয়া মরিয়াছে, কেবলই ভাবদ্বন্দ্বে দোল খাইয়াছে। 'একদিন সে বুদ্ধির উপর ভর করিয়া দেখিল, সেখানে জীবনের সব ভার সয় না; আর একদিন রসের উপর ভর করিয়া সে দেখিল, সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই।' আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে যে আশ্রয় সে পাইল, সেখানে দামিনীর কোনও স্থান নাই। শচীশ সেখানে 'আলেয়ার আলো নয়, সে-যে আগুন।' সে তখন জ্বলিতেছে; 'তা'র জীবনটা একদিক হইতে আর একদিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া' উঠিয়াছে।

দামিনীর জীবন আমাদের সম্মুখে যখন উন্মুক্ত হইল তখন সে ভক্তির দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী নারী। কিন্তু লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে শচীশের অভ্যুদয়ের কিছুদিনের মধ্যেই অঘটন ঘটিতে আরম্ভ হইল। শচীশের দিকে সে সবলে আকৃষ্ট হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাহিরের "বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা কোন্ ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল।* * * এমনি করিয়া দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে শচীশ তা'র শোভা দেখিতে লাগিল।" কিন্তু শচীশ 'কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে

দেখিল না'। দামিনীর প্রেম শচীশের স্বীকৃতিলাভ করিল না; সেই দামিনী শচীশের কাছে প্রথম প্রত্যাখ্যাত হইল গুহাভ্যন্তরে। প্রত্যাখ্যাতা দামিনী আবার বিদ্রোহিনী হইল, ভক্তির দস্যুবৃত্তির মধ্যে সে কিছুতেই ধরা দিবে না। কিন্তু ধরা দিবেনা স্থির করিলেই ত হয়না। একবার যে সে ধরা দিয়াছিল সে ত শচীশের টানে; সে-টান ত তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। অথচ প্রকাণ্ড আনুগত্যটা শ্রীবিলাসের প্রতিই বেশী, সেজন্ত শচীশের মনে একটু ঈর্ষ্যাবোধও আছে। অনেক ভাবিয়া নিজের সঙ্গে অনেক যুঝিয়া শচীশ দামিনীকে নিজেদের ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গতার মধ্যে আহ্বান করিল। দামিনী ভাবিল, শচীশকে পাইবার পথ বুঝি উন্মুক্ত হইল; ভাবিল,শচীশের পথানুবর্তিনী হইয়া বুঝি সে তাহাকে পাইবে। দামিনী আবার গলিল। কিন্তু গলিলে হইবে কি? আত্ম-সংগ্রামে পীড়িত হইয়াও শচীশ শেষ পর্য্যন্ত গলিল না এবং অবশেষে দামিনীকে চিরতরে সে বিদায় দিল! দামিনী বিদায় লইল, কিন্তু বিদায় লইবার আগে কথায় ও কর্মে শচীশকে, শ্রীবিলাসকে, এবং "চতুরঙ্গে"র পাঠককেও বুঝাইয়া দিয়া গেল যে তাহার সমস্ত হৃদয় ও মন শচীশের; শচীশকেই নিঃশেষে সে তাহার সমস্ত সভক্তি প্রেম, সমুদ্ধ ভালবাসা অর্পণ করিয়াছে। বিদায় লইবার পর এবং শ্রীবিলাসের সঙ্গে বিবাহ হইবার পরও সে শচীশকে ভুলিতে পারে নাই, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, গভীর শ্রদ্ধায় ও প্রেমে সে বারবার তাহাকে স্মরণ করিয়াছে। দামিনী যেদিন শচীশের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতা চলিয়া আসে, তখন পথে শ্রীবিলাস শচীশকে উদ্দেশ্য করিয়া কিছু কড়া কথা বলিয়াছিল। উত্তরে দামিনী রাগ করিয়া বলিয়াছিল, "দেখ, তুমি তাঁর সম্বন্ধে আমার সামনে অমন কথা বলিয়োনা। তিনি আমায় কি-বাঁচান বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কি জান! তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও—আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সে দিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল, তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে।" তারপরে দামিনীই আব্দার করিয়া শচীশকে লইয়া আসিল শ্রীবিলাসের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিবার জন্য; এবং এক বৎসর পরে মৃত্যু-শয্যায় যখন সেই পুরাতন বুকের ব্যথা, সেই অন্ধকার গুহায় শচীশের পায়ের লাথি লাগিয়া যে-ব্যথার সৃষ্টি সেই ব্যথা "যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য্য, এ আমার

পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য ?"

কিন্তু শ্রীবিলাস শচীশও নয়, দামিনীও নয়। শচীশকে অবলম্বন করিয়া সে জ্যেঠামশায়ের শিষ্যত্ব লইয়াছিল, এবং পরেও শচীশকে উদ্ধার করিতেই সে লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে আসিয়া জুটিয়াছিল, শচীশের টানেই সে দলের স্রোতে ভিড়িয়াও গিয়াছিল। কিন্তু শ্রীবিলাস কখনও ত "ভেদজ্ঞান-বিলুপ্ত একাকারতা বন্যার একটা ঢেউ মাত্র হইতে" চাহে নাই। এই রসসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যখানে বসিয়া সে এক-একদিন ভাবিয়াছে, এ রসের তরঙ্গ তাহার সহিবে না, ছুটিয়া সে পালাইবে। সেই আশ্রম হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে শেষ পর্যন্ত সে শচীশ-দামিনীর সমস্ত লীলাটা চোখের উপর দেখিয়াছে। আগা-গোড়াই সে ইহাদের সঙ্গে জড়িত ; তিনজনের মধ্যে সে একজন, কিন্তু দামিনীর কাছে বরাবরই সে ছিল নিতান্তই গৌণ। অথচ শ্রীবিলাসের হৃদয়ে দামিনীর উত্তাপ যে লাগিয়াছিল তাহার প্রমাণ ত তাহার বচনে ও কর্মে সুস্পষ্ট ; দামিনীও যে তাহার খবর রাখিত না তাহা নয় ; কিন্তু শচীশ তাহাকে শেষ বিদায় দিবার আগে পর্যন্ত 'সে খবরটা তাহার কাছে দরকারী খবর ছিল না'। এতদিন 'শ্রীবিলাস যে একটা কিছু, দামিনী সে কথা লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই, বোধ করি আর কোনও দিক্ হইতে তাহার চোখে বেশী আলো পড়িয়াছিল'। এইবার শচীশের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চুকিয়া যাওয়ার পর শ্রীবিলাস যখন তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল, তখন 'দামিনী যেন শ্রীবিলাসকে প্রথম দেখিল'।

এই ত অতি সংক্ষেপে শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের পরিচয়। এই পরিচয়ের মধ্যে শচীশ ও দামিনীর যে পরিবর্তন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহা কি খুব দ্রুত ? এই পরিবর্তনের প্রত্যেকটি স্তরই লেখক আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন,তবে এই উদ্ঘাটনের বর্ণনা খুব সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কেতময় বলিয়া পরিবর্তনটাই দ্রুত বলিয়া মনে হয়। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিদ্রোহিনী দামিনীকে লীলানন্দ স্বামী কিছুতেই বাগ মানাইতে পারিতেছিলেন না, সেই অবস্থার মধ্যে আশ্রমে শচীশের আবির্ভাব হইল, এবং তারপরেই কি করিয়া দেখিতে দেখিতে দামিনীর এক অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়া গেল, কি করিয়া সে তাহার পাথরের দেবতা শচীশের হাত হইতে মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করিল,

ইহার সমস্ত ইতিহাসটি বর্ণিত হইয়াছে মাত্র কয়েকটি লাইনে। ইহার পশ্চাতে সুবিস্তৃত অলিখিত ইতিহাস ইঙ্গিতে শুধু ব্যক্ত হইয়াছে। "অঘটন ঘটিতে সুরু হইল। আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না, লেখাও কঠিন।" সত্যই ত, আর লিখিয়া কি হইবে! সমস্ত কথা ত ঐখানেই বলা হইয়া গিয়াছে। ইহার পর দামিনী কি করিয়া স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিল তাহার আভাস দিয়াই লেখক খালাস। এই যে এতবড় পরিবর্তনটা হইল তাহা দ্রুত হয় নাই, দ্রুত সাঙ্কেতিক সংক্ষিপ্ততায় বলা হইয়াছে মাত্র। আর এই পরিবর্তনগুলি 'নিয়মহীন উদ্দাম খেয়ালের অনুবর্তন', তাহাই বা কি করিয়া বলি? শচীশের যে-পরিবর্তন আমরা দেখিলাম তাহা কি নিয়মহীন উদ্দাম খেয়াল; সে যে এক স্তর হইতে আর এক স্তরে বিবর্তিত হইয়াছে তাহা খুব সঙ্গত ও স্বাভাবিক কারণেই। জন্ম-সংস্কারে সে যে খুঁটিতে বাঁধা ছিল, জগমোহন তাহাকে সেখান হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন; বুদ্ধির উপর ভর করিতে গিয়া সেখানে সে দাঁড়াইতে পারে নাই, রসের পালে হাওয়া লাগাইয়া পারে পৌঁছিতে সে পারে নাই, তখন সে যে-পথে নিজের মুক্তি পাইল সে-পথ তোমার আমার পথ নয়। এই যে এক খুঁটি হইতে আর এক খুঁটিতে গিয়া বাঁধা পড়া, এবং শেষ পর্যন্ত রূপ-সাধনা ছাড়িয়া অরূপ সাগরে ডুবিয়া যাওয়া, ইহা ত উদ্দাম খেয়াল নয়, ইহা আত্মানুসন্ধান। দামিনীর সঙ্গে তাহার যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলা তাহাকেও খেয়াল বলিলে অন্যায় বলা হইবে। দামিনীর শোভা সে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছে, সে ত দামিনীকে দেখে নাই, কিন্তু তারপর সে যখন বুঝিল দামিনীর রূপের নেশায় পা তাহার টলিতেছে, তখন হইতেই আরম্ভ হইল দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, একবার নিকটে আসিয়াছে, একবার দূরে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু অবশেষে সে জয়ী হইয়াছে। ইহার পরে ও কি করিয়া বলি, শচীশ-চরিত্রে উদ্দেশ্য-গভীরতার অভাব? ইহার পরেও কি করিয়া বলি শচীশ চরিত্র-বিকাশে কার্যকরণ-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই?

দামিনীর চরিত্র সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। দামিনী যে স্থির সৌদামিনী হইয়া আত্মোৎসর্গের শিশিরভরা মুখটি উপরের দিকে তুলিয়া ধরিয়াছিল তাহা লীলানন্দ স্বামীর প্রতি ভক্তিতে বা রসসাধনার প্রতি শ্রদ্ধায় নয়, শচীশের প্রতি প্রেমে। তারপর আবার যে সে বিদ্রোহিনী হইল তাহা শচীশের প্রত্যাখ্যানে, এবং পরে আবার যে পাথর গলিল তাহাও শচীশের

আহ্বানে। শচীশই তাহার জীবনের কার্যকরণ-সম্বন্ধের মানদণ্ড, এবং দামিনীর আবর্তন বিবর্তন সেই মানদণ্ডেই বিচার্য। শচীশকে গভীরতর সত্তার মধ্যে লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হওয়াই দামিনীর একমাত্র ধ্যান, একমাত্র আদর্শ; শচীশ তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছিল একথা সত্য, কিন্তু তাহার ধ্যান ও আদর্শকে ততক্ষণ সে সত্য ও সার্থক করিয়া লইয়াছে। এবং তাহা করিয়াছে বলিয়াই শ্রীবিলাসের আহ্বানে পরে সে এত সহজে সাড়া দিতে পারিয়াছে।

আসল কথা "চতুরঙ্গ" বা "শেষের কবিতা" বিবরণধর্মী উপন্যাস নয়। নিছক রসসমৃদ্ধ বিবৃতির স্তরের উর্দ্ধে উঠিয়া লেখক বুদ্ধির স্তর হইতে ইঙ্গিতে সঙ্কেতে ব্যঞ্জনায় হ্রস্ব সূত্রাকারে ঘটনা ও চরিত্রের গতি পরিণতির আভাস মাত্র দিয়াছেন। যাহা ঘটিতে অনেক সময় লাগিয়াছে, অনেক খড়কাঠ পুড়িয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ কোথাও নাই; এখানে একটি সরল, ওখানে একটি বক্ররেখা দিয়া লেখক কর্তব্য শেষ করিয়াছেন, ইহার সঙ্গে একটু বুদ্ধি ও কল্পনা যোগ করিলেই চিত্রটি সম্পূর্ণ হইতে পারে। এই বুদ্ধি ও কল্পনাকে কোথায় কি ভাবে মুক্তি দিতে হইবে তাহারও ইঙ্গিত-সঙ্কেত রাখিয়া যাইতে লেখক কোথাও ভুলেন নাই। গুহা-দৃশ্যটি পাঠককে স্মরণ করিতে বলি। কি অপূর্ব পরিবেশ-সৃষ্টি! কি অভিনব সঙ্কেতময় ব্যঞ্জনাময় রহস্যের অবতারণা! সেই 'আদিম জন্তুটা'র ধর্ম, তাহার গভীর অর্থ, তাহার পশ্চাতের সুদীর্ঘ অলিখিত ইতিহাস কি সবিস্তার বর্ণনার, কার্যকারণ-সম্বন্ধ-বিশ্লেষণের আর কোনও অপেক্ষা রাখে! শচীশের সঙ্গে দামিনীর যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্বন্ধ তাহার সূক্ষ্ম মানসিক দ্বন্দ্বলীলাও লেখক সবিস্তারে বলেন নাই, কিন্তু প্রত্যেক ভাব-পরিবর্তনেই দু'একটি ভাবগর্ভ বুদ্ধিদীপ্ত সঙ্কেতময় সূত্রে যে-রহস্য-ইতিহাস ব্যক্ত করিয়াছেন, কার্যকারণ-সম্বন্ধের শৃঙ্খলা সেইখানে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এই ধরণের সূত্র কত যে এই নাতিদীর্ঘ গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তাহার হিসাব করা যায় না। ইহারা যে কবিকল্পনায় সমৃদ্ধ তাহাই নয়, ইহারা এক একটি বিদ্যুৎচ্চমক; যেখানেই ঘটনা ও চরিত্রগুলি চোখের আড়ালে চলা-ফেরা করে, সেখানেই ইহাদের ক্ষণিক দীপ্তি একমুহূর্তে সব কিছুকে আলোকিত করিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়া দেয়। অন্যমনস্ক হইলেই এই সব বিদ্যুচ্চমক পাঠককে এড়াইয়া যায়, তখন মনে হয় ঘটনাগুলি অসংলগ্ন, চরিত্রগুলি বাত্যাতাড়িত শুষ্কপত্রের ন্যায় উদ্দাম। বস্তুতঃ, তাহা নয়।

"চতুরঙ্গে"র কবিকল্পনার ঐশ্বর্যও লক্ষ্য করিবার। বুদ্ধিদীপ্ত সূত্রগুলির মধ্যে ত সে-পরিচয় আছেই, তাহা ছাড়া, নানা জায়গায়, নানা বর্ণনায়ও এই ঐশ্বর্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সর্বত্রই এই বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; দুই চারিটি বাক্য মাত্র তাহার সম্বল, অথচ এই সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যেই সমস্ত রহস্য, সমগ্র সত্যটি যেন ঘনীভূত হইয়া আছে। কয়েকটি মাত্র বাক্যে দামিনীর যে বর্ণনা, একটি মাত্র পৃষ্ঠায় নারীহৃদয়ের অতলরহস্যের যে আভাস, দু' তিনটি প্যারাগ্রাফে দামিনীর পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত, কিঞ্চিদধিক এক পৃষ্ঠায় নীলকুঠির ভগ্নাবশেষের যে বর্ণনা, দু'টি প্যারাগ্রাফে বালুচরের বর্ণনা, দু'টি মাত্র পৃষ্ঠায় শচীশের গভীরতর সত্তার নিষ্পলক-ধ্যানের যে ইঙ্গিত, ঝড়ের রাত্রের সেই বর্ণনা, দামিনীর স্পর্শে শ্রীবিলাসের অন্তরের নূতন আস্বাদনের বর্ণনা, এ সমস্ত কি ব্যর্থ যাইবার? এখানে এই সব বর্ণনা উদ্ধার করিলেই কি তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যাইবে? সে-চেষ্টা আর না-ই করিলাম।

তবু, "চতুরঙ্গ"কে আমি মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টি বলি না। ইহার বস্তুভূমির গভীরতা আছে, কিন্তু প্রসার নাই; মানবসংসারের বিচিত্র বহুমুখীন্ তরঙ্গ-লীলার সঙ্গে ইহার যোগ নাই। ইহার জীবন-দর্শন খণ্ডিত, জীবনের সমগ্রতার স্পর্শ এই উপন্যাসে লাগে নাই। কিন্তু "চতুরঙ্গ" সুন্দর ও সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি। ইহার বুদ্ধির দীপ্তি, রহস্যময় সঙ্কেত, ইহার হ্রস্ব, সূত্রায়িত বর্ণনাভঙ্গি, ইহার জ্ঞানগর্ভ ইঙ্গিতময় বিবৃতি, ইহার সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের ধারা, সর্বোপরি ইহার কবিকল্পনার ঐশ্বর্য ইহাকে যে বিশেষ এবং অভিনব সাহিত্যমূল্য দান করিয়াছে তাহার তুলনা "শেষের কবিতা" ছাড়া বাঙ্‌লা সাহিত্যে আর একটিও নাই।

"ঘরে-বাইরে" উপন্যাসটি ১৩২২ সালের বৈশাখ হইতে ফাল্গুনের "সবুজপত্রে" প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে "বলাকা"র কবিতা রচনা কিছু কিছু চলিতেছে, গদ্যে প্রবন্ধ, আলোচনা ইত্যাদিও প্রচুর লিখিতেছেন।

উপন্যাসটি শেষ হইবার পরে ত কথাই নাই, মাসিক কিস্তিতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাকে লইয়া বাদবিতণ্ডা আরম্ভ হইয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। এই বাদবিতণ্ডার অনেক কথাই সাহিত্যালোচনায় অবান্তর; তবে ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ লইয়া যে দু'একটি কথা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধার করা

যাইতে পারে। উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য লইয়া কথা উঠিয়াছিল; উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, হরিণের গায়ে যে দাগ আছে লোকের ধারণা সেই দাগচিহ্নের দ্বারা আলোছায়ার সঙ্গে সে বেমালুম মিশিয়া যাইতে পারে; কিন্তু এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হরিণ হয়ত কিছু জানে না। লেখক সম্বন্ধেও তাহাই। তবে,

> "যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়ত, আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। * * * লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে। * * * আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যেসব রেখাপাত করেছে, ঘরে-বাইরে গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়ছে। কিন্তু এই ছাপের কাজ শিল্পকাজ। এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়। * * * ঘরে-বাইরে গল্প যখন লেখা যাচ্ছে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের ভালো-মন্দ লাগাটাও বোনা হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই রঙীন সুতোগুলো শিল্পেরই উপকরণ। তাকে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় তবে সে উদ্দেশ্য লেখকের নয়, পাঠকের। * * *"
> "সবুজপত্র", অগ্রহায়ণ, ১৩২২, ৫২০—২২ পৃ।

"ঘরে-বাইরে" গ্রন্থের সামাজিক পটভূমি লক্ষ্যণীয়। "গোরা"-আলোচনাতেই আমি ইঙ্গিত করিয়াছি, বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বাঙলাদেশে যে-দেশাত্মবোধ মুক্তি-লাভ করিয়াছিল এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে-আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার তলদেশে মস্ত একটা ফাঁকি ছিল। উত্তেজনায় যখন ভাঁটা পড়িল তখন সেই ফাঁকির দিকটা ধরা পড়িয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের চোখে শুধু যে তাহা বিসদৃশ হইয়া দেখা দিল তাহাই নয়, তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদও করিলেন। দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে ক্রমশঃ তাঁহার নিজের চিন্তাধারায়ও একটা আমূল পরিবর্তন দেখা দিল; দেশধর্ম ও মানবতাধর্মে যে-বিরোধ একদিন দেখা দিল সে বিরোধে রবীন্দ্র-চিত্তে মানবতার ধর্মই হইল জয়ী, দেশধর্মের নামে কোনও সংকীর্ণতা, কোনও ক্ষুদ্র চিন্তা, নীচ কর্ম, কোনও মিথ্যাকেই তিনি আমল দিতে রাজী হইলেন না। দেশধর্মকে তিনি মানবতার ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলেন না; এই মানবতার ধর্মে পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিল।

বিংশ শতকের প্রথম পাদে কলিকাতায় এবং বাঙলার অন্যান্য সহরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষমতাসম্পন্ন এক উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই শ্রেণীর সামাজিক আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল পরিপূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও দেশোত্তর

মানবতা ধর্মকে অবলম্বন করিয়া। এই সামাজিক আদর্শ কতখানি শ্রেণী-স্বার্থপ্রণোদিত, কতখানি নয়, সে-প্রশ্ন উপন্যাসালোচনায় অবান্তর। এখানে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই আদর্শ ও সংকীর্ণ দেশাত্মবোধের সংকীর্ণতর প্রকাশের মধ্যে যে-বিরোধ বাঙলা দেশের নাগর-জীবনে একদিন দেখা দিয়াছিল এবং সেই বিরোধ উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর নর-নারীর দৈনন্দিন ব্যক্তি-জীবনে যে-আবর্ত ঘনাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাই "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসের উপজীব্য।

সন্দীপকে স্বদেশী আন্দোলনের মুখ্য প্রতিনিধিদের অন্যতম বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে, কিংবা এই আন্দোলনের যে-দিক্‌টা উপন্যাসে চিত্রিত হইয়াছে সেই দিক্‌টাকেই যদি আন্দোলনের সমগ্র প্রতিকৃতি বলিয়া ধারণা করা যায় তাহা হইলেও অন্যায় করা হইবে। সমস্ত বৃহৎ আন্দোলনেই যেমন, স্বদেশী আন্দোলনও তেমনই সন্দীপের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, বাক্‌সর্বস্ব অথচ স্থূল স্বার্থলোলুপ, মাংসল-স্বভাব-সম্পন্ন কতকগুলি লোককে সাধারণ জীবনের গোপনতা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার একটা সুযোগ দিয়াছিল; এবং সেই সুযোগ অবলম্বন করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহারা চরিতার্থও করিয়াছিল। তেমনই নিখিলেশকেও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়না। উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে সামাজিক আদর্শের কথা আগে বলিয়াছি সে-আদর্শ অনেকটা যে শ্রেণী-স্বার্থপ্রণোদিত একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু নিখিলেশের অবচেতন চিত্তেও সেই স্বার্থবোধ নাই। তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ উৎকট, এবং এই স্বাতন্ত্র্যবোধের আদর্শ বৃহত্তর মানবতার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ জীবনে মূর্ত করিবার জন্য সে নিজের স্ত্রী বিমলাকে লইয়া পরীক্ষা করিতেও দ্বিধা করে নাই, এবং তাহার জন্য যে দুঃখ ভোগ করিবার তাহাও করিয়াছে। উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৈনন্দিন জীবনে এই সুকঠিন আদর্শনিষ্ঠা সচরাচর দেখা যায় না। নিখিলেশ একান্তই আদর্শবাদী; এমন নিছক আদর্শবাদী, এমন ছায়ামূর্তি, যে তাহার জীবন-দর্শন ও ব্যবহার সাংসারিক বাস্তবতার সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রায় যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও সে যে পাণ্ডুর ও বর্ণহীন হইয়া পড়ে নাই, সে শুধু তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য; বিমলার জন্য যে দুঃখ তাহাকে পীড়িত

করিয়াছে, যে-দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহার পরিচয়ই তাহাকে এই পরিণাম হইতে রক্ষা করিয়াছে। আর, বিমলা! বিমলা যে উচ্চ সম্পন্ন ঘরের বংশ ও আভিজাত্য গৌরবসম্পন্না কুলবধূ, সেই গৌরবই তাহাকে মহতী বিনষ্টি হইতে বাঁচাইয়াছে, স্বামীর আদর্শবাদ কিংবা স্বামীর প্রতি প্রেমের গভীর উপলব্ধি তাহাকে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত করিতে তেমন কিছু সাহায্য করিয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। একথা বিমলা-চরিত্রের আলোচনায় স্পষ্টতর হইবে।

কিন্তু, "ঘরে-বাইরে"র চরিত্রগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। লেখক এই গ্রন্থে গল্প বলিবার যে বিশেষ ভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে চরিত্রগুলি নিজেরাই নিজেদের বিশ্লেষণ পরিপূর্ণ ভাবে করিয়া গিয়াছে। এমন কি, বিমলার সঙ্গে সম্বন্ধে তাহার আদর্শবাদের মধ্যে ফাঁকটা যে কোথায় তাহাও নিখিলেশ নিজেই শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছে।

> "আজ সন্দেহ হ'চ্ছে আমার মধ্যে একটা অসত্যাচার ছিলো। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁৎ করে ঢালাই ক'রবো আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটাত ছাঁচে ঢালবার নয়। আর, ভালোকে জড়বস্তু মনে ক'রে গ'ড়ে তুলতে গেলেই মরে-গিয়ে সে তার ভয়ানক শোধ নেয়। এই জুলুমের জন্যেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তফাৎ হ'য়ে গেছি তা' জানতেই পারিনি। বিমল নিজে যা' হতে পারতো তা' আমার চাপে ফুটে' উঠতে পারেনি' বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ ক্ষইয়ে ফেলেছে।"

সন্দীপ ও চন্দ্রনাথ বাবুর মতন নিখিলেশও একটা মতামত ও আদর্শে বিশ্বাসী, এবং সে-আদর্শ প্রতিষ্ঠায়ই তাহার জীবন ও ব্যবহার নিয়মিত। নির্জনে বসিয়া সে যখন আত্মানুসন্ধান করিয়াছে তখন সে প্রাণাবেগ-চাঞ্চল্যে মাঝে মাঝে স্পন্দিত ও কম্পিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার ব্যবহার ও কর্মে সেই প্রাণাবেগের স্পর্শ কোথাও লাগে নাই, সে-চাঞ্চল্যে কোথাও আদর্শ হইতে সে এতটুকু বিচ্যুত হয় নাই। বিমলাকে লইয়া যখন এতবড় সংগ্রাম চলিতেছে তখনও সে একদিন একমুহূর্তের জন্যও তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে নাই; সে যেন একজন নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র, এবং দর্শকেরও যে আবেগ-চঞ্চলতা মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়, তাহাও তাহার মধ্যে যেন কোথাও নাই। মোহর চুরির ফাঁকি ধরা পড়িবার পর, মোহমুক্তির পর যখন বিমলার

সঙ্গে তাহার পুনর্মিলন হইল তখনও নিখিলেশ যেন অনেকটা নির্লিপ্ত, শীর্ণ ও জীবনহীন। এই নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্ততা নিখিলেশকে জীবনধর্মে দীন করিয়া চিত্রিত করিয়াছে।

চন্দ্রনাথবাবু সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে। উপন্যাসগত চরিত্র হিসাবে তাঁহার একমাত্র সার্থকতা নিখিলেশকে স্পষ্টতর করা, নিখিলেশের চরিত্রের একটা অবলম্বন দান করা। তিনিও নিখিলেশের মতনই আদর্শবাদী, এবং নিখিলেশের আদর্শবাদকে তিনি স্পষ্টতর রূপ দিয়াছেন। যেখানে নিখিলেশ নিজে নিজের কথা বলিতে বা বিশ্লেষণ করিতে পারে নাই, সেইখানেই প্রয়োজন হইয়াছে চন্দ্রনাথবাবুর।

"ঘরে-বাইরে"-গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ চিত্র হইতেছে সন্দীপ ও বিমলা। সন্দীপের চরিত্র যদি বা আপাতদৃষ্টিতে তাহার মতবাদ দ্বারা কতকটা ক্লিষ্ট, বিমলার ক্ষেত্রে তাহাও নাই। জীবনধর্মের পূর্ণ বিকাশ বিমলার চরিত্রেই দেখা যায়। সন্দীপের শক্তি আছে এবং সে-শক্তি ব্যবহার করিবার সমস্ত কৌশল তাহার করায়ত্ত, কিন্তু তাহার চরিত্র বলিয়া কোনও পদার্থই নাই। বিমলাকে যে সন্দীপ আকর্ষণ করিয়াছে তাহার ক্রমবিকাশ অতি সুনিপুণ; প্রথম সে তাহাকে দেশসেবার সহযোগিতায় অসঙ্কোচ অথচ সসম্মান আহ্বান জানাইয়াছে, ক্রমশঃ সে সেই আহ্বানের সুর চড়াইয়াছে, তাহাতে রঙ্ লাগাইয়াছে, এবং স্তরে স্তরে শেষ পর্যন্ত প্রণয় নিবেদনে গিয়া পৌছিয়াছে। তারপর ধীরে ধীরে সন্দীপের মুখোস খুলিতে আরম্ভ করিল, ধীরে ধীরে তাহার অর্থলোলুপতা, স্থূল মাংসলতা ধরা পড়িয়া গেল, এবং শেষ পর্যন্ত অমূল্যকে উপলক্ষ্য করিয়া ঈর্ষ্যার ছিদ্রপথ দিয়া তাহার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা বিমলার কাছে ধরা পড়িয়া গেল। তখন প্রথম তাহার জীবনে খট্‌কা লাগিল, কোথায় যেন একটা খোঁচা বিঁধিল, এবং ক্রমশঃ পরাভবের সংশয় তাহার মনকে স্পর্শ করিল। বিমলার চোখেও তাহা ধরা পড়িতে দেরী হইলনা। সন্দীপের শেষ প্রস্থানের আগেই আমরা দেখিলাম তাহার আত্মবিশ্বাসের গর্ব, শক্তির দর্প অনেকটা শিথিল, অনেকটা ম্লান, অনেকটা সঙ্কুচিত। শেষ পর্যন্ত একথা সে বুঝিয়া গিয়াছে যে তাহার মতন শক্তিমানের কাছেও দুর্লভ এমন বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিদিনের মানবসংসারেও আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই ভাবিয়া লেখকের শিল্পনৈপুণ্যে আশ্চর্য হইতে হয় যে, শেষ পর্যন্ত তিনি সন্দীপকে মোটামুটি

অপরিবর্তিতই রাখিয়াছেন, তাহার গর্বিত আত্মপ্রত্যয়কে একেবারে মাটির ধূলায় লুটাইয়া দেন নাই, এতটুকু অনুতাপের স্পর্শ তাহার চিত্তে লাগিতে দেন নাই। সন্দীপ-চরিত্রের অন্য বৈশিষ্ট্যও আছে। 'সে আইডিয়ার যাদুকর'! তাহার যুক্তি ও বাক্যজালকে সে এমন ভাবে সাজাইয়াছে যে সেই বাক্যচ্ছটার মোহ তাহার চরিত্রকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। নিখিলেশের সঙ্গে তর্কে প্রাণাবেগের স্পর্শ যে কোথাও নাই, তাহা যে শুধু বাক্যমাত্র তাহা ত সুস্পষ্ট; বিমলার সহিত কথায় বার্তায় ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধেও কোথাও তাহার গভীর হৃদয়ের স্পর্শ লাগে নাই। বিমলাকে যদি সে গভীর ভাবে ভালবাসিতে পারিত, এবং তাহার অর্থলিপ্সা যদি এতটা উৎকট না হইত তাহা হইলে এই উপন্যাসে ঘটনাচক্র কোন্‌পথে আবর্তিত হইত, বলা যায় না।

আমি আগেই বলিয়াছি, এই উপন্যাসে বিমলাই সর্বাপেক্ষা জীবন্ত। সে যে পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানে দাম্পত্য-রাজ্যে স্বামীই একমাত্র পুরুষ। নিখিলেশ তাহাকে যে স্বাধীনতার মুক্ত অঙ্গনে পাইতে চাহিয়াছিল বিমলার তাহার কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিলনা, স্বামীর সেই আদর্শ সে বুঝিতে পারিয়াছিল কিনা তাহাতেও সন্দেহ করা চলে। আসল কথা, স্বামীর যে অজস্র ভালবাসা সে পাইয়াছিল তাহার জন্য তাহাকে কোনও মূল্য দিতে হয় নাই। কিন্তু নিখিলেশের বাড়ীর খোলা দরজা দিয়া স্বদেশীর আন্দোলনের ঢেউ যখন অন্দর মহলে আসিয়া পৌঁছিল তখন সেই ঢেউএ বিমলা একেবারে ঘরের বাইরে সন্দীপের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইল। আন্দোলনের প্রাণাবেগে সে সন্দীপকে সন্দীপ হিসাবে দেখিল না, সন্দীপ তখন তাহার কাছে দেশমাতার শৃঙ্খলমোচনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উৎসর্গীকৃত-জীবন শক্তিমান্ সেবক। সেই সেবকের কাছে কি করিয়া ধীরে ধীরে সে নিজকে ধরা দিল, কি করিয়া সে নিজের স্বামীকে সন্দীপের সঙ্গে তুলনায় দুর্বল বলিয়া মনে করিল, কি করিয়া সন্দীপের প্রতি মোহ-বিহ্বলতায় ধীরে ধীরে নিখিলেশ হইতে সে দূরে সরিয়া গেল, এবং অবশেষে সন্দীপের কামনার মধ্যে ধরা দিতে উদ্যত হইল, এ সমস্তই ত স্তরে স্তরে গল্পের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পর সন্দীপের জীবনে দেখা দিল দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা; নিখিলেশের দৃঢ় আদর্শবাদ ভিতরে ভিতরে তাহাকেই করিল দুর্বল। তাহার উপর টাকার ব্যাপার লইয়া চিত্তের যে কদর্য লোভ ও অসংযম উদ্ঘাটিত হইয়া

পড়িল তাহাতেই বিমলার মোহ প্রায় ঘুচিবার উপক্রম হইল, এবং সর্বশেষ স্তরে সন্দীপ যখন তাহাকে আলিঙ্গনের মধ্যে টানিতে চাহিল তখন সুতীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। এইভাবে সন্দীপের নগ্ন নির্লজ্জতা এবং স্থূল ভোগলিপ্সা যখন ধরা পড়িয়া গেল তখন বিমলার একমাত্র চেষ্টা হইল সন্দীপের মোহকবল হইতে মুক্তি, এবং তখনই প্রয়োজন হইল অমূল্যর। এই অমূল্যকে আশ্রয় করিয়া যে কল্যাণস্নেহ তাহার হৃদয়ে উৎসারিত হইল, সেই স্নেহ ও সহজ ধর্ম-সংস্কারই বিমলাকে শেষ পর্যন্ত বিনষ্টির হাত হইতে বাঁচাইল। এই মোহমুক্তির পথে বিমলার মুখে বারবার যে আত্মগ্লানি ও দুঃখের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, এই দুঃখ ও অনুতাপ নিখিলেশের প্রেম হইতে বিচ্যুতির জন্য ততটা নয় যতটা মোহর-চুরির কলঙ্কের জন্য, যতটা একান্ত স্নেহভাজন অমূল্যকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিবার জন্য। নিখিলেশের প্রেমের আদর্শ যে সে বুঝিয়াছে, এবং বুঝিয়া সে তাহার নিজের কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন কোনও প্রমাণ লেখক আমাদিগকে দেখান নাই। বিমলা অবশ্য বুঝিয়াছে, সে নিখিলেশের হাত হইতে প্রেম কেবলই লইয়াছে, কিছুই সে দেয় নাই, এবং সেই হেতু তাহার প্রেম দুর্বল। নিখিলেশও বুঝিয়াছে তাহার প্রেমের আদর্শের মধ্যে কোথাও একটা অত্যাচার ও জবরদস্তি ছিল। কিন্তু, তবুও বাহিরের জীবনে যে পরীক্ষা তাহাদের হইয়া গেল তাহার ফলে তাহারা যে নিজদের আরও একান্ত ও নিবিড় করিয়া পাইল সে-ইঙ্গিত গল্পের কোথাও নাই। বিমলার পক্ষে ত কেবলই মনে হয়, বংশ ও পরিবারোচিত গৌরবের মধ্যে আত্মসম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি বজায় রাখা এবং সকলের সন্দেহদৃষ্টি, বিশেষভাবে মেজরাণীর ইঙ্গিতোক্তি হইতে নিজেকে বাঁচান, এবং সর্বোপরি অমূল্যর প্রতি স্নেহ, ইহারাই যেন বিমলাকে নিজের কেন্দ্রে ফিরাইয়া আনিল। আহত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় নিখিলেশ যখন ফিরিয়া আসিল তখনও বিমলার মানসিক উদ্বেগাকুলতার কোন আভাসও যে আমরা পাইনা, তাহাতে এই সংশয় আরও যেন দৃঢ় হয়।

কিন্তু স্বল্পায়তনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সজীব ও অভিনব চরিত্র মেজরাণীর। প্রথম স্তরে মেজরাণী ঈর্ষান্বিতা নারী, স্বামী সৌভাগ্যান্বিতা বিমলার প্রতি এই ঈর্ষা সহজবোধ্য, বিশেষতঃ যখন স্মরণ করা যায় নিখিলেশের পারিবারিক ঐতিহ্য

ও পরিবেশ। এই ঈর্ষা তাহাকে দিয়াছে একটা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি; সেই দৃষ্টি ও নারীর সহজাত-সংস্কারের বলে বিমলার সাজসজ্জা, হাবভাব, ছলাকলা সবকিছুর অর্থ ও উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা তাহার পক্ষে এতটুকু কঠিন হয় নাই। তাহা ছাড়া নিখিলেশের প্রতি তাহার যে স্নেহ সেই স্নেহের সঙ্গে একটু দেহলালসার খাদও যে মেশান ছিল তাহাও অস্বীকার করা চলে না। দ্বিতীয় স্তরে, বিমলাকে লইয়া যখন সন্দীপ-নিখিলেশের সংগ্রাম চলিতেছে, তখন বিমলার প্রতি মেজরাণীর ঈর্ষা বিবর্তিত হইয়াছে দেবরের প্রতি প্রীতিপূর্ণ শঙ্কায় ও সহানুভূতিতে, দেহলালস বিবর্তিত হইয়াছে সস্নেহ যত্ন, সেবা ও আশ্রয় রচনায়। যে মধুর স্নেহ ও বন্ধুত্ব বাল্যে অঙ্কুরিত ও মুকুলিত হইয়াছে, যৌবনে তাহাতে ঈর্ষা ও লালসার কিছুটা স্পর্শ হয়ত লাগিয়াছিল, কিন্তু বিমলার প্রেমচ্যুতি ও পদস্খলনের সম্ভাবনামাত্রই সেই ঈর্ষা লালসাকে দূর করিয়া দিয়া বাল্যের স্নেহ ও বন্ধুত্ব আবার মুক্তি লাভ করিল, এবং মেজরাণী নিখিলেশের জীবনের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা দুঃখজ্বালার সঙ্গিনী হইয়া একটা স্নিগ্ধ কোমল আশ্রয়ের মধ্যে তাহাকে ঘিরিয়া রাখিল।

"ঘরে-বাইরে" সম্বন্ধে একটি আপত্তির কথা বলিতেই হয়। এ-আপত্তি সাহিত্যবিচারের অন্তর্গত, যদিও আপাতদৃষ্টিতে আপত্তিটির বিষয়বস্তু সামাজিক সমস্যাগত। এই সমস্যা উত্থাপন করিয়াছেন লেখক স্বয়ং।

নিখিলেশের মুখ দিয়া লেখক স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের একটা আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছেন। সে বিমলাকে পাইতে চাহিয়াছিল, আগেই বলিয়াছি, স্বাধীনতার মুক্ত অঙ্গনে, আমাদের সংসার স্ত্রীর উপর যে সহজ অধিকার স্বামীর হাতে তুলিয়া দেয় সে-অধিকারে নয়। বাহিরের জীবনের স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়া সে স্ত্রীর প্রেম অর্জন করিবে এই ছিল তাহার সুদৃঢ় পণ। এই আদর্শের অনুসরণ করিয়াই লেখক বিমলাকে বাহিরের জীবনের স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রাম-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু যে-সন্দীপ এই সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পুরুষ সে কি নিখিলেশের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী? স্বদেশী আন্দোলন ত অনেক পুরুষকেই ব্যক্তিজীবনের শান্তিক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বৃহত্তর জীবনের মধ্যে মুক্তি দিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও জীবন-দর্শন ও কার্যকারণের যুক্তি ত সন্দীপের মতনই ছিল, কিন্তু সকলেই কিছু সন্দীপের মতন অর্থলোলুপ ও স্থূল ভোগলিপ্সু ছিলনা। যে-ভাবে

লেখক ঘটনার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের মধ্যে যে-কেহ একজন ত একই উপায়ে বিমলার সম্মুখীন হইতে পারিত, এবং স্থূল মাংসলতার পরিচয় না দিয়া বিমলাকে গভীর ভাবে ভালওবাসিতে পারিত। তখন সমস্যা কোন্ দিকে গড়াইত তাহা কে বলিতে পারে? সন্দীপের বেশ যদি ছদ্মবেশ না হইত, তাহার নগ্ন অর্থ ও ভোগলিপ্সা যদি এমন উৎকট ভাবে ধরা না পড়িত তাহা হইলে বিমলা কি করিত তাহা কে জানে? বিমলার সঙ্গে সম্বন্ধে সন্দীপের কোনও হৃদয়ের উত্তাপ ত লাগে নাই, সে বিমলাকে চাহিয়াছিল তাহার কামনার মধ্যে; যদি সে গভীরভাবে ভালবাসিতে পারিত তাহা হইলে ঘটনাচক্র অন্য পথে আবর্তিত হইতনা তাহা কে বলিতে পারে? কাজেই, যে-সমস্যা লেখক উত্থাপন করিয়াছেন তাহার যোগ্যক্ষেত্র তিনি রচনা করেন নাই বলিয়া যেন মনে হয়; আদর্শ পরীক্ষার ক্ষেত্র ঠিক যেন সমস্যানুযায়ী হয় নাই। তাহা ছাড়া যে-ভাবে বিমলাকে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া ফিরাইয়া লইয়াছেন, তাহাতেও যে নিখিলেশের প্রেমের আদর্শ জয়যুক্ত হইয়াছে তাহা মনে হয় না, এবং সে-ইঙ্গিত আগেই আমি করিয়াছি। আসল কথা, এই আদর্শকে যে-মানদণ্ডে বিচার করা হইয়াছে তাহা খুব নিরপেক্ষ নয়; সন্দীপকে নিখিলেশের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া গড়া হয় নাই। তাহাকে যদি এতটা সংকীর্ণ এতটা নীচস্বভাবসম্পন্ন বলিয়া চিত্রিত করা না হইত, তাহা হইলে এই পরীক্ষার ভিতর হইতে কে কি-ভাবে বাহির হইত, সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন পাঠকের মনে থাকিয়াই যায়।

"ঘরে-বাইরে"-গ্রন্থেই লেখক উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম চলিতভাষা ব্যবহার করিলেন, বোধ হয় "সবুজপত্রে"র প্রভাবে। তাহার ফল যে ভাল হইয়াছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। গল্পবস্তুর গতিবেগ তাহাতে বাড়িয়াছে এবং বিষয়-বস্তুকে তাহা সমৃদ্ধও করিয়াছে। ঘটনা-সংস্থানের নাটকীয়ত্বও বোধ হয় তাহাতে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া epigramএর সুতীক্ষ্ণ শাণিত বাক্য-ভঙ্গিমায় বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষ যে ভাবে দীপ্তিলাভ করিয়াছে তাহাও লক্ষণীয়। যে উন্মত্ত ভাবাবেগ স্বদেশী আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য সে-ভাবাবেগ চরিত্রগুলির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া বিচিত্র ঘটনাকে একটা খুব সচল গতি দান করিয়াছে; অন্যদিকে, ঘটনাস্রোতও এত দ্রুত যে চরিত্রগুলিও যেন সেই স্রোতের মুখে অনিবার্য বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। বুদ্ধির দীপ্তিতে "ঘরে-

বাইরে"ও মহিমান্বিত, কিন্তু, এই উপন্যাসের চরিত্র অথবা ঘটনা-বিশ্লেষণ "চতুরঙ্গ" অথবা উত্তরকালের "শেষের কবিতা"র মতন এত ভাব-গভীর নয়, ইহাদের কবিকল্পনার ঐশ্বর্যও "ঘরে-বাইরে"-গ্রন্থে তেমন নাই যদিও নিখিলেশ ও বিমলার ভাষণ মাঝে মাঝে কল্পনার উচ্চ স্তর স্পর্শ করিয়াছে।

(৭)

"যোগাযোগ" (১২৩৪-৩৫)
"শেষের কবিতা" (১৩৩৫)

"ঘরে-বাইরে" রচনার প্রায় বার বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ আবার উপন্যাস লিখিলেন। এই উপন্যাসের প্রথম নামকরণ হইয়াছিল "তিন-পুরুষ", এবং এই নামেই "বিচিত্রা" মাসিকপত্রে আশ্বিন ও কার্তিক এই দুইমাস বাহির হইবার পর কবি পুরাতন নাম বদল করিয়া ইহার নূতন নামকরণ করেন "যোগাযোগ"। এই নূতন নামকরণ উপলক্ষে লেখক একটি সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন। এই কৈফিয়তের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন হইল। কবি বলিলেন, সাহিত্যসৃষ্টিতে

"* * * আখ্যান বস্তু, রচনারীতি, চরিত্রচিত্র, ভাষা, ছন্দ, ব্যঞ্জনা, নাট্যরস সবটা মিলিয়ে একটি সমগ্র বস্তু। একেই বলা চলে ব্যক্তিরূপ। বিষয়ের কাছ থেকে সংবাদ পাই, ব্যক্তির কাছ থেকে তার আত্ম-প্রকাশজনিত রস পাই। বিষয়কে বিশেষণের দ্বারা মনে বাঁধি, ব্যক্তিকে সম্বোধনের দ্বারা মনে রাখি। * * * রসশাস্ত্রে মূর্তিটা মাটির চেয়ে বেশী, গল্পটাও বিষয়ের চেয়ে বড়ো। এই জন্যে বিষয়টাকে শিরোধার্য ক'রে নিয়ে গল্পের নাম দিতে আমার মন যায়না। * * * গল্প জিনিসটাও রূপ : ইংরাজীতে যাকে বলে 'ক্রিয়েশন', আমি তাই বলি গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা ; অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট। 'বিষবৃক্ষ' নামটাতে আমি আপত্তি করি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামে দোষ নেই।* কেননা ও নামে গল্পের কোনো ব্যাখ্যাই করা হয়নি'। * * * কর্তা বলেন, তিন-পুরুষের তিন তোরণওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে এই আমার

---

* তাহা হইলে "চোখের বালি" "ঘরে বাইরে" সম্বন্ধে কি বলা যাইবে ? "তিন-পুরুষ" নামান্তরের হেতু প্রভাতবাবু নির্দেশ করিয়াছেন অন্যরূপ। তিনি বলেন, কবি শুনিয়াছিলেন, ঐ নামে অন্য একখানি উপন্যাস বাঙলা ভাষায় ছিল, সেই জন্যই নাম বদলান প্রয়োজন হইয়াছিল। "রবীন্দ্র-জীবনী" ২য় খণ্ড, ৩৫৩ পৃঃ।

একটি খেয়াল মাত্র ছিল। এই চলাটা কিছুই প্রমাণ করবার জন্যে নয়, নিছক ভ্রমণ করবার জন্যেই। সুতরাং এই নামটা ত্যাগ করলে আমার গল্পের কোনো স্বত্বের দলিল কাঁচ্‌বেনা। * * * আর একটি নাম ঠাউরেচি। সেটা এতই নির্বিশেষ যে গল্প মাত্রেই নির্বিচারে খাটতে পারে * * * ("বিচিত্রা", অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, ৭৮৯-৯১ পৃ)।

সাধারণভাবে এই যুক্তিকে স্বীকার করিতে আমার কোনও আপত্তি নাই; নাম নাম মাত্রই, তাহার সঙ্গে বিষয়বস্তুর যোগ থাকিতেই হইবে, এমন কোনও যুক্তি নাই, বরং না থাকাটাই সুবিধাজনক। সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাবাহী নাম বন্ধনেরই নামান্তর। কিন্তু "তিনপুরুষ" নামটি যখন "যোগাযোগ" উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, তখন মনে হয় গল্পবস্তুটির রূপ ও প্রসার সম্বন্ধে গোড়ায় লেখকের মনে যে-ধ্যান ছিল সেই ধ্যানের সঙ্গে "তিন-পুরুষ" নামের একটা সার্থক যোগ ছিল। কিন্তু সেই ধ্যান "যোগাযোগে" পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই, গল্প বস্তুর রূপ ও প্রসার সম্বন্ধে যে-পরিকল্পনা সূচনায় ছিল তাহার সম্পূর্ণ অংশ "যোগাযোগে" উদ্ঘাটিত হয় নাই। যে-অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বৎসরের জন্মদিন লইয়া গল্পের সূচনা সেই গল্প পিছু হটিয়া যাত্রারম্ভ করিয়াছে অবিনাশের পিতামহ আনন্দ ঘোষালের মুহুরীগিরি হইতে, অর্থাৎ মোটামুটি ঊনবিংশ শতকের তৃতীয়পাদ হইতে। আনন্দ ঘোষালের জীবনেতিহাস প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ আনন্দ ঘোষালের পুত্র মধুসূদন, তৃতীয় পুরুষ অবিনাশ ঘোষাল। এই তিন পুরুষের প্রথম পুরুষের সংক্ষেপে এবং দ্বিতীয় পুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান ও পরিবেশ সবিস্তারে "যোগাযোগে" বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় পুরুষে অবিনাশ ঘোষালের জন্মের আভাসের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। কেন জানি মনে হয়, এই তিন পুরুষ ধরিয়া বাঙালী সমাজে পারিবারিক জীবনে যে বিবর্তন হইয়াছিল, গ্রন্থ-পরিকল্পনার সূচনায় এই বিবর্তনের ইতিহাস লেখকের মনের পশ্চাতে ছিল; এই প্রসারিত পটভূমির উপরই তিনি "তিন-পুরুষে"র বিচিত্র চরিত্রগুলির জীবন-লীলা ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, "যোগাযোগে" তাহা এত সমগ্রতায় উদ্ঘাটিত হয় নাই। মধুসূদন ও কুমুদিনীর বাল্য ও কিশোর জীবনের পরিবেশ, এবং তাহাদের যৌবনের দাম্পত্য জীবনের সূক্ষ্ম ও স্থূল লীলাই উপন্যাসটির প্রধান উপজীব্য।

পূর্বোক্ত কারণেই কিনা জানিনা, তবে ইহা অনস্বীকার্য যে উপন্যাসের

আরম্ভ ও শেষ একান্তই আকস্মিক। গ্রন্থ যখন আরম্ভ তখন অবিনাশ ঘোষালের দ্বাত্রিংশৎ জন্মোৎসব, আর, যখন শেষ হইল তখন পর্যন্ত অবিনাশ পৃথিবীর আলো দেখে নাই। গল্পবস্তুর গঠন ও একটু শিথিল, গল্পের বিভিন্ন অংশ সুদৃঢ় সংহত নয়। মধুসূদনের বংশ ও জীবনের পূর্ব-ইতিহাসের কতকটা বিস্তৃত পরিচয় নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কুমুদিনীর বাপের বাড়ীর যে সুবিস্তৃত পরিচয় গল্পের ভূমিকার অনেকগুলি পাতা জুড়িয়া আছে, এতটা দীর্ঘায়ত পরিচয় কতকটা অপ্রাসঙ্গিক এবং গল্পবস্তুর আয়তনের তুলনায় অতি মাত্রায় প্রলম্বিত। মুকুন্দলাল ও তাহার স্ত্রীর ট্র্যাজিক্-সম্বন্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গল্প; সেই গল্পটি এই দীর্ঘায়ত ভূমিকার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বিপ্রদাস ও কুমুদিনীর স্নেহপ্রীতিমধুর সম্বন্ধের বুনিয়াদটুকু এই ভূমিকার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাহা এইখানে এতটা বিস্তৃত না হইলেও তাহাদের সম্বন্ধে সত্য পরিচয় কঠিন হইত না। তাহা ছাড়া কুমুদিনী মধুসূদনের ঘর ছাড়িয়া পিতৃগৃহে চলিয়া আসিবার পর সুদীর্ঘ পৃষ্ঠা জুড়িয়া স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, স্ত্রীর অধিকার ইত্যাদি লইয়া যে তর্কজাল বিস্তৃত হইয়াছে তাহাও গল্পবস্তুর দিক্ হইতে কতকটা অবান্তর। তৃতীয়তঃ কুমুদিনী যখন অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় ফিরিয়া আসিল তখনও মধুসূদন শ্যামার স্থূল দেহমাংসের পঙ্কিলতার মধ্যে নিমজ্জিত। মধুসূদন কুমুদিনীকে ডাকিয়া আনিয়াছে যেহেতু সে গর্ভে ধারণ করিয়া আছে ভাবী বংশধর এবং কুমুদিনীকেও তাহা স্বীকার করিয়াই আসিতে হইয়াছে। কিন্তু সে যে-গৃহে আসিয়াছে সেখানে তাহার স্থান কি জননীরূপে, না শ্যামার পার্শ্বে মধুসূদনের অন্যতম ভোগ্যবস্তু রূপে? এ-প্রশ্নের কোন উত্তর গল্পে নাই। কুমুদিনীর কল্পনায় স্বামীপ্রেমের যে কোমল ও সুকুমার আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল সে-আদর্শ কুমুদিনী-মধুসূদনের পুনর্মিলনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এমন মনে হয় না। কারণ ইহাদের দুইজনের মধ্যে বিরোধ মূল প্রকৃতিগত, এবং সে-বিরোধ এত প্রবল ও তাহার মূল জীবনের এত গভীর স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত যে বংশধরের সেতুতে সে-বিরোধের দুস্তর মরু বাঁধা পড়িয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। অবিনাশ ঘোষাল তাহার বত্রিশ বৎসরের জীবনে তাহা পারিয়াছিল কিনা, সে-সংবাদও গল্পে নাই; যদি সে না পারিয়া থাকে তাহা হইলে সে পিতা ও মাতার এই বিপরীত সম্বন্ধকে কি ভাবে দেখিয়াছিল, কোন্ পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে তাহার বত্রিশ বৎসরের জীবন কাটিয়াছিল?

এসব প্রশ্ন পাঠকের মনে থাকিয়াই যায়। এক একবার মনে হয় কুমুদিনীর স্বামীগৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই যদি গল্পের সমাপ্তি হইত তাহা হইলে "যোগাযোগ" আরও দৃঢ় ও সংহত হইত। কিন্তু লেখকের মনের পশ্চাতে যে তিন-পুরুষের ইঙ্গিত তখনও সচেতন!

কিন্তু লেখকের অপূর্ব কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে কুমুদিনী-মধুসূদনের চরিত্র বিশ্লেষণে, ঘটনা-বিন্যাসে এবং তাহাদের দুই জনের অন্তর্বিপ্লবের বর্ণনায়। কুমুদিনী বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব হৃদয়ে লইয়া, নিজকে একান্তভাবে স্বামীর হাতে অর্ঘ্যরূপে তুলিয়া দিবে বলিয়া। বিবাহপ্রস্তাবের সূচনামাত্রেই সে ইহার মধ্যে অনুভব করিয়াছে দেবতার অদৃশ্য ইঙ্গিত; এবং তাহার পর কোনও সংশয়, কোনও সতর্কবাণীই তাহাকে আর বাধা দিতে পারে নাই। মধুসূদন বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক, ক্ষমতার আধিপত্যকেই সে শক্তির প্রকাশ বলিয়া জানে। সে কুমুদিনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে, তাহার অপমানিত বংশগৌরবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে, কুমুদিনীর কথা ভাবিয়া একমুহূর্তের জন্যও তাহার হৃদয়ে কোনও রঙ্ লাগে নাই। এই মধুসূদনের পরিচয় কুমুদিনী যখন প্রথম পাইল তখন হইতেই সুরু হইল উভয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে পক্ষ দুইটি, কিন্তু আক্রমণটি সমস্তই করিয়াছে মধুসূদন তাহার নীচ, ইতর, প্রভুত্বকামী প্রবৃত্তির অস্ত্রশস্ত্র লইয়া। আর কুমুদিনী সেই আক্রমণকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছে চরম সহিষ্ণুতায়, নিজের আদর্শের মধ্যে মধুসূদনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টায়। সে-চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইয়াছে তখন সহিষ্ণুতা রূপান্তরিত হইয়াছে ঘৃণায় ও গ্লানিতে। সে তখন মধুসূদনের প্রতি একান্তই বিমুখ; তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে সংস্কারে বাধে, তবুও সমস্ত দেহ মন যেখানে বিমুখ ও বিদ্রোহী সেখানে মৌন অথচ দৃঢ় প্রত্যাখ্যান ছাড়া নিজেকে মুক্ত ও শুচি রাখিবার আর কি-ই বা উপায় আছে! এই বিপুল ও দীর্ঘায়ত সংগ্রামের বিচিত্র বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর গুলি, বিভিন্ন চরম মুহূর্ত গুলি এমন সূক্ষ্ম, সম্পূর্ণ ও সুনিপুণভাবে বিশ্লেষিত ও রূপায়িত হইয়াছে যে লেখকের সূক্ষ্ম কারুশিল্প ক্ষমতার কথা ভাবিয়া অবাক হইতে হয়।

সংগ্রামের প্রথম স্তরে মধুসূদনের মূঢ়, রূঢ়, নির্মম ও ইতর ব্যবহার বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কুমুদিনীর আদর্শের বিসর্জন হইতে

বিলম্ব হয় নাই, কিন্তু তাহা হইলেও প্রাণপণ শক্তিতে নীরবে সে সমস্তই সহ্য করিয়াছে। কুমুদিনীর এই একান্ত আত্মবিলুপ্তি, তাহার রূপ ও তাহার ভাব-গভীর হৃদয়ের সৌন্দর্য ধীরে ধীরে মধুসূদনকে একটু দুর্বল করিল, এবং এই দুর্বলতায় সে সর্বপ্রথম কুমুদিনীর কাছে কতকটা নতি স্বীকার করিল।

এই নতিস্বীকার যে নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করিল তাহার ফলে গল্পের দ্বিতীয় স্তরের সূচনা। মধুসূদন যতদিন উৎপীড়ক ছিল ততদিন কুমুর পক্ষে সহজ ছিল তাহার প্রতি বিমুখ থাকা, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা; আজ যখন মধুসূদন মাথা নোয়াইল তখন কুমুদিনী সহজ সংস্কারের বশেই বুঝিল ইহা একান্তই দৈহিক কামনার তাড়নায়। কুমুদিনীর সমস্ত দেহমন ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মধুসূদনের লোলুপ অনুনয়ে সে নিজকে দান করিতে বাধ্য হইল একান্ত অনিচ্ছায়, ঘৃণায় ও অবহেলায়। এই অনিচ্ছার, অবহেলার দানে মধুসূদনের অতৃপ্তি বাড়িয়াই উঠিল, তাহার প্রভুত্বের গর্ব উদ্দীপ্ত হইল, এবং তাহার একমাত্র চেষ্টা হইল কুমুর হৃদয়কে না পাইলেও প্রভুত্বের জোরে কাড়িয়া কুমুর দেহকে পাওয়া।

একদিকে এই গায়ের জোরের টান, আর একদিকে নীরব প্রত্যাখ্যান যখন চলিতেছে তখন মধুসূদন একদিন নবীনের চক্রান্তে ধরা পড়িল। এইবার গল্পের তৃতীয় স্তর। মধুসূদন ভাবিতে শিখিল কুমু তাহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী, সে-ই আনিয়াছে তাহার বিপুল ঐশ্বর্য। বিষয়ী, লোভলিপ্সু মধুসূদন প্রভুত্বের সিংহাসন হইতে নামিয়া এইবার হইল কুমুর দাস; নতজানু হইয়া সে কুমুর প্রেমভিক্ষা করিল। সে তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য কুমুর পায়ে ঢালিয়া দিতে চাহিল। কিন্তু কুমু আবার সহজ সংস্কার দিয়াই বুঝিল, মধুসূদনের ইহা আর এক নূতনতর মোহ, তাহাকে কামনার মধ্যে পাইবার আর এক অভিনব কৌশল। কুমু এই নিবেদনের থালা হইতে কিছুই লইলনা, অথবা যাহা লইল তাহা এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাতে আবার মধুসূদনের মোহচ্যুতি ঘটিল। সে এইবার এবং শেষবার বুঝিল, কুমুদিনী তাহার বজ্রমুষ্টির আয়তনের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে ধরিবার ক্ষমতা আর তাহার নাই। কুমুর ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা তাহার ইতর প্রবৃত্তিকে আবার মুক্তি দিল।

গল্পের চতুর্থ স্তরে মধুসূদন তাহার দাসী শ্যামার স্থূল দেহলালসার মধ্যে নিজের নির্লজ্জ ও নিঃসঙ্কোচ আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেখানে তাহার

প্রভুত্ব প্রকাশের কোনও বাধা নাই, কামনার অবাধ চরিতার্থতায় কোন বাধা নাই, কোনও সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বলীলার অবকাশ নাই, কামনার বস্তুকে দাসীর চেয়ে বেশী সম্মান দিবার প্রয়োজন নাই, শ্যামাও তাহা দাবী করে নাই। তাহা ছাড়া কুমুদিনীর ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় তাহার প্রভুত্বের অহঙ্কার যে-ভাবে অপমানিত হইয়াছে, শ্যামা তাহার সাগ্রহ আহ্বান ও সাদর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নে সেই অপমানক্ষত অনেকটা জুড়াইতে সাহায্য করিয়াছে। মধুসূদনের পক্ষে শ্যামা জলের মত সুলভ ও সহজ; কুমুদিনীকে বুঝা তাহার স্থূল বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির পক্ষে কঠিন!

যাহা হউক, এই শ্যামা-অধ্যায়ের পর গল্পের আর কোনও বিকাশ নাই। ইহার পরও গ্রন্থ আরও বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু গল্প বিস্তৃত হয় নাই। কুমুদিনী স্বামীর ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, শ্যামা-পর্বের মধ্যে সে ফিরিয়া আসিয়াছে, একথা ত আগেই বলিয়াছি। শ্যামা-পর্বে শ্যামার আকর্ষণের স্বরূপ অপূর্ব দক্ষতায় বিশ্লেষিত হইয়াছে; মধুসূদন কি ভাবে কি দৃষ্টিতে তাহা গ্রহণ করিয়াছে তাহাও চরম নৈপুণ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কুমুদিনীকে লইয়া লেখক কি নির্মম পরীক্ষাটাই না করিয়াছেন! এমন কোমল, সুকুমার, মধুর, আত্মজিজ্ঞাসু ও ধ্যানবিমুগ্ধ কল্পলোকের লাবণ্যময়ী নারীকে তিনি মধুসূদনের হাতে তুলিয়া দিয়া কঠোর নিষ্ঠুর বাস্তব জীবনের চক্রে কি ভাবে নিষ্পেষিত করিয়াছেন ভাবিলে দুঃখ হয় বই কি? কুমু কি human nature's daily food হইবার যোগ্য? অথচ মানবজীবন এইরূপই বিচিত্র, তাহার দাবী দাওয়া এইরকমই কঠোর ও নির্মম! প্রয়োজনের সংগ্রামে সে কাহাকেও রেহাই দেয়না! জানি, উপন্যাসগত চরিত্রের যে ব্যক্তিত্বের দীপ্তি থাকা প্রয়োজন কুমুর চরিত্রে সে ব্যক্তিত্বের বিকাশ নাই; তবু কি কোমলতায়, কি কারুণ্যে, কি সুকুমার তুলিতে রবীন্দ্রনাথ কুমুর চিত্রটি আঁকিয়াছেন, কি পরম সহানুভূতিতে তাহার আত্মার সৌন্দর্যকে রূপায়িত রসায়িত করিয়াছেন, কি কাব্যসুষমায় তাহার চরিত্রটি মণ্ডিত করিয়াছেন, এবং সেই কুমুকেই তিনি কি দুঃখের, কি বেদনার মধ্যে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও কি দুঃখ বেদনাই বহন করিয়াছেন, অথচ তাঁহার লেখনী এতটুকু বিচলিত হয় নাই! একথা যখন ভাবি, তখন সমস্ত বিচার যেন স্তব্ধ হইয়া যাইতে চায়। কুমুর সঙ্গে বিপ্রদাসের এমন একাত্মবোধ এমন কবিত্বময় ভাষায়

এমন পরিবেশের মধ্যে এমন নিপুণতায় প্রকাশ করা কি আর কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল? কুমুর জীবনের একদিকে দাদা বিপ্রদাস সূক্ষ্ম মমত্বে ও সহানুভূতিতে, প্রাণের গভীরতম স্পন্দনে, হৃদয়ের প্রতি তন্তুতে তন্তুতে, অন্তরের সকল আশা আকাঙ্ক্ষায় দুইটি ভাইবোন যেন একই আত্মার আধারে বিধৃত। আর একদিকে মধুসূদন; বিবাহের সংস্কারে কুমু তাহার গাঁটছড়ায় বাঁধা; অথচ কত বিপরীত তাহাদের চরিত্র! এই কুমুদিনীর বৈপরীত্য দুই চরিত্রকে বিকশিত করিতে সাহায্য করিয়াছে, তাহাকে স্ফুটতর স্পষ্টতর করিয়াছে। ইহার মধ্যে শুধু ভাব-গভীরতা ও অপূর্ব কবি-কল্পনার পরিচয় ছাড়া শিল্পকৃতিত্বের পরিচয়ও সুস্পষ্ট।

ছোটখাট চরিত্রের মধ্যে শ্যামার কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মোতির মা ও নবীন দুইজনেই মধুসূদনের সংসারের আশ্রয়পুষ্ট, এবং সেই হিসাবে দুইজনই তাহাদের সামাজিক স্থান সম্বন্ধে সচেতন। অথচ সংসার ও সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতায় তাহারা তাহাদের প্রভুকেও অতিক্রম করিয়াছে। তাহাদের চোখের সম্মুখে যাহা ঘটিতেছে তাহার মর্ম মধুসূদন অপেক্ষাও তাহারা ভাল করিয়া বুঝিয়াছে, এবং সেইভাবেই তাহাদের কর্তব্য ও জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। আর নবীনের বুদ্ধি-কৌশলের ফাঁদে ত মধুসূদন ও পা' না দিয়া পারে নাই।

"যোগাযোগের", বর্ণনাভঙ্গি হ্রস্ব ও সংক্ষিপ্ত কিন্তু এই হ্রস্ব সংক্ষিপ্ততা "চতুরঙ্গ-ঘরে বাইরে-শেষের কবিতা"কে যে সচল প্রাণময় গতিবেগ দান করিয়াছে, epigramএর দীপ্তি থাকা সত্ত্বেও "যোগাযোগ" সেই গতিবেগ লাভ করে নাই। ইহার বিবৃতি দীপ্ত কিন্তু গতি মন্থর। তাহার একটা কারণ "যোগাযোগে"র সূক্ষ্ম কারুনৈপুণ্য। প্রসারিত প্রাচীরচিত্রে যদি তুলি ধরিয়া সূক্ষ্ম কারুকার্য করা যায় তাহাতে রেখার সবল দীর্ঘায়ত ভঙ্গি এবং চিত্রের সমগ্রতা যেমন সহসা দৃষ্টিগোচর হয়না, সুনিপণ শিল্পকলার উপরেই যেমন দৃষ্টির গতি মন্থর হইয়া যায়, "যোগাযোগে" ও ঠিক্ তাহাই হইয়াছে। চরিত্র ও ঘটনা উভয়েরই বিশ্লেষণ এই কারুনৈপুণ্যের পরিচয়।

গল্পের বাক্যভঙ্গি তীব্র শাণিত; বুদ্ধির দীপ্তি এবং epigramএর সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গময় ঔজ্জ্বল্যে ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি যেন রৌদ্র-কিরণে ঝলকিত মৃদু উদ্বেলিত জলস্রোতের মতন দীপ্ত ও শাণিত।

Epigramএর বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানগর্ভ ভাষায় কুমুদিনী, মধুসূদন, বিপ্রদাস ত কথা বলেই, লেখকের বিশ্লেষণও তদনুযায়ী, কিন্তু মোতির মাও যখন সেই একই ভঙ্গিতে কথা বলে তখন তাহা বিসদৃশ লাগে বই কি? আসল কথা, প্রত্যেকটি চরিত্রই লেখকের নিজের বুদ্ধিদীপ্ত হ্রস্ব সূত্রায়িত ভাষায় কথায় বলে, নিজেদের ভাষায় নয়। কিন্তু, "যোগাযোগে" সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য ইহার কাব্যময় বিবৃতি ও ভাব-গভীর চরিত্র ও ঘটনা বিশ্লেষণ। বর্ণনা এক এক জায়গায় কবিত্বের উঁচু পর্দায় ঝঙ্কার তুলিয়াছে, এবং সে-বর্ণনা ভাব-গভীরতায়, জ্ঞানের দীপ্তিতে অতুল। ইহার দৃষ্টান্ত গ্রন্থের পাতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

"শেষের কবিতা" রচিত হয় ১৩৩৫ সালের গ্রীষ্মকালে, দক্ষিণ ভারতের পথে ও প্রবাসে। বাঙ্গালোরে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের বাড়ীতে ১৪ আষাঢ় বইখানির রচনা শেষ হয়, এবং সেই বৎসরই ভাদ্র হইতে চৈত্র পর্যন্ত "প্রবাসী" মাসিক পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

"গোরা"-পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে "শেষের কবিতা" নিঃসংশয়ে সর্বোত্তম সৃষ্টি, এবং একাধিক কারণে সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি। কবি-কল্পনার অতুলনীয় ঐশ্বর্যে, epigramএর দীপ্তির চরম ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতায়, হ্রস্ব অথচ অর্থগৌরবপূর্ণ, ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতে ও ভাষণে, বিষয়গত ঐক্যবোধে, সর্বোপরি দৃঢ় সংহত সমগ্রতায় "শেষের কবিতা"র মতন উপন্যাস বাঙ্‌লা সাহিত্যে আর রচিত হয় নাই। বৃহৎ ও মহৎ উপন্যাসের প্রসার ও পরিধি, বৃহত্তর মানব-সংসারের উত্থান-পতন ও সংগ্রাম-কোলাহলের বিচিত্র তরঙ্গলীলা, প্রবহমান কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর বৃহতের স্পর্শানুভূতির পরিচয়, মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণার আভাস অথবা বৃহৎ বস্তুপুঞ্জের অনিবার্য সবল প্রবাহের পরিচয় "শেষের কবিতা"য় নাই, একথা সত্য; লেখক সে-প্রয়াসও করেন নাই। আর "শেষের কবিতা"ই বা বলি কেন, এক "গোরা" ছাড়া সে-পরিচয় রবীন্দ্রনাথের আর কোনও উপন্যাসেই নাই। কিন্তু যে-চেষ্টা লেখক করিয়াছেন, অর্থাৎ 'লিরিক্' পরিকল্পনার মধ্যে এবং স্বল্প প্রসার ও পরিধির মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পরিবেশে নরনারীর প্রেমের স্বরূপ ও পরিণতি চিত্রণ, সেই চেষ্টা যে "শেষের কবিতা"য় সুন্দর ও সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, এ সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

"শেষের কবিতা"র বস্তুভূমি বাঙ্‌লাদেশের নাগর সমাজের অবসরপুষ্ট উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর চারিটি সুশিক্ষিত মার্জিত বুদ্ধি সংস্কৃতিপরায়ণ নরনারীর প্রেম ও যৌবনের বিচিত্র লীলা ও রহস্য। গল্পের মধ্যে বিস্ময়কর উত্তেজনা কিছুই নাই, ঘটনা যাহা ঘটিতেছে তাহার পরিমাণ খুবই কম, লোকের অথবা ঘটনার ভিড় নাই বলিলেই চলে, নাটকীয় আকস্মিকতাও কিছু নাই। অথচ ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এতই প্রাণাবেগ-চঞ্চল যে মনে হয় যেন সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রকে লঘুপাখায় উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে, অমিত ও লাবণ্যর প্রেমের বিপুল গতিবেগ যেন সঞ্চারিত হইয়াছে উপন্যাসের ভাষায় ও বর্ণনায়। বসিয়া বসিয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রেমালাপও যখন চলিতেছে কবিত্বময় অথচ তীক্ষ্ণ শাণিত ভাষায় তখনও এই গতি যেন অনুভব করিতে পারা যায়। ভাষা ও বিবৃতির এমন প্রাণাবেগ-চঞ্চল গতিসঞ্চার রবীন্দ্রনাথের আর কোনও উপন্যাসেই নাই, এমন কাব্যময় প্রকাশও নয়। বস্তুতঃ যে গীতধর্ম ও কাব্যের গতিরাগ "চতুরঙ্গে" সূচিত হইয়াছিল, "শেষের কবিতা"য় আসিয়া তাহা চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। "শেষের কবিতা" চরম কাব্যোপন্যাস।

"শেষের কবিতা" পড়িতে পড়িতে বার বার মনে হয়, লেখক কি যাদুকর! চোখের পলকে দেখি, ভাষার রূপ গিয়াছে বদ্‌লাইয়া, ভঙ্গি হইয়াছে নূতন; "চতুরঙ্গ-ঘরেবাইরে-যোগাযোগে"র রূপ ও ভঙ্গি অপেক্ষাও নূতনতর। লঘু গতিছন্দে চঞ্চল চলন, অথচ তাহারই মধ্যে দৃপ্ত শক্তি ও আভিজাত্যের স্পন্দন, লঘু ছন্দ লয়ে আশ্চর্য কঠিন সুগম্ভীর ভাব-গভীর বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণ! এমন বুদ্ধি-সাধা দৃঢ় ঋজুতা অথচ এমন সরস কবিত্বসুষমায় মণ্ডিত! আর, এ কি সূক্ষ্ম দৃষ্টির ক্ষমতা! এমন সুতীব্র দৃষ্টির আলোকে বিংশ শতকের বাঙলাদেশের নাগর-জীবনের একটি বিশেষ শিক্ষিত মার্জিত সংস্কৃতিবান্ মুষ্টিমেয় শ্রেণীর তরুণ-তরুণীদের অশনে বসনে চলনে বলনে গতিতে মতিতে কে কবে দেখিয়াছে, আর সেই দেখার সাহিত্যিক প্রকাশ কি সুতীক্ষ্ণ শাণিত শ্লেষ-কটাক্ষে কণ্টকিত! যে-সব সাধারণ তরুণ-তরুণী একই সঙ্গে একান্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও আবেগবিহ্বল, অথচ যাহারা তাহাদের নিজেদের মনের খবর নিজেরাই সুস্পষ্ট করিয়া জানে না, জানিলেও ভাষায় প্রকাশ করিবার পথ খুঁজিয়া পায় না, কৃতির মধ্যে রূপদান করিতে পারে না, সেই তরুণ-তরুণীকে অসাধারণত্বের বেদীতে বসাইয়া তাহাদের মনের ভাব-পর্যায়ের সূক্ষ্মতম তন্তুজালের মধ্যে এমন স্বচ্ছন্দ বিহার, এ বুঝি

শুধু কবিধর্মেই সম্ভব! প্রেমের ইঙ্গিতময় অতলগর্ত রহস্য, বিদ্যুৎশিখার দীপ্তি, সর্বব্যাপী বিস্তার, উজ্জ্বল আকস্মিক চমক, ইহার পরিপূর্ণ সার্থকতা ও সূক্ষ্ম অতৃপ্ত অভাববোধ, ইহার অবসাদ ও অন্তরায়, ইহার বিচিত্র বর্ণ সমস্তই চারিটি তরুণ-তরুণীর প্রতিদিনের জীবনের বাস্তবতার সংস্পর্শে আসিয়া এই একান্ত রূঢ় বস্তুসংসারের মধ্যেই রোমান্সের কল্পলোক সৃষ্টি করিয়াছে এবং দু'টি জগতকে মিলন-সূত্রে বাঁধিয়াছে। বাঙ্‌লার বর্তমান নাগর-জীবনের বহু অমিত রায়, বহু লাবণ্য, বহু কেতকী মিত্র, বহু শোভনলাল এই বইখানির মধ্যে তাহাদের ছায়া দেখিয়া হয়ত নিজেদের চিনিতে পারিয়াছে।

অনেক অমিত রায় হয়ত বুদ্ধির বিলাসে পরের হৃদয়ের তাপে নিজেকে গলাইয়া কল্পনার মূর্তি গড়িতে ব্যস্ত, কি যে সে চায় নিজেই জানে না। অনেক লাবণ্য হয়ত প্রথম যৌবনে বিদ্যার অহঙ্কারে, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধে যে-অঙ্কুর বড় হইতে পারিত তাহাকে চাপিয়া দেয়, বাড়িতে দেয় না, ভালবাসাকে দুর্বলতা মনে করিয়া নিজেকেই ধিক্কার দেয়; তারপর ভালবাসা তাহার শোধ নেয়, অভিমান হয় ধূলিসাৎ। অনেক কেতকী মিত্র হয়ত একজনের মুঠির চাপ হারাইয়া দশজনের মুঠির চাপে হইয়া উঠে কেটি মিটার, দশের মতন করিয়া সাজে। তাহারা সকলে এ-বইটিতে যুক্তি ও মুক্তির সন্ধান পাইয়াছে কিনা জানি না, না পাইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু একথা সত্য যে তাহারা ইহাতে নিজেদের ছায়া দেখিতে পাইয়াছে, নিজেদের ভাষা খুঁজিয়া পাইয়াছে।

একথা সত্য যে "শেষের কবিতা" কোন বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের মুষ্টিমেয় কোনও শ্রেণী বিশেষের চিত্র; সেই বিশেষ শ্রেণীর পরিচয়ে ইহার একটা পৃথক মূল্য আছে। কিন্তু শিক্ষিত মার্জিতবুদ্ধি সকল মানুষের কাছেই ইহার একটা অবিশেষ মূল্য আছে; সে মূল্য ইহার রসের মূল্য, ইহার সাহিত্যিক মূল্য। সে-কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রেমোপজীবি উপন্যাসে ইহার অন্য বিশেষ মূল্যও আছে। তাহার পরিচয় আমরা পাই অমিত ও লাবণ্যর, কেতকী ও শোভনলালের প্রেম-লীলার বিচিত্র বিকাশের অপূর্ব বিশ্লেষণের মধ্যে। এক সময় ছিল যখন মনের মোটা মোটা ভাবগুলি লইয়া সংসারের সুখ দুঃখ যথেষ্ট ছিল, সমস্যাও কিছু কম ছিল না। আজ সেগুলি সূক্ষ্ম হইয়া এতই বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, কিছুই আর সহজ নাই। বুদ্ধি যতই বাড়িতেছে,

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যতই সূক্ষ্ম হইতেছে, আমাদের মনন ও কল্পনা ততই আরও নূতন নূতন পথে সৃষ্টি ও প্রকাশের আনন্দ খুঁজিতেছে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেগ-বিহ্বলতারও কিছু অপ্রাচুর্য নাই। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভালবাসার আদান প্রদানের সম্বন্ধ লইয়া মনের মধ্যে ক্রমেই নানান্ সূক্ষ্ম অনুভূতি নূতন করিয়া আমাদের বোধ ও বুদ্ধির কাছে ধরা দিতেছে, যে-সব আলো অদৃশ্য ছিল তাহারা আজ গোচর হইতেছে, তাহাদের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য যতই বাড়িতেছে, মনের মধ্যে সমস্যা ততই জটিল হইয়া উঠিতেছে। আবার বিপদও আছে! আমাদের ধর্মের, সমাজের, রাষ্ট্রের সমস্যাগুলি আমরা চোখে দেখিতে পাই, বুদ্ধিতে ধরিতে পারি, তাহা লইয়া আলোচনাও করা চলে। কিন্তু মনের জটিল সমস্যাগুলি থাকে গহন তিমিরের তলে, যাহার সমস্যা সে নিজেই তাহার খবর জানেনা। কবির, সাহিত্যিকের তীব্র দৃষ্টি যখন সেগুলিকে টানিয়া আনিয়া রূপে ও রসে অভিষিক্ত করে তখন আমরা তাহার পরিচয় পাই, তখন বুঝিতে পারি মানবমনের জটিলতা কত সূক্ষ্ম, কত বিচিত্র! অথচ এই আমাদের সংসারটা কখনই এত সূক্ষ্ম জটিলতার উপযুক্ত নয়, তাহাকে স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুতও নয়।

একথা জানা সত্ত্বেও আমরা খুঁজি সমস্যার একটা মীমাংসা। "শেষের কবিতা"র মধ্যে প্রেমের যে সূক্ষ্ম লীলা বিচিত্র ভাব-পর্যায়ে অপূর্ব ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সে-দ্বন্দ্বের, সে-সমস্যার মীমাংসা কিছু আছে কিনা, এ প্রশ্ন সাহিত্য-বিচারের অন্তর্গত নয়। হয় ত আছে, হয় ত নাই! যদি থাকে, সে-মীমাংসা সকলের মীমাংসা না-ও হইতে পারে, সকলের মতের সঙ্গে না-ও মিলিতে পারে; যদি না থাকে তাহা হইলেও রসোদ্বোধনের কোন ক্ষতি হয় না। তাহা পরে আলোচনা করা যাইতে পারে। আপাততঃ আমাদের বিচার্য মনের যে-দ্বন্দ্বলীলার পরিচয় আমরা এই উপন্যাসে পাই, তাহা সার্থক রূপে ও রসে অভিষিক্ত হইয়া আমাদের উপলব্ধিতে সুস্পষ্ট ভাবে ধরা দিল কিনা, আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির কাছে তাহার আবেদন আসিয়া পৌঁছিল কি না, এবং ভাবের ও অনুভূতির তরঙ্গ-পর্যায়, ঘটনাবস্তুর বিন্যাস ও সমাবেশ কার্য-কারণ-শৃঙ্খলায় নিয়মিত হইয়াছে কি না।

"শেষের কবিতা"র বিষয়-বিন্যাসের মধ্যে একটু জটিলতা আছে। এ জটিলতার জন্য কতকটা দায়ী বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম তরঙ্গলীলা;

কতকটা কবির স্বেচ্ছাকৃতও বটে। তাহার কারণও আছে; প্রধান কারণ গল্পের সমগ্র গতি ও পরিণতিকে ঘোরাল করিয়া মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের রসটুকুকে ঘন করিয়া তুলিবার সজ্ঞান চেষ্টা। কিন্তু তাহার ফলে একটু অসুবিধা হইয়াছে এই যে, প্রত্যেক চরিত্রের পরস্পরের ব্যবহারের মধ্যে, তাঁহাদের মানসিক ভাব-পর্যায়ের মধ্যে যুক্তি-সঙ্গতির সূত্র মাঝে মাঝে যেন হারাইয়া যাইতে চায়, ঘটনা-বিন্যাসের পারম্পর্য খুঁজিয়া পাইতে যেন একটু দেরী হয়। সেই জন্যই একটু বিস্তৃত করিয়া ঘটনা-বিন্যাসের পারম্পর্য একটু গুছাইয়া লইতে পারিলে চরিত্রগুলির ব্যবহারের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া সহজ হইয়া উঠে; তখন অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায় এই সঙ্গতির কোথাও কিছু অভাব নাই।

["শেষের কবিতা"র গল্পবস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে অমিত ও লাবণ্যর মনের জটিল তন্তুজালকে আশ্রয় করিয়া; তাহাদের সমস্যাই সমগ্র গল্পটির সমস্যা। এই হিসাবে ইহারা দুইজনেই গল্পের প্রধান নায়ক ও নায়িকা। কিন্তু ইহাদের আড়ালে রহিয়াছে আরও দুই জন, কেতকী ও শোভনলাল। কেতকীর সঙ্গে অদৃশ্য এক বন্ধনে জড়াইয়া আছে অমিত, যে-অমিত নিজের দিক হইতে সে-বন্ধনকে একেবারে নীচে চাপিয়া দিয়াছে; আর শোভনলালের সঙ্গে হৃদয়ের এক কোণে একটি গ্রন্থি জড়াইয়া আছে লাবণ্যর, যে-লাবণ্য নিজের জ্ঞানের অহঙ্কারে, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধে নিজেকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা দুই জনেই নিজের মূঢ়তার কাছে বন্দী, নিজেদের কাছে অপরিচিত। এমন সময় হইল ইহাদের পরিচয়, সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের সূত্রপাত। কিন্তু "আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যেবেলায় দীপ জ্বালানোর আগে সকাল বেলায় সল্‌তে পাকানো।"]

শিলং-এ মোটরের ধাক্কা খাইয়া উপন্যাসের যেখানে সূত্রপাত, সেই সূত্রপাতের আগের পর্বটির অভিনয়ের স্থান অক্সফোর্ডে; সময় সাত বৎসর আগে। সেটা একটু ভাল করিয়াই জানা প্রয়োজন। তখন সেখানে এক জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যখন কথা বলিয়া উঠে, তারার ফুল যখন কণ্ঠ বেড়িয়া মালা গাঁথিয়া দেয়, মাঠে মাঠে ফুলের বৈচিত্র্যে ধরণী যখন তাহার ধৈর্য হারায়, তখন নদীর ধারে বসিয়া এক বাঙ্গালী তরুণের—অমিট্ রয়ের—ভব-বিলাসী চিত্ত পাশে এক আঠার বৎসর বয়সের বাঙালী তরুণীর মুখের

দিকে চাহিয়া তাহার ধৈর্য হারাইল। সমস্ত প্রকৃতি যখন প্রকাশের প্রাচুর্যে কম্পিত ও উদ্বেলিত, যখন সমস্ত চিত্ত আকাশ ও পৃথিবীর সৌন্দর্যের তরঙ্গে এক সঙ্গে নাচিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, তখন সরলা, হাস্তোজ্জ্বলা, ভাবাবেগারক্তা এক তরুণী সঙ্গিনীর—শ্রীমতী কেতকী মিত্রের—মুখের দিকে চাহিয়া এক মুহূর্তে মনে পড়িল, সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য মাধুর্য ইহার মধ্যে রূপ লইয়াছে তখন এক মুহূর্তে তাহার হাতখানি হাতের মধ্যে টানিয়া নিয়া একটি চাঁপার মত আঙুলে আংটি পরান অত্যন্ত সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিল, একথা তাহাকে বলা সহজ হইল, 'তোমাকে আমি পাইলাম, tender is the night, and haply the queen moon is on her throne'। সমস্ত প্রকৃতি তখন এই দুইটি ভাবমুগ্ধ হৃদয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। কল্পনায় উদ্দীপ্ত যে-যুবক, প্রত্যেক ভাব-তরঙ্গে কম্পিত যে-চিত্ত, সে-চিত্তে একবারও একথা মনে পড়ে না, এই বলার মধ্যে এই আংটি পরানর মধ্যে কোন দায় আছে, কোন বন্ধন আছে। চাঁদ যখন ডুবিল, ধরণী যখন তাহার ফুলের সজ্জা ঘুচাইল, চিত্তের মধ্যে ভাবের তরঙ্গ যখন বিলীন হইয়া গেল, তখন আর মনেও রহিল না, কোন্ এক ভাবোদ্বেলিত মুহূর্তে কে কবে কাহার হাতে আংটি পরাইয়া-দিয়াছিল। কারণ, যে আংটি পরাইয়াছিল সেই অমিতের কাছে এই মুহূর্তটাই সত্য, আংটি পরানর ব্যাপারটা একান্তই সাধারণ।

কিন্তু আঠার বছর বয়সের শ্রীমতী কেতকী মিত্র লিলি গাঙ্গুলী নয়। যে-মুহূর্তে অমিত তাহার আঙুলে আংটি পরাইয়াছিল, সেই মুহূর্তটি তাহার জীবনে অনন্তকালের জন্ম বাঁচিয়া রহিল। অমিতকে সে চিনিতে পারে নাই, সেই জন্মেই তাহার পরান আংটি এক মুহূর্তের জন্মও খুলিতে পারিল না, তাহার দেহের সঙ্গে তাহা এক হইয়া গেল। তখন সে বেশী কথা বলিতে শেখে নাই, কিন্তু সেই জ্যোৎস্না রাত্রিতে নদীর ধারে বসিয়া অমিতের আংটি পরানর মধ্যে সে ভবিষ্যৎ মিলনের সূচনা দেখিয়াছিল। সেই মুহূর্তটিকে সে অনন্ত জীবনের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া ধরিয়া রাখিবে, ইহাই ছিল তাহার মনের কথা। কিন্তু দু'দিন পরে অমিতের কাছে সেই মুহূর্তটি খসিয়া পড়িয়া গেল সমুদ্রের জলে, তাহার কোন হিসাবও রহিল না। তখন কেতকী মিত্রের উপর তাহার মুঠি গেল আল্‌গা হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে দশের মুঠির চাপ আসিয়া পড়িল ; তাহার উপর তাহার হৃদয় গেল মরিয়া, কাজেই মূর্তির বদল হইতে

দেরী হইল না। তখন "দাদার কায়দা কারখানার বকযন্ত্রপরম্পরাশোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই করা বিলিতি কৌলিন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স" গায়ে মাখিয়া শ্রীমতী কেতকী মিত্র হইয়া উঠিল কেটি মিটার। কিন্তু একথা বুঝিতে পারা শক্ত নয় যে, এই অত্যুগ্র বিলিতি কৌলিন্য কেতকী মিত্রের সহজাত সংস্কার বা প্রবৃত্তি নয়, তাহার বিফল কামনা-প্রসূত একটা বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসারই রূপান্তর। অমিতের ব্যবহারে তাহার মনের ক্ষোভ ও বেদনা, মানুষের উপর, সহজ বিশ্বাসের উপর এই নিষ্ঠুর আঘাত তাহার মনকে এমনই করিয়া মুচড়াইয়া মুষড়াইয়া দিল! কেটি মিটার কেতকী মিত্রের কৃচ্ছ্র-সাধনের রূপ, নিষ্ঠুর বেদনার রূপ, জীবনকে ব্যঙ্গ করিবার রূপ।

আর এক সলিতার জটের পাক লাগিয়া রহিল লাবণ্যর মনে। প্রথম যৌবনে তাহার মনের নরম জমিটুকু "গণিতে ইতিহাসে সিমেন্ট করে গাঁথা হয়েছে—খুব পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে—বাইরে থেকে আঁচড় লাগ্‌লে দাগ পড়ে না।" তাহারই সহপাঠী সুকুমার মুখচোরা শোভনলাল মনের এক প্রচ্ছন্ন বেদীতে শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর অগোচরে লাবণ্যর মূর্তি পূজা করিত। কিন্তু লাবণ্যর দিক হইতে সে-ভালবাসা স্বীকারে বাধা ছিল; সে-বাধা তাহার প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। শোভনের আত্ম-প্রকাশের সংকোচ তাহার কাছে দীনতারই নামান্তর, এই দীনতার কাছে লাবণ্য কিছুতেই নিজেকে বড় মনে না করিয়া পারে না। কাজেই তাহার কাছে তিরস্কৃত হইয়া শোভনলাল চলিয়া গেল দূরে। তাহার প্রতি একটা অন্ধ বিদ্বেষে লাবণ্যর মন ভরিয়া উঠিল।

তারপরের পর্বেই অমিত ও লাবণ্যর পরিচয়—শিলং পাহাড়ে। পরিচয়ে ক্রমে জমিয়া উঠিল আলাপ। লাবণ্যের হৃদয়ের তাপ লাগিল অমিতের মনে ও হৃদয়ে; বরফ গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে সুরু হইল, এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখে কথার উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিল। প্রকৃতির সকল সৃষ্টি তাহার কাছে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিল; সে স্পষ্ট করিয়া জানিতে পারিল যে, পাখী আছে, এমন কি তাহারা গানও গায়। একথা শুনিয়া লাবণ্য একটু হাসিয়াছিল; তাহার উত্তরে অমিত বলিয়াছিল, "এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ সমস্তই নতুন করে জান্‌চি, নিজেকেও। এর উপরে তো হাসি চলে না।" তারপর দ্রুত তাহার মন ও আবেগ লাবণ্যকে ঘিরিয়া ফেলিল, অমিত নিজেকে

নূতন করিয়া আবিষ্কার করিল, তাহার মনের কথাটি বাহির হইয়া পড়িল, for God's sake hold your tongue and let me love! তারপর একদিন যোগমায়া-দেবীর কাছে লাবণ্যকে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বসিল।

অমিতের আহ্বানে লাবণ্যর মন জাগিয়া উঠিল। বুদ্ধির অহঙ্কারের আচ্ছন্নতা হইতে, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ হইতে সে মুক্তিলাভ করিল; কিন্তু সে আহ্বানে এত সহজে সাড়া দিতে সে সাহস পাইল না। অমিতকে সে চিনিতে পারিয়াছিল; কি যে অমিত তাহার কাছে চায়, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু এটুকু সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে অমিত তাহার বুদ্ধি, তাহার রুচিটাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে, সেই বুদ্ধি, সেই রুচিটাকেই সে চাহিয়াছে। সে যেই তাহার মনকে স্পর্শ করিয়াছে অমনি তাহার মন অবিরাম অজস্র কথা বলিয়া উঠিয়াছে। সেই কথা দিয়াই অমিত লাবণ্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে; সেই হেতুই, যে-লাবণ্যকে সে ভালবাসিয়াছে সে-লাবণ্য অমিতেরই এক মনগড়া-মূর্তি। যে-লাবণ্য সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, সে-লাবণ্যকে অমিত দেখিতে পায় নাই। সেইজন্য লাবণ্যর ভয় একদিন এই বুদ্ধি ও রুচির মধ্যে যে-রস অমিত ভোগ করিয়াছে, সে-রস যখন নিঃশেষ হইয়া যাইবে, মন যখন ক্লান্ত হইবে, তখন সেই প্রতিদিনের সহজ জীবন স্রোতের মধ্যে ধরা পড়িবে, নিতান্ত সাধারণ মেয়ে এই লাবণ্য; সে লাবণ্য অমিতের নিজের সৃষ্টি নয়। এই সাধারণত্ব অমিতের সহ্য হইবে না, তাহার স্বভাবই তাহা নয়। একদিন অমিতের রুচি, অমিতের বুদ্ধির বিলাস লাবণ্যকে ছাড়াইয়া যাইবে, তখন অমিত ফিরিয়াও লাবণ্যকে ডাকিবে না, এই ভয় লাবণ্যকে পীড়িত করিয়া তুলিল। একথা মনে করিয়া সে দুঃখ পাইল, অমিত জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালিতেই ব্যস্ত; কিন্তু সে চায় জীবনের তাপ জীবনের কাজে লাগাইতে। অমিত তাহা পারে না; সে তাহার জীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয়ে জীবনকে শুধু রসাইয়া লয়, বুদ্ধি ও রুচির তৃষ্ণাকে মিটাইয়া লয়, গভীর ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। অমিত-চরিত্রের বিশ্লেষণ লাবণ্যর চেয়ে ভাল করিয়া করা বুঝি আর সম্ভব নয়! লাবণ্য তাহার প্রখর বুদ্ধির আলোকে সমস্তই খুব স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইল; সেই জন্যই যখন ধরা পড়িবার সময় আসিল তখন মনটা যেন কেমন মোচড় দিয়া উঠিল। তবু

তাহাকে বলিতেই হইল,—"মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বলবার জোর দিয়েচ। আজ তোমাকে যা বল্‌চি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জানো। জান্‌তে চাওনা পাছে যে-রস এখন ভোগ করচো তা'তে একটুও খট্‌কা বাঁধে। তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্য ফেরো, সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেই জন্যেই তুমি এসেচো"। একথা বলিতে লাবণ্যর ভিতরটা কাঁদিয়া উঠিল। অমিতের তৃষ্ণার তাপে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের পদ্মটি ফুটিয়াছে, সে-ও যে ভালবাসিতে পারে এ-সন্ধান সে পাইয়াছে। অমিত কত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল, "শুনে লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এলো। তবু একথা মনে না করে থাক্‌তে পারলে না যে, অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে। সেইটেই ওর জীবনের ফসল; তাতেই ও পায় আনন্দ।" যোগমায়া অনেক করিয়া বুঝাইলেন; কিন্তু লাবণ্য কিছুতেই একথা মনের মধ্যে স্বীকার করিতে পারিল না যে, অমিত তাহাকে বিবাহ করিয়া ঘর পাতিয়া সংসারী হইয়া সুখী হইতে পারিবে। এইটুকুমাত্র সে স্বীকার করিয়া লইল "যতটুকু আমি তার কাছে পেলেম, ততটুকুই আমার পরম লাভ।" সে যোগমায়াকে বলিল—"যতদিন পারি, না হয় ওঁর সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিলিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাক্‌বো। আর স্বপ্নই বা তাকে বল্‌বো কেন? সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েচে।" আর সেইটুকু দেখা দিয়াছে বলিয়াই তো লাবণ্য নিজেকে নূতন করিয়া জানিবার সুযোগ পাইল, জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে। সেই জন্যেই যোগমায়া যখন বলিলেন "আজ আমার বোধ হচ্ছে কোনকালে তোমাদের দুজনের দেখা না হলেই ভাল হোত", তখন লাবণ্য কিছুতেই সে-কথা স্বীকার করিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল—"না, না, তা' বলোনা। যা' হয়েচে তা' ছাড়া আর কিছু যে হ'তে পারতো এ আমি মনেও করতে পারিনে। এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান্তই শুক্‌নো,—কেবল বই পড়বো, আর পাস করবো, এমনি করেই আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলেম, আমিও ভালবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হোল এই আমার ঢের হয়েচে, মনে হয় এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েচি। এর চেয়ে আর কি চাই।"

অমিত আশা ছাড়িল না; দ্বিতীয়বার তাহার সাধনা সুরু হইল। যোগমায়া তাহাতে অমিতের সহায় হইলেন। কথায় কবিতায় লাবণ্যর অন্তরবেদী ছাইয়া গেল। এ নিবেদনের তরঙ্গ লাবণ্য ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। একদিন যোগমায়া "লাবণ্যকে অমিত'র পাশে দাঁড় করিয়ে তার ডান হাত অমিত'র ডান হাতের উপর রাখলেন। লাবণ্যর গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দু'জনের হাত বেঁধে বল্লেন তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক্।" সেইদিন অমিত লাবণ্যর হাতে আংটি পরাইয়া দিয়া বলিল, তোমাকে আমি পাইলাম। ঠিক হইয়া গেল দু'জনের বিবাহ হইবে। তারপর লাবণ্যকে নিয়া অমিত কত সোনার জালই বুনিল, কত কল্পনার মালাই গাঁথিল! কিন্তু লাবণ্যর মনে একটা সন্দেহ জাগিয়াই রহিল, পরমক্ষণে শুভদৃষ্টি ত ঘটিল, ইহার পরে বাসরঘর কি আছে?

এমন সময় কেটি তাহার পূর্বদাবী লইয়া অমিতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, মূর্তিমান্ ব্যাঘাতের মতো। তারপর প্রত্যাবর্তন, The Great Return.

অমিতকে ফিরিতে হইল কেটির কাছে, সুদীর্ঘ সাতবৎসর যে-কেটি অমিতের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছে, যে কেটি অমিতকে সাতবৎসরেও ভুলিতে পারে নাই। অমিতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে বলিতে কেটি মিত্তিরের গলা ভার হইয়া আসিল, অনেক কষ্টে সে চোখের জল সামলাইয়া লইল; তারপর আংটিটা টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় 'এনামেল করা' মুখের উপর দিয়া দরদর করিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তখন একমুহূর্তে আমরা কেটি মিত্তিরকে চিনিতে পারিলাম, বুঝিতে পারিলাম তাহার মধ্যে কেতকী মিত্র সাতবৎসর পরেও বাঁচিয়া আছে। একটিমাত্র তুলির রেখায় কেতকীর সত্যকার পরিচয় একমুহূর্তে পাইলাম। অমিতের জীবনে লাবণ্যকে প্রয়োজন ছিল; সেই প্রয়োজন শেষ করিয়া দিয়া লাবণ্য সরিয়া পড়িল; তাহার সঙ্গে অমিতের অন্তরের যে-সম্বন্ধ তাহার লেশমাত্র দায় অমিতকে বহন করিতে দিতে রাজী হইল না, কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে, লইয়া যাইতে পর্যন্ত চাহিল না। তারপর দেখি অমিত ফিরিল কেটির কাছে। কেতকীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া অমিত মনের মতন কাজ পাইল। "এতদিন অমিত মূর্তি গড়বার সখ মেটাত কথা দিয়ে, আজ পেয়েচে সজীব মানুষ।"

লাবণ্যকে ফিরিতে হইল শোভনলালের কাছে, যে-শোভনলাল প্রথম যৌবনে একদিন তাহার কাঁকন-পরা হাতে ধাক্কা খাইয়া ঘর হইতে পথের মধ্যে ছিটকাইয়া পড়িয়া কাপিশ হইতে কুমায়ুন, কাশ্মীর হইতে কামরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়াও তাহাকে ভুলিতে পারে নাই, যে-শোভনলাল তাহার কাছ হইতে শাস্তি পাইয়াছে বিস্তর, অথচ কি অপরাধ সে করিয়াছে, কোনওদিন তাহা বুঝিতে পারে নাই। ফিরিবার পথে লাবণ্যর মনে হইল, "যে-অঙ্কুরটা বড় হয়ে উঠ্‌তে পারতো, সেটা সে অযথা একদিন চেপে দিয়েছিল, বাড়তে দেয়নি। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার করে তাকে সফল করতে পারতো। সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব্ব; বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা; উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেইদিন আপন রূপের মুগ্ধতা দেখে ভালবাসাকে দুর্বলতা মনে করে ধিক্কার দিয়েচে। ভালবাসা আজ তার শোধ নিলো, অভিমান হ'লো ধূলিসাৎ। সেদিন যা সহজ হ'তে পার'তো নিঃশ্বাসের মতো, সরল হাসির মত, আজ তা' কঠিন হয়ে উঠলো,—সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতেও বুক ফেটে যায়। * * * তারপরে কতদিন গেচে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালবাসা এতোদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইলো? আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।" সেই মাহাত্ম্যের কাছে নত না হইয়া লাবণ্য থাকিতে পারিল না। সুদীর্ঘ বৎসর উৎকণ্ঠিত চিত্তে যে তাহার প্রতীক্ষা করিয়াছে, কৃষ্ণপক্ষ রাত্রে যে রজনীগন্ধার বৃন্ত দিয়া অর্ঘ্যের থালি সাজাইয়া গেল, যে ভালমন্দ সকল মিলাইয়া অসীম ক্ষমায় তাহাকে দেখে, তাহারই পূজায় সে নিজেকে উৎসর্গ করিতে গেল।

তারপর যাহা আছে তাহা শুধু পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহারের কৈফিয়ৎ। সে ব্যাখ্যা, সে কৈফিয়ৎ একান্তই তাহাদের নিজেদের, আর কাহারও নয়। সাহিত্যরসিকের কাছে তাহা অবান্তর। বোধ হয় গল্পের পূর্ণতার জন্যও এ ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সর্বশেষের সুন্দর কবিতাটিতে লাবণ্যর যে-কথাটি আছে, লাবণ্য অমিতের সঙ্গে তাহার ব্যবহারে প্রাণ দিয়া সেই কথাটিকেই ব্যক্ত করিয়াছে। অমিতের বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে গিয়া তাহার সমস্ত অন্তর কাঁদিয়া মরিয়াছে, তবু সে তাহার প্রতিদিনের সঙ্গিনী হইতে পারে নাই। এই একান্ত বেদনার মধ্যে এই কথাটিই প্রকাশ পাইয়াছে, এবং এই বেদনার মধ্যেই সে শোভনলালের সন্ধানও জানিয়াছে। অমিতকে

অথবা আমাদিগকে নূতন করিয়া এ কথা বলিবার কিছু অপেক্ষা ছিল না। তবু এ-কথা স্বীকার করিতেই হয় যে একথাগুলি লাবণ্যের সমস্ত অন্তর মন্থন করিয়া উৎসারিত; এর সঙ্গে লাবণ্যর আগাগোড়া একটা সঙ্গতি রহিয়াছে। কিন্তু অমিতের নিজের ব্যাখ্যায় আমি কিছুতেই সেই সঙ্গতি খুঁজিয়া পাইতেছি না। অমিত বলিল, "একদিন আমি সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ, আজ আমি ডানা গুটিয়ে পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেচি। কিন্তু আমার আকাশও রইলো।" এই কথারই টীকা করিতে হইল রূপক দিয়া, "কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালবাসারই কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবো, প্রতিদিন ব্যবহার করবো। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালবাসা সে রইলো দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।" বলিতে ইচ্ছা হয়, এ-ব্যাখ্যায়, এ-কৈফিয়তে যতটুকু সত্য আছে, সে শুধু ঐ বলার মধ্যেই, একথা যেন অমিতের অন্তর হইতে উৎসারিত নয়, তাহার চরিত্রের সঙ্গে যেন এ ব্যাখ্যার সঙ্গতি নাই। আরও সুস্পষ্ট করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, এ যেন রবীন্দ্রনাথের কথা, অমিতের কথা নয়। তাহার কারণ খুঁজিতেও বেশী দূরে যাইতে হয় না। লাবণ্য যে শোভনলালের কাছে ফিরিয়া গেল, তাহার মধ্যে একটা যুক্তিপারম্পর্য আছে; সে একটা নিগূঢ় বেদনার মধ্যে নিজের ও শোভনলালের সত্যকার পরিচয় পাইয়াছিল, কাজেই তখন তাহার মন ও হৃদয় শোভনলালকে আশ্রয় না করিয়া পারে নাই। তাহাদের মানসিক ভাব-পর্যায়ের বিকাশের মধ্যে সেটা এত সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া ফুটিয়াছে যে এসম্বন্ধে কোন দ্বিধাই আমাদের মনে জাগে না। কিন্তু অমিত যে কেটির কাছে ফিরিয়া আসিল এর মধ্যে কোনও সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কেটির জন্য তাহার মনের মধ্যে কোথাও যে কোন বেদনা জাগিয়াছিল, তাহার কাছে ফিরিবার জন্য সে যে অন্তর হইতে কোন আহ্বান পাইয়াছিল, একথার পরিচয় আমরা কোথাও পাইনা, না তাহার মনে, না তাহার কাজে। কেটি যেদিন অমিতের দেওয়া আংটি আঙুল হইতে হইতে খুলিয়া ফেলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া 'এনামেল করা' মুখের উপর চোখের জল নিয়া চলিয়া গেল, সেদিনও যে তাহার মনে বেদনার কোন আহ্বান জাগিয়াছিল তাহার খবর আমরা পাই না। অনেকেই হয়ত বলিবেন লাবণ্য তাহার চোখ ফুটাইয়াছিল, তখন সে তাহার ভুল বুঝিতে

পারিয়াছিল; কিন্তু এই ভুল বুঝিতে পারিবার পরিচয় কোথায়? আমার বলিতে ইচ্ছা হয়, অমিত স্বেচ্ছায় অন্তরের আহ্বানে কেটির কাছে ফিরে নাই, এমন কি বুদ্ধির প্রেরণাতেও নয়; রবীন্দ্রনাথ অমিতকে কেটির দিকে ফিরাইয়াছেন, এবং তাহার প্রধান কারণ কেটির প্রতি সুবিচার করিবার একটা চেষ্টা। এ-প্রত্যাবর্তন উপন্যাসের কোন প্রয়োজনে নয়, অন্য কোন কিছুর প্রয়োজনে।

"শেষের কবিতা"র চরিত্র চিত্রণ অপূর্ব, অদ্ভুত! প্রত্যেকটি চরিত্র সুস্পষ্ট রেখায় আঁকা, অপূর্ব সেই রেখার লীলা! কি প্রখর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি; ভিতরের ও বাহিরের প্রত্যেক ভাব ও ভঙ্গি লেখনীর মুখে চিত্রকরের তুলির চাইতেও সজীব হইয়া ফুটিয়াছে; অমিতের মনের পরিচয় আমরা পাই তাহার প্রত্যেক কথায়, চলনে বলনে, প্রত্যেক বুদ্ধি দীপ্তি epigramএর উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে, তাহার বেশে ভূষায়। এমন সুস্পষ্ট করিয়া একটি অসাধারণ মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় বাঙলা সাহিত্যে কমই দেখা যায়। অমিত রায়—বিকল্পে অমিটরে'—বাঙলা দেশের কোন বিশেষ শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিত মার্জিত তারুণ্যের একটা type, সে type-র মধ্যে অস্পষ্টতা কোথাও নাই। "মেয়েদের প্রতি ব্যবহারে সে উদাসীন নয়, বিশেষভাবে কারো প্রতি আসক্তিও দেখা যায় না, অথচ সাধারণভাবে কোথাও মধুর রসের অভাব ঘটে না। এক কথায় বল্‌তে গেলে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে।" এরকম অনেক কথার মধ্যে এই একটি। কিন্তু এই একটি কথায় অমিতের চরিত্রের একদিকের সমস্ত পরিচয়টুকু আছে। তারপর লিলি গাঙ্গুলীর একটি কথার মধ্যে, লাবণ্যর বিশ্লেষণের মধ্যে অমিতের যে পরিচয় আছে, সে-পরিচয় বহু কথা বলিয়াও জানাইবার সুবিধা ছিল না। অমিতের আর একদিকের পরিচয় লিলি গাঙ্গুলীর একটি কথায় আছে, "তারপরে সোনার মুহূর্তটি অন্য মনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগলা স্যাক্‌রার গড়া এমন তোমার কতো মুহূর্ত খসে পড়ে গেচে, ভুলে গেচো বলে তার হিসেব নেই।" লাবণ্য, যোগমায়া, কেতকী, শোভনলাল প্রত্যেকেই আপনাপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল! শোভনলালের সঙ্গে দেখা আমাদের খুব বেশী নয়; তাহার সম্বন্ধে খুব বেশী কথাও কিছু নাই। কিন্তু লাবণ্য যেদিন দুপুর বেলা নির্জন লাইব্রেরী ঘরে আসিয়া শোভনলালকে

তিরস্কার করিল, তখন শোভনলাল চোখ নীচু করিয়া শুধু বলিল, "আমাকে মাপ করবেন, আমি এখনি যাচ্ছি।" আর কিছু বলিল না, ধীরে ধীরে খাতাপত্র-গুলি সংগ্রহ করিয়া লইল; "হাত তার থর থর করে কাঁপচে; বোবা একটা ব্যথা বুকের পাঁজরগুলোকে ঠেলা দিয়ে উঠতে চায়, রাস্তা পায় না", সেই মুহূর্তে আমরা শোভনলালের সমস্ত পরিচয়টুকু পাইলাম। এর পর, যখন শোভনের কাছ হইতে একটি ছোট্ট চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল লাবণ্যর হাতে, সেই চিঠির ছু'টি কথায় তাহার ভিতর ও বাইরের কিছু আর জানিতে বাকী রহিল না। সর্বাপেক্ষা নৈপুণ্য ফুটিয়াছে কেতকীর চিত্রণে। তাহার দেখা ত মাত্র ছু'টি জায়গায় পাইলাম; কিন্তু অক্সফোর্ডে নদীর ধারে দেখা ত কোন পরিচয় নয়, কেটি মিটারের রূপও তাহার সত্যিকারের পরিচয় নয়; সে-পরিচয় যখন পাই তখন একটা ঘৃণায় আমাদের মন তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে, অথচ সেই যে আংটির বাজী হারিয়া অমিতকে দায়ী করিতে গিয়া কেটির গলা ভার হইয়া আসিল, অনেক কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া লইল; তারপর আংটি খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল, 'এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দর্‌দর্‌ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো'—এই একটি মাত্র রেখায় কেতকীর সাত বৎসরের পরিচয় আমরা এক মুহূর্তে পাই। তাহা ছাড়া অদ্ভুত চরিত্রবর্ণনার পরিচয় পাই, অপূর্ব সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাই যোগমায়া, লাবণ্য, লিসি, নরেন মিত্তির, কেটি মিত্তিরের চরিতরেখা অঙ্কনে। বর্ণনার এমন অদ্ভুত নৈপুণ্য, এমন সজীব, সত্য পরিচয়ের কৌশলের দৃষ্টান্ত বাঙ্‌লা সাহিত্যে খুব বেশী আছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। ইহাতে শুধু তাহাদের বাইরের বেশভূষা চালচলনের পরিচয় আমরা পাই না, তাহাদের মনের, তাহাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের পরিচয়ও পাই। সিসি, লিসি, নরেন মিত্তিরের প্রয়োজন হইয়াছে অমিত ও লাবণ্যকেই বিশেষ করিয়া ফুটাইবার জন্য, কেটিকেই ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য। ইহারা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে, যে-আবেষ্টনের পরিচয় না পাইলে বিভিন্ন চরিত্রের ভাব-পর্যায়ের ও সূক্ষ্ম মানসিক দ্বন্দ্বের সমস্যাটিকে, একের সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধটিকে বুঝিতে পারা কিছুতেই সম্ভব হইত না। যাহার যাহা সত্যকার পরিচয় তাহা প্রত্যেকের কথার মধ্যে, ভঙ্গির মধ্যে এমন সুস্পষ্ট, মনে হয় প্রত্যেকের জীবনের ব্যাখ্যা ও পরিচয় যেন তাহারা নিজেরাই রাখিয়া যাইতেছে

তাহাদের প্রতি মুহূর্তের পদক্ষেপে। তাহার উপর আর টীকার দরকার করে না।

"শেষের কবিতা"কে বলা হইয়াছে satire বা ব্যঙ্গ-সাহিত্য। একথাকে আমি স্বীকার করিয়া লইতে পারিলাম না। অমিতের বর্ণনায়, সিসি, লিসি, কেটি নরেনের বেশভূষা ও চলন-বলনের বর্ণনায়, তাহাদের প্রতি সুতীব্র শ্লেষ ও বক্র কটাক্ষে, রবিঠাকুরকে লইয়া নিবারণ চক্রবর্তীর বক্র ঈর্ষ্যার খেলায়, অমিতের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গবহুল কথায় বার্তায়, তাহার মিলন-লীলার স্বপ্ন-কল্পনায় আপাতদৃষ্টিতে তাহাই মনে হয়। মনে হয় কোন শ্রেণীবিশেষের ফ্যাসানগ্রস্ত যুবক-যুবতীদের বিলিতি উৎকট ফ্যাসনপ্রীতিকে, তাহাদের সৌখিন প্রেম-বিলাসকে বিদ্রূপ করিবার জন্য,সুতীব্র শ্লেষকটাক্ষের কষাঘাতে বিপর্যস্ত করিবার জন্যই বুঝি "শেষের কবিতা"র সৃষ্টি। হয়ত এই শ্লেষ ও কটাক্ষের, সুতীব্র কষাঘাতের প্রয়োজন আছে; কিন্তু "শেষের কবিতা"র সাহিত্য-বিচারে এইরূপ পরিচয় আমার সত্য মনে হয় না। আমার একান্ত বিশ্বাস, এই শ্লেষ, এই বিদ্রূপ-কটাক্ষ "শেষের কবিতা"র অত্যন্ত স্বল্প পরিচয়; শুধু এই পরিচয়ের জন্যই "শেষের কবিতা" রচিত হয় নাই। বইটির সমস্ত শ্লেষ-কটাক্ষের আবরণের ভিতর রহিয়াছে মানব মনের একটি জটিল সুগভীর সমস্যা, সে-সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে অমিত-লাবণ্য-কেতকী-শোভনলালের মর্মভেদ করিয়া। মানব-মনের বিচিত্র ভাব-পর্যায়ের জটিল উৎস হইতে "শেষের কবিতা" উৎসারিত হইয়াছে, এবং তাহা আশ্রয় করিয়াছে কয়েকটি বিশেষ মনের বিশেষ ধারাকে। তাহাদের মনকে আশ্রয় করিয়াই তাহাদের জীবনের জটিল সমস্যা নিয়াই রবীন্দ্রনাথ একটি গল্পের তন্তুজাল রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কবিচিত্তকে দোলা দিয়াছে মানব-মনের এই বিচিত্র অথচ জটিল সুগভীর প্রেম-সমস্যার লীলা; এই লীলাই তাঁহাকে "শেষের কবিতা"-রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে, ইহাই আমার বিশ্বাস। আধুনিক উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের সহর-জীবি, নিম্নস্তরের ইঙ্গবঙ্গ আবহাওয়া-পুষ্ট, ফ্যাসনবিলাসী শ্রেণী-বিশেষের নর-নারীর চালচলন, জীবনযাত্রা অথবা প্রেম-বিলাস রবীন্দ্রনাথকে এ গল্পের সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করে নাই, একথা কতকটা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়। এমন কি নিজেকে লইয়া যে-কৌতুক তিনি করিয়াছেন, তাহাও একটা অবান্তর কৌতুক বই আর কিছুই নয়, উপন্যাসের সঙ্গে এ-কৌতুকের কোন সম্বন্ধ

নাই। আর যে শ্লেষ ও কটাক্ষ শ্রেণী-বিশেষের তরুণ-তরুণীর প্রতি তিনি করিয়াছেন, তাহার দরকার হইয়াছে শুধু সেই শ্রেণী-বিশেষের আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন সৃষ্টি করা গল্পের খাতিরে প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই।

"শেষের কবিতা" যতবার পড়িয়াছি, ততবারই সকলের শেষে একটি কথা মনে হইয়াছে। আমি আগেই বলিয়াছি, "শেষের কবিতা" বাঙ্‌লা দেশের একান্ত সাম্প্রতিককালের কোন শ্রেণী-বিশেষের নরনারীর জটিল প্রেম লীলার এক অপূর্ব কাব্য। যে-বয়সের তরুণ-তরুণীর মানসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে রূপে রসে ফুটাইয়া তুলিলেন, সে-বয়স হইতে তিনি অনেক দূরে, বহুদিন তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন; যে-যুগে তিনি যুবক ছিলেন এবং যুবক-মনের দ্বন্দ্ব তাঁহার জানা সহজ ছিল সে-যুগে এসব সমস্যা ছিল না, সে-যুগের আবহাওয়া, আবেষ্টন এরকম ছিল না। কিন্তু "শেষের কবিতা" পড়িয়া মনে হয়, একি অদ্ভুত প্রতিভা, অপূর্ব বুদ্ধি ও কল্পনার ঐশ্বর্য, কি সূক্ষ্ম দৃষ্টির ক্ষমতা, যাহার বলে তিনি এক দুস্তর কালসমুদ্র পার হইয়া এই একান্ত আধুনিক বর্তমানের, এই অতি-আধুনিক শিক্ষিত, মার্জিত, উচ্চমধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণীর মন ও হৃদয়ের মধ্যে নিজের বাসা লইয়াছেন, এবং সেখানে প্রত্যেক অলিগলির সন্ধানও তাঁহার কাছে এত সহজ হইয়া উঠিয়াছে! এ কি চোখের ও বুদ্ধির দীপ্তি যাহার ফলে অতি সূক্ষ্মতম বৈশিষ্ট্যও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় না, অতি তীক্ষ্ণতম বাক্যও তার অর্থ হারায় না! আমরা যে-সব তরুণ-তরুণী বর্তমানে এই অতি-আধুনিক যুগে বাস করি, এমন করিয়া আমরাও দেখিনা, বুঝিনা, জানি না; যতটুকু দেখি, বুঝি বা জানি ততটুকুও এমন করিয়া বলিতে পারি না। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ কি আমাদের তরুণ-তরুণীদের চাইতেও অধিকতর তরুণ? সত্যই তাই, "শেষের কবিতা"র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে, বুদ্ধি ও কল্পনায় সর্বোপরি প্রেম-লীলার বোধ ও অনুভূতিতে এবং তাহার প্রকাশ-ক্ষমতায় তরুণদের মধ্যে তরুণতম, আধুনিকদের মধ্যে আধুনিকতম।

তবু, "শেষের কবিতা" বৃহৎ বা মহৎ উপন্যাস নয়। কেন নয়, সে-কারণ আমি আগেই একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। এখানে আর তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের সকল উপন্যাসই বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত, মার্জিতবুদ্ধি, সংস্কৃতি-সম্পন্ন ভদ্রলোকদের সমতল সংকীর্ণ নিস্তরঙ্গ স্বল্পায়তন জীবনযাত্রা লইয়া রচিত। এই জীবনযাত্রায় প্রেমই একমাত্র বস্তু যাহা কিছু তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সেই প্রেমই রবীন্দ্র-উপন্যাসের উপজীব্য। / মধ্যবিত্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ ও পরিণতি, ইহাই রবীন্দ্র-উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তুর সাহিত্যিক প্রকাশের মধ্যে ঘটনা অথবা চরিত্রের ভিড় সর্বত্রই কম। / এবং এক "গোরা" ছাড়া বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে এই বিষয়বস্তুর যোগ অন্যত্র বিশেষ কিছু আবিষ্কার করাও কঠিন। এই কারণেই রবীন্দ্র-উপন্যাসের বস্তুপটভূমির প্রসার ও পরিধি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আমাদের সমতল, স্বল্পায়তন সমাজ ও পারিবারিক জীবনও ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

"গোরা"-পরবর্তী উপন্যাসগুলির সামাজিক পটভূমিও একটু লক্ষ্য করা যাইতে পারে। "গোরা" ও আগেকার উপন্যাসগুলির, অবশ্য "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" ও "রাজর্ষি" বাদে, সামাজিক আশ্রয় সাধারণভাবে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসগুলির বিশেষভাবে "ঘরে বাইরে", "যোগাযোগ" ও "শেষের কবিতা"র আশ্রয় অবসরপুষ্ট নগর-নির্ভর উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী। বাঙ্‌লার সহরগুলিতে এবং কলিকাতায় ইতিমধ্যে এই উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে ; এই শ্রেণী একদিকে ক্ষীয়মাণ অভিজাত শ্রেণী ও অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পন্নতর সমৃদ্ধতর ব্যক্তিদের দ্বারা পুষ্ট। এই মুষ্টিমেয় শ্রেণীই শেষের দিক্‌কার উপন্যাসগুলির সামাজিক আশ্রয়। তাহাদের ধ্যান-ধারণা, তাহাদের জীবনযাত্রা অবলম্বনেই এই উপন্যাসগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। *

---

* প্রথম রচনাকাল ১৩৩৭ ; বর্তমানে অনেক স্থানে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত। কোন কোন অংশ "বিচিত্রা" (১৩৩৯) ও অন্যান্য দু' একটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

নাম-সূচী